সূচিপত্র

ভূমিকা

অন্যান্য ভারতীয় ভাষার মতোই হিন্দী সাহিত্যে উপন্যাসের বিকাশ ঘটে উনবিংশ শতাব্দীর উত্তরার্ধে। নানাদিক দিয়েই এটা ছিল বিপ্লবের যুগ ; ইংরেজদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি ভারতবাসীর শ্রদ্ধাই যে শুধু বাড়ে তাই নয়, আদান-প্রদানও রীতিমত শুরু হয়ে যায়। আধুনিক সাহিত্য বিকাশের প্রথম পদক্ষেপকে হিন্দীতে ভারতেন্দু-যুগ বলা হয়। হিন্দী সাহিত্যে কে প্রথম ঔপন্যাসিক, এ নিয়ে আজও বিতর্কের শেষ নেই। কিছুদিন আগেও লালা শ্রীনিবাসদাসের 'পরীক্ষা গুরু' (1882) উপন্যাসকেই হিন্দী ভাষার প্রথম মৌলিক উপন্যাস হিসেবে গণ্য করা হয়েছিল। কিন্তু আচার্য রামচন্দ্র শুক্লের 'হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে শ্রদ্ধারাম ফিলৌরীর 'ভাগবতী' (1877) উপন্যাসটিরও উল্লেখ আছে। বহুদিন এ উপন্যাসটি অপ্রকাশিত ছিল ; সম্প্রতি তা প্রকাশিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও তিনি স্বীকার করেছেন যে, ইংরেজী রচনাশৈলীর কায়দায় হিন্দীতে প্রথম মৌলিক উপন্যাস শ্রীনিবাসদাসের 'পরীক্ষা গুরু'।

প্রথম দিকের এই উপন্যাসের পরেই এল সামাজিক উপন্যাসের যুগ ; বালকৃষ্ণ ভট্ট, রাধাকৃষ্ণদাস, লজ্জারাম শর্মা, কিশোরীলাল গোস্বামী,

অযোধ্যাসিং উপাধ্যায় 'হরিওধ' এবং ব্রজনন্দন সহায় ও আরো কয়েক-জনের হাতে সামাজিক উপন্যাসের নতুন ধারার শুভ-আরম্ভ। এইসব লেখকেরা সামাজিক কুরীতিনীতি তাঁদের লেখায় ফুটিয়ে তুলেছেন আর সেইসঙ্গে তার প্রতিকারের ইঙ্গিতও দিয়েছেন। বালকৃষ্ণ ভট্টের উপন্যাস 'নতুন ব্রহ্মচারী'-র মূল উদ্দেশ্যই ছিল সুধী ছাত্রসমাজের মধ্যে নীতিবোধের উন্মেষ ঘটানো। এঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'শৌ অজান এক সুজান'-এর বিষয়বস্তুও অনেকটা এই ধরনের। কুসঙ্গ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ ও কুঅভ্যাস ত্যাগের ইঙ্গিতই তিনি এতে দিয়েছেন। গোহত্যার সমস্যাকে কেন্দ্র করেই লেখা হয়েছে রাধাকৃষ্ণদাসের 'নিঃসহায় হিন্দু' উপন্যাসটি। উপন্যাস হিসেবে হরিওধের 'ঠেট হিন্দি কা ঠাট্' বিশেষ উল্লেখযোগ্য, কারণ প্রেমচন্দের অনেক আগেই তিনি আভিজাত্যের দম্ভ ও অসমঞ্জস বিবাহের অশুভ পরিণতির চিত্র তুলে ধরেন।

এই-সমস্ত সমাজসংস্কারমূলক ও উপদেশধর্মী উপন্যাসের পর হিন্দী উপন্যাসে দ্বিতীয় এক অধ্যায় শুরু হয়। রূপকথা-ধর্মী ও অন্যান্য মনমাতানো রোমাঞ্চকর উপন্যাসের প্রেরণার মূল উৎস রয়েছে আরবী ও ফার্সী রচনার মধ্যে — বিশেষ করে 'তিলিস্ম-এ-হোশরুবা' ও 'দাস্তান-এ-অমীর হাম্‌জা'-তে। দেবকীনন্দন ক্ষত্রী, গোপালরাম গহমরী, কিশোরীলাল গোস্বামী এবং আরো অনেককেই এই ধরনের কাহিনীকার বলা যেতে পারে। এইসব উপন্যাসের বিষয়বস্তু রাজকুমার ও রাজ-কুমারীর প্রেমলীলা এবং এদের অনুচরবর্গের কর্মধারার শ্বাসরোধকর কাহিনী। কথা ও কাহিনীর জাল বিছিয়ে, ঘটনার পর ঘটনার বিন্যাসে, মূল ঘটনায় ফিরে আসার চাতুর্যে পাঠকের কৌতূহলকে ধরে রাখার প্রয়াসই এইসব উপন্যাসের প্রাণ। অনেক আজব কাহিনীর অবতারণা ও রোমাঞ্চকর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে মূল কাহিনীর সুরটি ফুটে ওঠে ;

কাহিনীর পরিণতি ঘটে প্রতিপক্ষের পরাজয়, যাদুকর খলনায়কের নিধনে আর নায়ক-নায়িকার মিলনে। পাঠকের কৌতূহল ও দুর্বার কল্পনা-বিলাসকে শেষ পর্যন্ত ধরে রাখাটাই এইসব উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য। এই ধরনের উপন্যাস রচয়িতাদের পরম্পরায় কিশোরীলাল গোস্বামী তৃতীয়-তম। এই যুগে একমাত্র তিনিই উপন্যাসের মধ্যে একাধারে সামাজিক, অলৌকিক, অপরাধমূলক, ঐতিহাসিক ও অন্যান্য ঘটনার সমাবেশ ঘটিয়েছেন। পূর্বসূরীদের তুলনায় তাঁর উপন্যাসে চরিত্রের বিকাশ ও ঘটনাবিন্যাসের বলিষ্ঠতা অনেক বেশি ফুটে উঠেছে। এঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলো মূলতঃ রোমান্স ; এতে ঐতিহাসিক ঘটনা ও পরিবেশের চেয়ে রোমান্সই বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। ভাষা ও রচনাশৈলীর দিক থেকে তাঁর উপন্যাসের মধ্যে পরিস্থিতি ও পরিবেশের নিপুণ বিন্যাস, সামাজিক প্রবাদ-প্রবচন ও আচার-ব্যবহারের সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটেছে। ভাষার দিক থেকে এ উপন্যাসগুলি খুবই স্মরণীয় কেননা এগুলি দিল্লীর বিশেষ ভাষা 'খড়ীবোলি'র বিকাশে অভূতপূর্ব অবদান জুগিয়েছে।

প্রেমচন্দ ও তাঁর পরের উপন্যাসের সাফল্য এবং অগ্রগতি দেখে এটাই মনে হয় যে, তাঁর আগের চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছরে হিন্দী উপন্যাসের গতি বেশ মন্থর ছিল। প্রেমচন্দের জীবনীকার পুত্র উল্লেখ করেছেন "কলম কা সেপাই : প্রেমচন্দ" বলে। প্রেমচাঁদের প্রথম দিকের লেখা উপন্যাসের কথা ছেড়ে দিলেও হিন্দীতে তাঁর সম্পূর্ণ রচনাকালের মেয়াদ আঠারো বছরের বেশি নয়, অর্থাৎ 1918 সাল থেকে 1938 সাল পর্যন্ত। এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি উপন্যাসের কাঠামোর মধ্যে এক বিপ্লব আনেন। শুধু আনন্দ দেওয়াই উপন্যাসের একমাত্র উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য — এটা তিনি মোটেই মানতে পারেন নি। তবুও তিনি সাবলীল ভাষা অক্ষুন্ন রেখে সমসাময়িক যুগের সমাজ ও

রাজনীতির বিশাল পটভূমিকা চিত্রিত করেছেন। কিষাণদের শোষণ আর নির্যাতনের কাহিনী তাঁর উপন্যাসে স্থান পেয়েছে ; এর বিরুদ্ধে তাঁর বলিষ্ঠ লেখনীতে জনজীবন ও মানবতার যে উদার আদর্শ রূপ পেয়েছে—তা শুধু হিন্দীতেই নয়, ভারতের সমস্ত ভাষার পক্ষেই এক অভূতপূর্ব অবদান। 'প্রেমাশ্রম', 'রঙ্গভূমি', 'কর্মভূমি', 'গোদান' ও আরো অনেক উপন্যাসে এই তুই দশকের ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক আর জনজাগরণের একটা সর্বাঙ্গীণ ও সার্থক শিল্পরূপ তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। এই কারণেই হয়তো এইসব উপন্যাসকে ডঃ নাম্বর সিং "কমেডি হিউমেন" বলেছেন।

প্রেমচন্দের পরবর্তী যুগে হিন্দী কথাসাহিত্যের সামাজিক ধারার এই প্রবাহকে যাঁরা আরো এগিয়ে নিয়ে গেছেন, তাঁদের মধ্যে যশ-পালকে অন্যতম বললে অতিশয়োক্তি হবে না। এও বলা যায় যে, প্রেমচাঁদ যেখানে থেমেছেন, যশপাল সেই কাজ সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়েছেন। তিনি উপন্যাসের মধ্যে এনেছেন রাজ-নৈতিক চেতনা, জনগণের উন্মেষ আর শোষণের বিরুদ্ধে সাহিত্যিকের রুখে দাঁড়াবার তুর্বার ক্ষমতা, সক্রিয় ও নিরপেক্ষ দৃষ্টি। জৈনেন্দ্র, অজ্ঞেয় আর ইলাচন্দ্র যোশীর মতো মনোবিজ্ঞানের তথাকথিত জটিল পথে সাহিত্যসৃষ্টি করা যশপালের উদ্দেশ্য ছিল না ; সে পথও তাঁর নয়। অহংবোধপীড়িত, অবাস্তব, কাল্পনিক ও বৈপ্লবিক চিন্তাধারায় বিক্ষুব্ধ কোনো নায়ক-নায়িকার চরিত্রকে তিনি চিত্রায়িত করেন নি। যশপালের বৈপ্লবিক চেতনার মূলে রয়েছে নিজের জীবনের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা, জীবন-দ্বন্দ্বের তাপদগ্ধ উপলব্ধি। ভগৎসিং, আজাদ, সুখদেব ও ভগবতীচরণের তিনি নিকট সংস্পর্শে এসেছিলেন। ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে তাঁর চরম বিদ্বেষ ও ঘৃণা ছিল। অভিজ্ঞতালব্ধ এই জীবনের এক আকর্ষণীয় ও প্রামাণিক চিত্র তিনি তাঁর আত্মকথা 'সিংহাবলোকনে'

ফুটিয়ে তুলেছেন। তিন-খণ্ডের এই আত্মকথা না পড়লে যশপালের জীবনদর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গির সম্যক ধারণা করা সম্ভবপর নয়; দেহের শিরা-উপশিরায় রক্ত-প্রবাহের ধারার মতো তাঁর উপন্যাসের মধ্য দিয়ে এই জীবনদর্শনই প্রাণ পেয়েছে।

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যশপালের উপন্যাসের মূল সুরই এই গভীর সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনা। এই রাজনৈতিক চেতনার জন্য তাঁকে কম সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয় নি; অ-মার্ক্সবাদীরা তো ছিলেনই, এমনকি মার্ক্সবাদী সমালোচকরাও বাদ যান নি। এঁদের মধ্যে মুখ্য হলেন ডঃ রামবিলাস শর্মা।

'দাদা কমরেড' (1941) থেকে নিয়ে "মেরী তেরী উসকী বাত" (1941) পর্যন্ত তাঁর এই সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনা কোনো-না-কোনো রূপে প্রকাশ পেয়েছে। 1929 থেকে 1933 সালের ভারতের রাজনৈতিক পটভূমিকায় 'দাদা কমরেড' উপন্যাসটি লেখা হয়েছে। এই সময়ে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের পৈশাচিক শক্তি পূর্ণমাত্রায় সচেষ্ট ও সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। বড়ো বড়ো বিপ্লবীদের হয় ফাঁসির কাঠগড়ায় প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছে আর নয়তো জেলের গর্ভে নিহিত হতে হয়েছে। আব যেসব ভাগ্যবানরা বাইরে থাকার সুযোগ পেয়েছিলেন, তাঁরা বিফল প্রয়াসে ক্ষুব্ধ ও হতাশ হয়ে ওঠেন। গান্ধীবাদী-সত্যাগ্রহের প্রতি এঁদের কোনোরকম আস্থা আর ছিল না। রাশিয়ার বিপ্লব আর লেনিনের বিশ্লেষণের সম্যক পরিচয় পেয়ে এঁরা বুঝতে পেরেছিলেন সন্ত্রাসবাদে মুক্তি নেই। এও বুঝেছিলেন যে জনতার সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া দেশব্যাপী বিপ্লব আনা সম্ভব নয়। 'দাদা কমরেডের' হরীশ এই মানসিকতার প্রচ্ছন্ন প্রতীক। নায়কের কার্যকলাপ ও চিন্তাধারার মধ্যে যশপালের অভিজ্ঞতা ও গভীর অনুভূতিই স্পষ্ট ছায়া ফেলেছে। সন্ত্রাসবাদ থেকে সাম্যবাদের মানসিক ক্রমবিকাশ দেখাতে গিয়ে

যশপাল 'দেশদ্রোহী' (1943), 'গীতা-পার্টি-কমরেড' (1946) আর 'মনুষ্য কে রূপ' (1949)— এই তিনখানি উপন্যাসে প্রধান কম্যুনিস্ট নায়ক বা নায়িকার ভূমিকায় ভগবানদাস খান্না, গীতা ও ভূষণের মতো চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। এইসব উপন্যাসের যেসব জায়গায় মধ্যবিত্ত যুবসমাজের রাজনৈতিক চিন্তাধারার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে সেখানে অনেক বিষয়ে কম্যুনিস্ট কর্মীদের ভ্রান্ত বদ্ধমূল ধারণা ও বিচারবোধের অযৌক্তিকতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দেখানো হয়েছে উপন্যাসের নায়ক-নায়িকারাও এই ভ্রান্ত ধারণার মধ্যে আবদ্ধ। যশপালের উপন্যাসের পাত্রপাত্রীরা স্বাভাবিক ও জীবন্ত, তাই মানুষের সুখদুঃখ ও দুর্বলতা নিয়েই পৃথিবীটাকে দেখে, বিচার করে। নিজেরা সৎ ও ইমানদার বলেই রাজনৈতিক আদর্শকে তলিয়ে দেখতে পারে এবং পারস্পরিক সম্বন্ধের যথার্থতা উপলব্ধি করে। এরা গভীর মানব-প্রেমে পরিপূর্ণ। 'দিব্যা' (1945) আর 'অমিতা' (1956) উপন্যাস দুটি ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত। পুরুষ-শাসিত সমাজে নারী এবং অভিজাত সমাজে ক্রীতদাস কীভাবে অবাধ গতিতে শোষিত হয় তা নিয়েই এই দুই উপন্যাস। এতে নারীসমাজের স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃতি পেয়েছে। ক্রীতদাস-শোষণের একটা অমানুষিক দিক তাঁর নিপুণ রচনাশৈলীতে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। 'অমিতা'-র পটভূমিকা অশোকের কলিঙ্গ যুদ্ধ ; এই পটে বিশ্বশান্তি সমস্যার বিভিন্ন দিক নিয়ে সাম্রাজ্য-বিস্তারের নীতির বিরোধিতা করা হয়েছে।

সামাজিক উপন্যাসগুলির মধ্যে 'ঝুটা সচ' (দুই খণ্ডে : 1954 ও 1960) যশপালের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। দেশ বিভাগের মর্মান্তিক কাহিনী নিয়েই এই উপন্যাস। এই উপন্যাসের নায়ক জয়দেবপুরী। তার মধ্য দিয়ে একটা বিরাট বিপদের ইঙ্গিত দিয়ে যশপাল দেখিয়েছেন যে, সুবিধাবাদীর জীবনতৃষ্ণায় মধ্যবিত্ত যুবকের সাহিত্যিক চেতনা ও

বৈপ্লবিক বিচারবুদ্ধি কিভাবে নষ্ট হয়ে যায় আর সে এই ধরনের আদর্শজীবন বিসর্জন দিয়ে কতটা ঘৃণ্য ও সমাজবিরোধী জীবন যাপন করতে পারে। হিন্দু ও মুসলমান নেতাদের স্বার্থবুদ্ধির সংঘাতে ও ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীর ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তে পড়ে ভারতীয় জনতা কিভাবে নিষ্পেষিত হচ্ছে— এরই এক মর্মস্পর্শী জীবন্ত রূপ এই উপন্যাসে ফুটে উঠেছে; এতে হিন্দু ও মুসলমান দুইই আছে। তাঁর দ্বিতীয় খণ্ড, 'দেশ ও ভবিষ্যৎ' উপন্যাসে, ঘৃণিত বাস্তবতার স্বরূপ এক নতুন দেশের মাটিকে কিভাবে কলুষিত করছে, সত্যতিলকধারী নেতাদের মধ্য দিয়ে তা যশপাল নির্মমভাবে উদ্ঘাটন করেছেন। 'ঝুটা সচ' উপন্যাসে এই বিশ্বাস ও আস্থা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, "দেশের ভবিষ্যৎ কিছু সংখ্যক নেতার হাতে নয়··· জনতার হাতে।"

'মনুষ্য কে রূপ-'এ রয়েছে এক পাহাড়ী বিধবা যুবতীর কাহিনী, নাম সোমা। বিভিন্ন পরিস্থিতির পাকচক্রে একটি মানুষের রূপ যে কত বদলায়, তা নিয়েই এই উপন্যাস। সমাজের নানান স্তরের নানান মানুষের কত রূপ হতে পারে তাও এতে আছে। বিরাট বড়ো একটা ক্যানভাসে লেখা এই উপন্যাস— কাংড়ার পাহাড়ী পথে শুরু আর বোম্বাইয়ে এর শেষ; মাঝখানে বারবার এসেছে ধর্মশালা, লাহোর আর সিমলার পরিবেশ। পাহাড়ী সড়কে ধনসিং-এর ট্রাক একটি বউকে বাঁচাতে গিয়ে দুর্ঘটনায় পড়ে বিকল হয়ে যায়— এই নিয়ে কাহিনীর শুরু। ভীরু গ্রাম্য বধূ সোমা— কীভাবে ও কোন্ কোন্ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে একদিন নাম-করা চিত্রতারকা পাহাড়ন হয়ে উঠল— তা দিয়েই এই উপন্যাসের শেষ। ভাগ্য-বিপর্যয়ে নিষ্পেষিত যে সোমা একদিন ধনসিং-এর প্রেমের বন্যায় ভেসে গিয়ে নিজের ঘর ছাড়ল সেই সোমাই শেষ পর্যন্ত ধনসিংকে চিনতে পেরেও চিনতে না-পারার ভাণ করে।

প্রেমের শাশ্বত আদর্শ ও অপরিবর্তনীয় রূপের যাঁরা পূজারী—যশপাল তাঁদের দলে নন ; তিনি এটাই বিশ্বাস করেন যে, প্রেম সামাজিক ও আর্থিক পরিস্থিতির উপরেই নির্ভরশীল ; পরিস্থিতির পরিবর্তন থেকে প্রেম প্রভাবমুক্ত নয়। তাই ভূষণ আর মনোরমার প্রসঙ্গেও দুটি মনের ভিন্ন সমাজের অনুভূতি ছিল বলেই মনোরমা শত আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা থাকা সত্ত্বেও ভূষণকে দূরে ঠেলে দেয়। এই সমাজ-ভেদবুদ্ধির প্রভাবে মনোরমা স্বল্প পরিচিত নপুংসক সুতলী-ওয়ালাকে বিয়ে করে আর অল্প দিনের মধ্যে তাদের বিচ্ছেদ ঘনিয়ে আসে। ভিন্ন ভিন্ন পথে চলতে অভ্যস্ত স্বয়ংসম্পূর্ণতার আদর্শে আস্থাবান যুবক-যুবতীর মধ্য দিয়ে যশপাল নারীসমাজের আত্মনির্ভরতার প্রশ্নই তোলেন। তিনি বলতে চান যে, স্বাবলম্বী ও আর্থিক দিক থেকে আত্মনির্ভরশীল মেয়েরাই বিচিত্র ও বহুবিধ সামাজিক শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার শক্তি ও সামর্থ্য রাখে।

ব্যারিস্টার জগদীশ সরোলার ক্লাবের সঙ্গীদের ও সুতলীওয়ালার মতো চরিত্রের রূপায়ণে যশপাল সমাজের তথাকথিত "প্রতিষ্ঠিত লোকদের" নানারকম সামাজিক ও নৈতিক পদস্খলন দেখিয়েছেন। ব্যঙ্গ ও কৌতুকে যশপাল সিদ্ধহস্ত। এই সজীব ব্যঙ্গচিত্র ফুটিয়ে তুলতে তিনি নিজের জীবনলব্ধ অভিজ্ঞতাকেই কাজে লাগান। ঠিক সেইভাবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দুঃসহ দিনগুলিতে সৈন্যবাহিনী ও পুলিশের বীভৎস অত্যাচার ও আতঙ্ক, সরকারের বিভ্রান্তনীতি আর সেনাবাহিনীতে সাদা ও কালো চামড়ার বিভেদনীতি যশপাল সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছেন। যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম সাধারণ মানুষকে কিভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে — তা তাঁর রচনাশৈলীতে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

পাহাড়ের অভাব-অনটনের জীবনই হোক অথবা ফিল্মের ঐশ্বর্যপূর্ণ জীবন হোক — সব সময়ে পুরুষজাতটা মহিলাদের অসহায়তার সুযোগ

নিতে চায়। যুদ্ধে স্বামী মারা যায়; শ্বশুরবাড়িতে অমানুষিক শক্তি ও সামর্থ্য নিয়ে জনে জনে সেবা করেও সোমার, হু'বেলা অন্ন জোটে না। বিনিময়ে মন্নুসাহের পরামর্শে তার শ্বশুর-শাশুড়ী তাকে বেচে দিতে চায়। বোম্বাইতে যখন ওর জীবনে সচ্ছলতা এল, তখনও সে মনের জ্বালায় বলে উঠেছিল— 'এ দুনিয়ায় আমার গলা জড়িয়ে সবাই আমাকে নিয়ে খেলা করতে চায়। কিন্তু হাতটা বাড়িয়ে কেউ আমাকে একটুও সাহায্য করতে রাজি নয়।' এরকম সামাজিক অসংগতি ও অন্তর্দ্বন্দ্বের বাস্তব ও নিখুঁত চিত্র তুলে ধরেন যশপাল। মনোরমার তালাক দেবার প্রসঙ্গে পার্টি-দপ্তরের সঙ্গীরা, বিশেষ করে কমরেড নীতা যেভাবে তার রুক্ষ স্বভাবটাকে কৌতুকময় করে তোলে— তাতে যশপালের জীবনদর্শন আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিচ্ছেদ ঘটার পরে মনোরমার মনে সুখ-দুঃখের মিশ্র অনুভূতি; একটু পরেই আমরা দেখতে পাই মনোরমা নিজেকে প্রবোধ দিচ্ছে— 'মুক্তি পেতে হলে মনটাকে কুসংস্কার থেকে মুক্ত করা চাই।'

সর্বশেষে 'মনুষ্য কে রূপ'-এর ভাষাশৈলী নিয়ে সংক্ষেপে কিছু বলা প্রয়োজন। এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হবার পরে ধনসিং ও তার সঙ্গীদের, ট্রাক ড্রাইভার ও ক্লিনারদের নিজস্ব বাচনভঙ্গি, বিশেষ করে ওদের কথায় কথায় গালিগালাজ করার ভাষা নিয়ে প্রবল একটা ঝড় ওঠে। অনেকে এইসব অভদ্রোচিত খোলাখুলি গালিগালাজ রুচিকর নয় বলে বিরূপ সমালোচনা করে বলেছেন, এসব বিকৃত অভিজ্ঞতাজাত। কিন্তু 'মনুষ্য কে রূপে' আরো অনেক চরিত্র আছেন যাঁরা মুখ খারাপ করেন না। পরিবেশ অনুযায়ীই মানুষের ভাষা; আর সেই পরিবেশকেই জীবন্ত করে তুলতে পারে বাস্তবমুখী ভাষা। ভাষা নিজেই স্বতন্ত্র – শ্লীল নয়, অশ্লীলও নয়। বিভিন্ন পরিবেশে এর বিভিন্ন অর্থ; বিশেষ বিশেষ পরিবেশকে ঠিকমত ফুটিয়ে তুলতে পারছে কি-না সেটাই ভাষার

কষ্টিপাথর। শাসনতন্ত্র, শাসনব্যবস্থা ও অন্যান্য সমস্যার বিরোধ থেকে শুরু করে, এমন-কি ভাষার আদর্শ নিয়েও যশপাল তাঁর উপন্যাসে লিখেছেন ; তাই লোকে তাঁকে যুব-সমস্যার একজন লেখক বলে গণ্য করে। আর এই-সমস্ত উপন্যাসের মধ্যেই তাঁর বলিষ্ঠ লেখনীর শক্তি নিহিত আছে এবং এই উৎসকে আমাদের খুঁজে বার করতে হবে।

-- মধুরেশ

পাহাড়ের রাস্তায়

ইংরেজ সরকার তো স্থির করে ফেললেন যে, পাঠানকোটের আগে পাহাড়ী এলাকায় রেলগাড়ি চালু করতে হবে। কাংড়া পাহাড়ের পাঁজর টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে তৈরি হল রাস্তা, রেল লাইন। ছোট ছোট ইঞ্জিন পেছনে ছোট ছোট রেলগাড়ি বেঁধে নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে জোরে জোরে 'ছক ছক' নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে এগিয়ে চলে। দম নিয়ে নিয়ে ধোঁয়া ছাড়ে। রেলগাড়ি লাইন বেয়ে পাহাড়ের বিশাল শরীরের গা ঘেঁষে বিছের মতো সর্পিল গতিতে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলে। মানুষের এই অহংকার ও দুঃসাহসের প্রতিরোধ করে পাহাড়, তার গর্বিত সত্তা। গায়ে বসা পোকামাকড় তাড়াতে মহিষ যেমন শরীরটাকে নাচাতে থাকে তেমনি এই বিশাল পাহাড়ের শরীরের ওপর দিয়ে রেলগাড়িটা সরসর করে এগিয়ে গেলে সেও যেন শরীরটাকে একটু নাড়াচাড়া দিয়ে ওঠে। আর পাহাড়ের কোন একটা অংশ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে লাইনের ওপর ; কখনও-বা ফাটল ধরে। লোহার লাইনের বেষ্টন কাঁচা সুতোর মতো ছিঁড়ে যায়, রাস্তা ভেঙে পড়ে। অমনি সরকার বৈজ্‌নাথ থেকে রেল লাইন গুটিয়ে শুধু নগরোটা পর্যন্ত রেলপথ চালু রাখার সঙ্কল্প করেন।

এখনও পাঠানকোট থেকে কুলু-মানালী পর্যন্ত সওয়া দু'শো মাইলের বেশি পথ যাত্রীরা পেরোয় সড়কের পথে ; মোটরগাড়ির সড়কও আবার তেমনি। মোটরগাড়ি যখন-তখন বিগড়ে যায়। যারা খোলামেলা ময়দানের বাসিন্দা, তারা মোটরগাড়ি বিগড়োতে দেখলে একটু অবাক হবে, হয়তো-বা ধাঁধায় পড়ে যাবে। কিন্তু ভুক্তভোগীদের কথা আলাদা। গাড়িটা হাঁ করে দাঁড়িয়ে পড়ার দৃশ্যটা বোঝাতে একটা তুলনা দেওয়া যেতে পারে ; যেন একটা উঁচু দোলনায় অনবরত কেউ ঝুলছে তো ঝুলছেই। গোটা পথটার বেশির ভাগই চড়াই-উৎড়াই। এই পথের গা বেয়ে ঢাল। একটু বাদে বাদে বাঁক। সবুজ ক্ষেত আর ফুলে ভরা টিলাগুলি যেন উঁচু প্রাচীরের মত দাঁড়িয়ে। টিলা দেখতে কেউ যদি মেহনত্ করে, তবে সড়াৎ করে টুপিটাই পড়ে যাবার ভয়। রাস্তার অন্য দিকে পাথরে-ভরা পাহাড়ী গর্ত। পঞ্চাশ-ষাট হাত গভীরে সাদা সাদা ফেনা তুলে বয়ে যাচ্ছে নীল ধারা। আঁকাবাঁকা পথের কখনও সামনে, ডানে-বাঁয়ে, আবার পেছনের পাহাড়ের চটিতে সুবিস্তৃত বরফ দেখে মনে হয় যেন রৌদ্রের তেজ থেকে বাঁচতে পাহাড়গুলি তাদের মুখেচোখে সাদা গামছা এঁটে দিয়েছে।

কোথাও-বা পথের কিনার দিয়ে ছোট ছোট পাহাড়ী ক্ষেত চওড়া চওড়া সিঁড়ির মতো নেমে গেছে। এই ক্ষেতে বা ঢালে পাহাড়ী পশু চড়ে বেড়ায়। এরা রাস্তা দিয়ে ছুটে চলে। আঁকাবাঁকা পথে চলন্ত মোটরগাড়ির দিকে কৌতূহলী ঝকমকে চোখে তাকায় : নিষ্পলক দৃষ্টিতে ছোট ছোট পাহাড়ী গোরু ও কখনও-বা ভেড়া-ছাগল, খচ্চর পথের কিনারের সছিদ্র প্রাচীর ডিঙিয়ে রাস্তায় নেমে আসে। মোটরের সঙ্গে যেন তারা পরিচিত হতে চায় কিংবা পরিহাস করতেই যেন তাদের আগমন। মোটরের সামনে এসে মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ায়। এরা তাকিয়ে দেখে মোটরগুলিকে আর ড্রাইভাররা আশঙ্কায় তাকিয়ে দেখে

এই পশুদের গতিবিধি। অভ্যস্ত মিলন। মুহূর্তের জন্য পশুরা গাড়ির সঙ্গে চোখ মেলায়। চমকে ওঠে। ভয়ে কুঁকড়ে যায়, শিঙ-দুটো অল্প একটু নেড়ে দেখায়। মোটরটাও একটু ভ্রূ কুঁচকিয়ে এক পলকে রাস্তা কেটে বেরিয়ে যায়। পশুরা আবার সছিদ্র প্রাচীর ‿পকে খেতে বা ঢালে লাফিয়ে পড়ে।

মুসাফিররা এ দৃশ্য দেখে মোটেই খুশী হয় না। চক্কর খাওয়া মোটরের চালচলন দেখে তাদের মাথাটাও ঘুরে ওঠে; দুই হাতে মাথা চেপে ধরে। কাপড়ের কোণ দিয়ে মুখ ঢাকে। সমস্ত রোমকূপে অদ্ভুত একটা শিহরণ জাগে। ডাইনে কিংবা বাঁয়ে মোটরটা যদি এক ইঞ্চিও হেলে পড়ে, তবে তার আর পাত্তা পাওয়া যাবে না। মুসাফিররা ঝুঁকি নিয়ে রাস্তা পার হয়। এই পথ দিয়ে রোজ যে-সব ড্রাইভার যাতায়াত করে তাদের অবস্থা না জানি কতই সঙ্গীন। ওরা পথের ওপর নিজেদের সতর্ক ও জাগ্রত দৃষ্টি বিছিয়ে রাখে। কখনও-বা এরা কোন একটা গানের কলি ভাঁজতে থাকে। সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে গাড়ি নিয়ে সাবধানে এগিয়ে যায়। সব ব্যাপারটাই এদের যেন অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

ধনসিং দেড় বছর ধরে এই পথে গাড়ি চালাচ্ছে। ঠাণ্ডার দিন। দুপুরের একটু পরে সে কুলু থেকে রওনা দিয়েছিল। মণ্ডী পেরিয়ে এখন অনেকটা ঢালু রাস্তায় এসে পড়েছে। এরপর বৈজ্‌নাথ পর্যন্ত অনেকটা নিশ্চিন্ত; নিশ্চিন্ত হলেও অভ্যাসবশতঃ সাবধানে চলছিল। পথের মাঝখানে নিবদ্ধ ওর অপলক দৃষ্টি। লরির চাকার নীচে সড়কটা যেন মেসিনের রোলারে-জড়ানো পট্টির মতো পিছলে পিছলে এগিয়ে চলেছে। ওর আঙুলগুলো শক্তভাবে আঁকড়ে আছে স্টিয়ারিং-এ; সড়কের অবস্থা বুঝে ও স্টিয়ারিং ঘোরাচ্ছে, কখনও-বা সামলে নিচ্ছে।

পথের বাঁদিকে বিছানো উপত্যকার কিনার দিয়ে লরিটা পাহাড়ের বুক চিরে এগিয়ে যাচ্ছিল। দু'পাশের পাহাড়ের মাঝখানের সমতল

ভূমির সবুজ খেতে ঠাণ্ডার স্পর্শ লেগে হলুদ রঙটায় কেমন যেন একটা সোনালী ছোপ লেগেছে। সূর্য পশ্চিম দিগন্তে ঢলে পড়েছে ; পশ্চিম সীমান্ত দেবদারু গাছে ভরা পাহাড়ের বালিশে সূর্যটা যেন মাথা রেখে শুয়ে পড়তে চায়। বৈজ্‌নাথ পর্যন্ত ধনসিংকে আর নয় মাইল পথ পেরোতে হবে। যাত্রীদের হাঁকডাক ও চেঁচামেচির বালাই নেই। লরিটাতে বোঝাই আলুর বস্তা।

লরির ক্লিনার কর্মু, ধনসিং-এর সহকারী। পেছনের দিকে আলুর পাহাড়ের ওপর পাখির মত একটা বাসা তৈরি করে সে দিব্যি নিশ্চিন্তে শুয়ে আছে। উপরের দিকে মুখ। কানে আঙুল দিয়ে প্রাণের আবেগে গলা ছেড়ে সে একটা পাহাড়ী গান গাইছিল ঃ—

"দিলাং দিয়াং কুন্তিয়াং খুলাই কনে বো,
প্রিতাং দিয়াং রীতাং ভুলাই কনে বো,
দিত্তা বিছোড়া বন্দিয়া জো।

[মনের দরজার ছেকল খুলে, প্রেম-প্রীতির রীতি ভুলে, দিয়েছে ...কে ছেড়ে....]

কর্মুর গলায় বেশ সুর, আবার দরদও। লরির ঝাঁকানিতে ওর সুরেলা গলা কাঁপছে। লরির গতি আর ইঞ্জিনের শব্দ একসঙ্গে যেন ওর গানের সঙ্গে তাল দিচ্ছে। গলা ফাটিয়ে গান গাইছে বটে কিন্তু লরিটার প্রচণ্ড বেগ ওর আওয়াজটাকে ঝাপটা দিয়ে পেছনে ছুঁড়ে মারছে। উপত্যকা ছুঁয়ে এসে সুরটা কোমল হয়ে ধনসিং-এর কানে বাজছে। ওর হাতে স্টিয়ারিং। পা ছুঁয়ে আছে প্যাডেল। তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি মেলে ধরেছে রাস্তায়। কানে ভেসে আসছে গান। মন ডুব দিয়েছে গানের মর্মে। ওর সতর্ক দৃষ্টিতে ছিল কেমন একটা উদাস ভাব, চেহারায় মগ্নতা।

লরির সামনে হঠাৎ কয়েকটি ছাগল ও ভেড়া এসে পড়ল। ধনসিং

সঙ্গে সঙ্গে হর্ন বাজাল। ছাগল ও ভেড়াগুলি একটু ঘুরে রাস্তার প্রাচীরের দিকে উঠে গেল। কিন্তু দুটো ছোট্ট ভেড়া হঠাৎ তাদের পা তুলে লরির সামনে লাফিয়ে পড়ল আর তাদের সঙ্গে ছায়ার মত একটি বউ।

মেসিনের মত তড়িৎ গতিতে ধনসিং তার পা দিয়ে চেপে ধরল ক্লাচ ও ব্রেক। প্রচণ্ড বাধা পেয়ে গাড়িটা একটা লাফ দিয়ে থেমে গেল। লরির প্রতিটি অংশ যেন ভেঙে চৌচির। ধনসিং-এর প্রতিটি রোমকূপ দিয়ে ঘাম ছুটছিল। বউটি মাডগার্ডের ধাক্কা খেয়ে উল্টে পড়ল। ভেড়ার ছটপটে পা দু'টো এখনও তার হাতে। অন্য ভেড়াটি এক লাফে সড়ক পেরিয়ে চটিতে উঠে গেছে, এই খেলায় যেন মজা পেয়ে ম্যাঁ ম্যাঁ করে ডাকছে। ভেড়াকে অক্ষত দেখে বউটি তার পা দু'টো ছেড়ে দিল। আঁচল সামলে উঠে পড়ার চেষ্টা করে ড্রাইভারের দিকে তাকাল।

ধনসিং-এর ক্রোধ তখন মাথায় চড়ে গেছে। চোখ দুটি রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছে। ডান হাতে লরির দরজাটা খুলে লাফিয়ে পড়ে গাড়ির একেবারে সামনে এসে দাঁড়াল। বউটাকে মারবার জন্য ওর হাত নিশপিশ করছিল। অনেক কষ্টে ও নিজেকে সামলে নিল। মেয়েছেলে বলে ছেড়ে দিল বটে কিন্তু গালাগালি দিতে ছাড়ল না— তেরী মা-কি, আমায় ফাঁসি দিবি নাকি? বহিন কী···তুই কি ফালতু, অ্যাঁ? প্রচণ্ড ক্রোধে ওর মুখ দিয়ে অনর্গল গালাগাল বেরিয়ে আসছিল।

বউটির কোমরে চোট লেগেছে। এক হাতে কোমর চেপে ধরে অন্য হাতটা দিয়ে মাথা সামলাচ্ছে। আতঙ্ক-ভরা চোখে বউটি ধনসিং-এর দিকে নির্বাক তাকিয়ে রইল। ধনসিং একটু যেন বিহ্বল হয়ে পড়েছিল; নিজের বিহ্বলতায় একটু বিরক্ত হল। এরকম একটা ভয়ংকর জ্বালাতনী মানুষকে কোথায় পিটিয়ে ক্রোধটাকে দমন করবে কিন্তু তা আর হয়ে উঠল না।

যুবতী বউ না মেয়ে, কে বলবে! বড় বড় আশমানী নীল চোখের

দৃষ্টিতে বিমূঢ়তা। এত ঘাবড়ে গেছে যে, এখনও ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলছে। কুর্তার ফাঁকে ভরা যৌবন উদ্ভাসিত। ঘাবড়ে গিয়ে গায়ে আঁচল টেনে দিতে ভুলে গেছে। এই বিমূঢ় ভাব দেখে ধনসিং-এর ক্রোধ জল হয়ে গেল।

হঠাৎ লরিটা থামবার প্রচণ্ড ঝটকায় কর্মূ পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছিল। সেও নিচে নেমে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। যুবতী মেয়ের ভীত ও সন্ত্রস্ত অবস্থা দেখে বিরক্তিতে ফেটে পড়ে সে ধনসিংকে বলল—বাঃ ওস্তাদ, দারুন মাল্ তো। মেয়েটিকে তাজা করে তুলতে ঠোঁট দিয়ে শিটি বাজাল। ধনসিং হেসে উঠল।

ধনসিং মেয়েটাকে বলল—তোর বাপ যদি তোর জন্যে স্বামী জোটাতে না পারে, তবে বহিন···কারুর সঙ্গে ভেগে যা না। এই গরিবের গলায় কেন ফাঁস লাগাতে চাস্। মেয়েটা যাতে বুঝতে পারে তাই ধনসিং পাহাড়ী ভাষায় কথা বলছিল।

মেয়েটি চোট খেয়ে এত স্তম্ভিত হয়ে গেছে যে ধনসিং-এর ক্রোধ ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ও মোটেই সংকুচিত হয় নি। নিজের ভাষায় কথা শুনছে কিনা তাই। কর্মূর ইঙ্গিতের অর্থ বুঝে ও তার ময়লা-ঘষা ছেঁড়া জামার ফাঁকে দৃশ্যমান শরীরটাকে আঁচল দিয়ে বেশ ভালো করে ঢেকে নিল। লজ্জায় মাথা নত হয়ে এল।

কর্মূ আবার তার কুকীর্তি শুরু করে দিল। ধনসিং হেসে উঠে বলল— চল্, এখন ওঠ্। রাস্তা ছেড়ে ঘরে যা···নয়তো গাড়িতে এসে বোস্, তোকে নিয়ে যাই।

মেয়েটি কাৎরে উঠে দাঁড়াল। রাস্তার ধারে প্রাচীরের কাছে সরে এল। ধনসিং গাড়িতে উঠে বসল। সুইচ টিপল, স্টার্টারে চাপ দিল। ইঞ্জিন চালু হবার কোনো লক্ষণ নেই।

—লে, ভাই কর্মূ, ধনসিং ক্লিনারকে ডাকল। —মস্ত ফ্যাসাদ।

এবার ঠেলা সামলা। ব্যাটারীর তার বোধ হয় ছিঁড়ে গেছে। ধনসিং আবার লরি থেকে নামল। ইঞ্জিনের ঢাকনা খুলে পরীক্ষা করতে লাগল।

কর্মৃ মেয়েটার দিকে ইশারা করে বলল— আরে ভাই, খবসুরত মেয়েছেলের নজর বড় সাংঘাতিক। পুরুষ খতম হয়ে যায়। এ তো আবার লোহার মোটর। দেখলে না ইঞ্জিনের কি রকম মাথা ঘুরে গেছে!

ধনসিং মেয়েটার দিকে তাকাল— এ আবার কী যাদু করল রে, কালী-কা-মাই। এখন রাতটা যদি এখানে কাটাতে হয় তবে একটু ছোলাফোলা, রুটির টুকরো-ফুকরো খেতে দিবি না এভাবেই ভুখা মারবি?

মেয়েটা কোন জবাব দিল না। মাথা নীচু করে পথ পেরিয়ে কাছের টিলার সংলগ্ন পাকদণ্ডীর পথে উপরে উঠে গেল। তাকে আর দেখা গেল না।

ধনসিং ইঞ্জিনের ঢাকনা খুলে কখনও পরীক্ষা করে দেখছে নানা যন্ত্রাংশ, কখনও এটা, কখনও সেটা। কিন্তু বুকের ধুকধুকানি থামার মতো নিশ্চল, কিংবা ফুসফুসের যন্ত্রটা বিকল হয়ে মানুষ যেমনি অসাড় হয়ে যায়, লরিটাও তেমনি নিশ্চল, অসাড়। নিজের যোগ্যতা ও বুদ্ধি অনুসারে ধনসিং যন্ত্র ঠিকঠাক করছিল।

ক্লিনার কর্মৃ ধূলোয় ভরা মাথাটা চুলকোতে চুলকোতে বিড়বিড় করতে লাগল— রাত হয়ে আসছে। পেছন দিক থেকে আর কোনো গাড়িও আসছে না। মণ্ডীতে তুমি আমাকে খেতেই দিলে না। দু'পয়সার আলু কিনে একটু জল খেলাম। কম্বলও সঙ্গে নেই।

ধনসিং কষে একটা ধমক দিল— কী এত বকবক করছিস! পাম্প নিয়ে আয়। কানেকশনে হাওয়া ছাড়।

ধনসিং লরীর নীচে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়েছে। গাড়িটা বিকল হবার কারণ সে তখনও তলিয়ে দেখছিল। হঠাৎ চিৎকার করে ডাকল— ভাই কর্মু, স্রেফ মরে গেছি। লরির শিরদাঁড়াই ভেঙে গেছে। শালা ইউনিভার্সাল জয়েন্ট কাত।

ধনসিং বাইরে বেরিয়ে এল। এত পরিশ্রম সব বৃথা। গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কোমরে হাত রেখে ধনসিং চোখে যেন অন্ধকার দেখল। বলল— এখন উপায় ?

নিস্তেজ সূর্য যেন ক্লান্ত হয়ে উপত্যকার প্রান্তদেশে পাইন গাছের অরণ্যের পেছনে বিশ্রামের আশায় লুকিয়ে পড়েছে। ছায়া ও অন্ধকারের চাদর নিজের শরীরে টেনে নিচ্ছে। নীচে সুবিস্তীর্ণ উপত্যকায় শ্যামল আস্তরণ। শুধু উঁচু পথে সূর্যের হালকা নরম ঝিলমিল আলো।

ধনসিং দুশ্চিন্তায় ভারী গলায় বলল— ভাই কর্মু, মালিকের গাড়ি ছেড়ে আমি তো যেতে পারব না। সাবাস বাহাদুর জওয়ান, তুই চলে যা। তোর নিশ্চয় খুব খিদেও পেয়েছে। রাতে তোর খুব কষ্টও হবে। পয়সা না থাকলে আমি দিচ্ছি। এখান থেকে দু'মাইল দূরে পাটোলার দোকান। ওখানে তুই কিছু খেয়ে নিস্। তোর মত জওয়ান, কী-রে এটুকু পথ লম্বা লম্বা পা ফেলে মেরে দিতে পারবি না ? সব শুদ্ধ আট মাইল। দু'ঘণ্টার মার। বৈজ্‌নাথে খবর দিবি। বলবি, ইউনিভারসাল জয়েন্ট ভেঙে গেছে ; ইঞ্জিনটাও বিগড়ে গেছে। সকালে সার্ভিস চালু হবার সঙ্গে সঙ্গে যেন একজন মিস্ত্রি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কাল পাঁচটা পর্যন্ত মণ্ডী থেকে তো সার্ভিস করতে কেউ আসবে না।

রাগে ও বিরক্তিতে বিড়বিড় করতে করতে কর্মু বৈজনাথের দিকে পা বাড়াল। পথের মাঝখানে ধনসিং একা পড়ে রইল। সূর্য অস্ত গেছে। সমতলভূমির মতো পাহাড়ী এলাকাতেও সূর্যাস্ত ও রাতের সন্ধিক্ষণ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। উপত্যকার কোল থেকে উঠে আসা অন্ধকার নিঃশব্দে আকাশ ছেয়ে ফেলে।

ধনসিং-এর গলাটা শুকিয়ে কাঠ। পথটা ছাড়া এ এলাকার সব-কিছুই তার অচেনা। পথের ডান দিকের টিলাটা প্রাচীরের মতো হাঁ করে দাঁড়িয়ে। উপরের গাছপালা ছাড়া কিছুই বিশেষ আর দেখা যাচ্ছে না। বাঁ দিকে উপত্যকার বিস্তৃত খেত ; প্রশস্ত সি ড়ির মতো নেমে এসেছে। সামান্য একটু বিস্তৃত হয়ে আবার দূরে পাহাড়ের উপরে চলে গেছে। উপত্যকাটা যেন তার অঞ্জলি-ভরা হাতে খেতের আধ-পাকা ফসল সামলাচ্ছে। অন্য কয়েকটি খেত শস্যহীন। ডান দিকের চটি থেকে পাকদণ্ডী নেমে এসেছে সড়কে, সড়ক পেরিয়ে বাঁ-দিকে সোজা খেত। কত দূরে হু'দিকের বস্তি বলা মুশকিল।

উপত্যকার বুকে ঘন অন্ধকার ; দূরে অন্ধকারের পর্দা ঠেলে ধোঁয়া উঠতে দেখলে বস্তি কোথায় বোঝা যেত। কিন্তু এরকম আবছা আলোয় কিছুই অনুমান করা হুরূহ। পাহাড় এলাকায় কিছু দেখলে মনে হয় কত কাছে, এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে ডাক দিলে আওয়াজটা পৌঁছতে যতক্ষণ লাগে, ততটা পথের দূরত্ব কিন্তু পাকদণ্ডীর পথে হয়তো হুই ক্রোশ। ধনসিং এই অজানা পথে যাবার সংকল্প ছেড়ে দিল। চটির দিকে পাকদণ্ডী দিয়ে চলাই ভালো।

ধনসিং টিলায় উঠে পাকদণ্ডীর পথে এগিয়ে গেল। পাকদণ্ডীর পথটা বাঁশঝাড়ের পাশ দিয়ে চলে গেছে। তার আগে ঘন ঝোপঝাড়। আর এগোবে কি না ধনসিং ভাবল। ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে একটি বউ, তার মাথায় ঘড়া। আঁচলে মুখ ঢাকা। এই পাহাড়ী অঞ্চলে পরিবারের আত্মীয়স্বজনের সামনে পড়লে বা গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাতে বউরা মাথার ঘোমটা টেনে দেয়। কিন্তু অন্ধকারে ঘোমটা টানার কী অর্থ ধনসিং তা ভেবে পেল না। কয়েক পা এগিয়ে আসার পর বউটির মুখ থেকে আঁচল খসে পড়ল। আর হু'পা এগিয়ে আসতেই ধনসিং তার কাপড়

চিনতে পারল। লরির সামনে যে মেয়েটা উল্টে পড়েছিল, এই তো সেই। যুবতী বউয়ের মাথার ঘড়াটা উল্টো করে রাখা।

—আমি তো পিপাসায় কাতর হয়ে ভাবছিলাম তোর কাছে জল চাইব। কিন্তু তোর ঘড়াটা দেখছি উল্টোনো। ধনসিং যেন কোন পরিচিত বউয়ের সঙ্গে কথা বলছে।

—ভাগ্যটাই উল্টো হয়ে গেছে, ঘড়া তো কোন্ ছার। মেয়েটি ঘন নিশ্বাস ছাড়ল।

ধনসিং বউটির গলার কণ্ঠস্বরে আপনজনের দরদ ও ব্যথা গুঞ্জরিত হতে শুনল। চোখের জলের আর্দ্রতা অনুভব করে ও খুঁটিয়ে দেখল মেয়েটির মুখ। তারপর বলল— কি, তুই কাঁদছিস? খুব চোট লেগেছিল, না রে?

দুঃখের কলসিটা কান্নার বেগে যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। ধনসিং-এর সমবেদনার স্বর শুনে ও সামলে নিয়েছিল কিন্তু বেশীক্ষণ পারল না। একটু বাদেই কলসটা হাত ফসকে পড়ে গেল। মুখের উপর আবার আঁচল টেনে মেয়েটা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ধনসিং ওর শরীরের কাঁপুনি ও চাপা কান্না আঁচলের আড়াল থেকেই অনুভব করতে পারছিল। মোটর ড্রাইভারের রুক্ষ কঠিন ব্যবহার সহানুভূতিতে ভরে উঠল। গলার স্বর আর্দ্র হয়ে উঠল— আরে পাগলি কী করে জানব তুই একেবারে গাড়ির সামনে এসে পড়বি···তোকে বাঁচাতে আমি তো লরিটাই ভেঙে ফেলেছি।

মেয়েটা চোখের জল মুছে মুখ থেকে আঁচল সরিয়ে নিল। কান্নার বেগ সামলাতে ও দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা চেপে ধরেছিল। সংযমের বাঁধ ভেঙে পড়ায় বলে ফেলল— পরদেশী, আমার সঙ্গে তোমারই-বা এত শত্রুতা কেন? ভালোমানুষের মতো গাড়িটাকে না থামালে রোজকার এ ল্যাঠা চুকে যেত। বেসামাল কান্নায় ভেঙে পড়ে মেয়েটা মুখটাকে

আবার আঁচল দিয়ে ঢাকল। আঁচল দিয়ে ঠোঁট চেপে থাকায় কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছিল না। কিন্তু ধনসিং বুঝতে পারল মেয়েটার ভেতর থেকে প্রকাণ্ড একটা কান্না বেরিয়ে আসছে। মেয়েটি কিছুক্ষণ মুখ ঢেকে কান্না চাপবার চেষ্টা করল কিন্তু ফোঁপানি বন্ধ হল না। ড্রাইভারের জীবনের উত্তেজনা ছেড়ে ধনসিং-এর মনটা কোথায় যেন চলে গেছে। এক বিবশ, বিহ্বল ভাব। হৃৎপিণ্ডটা পিপাসায় শুকিয়ে গলা পর্যন্ত উঠে এসেছে। পিপাসার আসল অর্থ কী তা ও বুঝতে পারছিল না। ধনসিং বলল— বড় তেষ্টা পেয়েছে। কোথাও জল পাওয়া যাবে?

গলা থেকে মুখ পর্যন্ত উপচে ওঠা চোখের জল সামলে, আঁচল দিয়ে চোখ মুছে মেয়েটি জবাব দিল— জল খাবে? জল আনতেই তো যাচ্ছি!

মেয়েটি পাকদণ্ডী দিয়ে আগে আগে হেঁটে চলল। ধনসিং তার পেছনে। চলতে চলতে ধনসিং-এর মন কৌতূহল ও সহানুভূতিতে ভরে উঠল। কান্নার কোন শব্দ এখন আর ধনসিং শুনতে পাচ্ছে না। মেয়েটি টিলা থেকে নিচে নামল, লরির সামনে দিয়ে রাস্তা পার হল। নিচে খেতের দিকে এগিয়ে চলল। ধনসিং জিজ্ঞেস করল—এখানেই জল দিবি, না পুকুর পর্যন্ত যাবি?

মেয়েটি পেছন ফিরে দেখে বলল—এখানেও দিতে পারি, চাইলে পুকুর পর্যন্ত চল। তুমি কোন্ লোক?

ধনসিং কাংড়া জেলার লোক। অদ্ভুত প্রশ্নটার অর্থ বুঝতে ওর অসুবিধা হল না। বলল— আমরা খারী জাত, রাজপুত।

—তবে আর কি, আমিও তো রাজপুত। জল আনার পাত্র দাও, ভরে আনি।

—পাত্র নেই। চল্, আমিও যাচ্ছি। কলসির থেকে জল ঢেলে দিস্, অঞ্জলি ভরে খেয়ে নেবে।

পাঁচ কদম উঁচুতে উঠে প্রথম খেতটা পেরিয়ে অন্য খেতে নেমে এসে ধনসিং জিজ্ঞেস করল— বেশ লোক তো তুই, এত কেন কাঁদছিস বল্ তো! তোর আবার কী দুঃখ?

মেয়েটি মুখ ঘুরিয়ে এবার আর ধনসিংকে দেখল না। নির্জন সন্ধ্যায় ওর হৃদয় থেকে বেরিয়ে এল ঘন এক দীর্ঘশ্বাস। তার শব্দ ধনসিং শুনতে পেল। মেয়েটি যেন স্বগতোক্তি করল - দুঃখ আবার কী? দুনিয়ার বোঝা ঘাড়ে চাপলে এ অবস্থা হবে না তো কী; নইলে কত ভালো লোকই তো মরে যায়, আমার মরণ হয় না কেন?

উত্তরটা ধাঁধার মত মনে হল ধনসিং-এর, কিছুই বুঝল না। চেহারায় অল্পবয়সের ছাপ; হৃষ্টপুষ্ট শরীরটা দেখে বিধবা বলে মনে হচ্ছে। অথচ এই জেলায় এই বয়সের বিধবা বড় একটা দেখা যায় না।

—মা-বাপের কাছেই তো থাকো, না? ধনসিং ওর অবস্থা খতিয়ে নিতে চাইল।

—মা-বাপ তো তাদের হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে দিয়েছে। বুঝলে, বাছুর কশাইয়ের হাতে পড়বে কিংবা ব্রাহ্মণের হাতে— সেটা তো কপালের কথা। মেয়েটি আরো একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল— মা-বাপের কাছে কে আর সারা জীবন পড়ে থাকে? কিন্তু সুখ-দুঃখের সময় তো দু-চারদিন বাপের বাড়ি গিয়ে মেয়েরা থাকতে চায়। এরা ভাবে চারশো টাকা দিয়ে একটা জানোয়ার কিনেছে। বাঁচলেও যা মরলেও তাই। যতক্ষণ গতরে শক্তি আছে ততক্ষণ এরা ছাড়বে কেন? মা-বাপ কোন্ মুখে বলবে! থলে ভরে টাকা নিয়েছে যে!

মেয়েটি বলে চলল— আমরা দুই বোন, এক ভাই। বাপ তো খালি বলত মরণ হয় না। বলত, বড় মেয়ের জন্য পাল্টা ঘর চাই। কিন্তু ছোট মেয়ের কন্যাদানের পুণ্যটা বড় বোনের বোধ হয় সইল না: গত জন্মের নিশ্চয় অনেক পুণ্যি ছিল। তাই বিয়ের আগে সে অসুখে মারা

গেল। আমি অভাগী তো, তাই পড়ে রইলাম। তখন খুব ছোট। ঘর পালটাবার মত বয়স তখন হয় নি। ভাইয়ের বিয়ের জন্য বাবা তার খেতিবাড়ি "মিয়া"-র (বড়লোক রাজপুত) কাছে বন্ধক রেখে তিনশো টাকা ধার নিল। ভাইয়ের বিয়ে না দিলে চলবে কেন? মা আমার ছোটবেলাতেই মারা গেছে। ছেলের বউ না এলে ঘরের কাজ করবে কে? মেয়ে নিয়ে কতটুকু আর ভরসা। সে তো পরের ঘরের জন্য তোলা থাকে। তাই ছেলের জন্য একটা বউ চাই। এদিকে বন্ধকী ক্ষেতের ধার মেটানো যায় কী করে? আমাকে না বেচে উপায় কি?— বিরক্তি-ভরা স্বরে মেয়েটি বলে যাচ্ছিল। যেন যত রাগ নিজের ভাগ্যের উপরে; কারুর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। পেছনে যেতে যেতে ধনসিং নীরবে শুনছিল; শুনতে শুনতে ভিতর থেকে একটা কান্না গুমরিয়ে উঠছিল।

দুজনে পুকুরের কাছাকাছি এসে গেছে। কলসিটাকে কুয়োর বাঁধানো চাতালে রেখে মেয়েটি আবার বলতে শুরু করল— বিয়ের ছ'মাসের মধ্যে স্বামী ফৌজে ভর্তি হয়ে দূর দেশে কোথায় চলে গেল। নয় মাসের মাথায় চিঠি; গুলি খেয়ে মরে গেছে। কোলে একটা বাচ্চা ছিল। ভগবান তাকেও ছিনিয়ে নিলেন। বড় ও ছোট জ্যাঠশাশুড়ী আমাকে কোনকালে দেখতে পারত না। ওরা যেন পাল্লা দিয়ে আমার পিছনে লেগে থাকত। মুখ ফুটে যদি কিছু বলি দোষ হবে ওদের মেয়েদের। আমি তো কেনা গোলাম, তারপরে আবার বিধবা। কাজ করতে করতে পাঁজর ভেঙে যায়, মার খাই। পুরুষ মানুষকে বলার মত কথা নয়। তবু বলছি, সারা শরীরে আমার কালসিটে। কী আর বলব! গাড়ির নিচে চাপা পড়তে পড়তে যখন বেঁচে গেলাম!

হাঁটুর ওপর ঘাগড়াটা ছিঁড়ে গেছে। ধবধবে ফর্সা হাঁটু বেরিয়ে আছে। শরীরটাকে ঢাকতে কাপড়টাকে সাপটে নিল মেয়েটি, তারপর সলজ্জ স্বরে বলল— কাপড়টা ছিঁড়ে গেছে। কাপড়ে তালি দিতে

বসেছিলাম। ঘর-বার করতে হয়। পুরুষের নজরে বড় লজ্জা পাই। কাপড়ে তালি দিচ্ছি দেখে বড় জ্যাঠশাশুড়ী পেটে প্রচণ্ড একটা লাথি মেরে বলল— কী রে, মায়ের কফিন সেলাই করতে বসেছিস নাকি? জল কি তোর মা নিয়ে আসবে? তুমি তো দেখেছ, সবে ছাগল-ভেড়া চরিয়ে ফিরলাম। একদিন ছাগল-ভেড়া না চরালে তারা দুধ দেয় না, আর পড়ে পড়ে আমিই মার খাই। আশে-পাশের ছোকরারাও কম রাক্ষস নাকি? ছাগলের বাঁটে মুখ দিয়ে দুধ খেয়ে নেবে। এদিকে ছাগল চরাতে গেলেও গালিগালাজ খাই; শুনতে হয় কাজের বাহানা করে আমি নাকি ইয়ার দোস্তদের সঙ্গে গল্পগুজব করতে যাই। সব দিকেই মরণ…। এই দেখ, কথা বলতে বলতে ভুলে গেছি, তোমাকে এখনও জল দিই নি। একদম ভুলে গেছি। দাঁড়াও, কলসিটা ধুয়ে জল দিচ্ছি। বহুদিনের চাপা দুঃখ প্রকাশ করে মনটা এখন অনেক হালকা লাগছে। জল দেবার কথা তাই বেমালুম ভুলে গিয়েছিল।

ধনসিং ঘাটলায় ঝুঁকে বসে মেয়েটির কথা তন্ময় হয়ে শুনছিল। তেষ্টার কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিল। মাথা নেড়ে বলল – ও, হ্যাঁ, দাও, জল দাও। কুয়োর চাতালে পা রেখে মেয়েটি চোখেমুখে জল দিয়ে কলসিতে জল ভরল। কলসিটাকে চাতালের ওপর রেখে দু'হাতে জল ঢেলে দিল। ধনসিং চাতালের নিচে হাঁটু গেড়ে বসে অঞ্জলি ভরে জল খেল।

একটু পরে টুক করে ঘন অন্ধকার নেমে এসে সব-কিছু ডুবিয়ে দেবে। শুভ্র ছবির মতো আলো পর্বতের ঝাকনি চুঁয়ে ছড়িয়ে পড়ছে উপত্যকায়। চারিদিকে এখনও আবছা রোশনী। দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ী এলাকায় কৃষ্ণপক্ষের রাত; তাতে ঠোক্কর খেয়ে যেন চাঁদ নিঃশব্দে উঠে এল। সেই রোশনী প্রতিবিম্বিত হল মেয়েটির ফর্সা মুখাবয়বে। এক জোড়া ময়নার মত দুই চোখে চমক। মেয়েটি একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে

স্বগতোক্তি করল—'চল্ রে মন।' বলে ভরা কলসিটা তুলে নিয়ে এগিয়ে গেল।

ধনসিং জানতে চাইল— এখানে রাজপুতদের বস্তি নাকি ?

—কয়েকটা ঘর রাজপুতদের, ব্রাহ্মণ আর ঘিরথবাও আছে। ওড়না পাকিয়ে পাকিয়ে বিড়ে তৈরি করে মেয়েটি বলল— এসব ঘরের কথা জিজ্ঞেস করছ কেন ? কী রকম লোক তুমি ?

ধনসিং বিস্মিত হল— কেন এরা বুঝি ভালো লোক নয় ?

মেয়েটি মাথা নেড়ে বলল -- বদমাশ, নির্লজ্জ। খালি তামাশা করার তালে থাকে। নিজের ঘরের বউকে যদি পথে-ঘাটে কারুর সঙ্গে কথা বলতে দেখে তো তার মুণ্ডুপাত করবে। কিন্তু অন্য বাড়ির বউয়ের সঙ্গে খেল্তামাশা জুড়ে দেবে। ঐ তো জেলের ছাপ-মারা ছোকরাটা। এখনও গোঁফ গজায় নি। শাল গাছের জঙ্গলে বসে আমি জ্বালানি কুড়ুচ্ছিলাম। ছেলেটা এসে আমার হাত চেপে ধরল, বললে— এই নে আট আনা। কষে এক চড় বসালাম। দাঁত দিয়ে রক্ত ঝরে পড়ল। একটু থেমে মেয়েটি বলল— চলি, অনেক দেরি হয়ে গেল। জানি না কপালে আবার কোন্ দুর্ভোগ লেখা। হায়··· মরে আছি। বড় জা নিশ্চয় জল ছাড়াই আটা মাখতে বসে গেছে। গিয়ে বলব—অন্ধকার ও নির্জন দেখে একেবারে স্নান সেরে এলাম। ধনসিং-এর দিকে তাকিয়ে মেয়েটি অসহায়ভাবে বলল— কত আর সইব। মানুষ কত আর সইতে পারে ?

ঝুঁকে কলসিটা তুলে নিতেই ধনসিং উঠে পড়ল। এগিয়ে এসে বলল— দে, কলসিটা রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিই। তুই তো চোট পেয়েছিস !

মেয়েটি মুচকি হেসে মাথা নাড়ল। দুটি অভ্যস্ত হাতে কলসির কানা ধরে এক ঝটকায় হাঁটু পর্যন্ত তুলে নিল। চাতালে পা তুলে হাঁটুর

ওপর কলসিটা রাখল। হাত দু'টো কলসির নীচের দিকে সরিয়ে নিয়ে আর এক ঝট্‌কায় কলসিটাকে মাথার বিড়েতে তুলে নিল।

—তোর নাম কী? ধনসিং জানতে চাইল।

চাঁদের আলো সোজা এসে পড়েছে মেয়েটির মুখে। স্মিত হেসে বলল— সোমা। চলতে চলতে বলল— বড় ভালো লোক তুমি গো। বছর ছয়েকের মধ্যে আমার সঙ্গে এত মিষ্টি করে কেউ কথা বলে নি। তোমার ভালো হোক, কল্যাণ হোক। তোমার ঘর কোথায়?

—হামীরপুর তহশীলের চড়সর থানার কাছে।

পাহড়ের ঢালে শাল বনে সোঁ সোঁ শব্দে বাতাস বইছে; উপত্যকাটা যেন হাওয়ায় কেঁপে কেঁপে উঠছে। মাঘের শীতের ঝাঁপট লাগছে ধনসিং-এর গায়ে। মেয়েটির পিছন পিছন চলতে চলতে ধনসিং একটা সিগারেট ধরাল। একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে স্বগতোক্তি করল— হাড়-কাঁপুনে শীত, বাবাঃ! এই শীতে সারাটা রাত রাস্তাতেই কাটাতে হবে।

সোমা মাথা নেড়ে সায় দিল— ঠিক তাই। হতভাগাদের বাঁচাতে গেলে ভগবানও চটে যান। দেখ-না, লরিটা কেমন ভেঙে গেল।

—এরকম কথা বলছিস কেন? ধনসিং সিগারেটের ধোঁয়া-ভরা শ্বাস ছেড়ে নরম সুরে বলল।

রোজ ওর কপালে মারধোর ছাড়া আর কিছুই জোটে না। ধনসিং-এর স্বরে ও যেন সান্ত্বনার একটা আশ্রয় খুঁজে পেল। রাস্তাটা এখনও অদূরের টিলা ও তার গাছগাছড়ার ছায়ায় ঘেরা; জ্যোৎস্নার আলো ঠিকরে পড়ছে ধনসিং ও সোমার গায়ে-মুখে। রাস্তায় পৌঁছে ধনসিং জিজ্ঞেস করল— আশেপাশে কি খাবার-টাবার পাওয়া যাবে? আটার দাম না-হয় দিতে রাজি।

সোমা হাত নেড়ে বলল— না গো, এই জায়গার আশেপাশের

লোকগুলো আস্ত রাক্ষস। পরদেশী যারা আসে তারাও তেমনি কিনা। যা হাতের কাছে পায় উঠিয়ে নেয়। লোকের মুখে শুনি আগে নাকি এখানে চুরিচামারি হ'ত না। এখন তো খেতের সিম-বেগুন, লাউ-কুমড়ো, ডালিম সব চুরি হয়ে যায়। কলা তো বাড়তেই পারে না। চোরের হাত লেগে লেগে গাছগুলো সব নিস্ফলা হয়ে গেছে। মাথার কলসিটাকে সোমা এক হাতে সামলে পাকদণ্ডীর পথে ঘুরে গেল। ধনসিং প্রশ্ন করল— তোর বাড়ি অনেক দূরে নাকি ?

—দূরে কই ? টিলার ওপরে যে গাছপালা দেখা যাচ্ছিল, তার দিকে হাত দেখিয়ে সোমা বলল— ঐ তো ওখানে। টিলার ওপরে গাছের আড়ালে।

মোটর গাড়ির শব্দ সব শোনা যায়। শুধ্ কি তাই, মোষের ডাকও শুনতে পাচ্ছি। আমার তো মরণ. ফিরে গিয়েই দুধ দোয়াতে হবে। ঐ পটের বিবিরা তো মেহেদী রঙে হাত রাঙিয়ে বসে থাকে। মেজো জনের ছেলেটা হেগে মুতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে একশা করেছে। ওর গুয়ের কাপড় ধুতে হবে। বুড়ো শ্বশুর খক্‌খক্ করে কাশছে তো কাশছেই। ছোট ভাসুর পল্টনে কাজ করেন, বড় ভাসুর কাছারীতে চাকরি করেন। এখন চলি।

সোমা ঘুরে দাঁড়িয়ে ধনসিংকে বলল— গায়ে দেবার চাদর আছে তো ? শীত লাগলে আগুন জ্বালিয়ে নিয়ো, কেমন ? আচ্ছা, এবার আমি চলি।

পাকদণ্ডী দিয়ে সোমা সোজা উঠে যাচ্ছে, ধনসিং পিছু-ডেকে বলল, —ফুটফুটে জ্যোৎস্না রাত। এদিকে তুই আর আসবি, না ঘুমিয়ে পড়বি ?

সোমা পেছন ফিরে না তাকিয়েই বলল— হুঁ, কী যে বল, আমার এখন যেন মরার ফুরসৎও আছে। সোমা এগিয়ে গেল।

ধনসিং একা পথে এসে দাঁড়াল। সিগারেটটায় কষে একটা টান মেরে লরির চারিদিকে বার কয়েক চক্কর মারল। এই দারুণ ঠাণ্ডায় রাস্তার উপরে রাত কাটাবার যে কত ক্লেশ তা ওর মনেই হয় নি। পাহাড়ের পথে যারা ড্রাইভার তাদের পক্ষে রাস্তায় রাত কাটানো সাংঘাতিক কিছু ব্যাপার নয়। এরা এরকম অবসরকে সুখের করে তুলতে জানে। দু'দিনের কথা মনে পড়ে যায়। পালমপুরের কাছে একবার ওস্তাদ জামালের সঙ্গে কষে তাড়ি টেনে আর ওদের নাচ দেখে দেখে একটা রাত কাটিয়ে দিয়েছিল। অন্য একদিন গোয়ালিনীদের খাটাল থেকে দুধ এনে খুব করে ক্ষীর খেয়েছিল।

সন্ধ্যার ঘটনা বারবার ঘুরেফিরে মনে পড়ছে। একটা ভেড়ার প্রাণ বাঁচাতে মেয়েটা লরির সামনে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ভড়কানো মুখে বিস্ময়ের রেখা ফুটে উঠেছিল। চোখের কোণে ভয়ার্ত দৃষ্টি··· অন্ধকারে থেকে থেকে অস্ফুট কান্নার শব্দ : চন্দ্রালোকিত চমকে-ওঠা ফর্সা মুখ···কোমল হাতে কলসি উঠিয়ে নিল মাথায়। সাদাসিধে সরল কথা বলার ভঙ্গী— তুমি বড় ভালো লোক গো ; বছর দুয়েকের মধ্যে আমার সঙ্গে এত মিষ্টি করে আর কেউ কথা বলে নি।···সোমার এই কথাটাই বারবার মনে পড়ছে। মিষ্টিমধুর একটা আবেশে মনটা ভরে উঠছে। মাধুর্যের এই অনুভূতি থেকে মনের মধ্যে কেমন একটা অভিমান গুমরে উঠল ; এল বিচার, এল সংকোচ। ভাবল, ও রাজপুত তো নয়। তবে মিথ্যে কথাটা সোমাকে বলার কী প্রয়োজন ছিল।

মিথ্যে কথা বললে ধনসিং-এর মনে একটা খটকা লেগে থাকত। ওর জন্ম রাজপুত বংশে নয় : বাপ-মা ছিল কাহার। কিন্তু জন্মাবধিই ও সেবা করছে ব্রাহ্মণ, রাজপুত, ক্ষত্রিয় আর নয়তো শূদ্র বা কায়স্থদের। কিন্তু তাদের সঙ্গে একাসনে বসতে পারে নি কোনোদিন ; তাদের সমকক্ষ হবার অধিকার তার ছিল না। নিজের নাম ধনসিং নয়, নাম হওয়া

উচিত ছিল— ধন্না বা ধন্নু। অথচ ওর মনে কোনো গ্লানি নেই ; নীচু জাত বলে নিজেকে কখন হীনমন্য ভাবতে পারে নি। নিজের মধ্যে যেটুকু দৈন্য, তার প্রকাশ দেখতে পেত অন্যের অহংকারে : নিজের মা-বাপ গরিব, সেই দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে। মনের মধ্যে এক অসীম জ্বালা, তীব্র বিদ্রোহ, আর সে জ্বালা থেকেই ও মিথ্যে কথা বলে ফেলত। নিজের ভাগ্যে জুটেছে ক্ষুদ্রতার অপমান ; বর্ষিত হয়েছে নিয়ত লাঞ্ছনা। এ দুর্ভাগ্য ও জোর করে অস্বীকার করতে চাইত। এই কারণেই ও উঁচু জাতের সমকক্ষ হতে চাইত ; তাদের সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে বসতে চাইত। এই মেয়েটির চোখে ও ছোট হতে চায় নি ; সেই অনুভূতি তখন মনকে আচ্ছন্ন করে ছিল। এ মানসিক দ্বন্দ্ব ও কাটিয়ে উঠতে পারে নি ; এ পুরনো স্মৃতি ওর মনে জাগিয়ে তোলে বিদ্রোহ : এ পুরনো জীবনের বিষণ্ণ পরিস্থিতি ও ভুলে থাকতে চায় ; এ জীবন ও কাটিয়ে উঠেছে। তবু এ কথা ভাবলে ওর মনে পড়ে যায় সেইসব দুঃসহ দিনগুলির কথা।

ধনসিং-এর বাপ কখনও থাকত লাহোরে, কখনও বা অমৃতসরে। চাকরি-বাকরি করে ঘরে পয়সাকড়ি পাঠাত। বাবা টাকা পাঠালে ডাকহরকরা টাকা নিয়ে আসত। কখনও বা চিঠি লিখত। চিঠিটা ডাকহরকরাই পড়ে দিত। দুধ ও তামাক দিয়ে ডাকহরকরার আপ্যায়ন হত। অল্প বয়সেই ওর মা অসুখে মারা যায়। এসব পুরনো কথা ছবির মতো মনে ভেসে ওঠে। মায়ের স্নেহ-ভরা মমতায় সমুজ্জ্বল মুখখানা, আদরের অস্পষ্ট স্মৃতি ; সঙ্গে সঙ্গে জেঠির দুর্ব্যবহার বেশী করে মনে পড়ে। তিন-চারটি ছোট ছোট খেতে ওর জ্যাঠা কাজ করত।

বাপের ইচ্ছায় ওর জ্যাঠা বাধ্য হয়ে ওকে স্কুলে পাঠায়, যদিও স্কুলে পাঠাবার ব্যাপারটা তার একেবারেই মনঃপূত ছিল না। কিন্তু ধন্নুর বাপ যে টাকা পাঠায়। তাই তার কথা একেবারে উড়িয়ে দেবার উপায় ছিল

না। স্কুলটা তু'মাইলেরও বেশী দূরে। বছর তিনেক ধনসিং স্কুলে গেল। কিন্তু একনাগাড়ে পড়া আর হয়ে ওঠে না; কখনও তু'মাস পড়ল কি তিন মাস বসে রইল। তিন মাস পরে যখন আবার স্কুলে যায় গোড়া থেকে পড়তে হয়। এরকম ভাবেই চলছিল। ওর জ্যাঠা আর তার তুই ছেলে নিজেদের খেতে চাষবাস করে; আবার পাড়াপড়শীর খেতে পালা করে গতর খাটে। খড় ও শুকনো ঘাসের চালাঘর; মাটির দেয়াল। ওদের খেতটা ছিল মিয়া বজরসিং-এর (কুলীন রাজপুত); পাশেই মিয়ার পাকা বাড়ি, টালির ছাদ। এবা ছিল মিয়া বজরসিং-এর কাছে ঋণবদ্ধ। ছোটবেলায় মিয়া ডেকে পাঠালে ধনসিং জলটল ভরে দিত; কখনও বা কাঁধে বা মাথায় করে কাঠ নিয়ে আসত, আবার কখনও অন্য কাজে যেত।

ধনসিং-এর বাপ মারা গেল লাহোরে। পয়সাকড়ি আসাও বন্ধ হয়ে গেল। বড় জেঠতুতো ভাই গঠেড়া গাঁয়ে মহাজনদের ঘরে একটা কাজ পেয়ে গেল। ধার শোধ দিতে পারে নি বলে মিয়া বজরসিং ওদের ঘরবাড়ি ক্রোক করে দখল করল। ক্রোকের জন্য একজন পাটোয়ারী ও তু'জন সেপাই এসেছিল। জেঠির গায়ে ছিল তু-চারটে রুপোর গয়না। কাঁদতে কাঁদতে জেঠি তার গয়নাগুলি খুলে দিয়েছিল। ঘর থেকে পেতলের বাসনকোসন, একটা মোষ আর ছাদের চালটাও খুলে সেপাইরা মিয়ার বাড়িতে রেখে এল। ধনসিং-এর জেঠা মিয়ার জমি ছেড়ে নখে সাহ-র জমিতে গিয়ে উঠল। আর তার খচ্চর চালানোর চাকরি নিল।

নিজের তু'ছেলের ঘর ছেড়ে চলে যেতে হওয়ায় জেঠির মন শোকে মুষড়ে পড়েছিল। ধনসিং-কে সে সবসময় গালিগালাজ করত। বলত, চৌদ্দ বছরের মরা জওয়ান ছেলেটা এখনই লায়েক হয়ে গেছে। কাজকর্মের ধার ধারে না…নিজের জা তো মরে কবে ভূত হয়ে গেল অথচ এই মরাটা গলায় আটকে রইল।

কখড়া গাঁয়ের বল্লে সুদ ধন্নুকে নিজের ঘরের কাজে নিযুক্ত করল। ধনসিং বল্লে সুদের ঘরে দু'বছরেরও কম দিন কাজ করেছিল। কিন্তু সেই স্মৃতি অম্লান। লোকের বিশ্বাস, বল্লের হাতে প্রচুর পয়সা। কিন্তু বল্লের ব্যবহারে, তার চালচলনে ঐশ্বর্যের বিন্দুমাত্র ছাপ ছিল না। তাচ্ছিল্যের সুরে লোকে বলত, কৃপণ, সুদখোর। আদর করে ডাকত, 'ময়লা-সাহ'। অর্থাৎ কাজকর্মের ঠেলায় নিজেকে খুবই ঘৃণ্য, মলিন করে তুলেছে অথচ একেবারে বেপরোয়া। বল্লের জোয়ান চাকর নজরসিং ; তার চেয়েও বল্লের জামা-কাপড় ময়লা, একটু যেন বেশী মলিন।

বল্লের দোকানের জিনিসপত্র খচ্চরের পিঠে বোঝাই করে নজরসিং হোসিয়ারপুর ও কাংড়া যাওয়া-আসা করত। নজরসিং-এর মাথায় কাঁচের টুকরোর তৈরি জড়ির গোল টুপি ; গায়ে কলার-দেওয়া জামা। জামায় লাল সুতোব কারুকার্য সেলাই চকচক করত। রুপোর মালায় আঁটা বড় বড় বোতাম সামনে থেকে দেখা যেত। বিয়ে-সাদীতে বরকে যেরকম চুড়িদার পাজামা পরানো হয়, ঠিক সেই রকম একটা কালো রঙের চুড়িদার পাজামা পরত। ওর জুতোয় কালো পলিশ, মাথায় চপ্‌চপ্‌ তেল। গাঁয়ের লোক ওকে দেখে বলত, 'শহরের জেণ্টলম্যান'।

অন্যদিকে বল্লে সাহর ময়লা, তৈলাক্ত টুপির জন্য ওকে মাঝে মাঝে চেনা ভার হত। জামারও ঐ একই হাল। দারুণ ঠাণ্ডার দিনেও ওকে কেউ পাজামা পরতে দেখে নি। কোমরে শুধু একটা গামছা, তাও আবার হাঁটু অবধি জড়ানো। তবে কোর্টকাছারী করতে বা বিয়ে-সাদীতে যেতে লোকলাজের ভয়ে তার পায়ে উঠত জুতো, মাথায় পরিষ্কার টুপি।

বল্লে সাহর দোকানে প্রায় সব জিনিসই পাওয়া যেত ; কৃষকদের সরঞ্জাম তৈরি করার লোহা থেকে শুরু করে নুন, কাপড়, আয়না-চিরুনি

সাবান ও মৌরী পর্যন্ত। কৃষকদের সুদে ধার দেওয়া ছিল তার আসল ব্যাবসা। সুদের টাকা দিয়েই সে ফসলের একটা বড় অংশ কিনে নিত বা সস্তা দামে ঘি কিনে আনত। সেগুলি খচ্চরের পিঠে চড়িয়ে দিয়ে নাদৌন, হোসিয়ারপুরের মণ্ডীতে পাঠাত। তার দোতলা বাড়ি, ভারী ভারী পাথরে বাঁধানো দেওয়াল, টালি-ঘেরা ছাদ। এ বাড়িতে বল্লে যেভাবে থাকে মনে হয় যেন এক ক্ষুধার্ত ও সন্ত্রস্ত বেড়াল। চেহারায় সমৃদ্ধির কোনো ছাপ নেই। কানে সোনার ছোট্ট মাকড়ি, ছোট্ট কিন্তু মোটা ও ভারী। ভারী মাকড়ির দৌরাত্ম্যে কানটার ছেঁদা দিন দিন যেন বড় হচ্ছে। তাই বল্লে ছেঁদার মধ্যে একটা সুতো বেঁধে এই ভারী মাকড়িটাকে কানের ওপরে ফাঁসিয়ে রাখত। গায়ের চামড়া ও হাত-পা কোমল, কোনোরকম রুক্ষতা নেই, কাঠিন্য নেই।

বল্লের বাড়ির ভেতরে মস্ত বড় একটা উঠোন। ওর স্ত্রী, মেয়ে আর বউ গাঁয়ের অন্য সবার চেয়ে অনেক ভালো ভালো জামাকাপড় পরে, তাদের গায়ে ওঠে গয়না। গাঁয়ের অন্য মেয়ে-বউয়ের গায়ে রুপোর গয়না অথচ বল্লের ঘরের বউদের নাকে ভারী নথ ; বেশ ওজন, আট আনি সোনার মতো। গলায় দু-তিনটে স্বর্ণালংকার। পরনে সালোয়ার কামিজ আর ওড়না, তেলচিটে ও ধূসর। এরা আবার অল্পবিস্তর আবরু মেনে চলে। পুকুরে বা বাইরে যদি কোথাও যেতে হত, সালোয়ারের উপরে পরে নিত ঘাঘরা আর মুখ ঢাকা দিত ঘোমটায়। ওরা পুকুর থেকে কখনো-সখনো কলসি কাঁখে জল নিয়ে আসত কিন্তু অন্য বউদের মতো কদাচ ঘাস কাটতে যেত না।

বল্লের কাছ থেকে ধন্নু পেত দু'টাকা আর খাওয়াপরা। ধন্নুর বেশভূষা অনেকটা তার মালিকের মতোই। সময় পেলে ধন্নু লাঙল চাষ করা থেকে নিয়ে নিজের হাতে সব কাজই করে নিত। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারেও তাই। ঘরের লোকেরা খায় খাস্তা রুটি, ভাত ;

আর ধনসিং খায় মকাই রুটি। ঘরের যাবতীয় কাজ ওর হাতে। পাহাড়ী চাকরেরা মেয়েদের ছাড়া কাপড়-চোপড় ধুতে চায় না। কিন্তু ধনসিং তাও করত। রান্না ঘরের কাজও ওকে সামলাতে হত। তবে ও নিচু জাত বলে ডাল-ভাত রান্না হবার সময় ওকে ছুঁতে দেওয়া হত না।

বল্লে সাহে-র বড় ছেলে ধনপত রায় ধরমশালার কলেজে পড়ত। ছুটির সময়ে যখন বাড়িতে আসত, রোজ দাড়ি কামিয়ে ধব্‌ধবে কাপড়-জামা পরে ফিটফাট বাবুজি সেজে থাকত। কানের মাকড়িও খুলে রেখেছিল। ও বাড়ি ফিরলে গাঁয়ে আর-সব বাড়িতে সোরগোল পড়ে যেত। ওর অবস্থা দেখে মনে হত ও যেন একটা ঝক্‌ঝকে বাংলো থেকে উড়ে এসে একটা ডোবায় এসে পড়েছে। ধনপত রায় ডনবৈঠক মারত এবং জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বুনো ফল দেখে বেড়াত। আরাম ও সুখ ছেড়ে স্বেচ্ছায় শরীরটাকে এত কষ্ট দেয় দেখে গাঁয়ের লোকেরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেত ; কী করে যেন সবার একটা ধারণা হয়েছিল যে ধনপত রায় শীগ্‌গির-ই ডেপুটী সাহেব হয়ে যাবে। ঘরের বউরা, মা-বোন, এমন-কি ওর স্ত্রী ওকে খুব ভয় পেত। ধনপত রায় ঘরে থাকলে এরা সব টুঁ-শব্দটি করত না।

ধনপত রায় কলেজে চলে গেলে বল্লে ও ধন্নু ছাড়া পুরুষমানুষ বলতে তখন বল্লে সাহ-র ছয় বছরের ছেলে গজপত। মেয়েরা ও বউরা ধন্নুর সঙ্গে হাসিগল্প ও ঠাট্টাতামাশায় মেতে উঠত। ধনপত রায়ের বউ ধন্নুকে নাম ধরে ডাকত না, কারণ ওর স্বামীর নামও যে এক। সব সময় ‘এই’ বা ‘ঐ’ বলে ডাকত, কখনও-বা গালি দিয়ে। ‘খসমখানা’, ‘বড় যে মরে আছিস’— এরকম পরিহাসসুলভ উক্তি শুনতে ধন্নুরও খুব ভালো লাগত। বউ আর বল্লুর বড় মেয়ে ধন্নুর সঙ্গে কখনও বা এমন সব কথা বলত বা এমন সব ইঙ্গিত করত যে ধন্নু সে-সবের অর্থ কিছুই বুঝত না। মেয়েরা একে অন্যকে ধাক্কা দিয়ে হেসে লুটিয়ে পড়ত।

প্রায়ই তারা ধন্নুকে প্রশ্ন করত— কবে বিয়ে করবি ? কবে বউ আনবি ? বউয়ের সঙ্গে কী কথা বলবি ? কী করবি ?

শীতের এক রাত। রান্নাঘরের কাজ শেষ করে বউটি ধন্নুকে খেতে ডাকল। 'নে মর' বলে পরম স্নেহে একটা গালি আওড়ে বউ তাকে একটা খাস্তা রুটি দিল। এত ভালো রুটি ওর ভাগ্যে জোটে না কিন্তু এটা বাড়তি ছিল। রুটিটায় একটু ঘি-ও লাগিয়ে দিল। ধন্নু পরম উৎসাহে আগুনের সামনে বসে খাচ্ছিল। রোজকার অভ্যাসমত রান্নাঘর থেকে একটু সরে এসে দালানের দিকে পিঠ দিয়ে উবু হয়ে বসল।

বউ ধমক দিল— এই মরা, তোর ঠাণ্ডা লাগে না ? উঠে আগুনের পাশে বস্ না।

ধন্নু উঠে উনুনটার কাছে বউয়ের পাশে একটু সরে বসল। বউ হাসি-ঠাট্টা শুরু করে দিল। কখনও নিজের মায়ের বাড়ির কথা। বোঝাচ্ছিল যে, যখন বিয়ে করবে তখন বউয়ের জন্য কীরকম জামাকাপড় বানাবে আর কী ধরনের গয়নাপত্র দিতে হবে, তাও। ধন্নু খেয়েদেয়ে রান্নাঘরের বাসন-কোসন মাজতে শুরু করল। বউ ওর সঙ্গে কথা বলতে বলতে নিজেও বাসন মেজে দিচ্ছিল। মিষ্টি আপেল দুধ দিয়ে জ্বাল দিতে দিতে ধন্নুকে ডেকে বলল -- নে, একটু দুধ খা। রান্নাঘরে আয়, দিচ্ছি।

ধন্নু বাটিতে দুধ খাচ্ছিল। এমন সময় বল্লে সাহ বার-দুই হাঁক দিলেন— কই রে, মরে গেলি নাকি ? কল্কে জ্বালিয়ে যা।

ধন্নু সাড়া দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু বউটি বাধা দিল। চুপ করে থাক্। ঐ বুড়ো-হাবড়াটা তো সারাদিনই চেঁচাচ্ছে। ছোট ননদ লচ্ছুকে চেঁচিয়ে ডেকে বউ বলল— বলে দে, ঘরে একফোঁটা জল নেই। কলসি নিয়ে ধন্নু পুকুরে গেছে।

তারপর ধন্নুর সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিল বউ— হ্যারে ধন্নু, তোব বউ

যদি তোর উপর রাগ করে তবে তুই কী করবি? মারবি, না তাকে আদর করবি?

—মারব। ধন্নু ঘুষি দেখিয়ে বলল।

—মরা কোথাকার। এরকম করতে হয় না।

মুচকি হেসে বউ বলল— বউ মরে গেলে কী করবি?

—কেন, আবার বিয়েতে বসব।

—ধুৎ। বউয়ের স্বরে প্রশ্রয়ের সুর। ধমক দিয়ে বলল—এরকম করে নাকি রে? ভালোবেসে বউয়ের সঙ্গে মানিয়ে নিবি···। কী করে ভালোবাসতে হয় জানিস?

ধন্নু মাথা নাড়ল, না। ও অনুভব করল একটা মধুর আবেগ ও উত্তেজনা ওর সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে। উনুনের আঁচে, প্রদীপের আলোয় বউয়ের মুখখানি রক্তিম দেখাচ্ছিল— চোখ তুটি আধ বোজা। বউ বলল, আমি তোকে শিখিয়ে দেব?

—হ্যাঁ শেখাও।—ধন্নু মুখে কিছু বলল না বটে কিন্তু ভাবে-ভঙ্গীতে এটাই স্পষ্ট হয়ে উঠল।

—এদিকে আয়। বউ দেয়ালের ধারে দাঁড়িয়েছিল। ধন্নু ওর কাছে এগিয়ে গেল। বউ ওর কাঁধে হাত রেখে ওর দিকে মুখ এগিয়ে নিল। ধন্নু তুহাত দিয়ে বউকে জড়িয়ে ধরল। ঠিক সেই সময় রান্না-ঘরের দরজায় বল্লের গালাগালি ও চিৎকার শোনা গেল। নিমেষের মধ্যে বল্লের হুকো ও একটা ভারী চ্যালা কাঠ ধন্নুর কাঁধ ছুঁয়ে পেছনের দেয়ালে আছড়ে পড়ল।

চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল বউ— ওরে আমি মরে গেলাম রে, আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল। আমি তো কাঁদছিলাম···।

ধন্নু রান্নাঘরের দরজা থেকে বল্লেকে এক ধাক্কা মেরে পালিয়ে গেল। পেছন থেকে শুনল প্রচণ্ড চিৎকার, 'ধর ধর'। কিন্তু কোনো দিকে না

তাকিয়ে ধন্নু উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল, আট মাইল দূরে সুজনপুরে গিয়ে তবে থামল। তিন দিনের দিন কাংড়ায় পৌঁছল। কয়েক মাস একটা মোটরগাড়ির কারখানায় ধন্নু কুলিগিরি করল। তারপর বছর তিনেক ক্লিনার হিসেবে কাজ করে ওস্তাদ মজহর খাঁর কৃপায় ড্রাইভার হয়ে গেল।

ছোটবেলা থেকেই ধনসিং মেয়েমানুষকে ধূর্ত বেড়াল ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারত না। ওর ধারণা মেয়েরা ইনিয়ে বিনিয়ে মিষ্টি-মধুর কথা বলে, আশ্রয় ছাড়া বাঁচে না, চুরি করে খায় আর সুযোগ বুঝে ছোটলোকামি করে। প্রাচীন ও অভিজ্ঞ লোকেদের ও বলতে শুনেছে, 'মেয়েদের ব্যাপারে সাবধান'। এ শিক্ষা ওর মনে গেঁথে বসেছিল। ড্রাইভার হিসেবে ওর কখনো কখনো মেয়েদের সংস্পর্শে আসবার সুযোগ হয়েছে। কিন্তু সবসময় এদের ভেবেছে কাঁটাঝাড়; খুব সাবধানে মেলামেশা করেছে। সামাজিক স্তরভেদটা মগজে রেখে ও পুরুষদের সঙ্গে যেমন মিশত আর সেটা মনে রেখেই ভালোবাসত বা উপেক্ষা করে চলত, তেমনি মেয়েদের বেলাতেও। তবে মহিলাদের ও একটু অবিশ্বাসের চোখে না দেখে পারত না। অথচ সোমার ব্যবহার কত সরল, কত সাদাসিধে অথচ সে কত দুঃখী।

মায়াবী চাঁদের আলো রাস্তায় ছড়িয়ে পড়েছে। কিছুক্ষণ ধনসিং লরির চারপাশে ঘুরে বেড়াল। রাস্তার ধারের প্রাচীরের কাছে একটা পাথরে এসে বসল। ঝিরঝিরে বাতাসে বেশ ঠাণ্ডা লাগছিল। গুড়িশুড়ি মেরে কোনোমতে রাতটা কাটিয়ে দেবে ভেবেছিল। অতীতের অনেক কথা মনে ভিড় করে এল। আগে শীতটা ওকে অতটা কাবু করতে পারে নি। হাড়কাঁপুনি শীতে ও যখন থরথর করে কাঁপছিল, তখন ভাবল গাড়ির ভিতরে গিয়ে বসবে কিনা। একটু খিদেও পেয়েছে। খিদের জ্বালায় শীতটাও পেয়ে বসেছে। দুপুরে কর্মূ আর ও বিশেষ কিছুই খায় নি। ধনসিং খিদেটা ভুলে থাকার চেষ্টা করছিল। লরির সিটের

তলা থেকে কম্বল বার করে বেশ ভালোভাবে সাঁপটে-জড়িয়ে-সেঁটে বসল। মনটাকে চাঙা করে তুলতে কর্মুর গানটা গুনগুনাতে লাগল।

গানটাতে কোনো এক সুন্দরী তরুণীর বিরহ-ব্যথার প্রকাশ— ওগো পরদেশী, তুমিই আমার মনের দরজার শেকল খুলে দিয়েছ। তোমাকেই আমি আমার মন দিয়েছি। ওগো পরদেশী, তোমার প্রতীক্ষা করতে করতে আমার যৌবনের দিনগুলি ফুরিয়ে গেল, শুধু চোখ মেলে চেয়ে রইলাম। আমার জীবনের শেষ মুহূর্তেও তোমার চোখে চোখ রাখব বলে আমার চোখ দিয়ে অবিরত জল ঝরে পড়তে থাকবে। ওগো পরদেশী, শ্রাবণ মাসের আকাশ ও পৃথিবী ঘন বর্ষার ধারায় বাঁধা। আমি স্বেচ্ছায় সেই বর্ষার ধারা মাথায় নিয়ে তোমার পথ চেয়ে আছি। আমার শাশুড়ি গঞ্জনা দেয়, বলে, তুই বাইরে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? এ কথা শুনে আমার ভীষণ কষ্ট হয়। প্রচণ্ড শীতের এক-একটা তীর-ফলক এসে যখন শাল গাছের পাতায় বেঁধে, তখন তারা মাথা দুলিয়ে 'সি' 'সি' আর্তনাদ করে কেঁদে কেঁদে ওঠে; ওগো পরদেশী, তোমার প্রতীক্ষায় তখনও আমি স্বেচ্ছায় তোমার পথের দিকে চেয়ে থাকি। শাশুড়ি যখন বলে, আরে বাইরে দাঁড়িয়ে আছিস কেন, ভালো করে কাপড় জড়িয়ে বোস্, তখন আমার বুকটা ব্যথায় ভরে ওঠে।

ধনসিং কল্পনায় যেন দেখতে পেল দুঃখিনী সোমা বৃষ্টি ও ঠাণ্ডা মাথায় করে ওর জন্যে প্রতীক্ষা করছে। ও-ই সোমার সেই পরদেশী। গান ওর কাছে বাস্তব সত্য হয়ে উঠল। গানের এই গভীর ভাব ওর হৃদয়কে ভিজিয়ে দিল; ওর বুকটা ব্যথায় টনটনিয়ে উঠল। ওর পক্ষে আর গুনগুন করে গান গাওয়া সম্ভব হল না; চুপ হয়ে গেল। সন্ধ্যার ঘটনা মনে পড়ছে আর সোমার কথাগুলোও আবার যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। একটা বিরাট দীর্ঘশ্বাস পড়ল। ভাবল, কাল সকালে সোমা যখন পুকুরে জল নিতে আসবে তখন ওর সঙ্গে আবার দেখা করতে হবে।

কল্পনার জগৎ থেকে বাস্তবে ফিরে এসেই বুঝল খিদের জ্বালাটা প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে। একবার ভাবল, কয়েকটা আলু সেঁকে খেয়ে নিলে কেমন হয়! সময়ও কাটবে আর আগুনও সেঁকতে পারবে। লরি থেকে নামল। চাঁদের আলোয় এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল আগুন জ্বালাবার মতো কিছু জোটে কিনা। ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে কিন্তু সবই অস্পষ্ট। রাস্তার ধারে যে-সব ডালপালা বা শুকনো ঘাসে হাত দিল সব-কিছুই দেখল শিশিরে ভেজা। শালের বনে কাঠ হয়তো পাওয়া যায় কিন্তু তা অনেক দূরে। ও যদি ওখানে যায় আর পেছন থেকে কেউ এসে আলুর বস্তা তুলে নিয়ে যায়··· ? আগুন জ্বালাবার চেষ্টা না করে ও কম্বলটা ভালো করে মুড়িসুড়ি দিয়ে আবার লরিতে এসে বসল। মনের মধ্যে একটা আশা উঁকি দিয়ে উঠছে ; কর্মুর কাছ থেকে খবর পেয়ে বৈজ্‌নাথ থেকে যদি এ সময়ে একটা লরি এসে যায়!

ধনসিং খিদেটা কিছুতেই যেন আর বাগে আনতে পারছে না। সোমার কথা ভাবলে খিদের জ্বালা অতটা অনুভব করে না। সোমা পাকদণ্ডীর পথ বেয়ে টিলা পেরিয়ে চলে গেছে ; ধনসিং ঘুরে ফিরে সে দিকেই দেখতে লাগল। ভাবল, ঘুম যখন আসবে না, তখন ওর বাড়ি পর্যন্ত গেলে কেমন হয়। ভিন-দেশী ড্রাইভার, সাহায্য চাইলে কি আর দেবে না। যদি খালি হাতে ফিরে আসতে হয়, তাই সই ; তবুও তো সোমার সঙ্গে আর-একবার দেখা হয়ে যাবে। তা ছাড়া সোমাকে এ কথা বলে আসাও দরকার। ওর আশঙ্কা হচ্ছে, বৈজ্‌নাথ থেকে অন্য একটা লরি এক্ষুণি হয়তো এসে যাবে। এরকম একটা অবস্থায় পড়ে আশে-পাশের বস্তিতে গিয়ে হাঁকডাক ছেড়ে কিছু সাহায্য চাওয়া কোনো ড্রাইভারের পক্ষে মোটেই সংকোচের ব্যাপার নয়। কিন্তু নানা কথা ভেবে ধনসিং দ্বিধা করছিল।

তবুও দ্বিধা কাটিয়ে উঠে ধনসিং পাকদণ্ডীর দিকে পা বাড়াল।

কয়েক পা এগোতেই ও পাকদণ্ডীর একটা পরিচিত জায়গা দেখতে পেল। এখানেই সোমার সঙ্গে ওর দেখা হয়েছিল। সোমা তখন আকুল হয়ে কাঁদছিল। ধনসিং আরও একটু দূরে এগিয়ে গেল। বাঁশের একটা ঝোপঝাড়, তার ঠিক পেছনেই তিন-তিনটে খড়ের চাল, মাটির দেয়াল। ধনসিং বুঝে উঠতে পারল না কোন্‌টা সোমার বাড়ি। মনে পড়ল সোমা যেন বলেছিল, প্রথম বাড়িটা।

কোথাও কোনো আলো নেই। ঘুঁটের গন্ধ ও শাল কাঠের ধোঁয়ায় চারপাশটা ভরে গেছে। কয়লার উপরে ভুট্টার রুটি সেঁকার সুগন্ধ ভেসে আসছে। ধনসিং নিশ্চিন্ত হল, লোকেরা এখনও জেগে আছে।

প্রথম বাড়িটার উঠোন এবড়োখেবড়ো পাথরের টুকরো দিয়ে বাঁধানো। চারিদিকটা ঘন জঙ্গলে ঘেরা। চারিদিকে তুঁত আর নানা গাছগাছড়া। ধনসিং খুব সন্তর্পণে পা টিপেটিপে এগোচ্ছিল। একবার ভাবল কোনো কুকুর বা কোনো লোক যদি ওকে এই অবস্থায় দেখে তবে নির্ঘাত চোর ভাববে। একটু কেশে পায়ের শব্দ করল।

উঠোনে ঢুকতেই কাঠের সঙ্গে সংলগ্ন বাঁশের অর্গল। ধনসিং বাঁশের দরজায় খটখট শব্দ করে চেঁচিয়ে ডাকল— বাড়িতে কে আছ? জেগে আছ তো?

—কে ভাই? মেয়েলি কণ্ঠ শোনা গেল।

—আমি পরদেশী মুসাফির। রাস্তায় গাড়ি বিগড়ে গেছে।

—তা হবে। এখানে তো কোনো হাটবাজার নেই। মহিলা আরো কিছু বলার আগেই এক বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।—আরে যাও যাও। এখানে কোনো সরাইখানা নেই। এরকম পরদেশী মুসাফিরকে খুব জানি। চুরি-বদমাশী ছাড়া আর কোনো কাজ নেই। খেতের ফল-পাকুড়, তরিতরকারী কিছুই এদের জ্বালায় রাখার জো নেই। বাড়ির মেয়েদের নিয়েও টানাটানি। বুড়ো কথাটা শেষ করতে পারল না। খক্ খক্ করে কাশতে লাগল।

ধনসিং নিরাশ হয়ে দুটো দরজার দিকে তাকিয়ে রইল। চারিদিকে ঘন অন্ধকার ; একটি দরজা যেন হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অন্য দরজায় সোমাকে এক মুহূর্তের জন্য দেখা গেল ; হাতে তার শাল কাঠের মশাল। কিন্তু পেছন থেকে কার রূঢ় ও অপমানকর কথায় সোমা একটু যেন থমকে দাঁড়াল। সুতীক্ষ্ণ কর্কশ স্বরে এক মহিলা বকে উঠলেন— রান্নাঘর ছেড়ে কোথায় যাচ্ছিস, মাগী ? পর-পুরুষের গন্ধ পেয়েই কুকুরের মতো এক টুকরো মাংসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। চেঁচামেচিতে একটা বাচ্চা ঘুমের মধ্যে চমকে উঠে চিৎকার করে কাঁদতে লাগল।

সোমা বলল— কে এসেছে দেখছিলাম।

—হ্যাঁ, তুই তো বাড়ির কর্ত্রী কিনা। নির্লজ্জ কোথাকার। ছাখ তো কত কষ্ট করে বাচ্চাটাকে ঘুম পাড়িয়েছিলাম । চিৎকার করে জাগিয়ে দিলি। জ্বালিয়ে মারল আমাকে। নিজের পেটেরটাকে তো ডাইনী খেয়েছে। অন্যের বাচ্চাকে আর সহ্য করতে পারে না। হে ভগবান, এ মাগীকে সামলাও।

সোমা ধনসিং-এর দিকে একবার ফিরে তাকিয়ে চুপচাপ ভেতরে চলে গেল। বুড়োটা কাশতে কাশতে তখনও কী সব বলে যাচ্ছিল। কিন্তু ধনসিং-এর কানে গেল না, শোনার আগ্রহও ছিল না। নিজের বোকামির জন্য মনটা বিমর্ষ হয়ে গেছে। ফিরে যেতে যেতে ভাবল, ওর জন্যে বেচারীকে মিছিমিছি গালাগাল শুনতে হল।

ধনসিং শরীরটাকে ভালো করে কম্বল দিয়ে জড়িয়ে, হাঁটুমুড়ে গাড়ির সিটে শুয়ে পড়ল। বাইরে চাঁদের আলোয় আকাশ থেকে ঘন কুয়াশা ঝরে পড়ছে। চাঁদের সেই জেল্লা এখন হালকা দুধের মতো ম্লান। বারবার ভাবছে একটা কথাই, ওখানে গিয়ে কী বোকামীই না করেছে !

সকালেই তো সোমা জল নিতে আসে। কর্মু নিশ্চয় এতক্ষণে

বৈজ্‌নাথ পৌঁছে গেছে। খেয়েদেয়ে ওরা লরি নিয়ে যদি রওনা হয়ে থাকে তবে এরই মধ্যে এসে যাবে। ন'মাইল বইতো নয়। এক ঘণ্টার মধ্যেই আসবে, না আসে তো বড়জোর সকালে। যদি যাত্রী থাকত তবে এতক্ষণে এসে যেত।··· ধনসিং ভাবে, মণ্ডীর দিকে যাবার সময় সোমার সঙ্গে দেখা করতে এখানে থামবে। এখানে তো পুকুর আছেই। ইঞ্জিনে জল ভরে নেবে। তবে এই অজুহাতে কতটুকু সময়ই-বা থামা যাবে। দশ মিনিট নিশ্চয় দাঁড়াতে পারব। উপরে ও নীচে দু'দিকেই ফটকের কাছে দাঁড়াতে হয়।···এত ভালো মেয়েটা কসাইদের হাতে পড়ে কী কষ্টেই না দিন কাটাচ্ছে। এদের সঙ্গে থেকে ও কীই-বা পাচ্ছে ? এদের সঙ্গে আছেই বা কেন ? আমি সোমার জন্য সব-কিছু করতে প্রস্তুত। এই দুনিয়ায় আমারই বা কে আছে ? বড়সারের সেই নিজেদের বাড়ি ও জমির কথা মনে পড়ে গেল। অনেকদিন আগেই তা চুকেবুকে গেছে। ঐ ঘর থেকে পুলিশের লোক এসে ওদের বার করে দিয়েছিল। সোমার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা যেমন ওর কেউ নয়, ওর জেঠিও ছিল সেরকম। কিন্তু পুরুষ মানুষ কার তোয়াক্কা করে ? তার সামনে তো মস্ত দুনিয়া পড়ে আছে। মেয়েরা তো আর তা করতে পারে না। পুরুষের আশ্রয়ছায়া ছাড়া ওরা থাকতেই পারে না।··· আমি কি পুরুষ-মানুষ নই ? আমি ওকে আশ্রয় দেব।

ঘন কুয়াশায় চারিদিক ছেয়ে গেল। দারুণ ঠাণ্ডা পড়েছে। ধনসিং-এর নিশ্বাস গাড়ির কাঁচের উপরে পড়ে একেবারে জমে যাচ্ছে। কাঁচটা আবছা লাগছে। বাইরের দিকে তাকালে এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া চোখেমুখে এসে লাগে। হিমশীতল নিশ্বাসে কল্‌জে পর্যন্ত জমে যাচ্ছে। ধনসিং কম্বলটাকে মুখের ওপর টেনে দিল। চোখ বুজে রইল ; ঘুরে, ফিরে সেই একই কথা ভাবতে লাগল। পুরুষ হিসেবে একটি মেয়েকে আপন করে পেতে চায় মন, আশ্রয় দিতে চায় ; সেই সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা

থেকে মাথার মধ্যে বিয়ের চিন্তা ঘুরতে লাগল। পরিচিত জনেরা যদি একবার জানত ও এখনও বিয়ে করে নি, তবে খুব অবাক হত, হয়তো একটু করুণা করত। ঐ জেলায় এতখানি বয়স পর্যন্ত ওর মতো একজন ভালো মানুষের বিয়ে না হওয়া খুব একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার। লোকেরা ভাবত, হয়তো পোড়া ভাগ্য, নয়তো কোনো খুঁত আছে। আসলে বিয়ের ব্যাপারে ধনসিং-এর সেরকম কোনো আগ্রহ ছিল না। তবে বিয়ে না করার জন্য গঞ্জনা শোনার ভয়টা ওকে মাঝে মাঝে পেয়ে বসত। এরকম কোনো অস্বস্তিতে পড়লে ও ভাবতে থাকত ধনপত রায়ের বউয়ের কথা, আর একটা চরম আক্রোশে বিয়ের চিন্তা মন থেকে তাড়িয়ে দিত। যে পুরুষ তার স্ত্রীর দেখাশুনো ঠিকমত করতে পারে না, সেই বউ কখনই ভালো থাকতে পারে না···ড্রাইভার খলীল ঠিকই বলত, সোনা-জরু-জমিন বীরের লভ্য, দুর্বলের নয়। ড্রাইভারদের বিয়ে করে কী লাভ? তাদের ঘর বলে কিছু আছে নাকি?

ধনসিং ভাবত স্ত্রীজাতি হবে সতী-সাবিত্রী। অথচ ও ভেবে অবাক হত যে, মহিলারা বেড়ালের মতো চুপিসারে দুধ আর মাংস খায়। শত ঘায়েও রা করবে না, দেখে মনে হবে কত সাদাসিধে। সেই আরামের স্বার্থে বড়লোকের বউরা যেমন, গরিব লোকের বউরাও তেমনি লোভের ফাঁদে পা দেয়; সবই এক পদের। সঙ্গী ড্রাইভারদের মুখে মুখে রোজ কত কাহিনী শোনে, নিজেও দেখতে পায়···। চাইলে কি আর মেয়ে-মানুষ জোটাতে পারত না? মন যেখানে চায় না, সেখানে সম্পর্ক পাতাবার চেষ্টা ক'রে নিজের অপমান ডেকে এনে কী লাভ? নিজের অপমান ডেকে আনার চেয়ে অন্যকে অপমান করা অনেক শ্রেয়। একান্ত একেবারে নিজস্ব একটা কথা ওকে যেন সর্বদা পিষে মারত; বিয়ে করতে হলে নিজের ঘরবাড়ি ও কুলগোত্রের পরিচয় না দিলে তো চলে না। সব-কিছু খুলে বলে অন্যের চোখে নিজেকে হেয় প্রতিপন্ন

করতে ও চাইত না। সে পথ থেকে অনেক দূরে ঐ টিলার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে নিজের জন্মবৃত্তান্ত; সেই অপমানের খোলস ছেড়ে নিজেও অপমান থেকে বেঁচেছে। এই ভাবনাকে আবার আপন করে লাভ কী?

অথচ সোমার অন্তরে কোনো জ্বালা নেই; কত নির্ভেজাল সরলতা, কত ভালোমানুষ। দুনিয়াতে ওর আপনজন বলতে কেউ নেই। ধনসিং-এরও তাই। এ নিয়ে ওর আর লাঞ্ছনা পাবার ভয় নেই। ওকে অন্তত ভালোবাসে।···তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে ধনসিং; ওর চিন্তাভাবনা ও বিচারশক্তিও এখন যেন নিষ্প্রভ। কুয়াশার মত ঘিরে আছে নিদ্রা: কুয়াশার অনন্ত সমুদ্রে সোমা যেন সাঁতার কেটে চলেছে— এরকম একটা দৃশ্য ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল। কিন্তু সোমা কাঁদছে কেন? আঁচল দিয়ে চোখ দুটো ঢেকে রেখেছে। ও নিজের হাতে সোমার চোখের জল আস্তে করে মুছিয়ে দিচ্ছে। সোমা এবার মুচকি হাসছে··· ওগো তুমি বড়ো ভালো মানুষ গো··· জী··· জী··· এই যে, শুয়ে পড়েছ নাকি? ও পরদেশীয়া! ওকে সত্যি সত্যি কেউ ডাকছে, না ও কল্পনার রাজ্যে স্বপ্ন দেখছে— ঘুমের ঘোরে তা ও ঠাহর করতে পারল না। আবার যেন কে ডাকছে— জী, ও জী, পরদেশী, আহা চাও না, চেয়ে দেখো।

ধনসিং কম্বলের ভেতর থেকে মুখ বার করে লরির জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখল সত্যি সত্যি সোমা দাঁড়িয়ে আছে।

—জী, ঘুমিয়ে পড়েছ? সোমা আঁচলের খুঁটে একটি পোঁটলা বেঁধেছে; তার থেকে মিষ্টি একটা গন্ধ বেরুচ্ছে। সোমা পোঁটলাটা ধনসিং-এর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল— ও জী, তুমি ওখানে গেলে বলেই পড়ে পড়ে আমি গাল খেলাম। আমি বলেছি না এখানকার লোকেরা একেবারে রাক্ষস। সজ্জন গৃহস্থের দুয়ারে কোনো পরদেশী অতিথি গিয়ে যদি দাঁড়ায়, তাকে কি কেউ অভুক্ত রাখে? আমি তোমার জন্য

খাবার নিয়ে এসেছি। তাই তো মোষের দুধ দুইবার সময় আমি বাচ্চা মোষটার বাঁধন ইচ্ছে করে খুলে দিয়েছিলাম। ওকে খুঁজতে আমাকে ঠিক পাঠাবে তা আমি জানতাম।

ধনসিং সোমার দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইল। হাতটা কাঁধের ওপর রাখল। শীতকালে পিঠে জলের ধারা পড়লে যেমন কাঁপুনি ওঠে তেমনি সোমা এই স্পর্শে কেঁপে উঠল। ধনসিং দেখল, ওর কাপড়টা শিশিরে ভিজে গেছে। ধনসিং লরির দরজা খুলে মৃদু স্বরে বলল— বাইরে ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে আছ কেন ? ভেতরে এসো।

সোমা আপত্তি করল— না, এখন যাই। কাজ করতে করতে মরে গেলাম, বাব্বাঃ। বাচ্চা মোষটাকে তো খুঁজে বের করতে হবে। সোমা কথা বলতে বলতে কাঁপছিল।

ধনসিং উদ্‌গ্রীব হল— আরে, একটু এসো না।

— না, না. এখন যেতে দাও। সোমা লরির দিকে একটু এগিয়ে আবার পিছিয়ে এল। দোটানায় পড়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ধনসিং অনুনয় করল— আমার দিব্যি।

সোমার মন গলে গেল, বাধা দিয়ে বলল— হায়, দিব্যি দিচ্ছ কেন ? বালাই ষাট. ভগবান তোমাকে রক্ষা করুন। তুমি বড় ভালো মানুষ গো। ধনসিংকে দিব্যি থেকে বাঁচাতে সোমা লরির উপরে উঠে মাথার কাছে আশীর্বাদের ভঙ্গীতে দাঁড়াল। ধনসিং হাত বাড়িয়ে সোমাকে নিজের পাশে বসিয়ে কম্বলের অর্ধেকটা গায়ে জড়িয়ে দিল। একটু যেন ঘাবড়ে গেল সোমা ; কুঁকড়ে গিয়ে আপত্তি জানাল— জী, না। আমার শীত লাগে না···তুমি কম্বলটা জড়িয়ে ভালো করে বোসো।

ধনসিং কোনো আপত্তি-ওজর শুনল না। হাতটা সোমার পিঠের ওপর রাখল। বাইরে কুয়াশায় ভেজা কাপড়ে সোমা কাঁপছিল ; কিন্তু এখন ধনসিং-এর ঘনিষ্ঠ স্পর্শে ও যেন একেবারে সিঁটিয়ে গেল।

সোমা ওকে বোঝাতে চাইল— জী, না। এরকম করতে হয় না। কিন্তু শত চেষ্টা করেও ও ধনসিং-এর কাছ থেকে সরে যেতে পারল না।

ধনসিং ওর কানে কানে ফিসফিসিয়ে বলল— সোমা, একটা কথা শুনবে ?

—কি কথা ?

—কথা রাখবে বলো।

তুমি বড় ভালো লোক গো, বলেই ফেল না।

— আমার সঙ্গে যাবে ?

সোমা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। ধনসিং আবার একই কথা পাড়ায় সোমার চোখ ঝাঁপিয়ে জল পড়ল। ধনসিং একটু যেন দমে গেল। সোমার দিকে ঝুঁকে পড়ে ব্যাকুল স্বরে বলল— তুমি রেগে গেলে ?

আঁচল দিয়ে চোখ মুছে মাথা নাড়ল সোমা। রুদ্ধ কণ্ঠে বলল— বড় ভালো মানুষ তুমি ওগো। আমাকে তুমি বাঁচিয়েছ। কিন্তু কোথায় আমি যাব ? আমার মরণ এখানেই। ভগবান করুন আমি যেন তাড়াতাড়ি মরণপারে যেতে পারি। কান্না চাপতে গিয়ে সোমা ফোঁপাতে লাগল। ধনসিং তার পাগড়ির খুঁট দিয়ে ওর চোখের জল মুছিয়ে দিল। কিন্তু সোমা এখন অঝোরে কাঁদছে। ধনসিং-এর কাছ থেকে সরে বসার কথা যেন ভুলেই গেছে। ধনসিং-এর সহানুভূতির উত্তাপে শ্বশুর-বাড়ির সব লাঞ্ছনা-গঞ্জনার কথা বড় যেন বেশি করে মনে পড়ছে।

ধনসিং সোমার মাথাটা ওর বুকে চেপে ধরে ওকে সান্ত্বনা দিল— সোমা, কেঁদো না, আমার মাথার দিব্যি। বরং তোমার শত্রুরা কাঁদুক। কাঁদ তো আমার মাথা খাও। দিব্যির ভয়ে সোমা ওর কান্নার আবেগকে জোর করে সংযত করল। ওর শিথিল শরীরটা ধনসিং-এর বাহুতে এলিয়ে পড়েছে। সোমাকে আরও গভীর আশ্রয় দিতে ধনসিং একটা গভীর নিশ্বাস ছেড়ে ওকে আরও কাছে টানল। সচকিত হয়ে সোমা

আলিঙ্গন-মুক্ত হবার জন্য বলল— জী না, এ রকম করে না। অথচ জোর করে বাধা দিতে পারল না। কিছুক্ষণ ওরা ওভাবেই বসে রইল।

তারপর সোমা ধনসিং-এর আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে বলল —জী, এখন চলি। ও উঠে দাঁড়াল। ধনসিং ওকে লরি থেকে নামতে সাহায্য করল এবং পাকদণ্ডী পর্যন্ত এগিয়ে দিল। সোমা আস্তে আস্তে উপরে উঠে গেল। ধনসিং মৃদুস্বরে বলল— সকালে পুকুরে জল নিতে আসবে তো?

ধনসিং লরিতে ফিরে এসে আবার কম্বল মুড়ি দিয়ে বসল। কিছুক্ষণ পরে খাবারের কথা মনে পড়ায় ও ভুট্টার রুটি গুড় দিয়ে ধীরে ধীরে খেতে লাগল। কুয়াশায় ও ঘোলাটে চাঁদের আলোয় গাছপালা ও পাহাড়কে মনে হচ্ছে যেন বড় বড় রঙের ছোপ। সেদিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে ধনসিং ভাবতে লাগল। বৈজনাথ থেকে কখন গাড়ি আসবে তা নিয়ে ও মোটেই দুশ্চিন্তা করছে না। বরং ভাবছিল, গাড়ি যদি এখন না আসে তবে বেশ হয়। নিষ্পলক দৃষ্টিতে ও বাইরে তাকিয়ে রইল। অতীত জীবনের পটে এই সন্ধ্যায় নতুন উপলব্ধি ওর মনকে বার বার আচ্ছন্ন করে ফেলছে। ওর কেন যেন মনে হতে লাগল সোমাকে সাহায্য করাই এখন ওর জীবনের পরম সার্থকতা; সোমাকে ভালোবাসা যেন মনে হয় জীবনের পরিপূর্ণ দিক। ওর কেন যেন মনে হল, ওর জন্যই যেন সোমার জন্ম।··· সোমা যেন এতদিন ওরই প্রতীক্ষায় ছিল। অজানা দুর্লংঘ্য পথে ভগবান মানুষের ইচ্ছা পূর্ণ করেন। ধনসিং-এর সমস্ত অন্তঃকরণ যেন বলে উঠল, সোমা ওরই জন্যে, সোমা শুধু ওর।···যে নারী সংসারে একান্ত আপনার তাকেই পুরুষ ভালোবাসতে চায়, তার জন্যই সব-কিছু বিলিয়ে দিতে চায়। যে নারী শুধু প্রিয়তমকে ছাড়া আর-কিছু জানে না, পুরুষের চোখে তাই নারীর প্রেম। অতীতের স্মৃতি মনে ভিড় করে এল। ধনপতের বউ, হোসিয়ারপুরের ওস্তাদ মজহুরের

দোস্ত, সেই বিধবা গুলাবীর কথা যত ভাবে তত ওর মনটা ঘৃণায় বিষিয়ে ওঠে। ওদের তুলনায় সোমার স্বচ্ছতা, সরলতা ওর মনকে যেন আচ্ছন্ন করে তোলে। ধনসিং ভাবল, সোমা ওর জীবনের সর্বস্ব।

ঘন কুয়াশা জমে জমে চাঁদের আলোকে যেন গাঢ় পর্দায় ঢেকে দিয়েছে। কুয়াশা তার ঘোলাটে ভাব কাটিয়ে এখন নিজের গায়ে সাদা আস্তরণ বিছিয়ে নিয়েছে। এ-সব ধনসিং-এর নজর এড়িয়ে গেল, ও নীরবে চেয়ে রইল। দূর থেকে গাড়ির প্রচণ্ড শব্দ ভেসে আসছে। ধনসিং পিছন ফিরে দেখল, রাস্তায় দূরে পাহাড়ের আড়াল থেকে একটা আগুনের গোলা ক্রমশ তার মুখটা বার করছে। ভোর চারটের সময় এই গাড়িটা মণ্ডী থেকে চলে। ধনসিং ভাবল, বৈজনাথ থেকে যদি মণ্ডীতে কোম্পানি ফোন করে দিয়ে থাকে তবে এই গাড়িটাই লরিটাকে পিছনে বেঁধে টেনে নিয়ে যাবে। অথচ সোমা তো এখনও এল না।

পেছনের গাড়ির আলোটা ধনসিং-এর লরিতে এসে পড়ল। গাড়িটা কাছে এসে থেমে গেল। ড্রাইভার বলল, বৈজনাথ থেকে তো ফোন এসেছে। কিন্তু এখনও বেশ অন্ধকার। এটা সওয়ারী গাড়ি। লরিটা টেনে নিয়ে গেলে বোঝা বেড়ে যাবে। এক ঘণ্টার মধ্যে মালপত্র নিয়ে অন্য একটা ট্রাক আসছে। সেটাই এটাকে টেনে নিয়ে যাবে। শুনে ধনসিং খুশি হল। ভাবল, ততক্ষণে সোমা এসে পড়বে তো! চাঁদের হলদে রঙ কুয়াশার গা থেকে মুছে ফেলেছে ; এখন ঘন সাদা। চারদিকে বিন্দু বিন্দু শিশির কণা। ধনসিং বারবার ফিরে ফিরে টিলার পাকদণ্ডীর দিকে তাকাতে লাগল। সোমা যদি দেরি করে আসে— মনের কোণে এই আশঙ্কাটা লেগে রইল। ওর কেন জানি মনে হল, খুব তাড়াতাড়ি সকাল হয়ে আসছে।

ভোরের আলো ফুটে উঠেছে। মাথায় কলসিটা উল্টো করে রেখে সোমাকে পাকদণ্ডী থেকে নেমে আসতে দেখা গেল। ধনসিং লরি থেকে

নেমে পড়ল। সোমার কাছে গিয়ে বলল— এসে গেছ। সোমার চোখে চোখ রাখল। সোমার চোখে সেই জল-মেশানো দুধের নীলাভ রঙ নেই, চোখটা একটু লালচে, ফোলাফোলা। দেখেই মনে হয় সারা রাত ঘুমোয় নি, শুধু কেঁদেছে। ও নীরবে ধনসিং-এর দিকে তাকিয়ে রইল। চোখের কোণ থেকে দুফোঁটা অশ্রুবিন্দু ঝরে পড়ল, স্ফটিক-বিন্দু যেন চিকচিক করে উঠল। সোমা দাঁড়াল না, পথ পেরিয়ে পুকুরের দিকে এগিয়ে গেল। ধনসিং এগিয়ে গিয়ে তাকে থামাল, বলল — আমার সঙ্গে যাবে ?

সোমার চোখ দিয়ে তখন অঝোরে জল পড়ছিল — জী, মরণ তো আমার এখানেই লেখা। আবার এসো, আমি তোমার পথ চাইব। বড় ভালো লোক গো তুমি !

ধনসিং মুখ ফুটে কিছুই বলতে পারল না। সোমা আঁচলে মুখ মুছে পুকুরের দিকে চলল। ধনসিং ওদিকে পা বাড়িয়েছিল কিন্তু দূর থেকে গাড়ির আলো দেখতে পাওয়া গেল, একটার পর আর-একটা, পর পর তিনটে গাড়ি। ধনসিং লরির পাশে এসে দাঁড়াল।

একটা খালি লরি ধনসিং-এর গাড়ির পাশে এসে থামল। সর্দার বসাখাসিং জিজ্ঞেস করল— কী হয়েছে ? ধনসিং-এর গাড়িটাকে গালি দিতে দিতে ও নিজের গাড়ি থেকে লোহার শেকল বার করল। ধনসিং-এর গাড়িটাকে নিজের গাড়ির সঙ্গে শক্ত করে বাঁধল। ধনসিং-কে হুঁশিয়ার থাকতে বলে সে লরিটাকে টেনে নিয়ে গেল।

ধনসিং বারবার পুকুরের দিকে তাকাচ্ছিল। কুয়াশার ঘন আস্তরণ ভেদ করে পুবে উষার প্রথম আলো উঠছে। কলসি মাথায় পাকদণ্ডীর পথ দিয়ে সোমা ফিরে যাচ্ছে ; তার ছায়াটাও ধনসিং দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু বসাখাসিং ওকে জোর করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

শ্বশুরবাড়ির সোহাগ

সোমার জীবন আগে যেভাবে বয়ে চলেছিল এখনও তেমনি কিন্তু ওর মধ্যে নতুন কী-যেন একটা অনুভূতি জাগল, পরিবর্তন এল। এখন যা-কিছু হয় সোমা পশুর মত মুখ বুজে সয়ে যেতে পারে না। অন্য কেউ ওর দুঃখী জীবনের কথা ভাবে, এ অনুভূতি ওর দুঃখকে যেন আরও গভীর করে তুলল। মানুষ যখন বোঝে তার পিছনে দাঁড়াবার কেউ আছে তখন সে সামনের ধাক্কা সামলাবার সাহস ও শক্তি খুঁজে পায়। তেমনি সোমাও ভাবে, এত দুঃখের জীবন ওরই-বা হবে কেন ?

ধনসিং সোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চেয়েছিল কিন্তু সোমা রাজি হয় নি। মনের দিক থেকে ও তৈরি ছিল না ; আবার এও মনে হয়েছে, এটা ঠিক নয়। তবুও ধনসিং-এর এই আশ্বাস ওর জীবনের মস্ত বড় ভরসাস্থল মনে হল। ধনসিং এর কথায় এমন একটা আশ্বাস ছিল যে ওর দুঃখের ভাগীদার হতে সে রাজি।

রাস্তার কাছেই সোমার বাড়ি। দূর থেকে কোনো গাড়ির শব্দ শুনলে ও রাস্তায় এসে দাঁড়ায়, ভাবে ধনসিং এল বুঝি। কিন্তু সেই ভালো মানুষটির আর দেখা নেই। যত সব লুচ্ছা ড্রাইভারদের দেখতে পায়। এরা চোখ মেলে সোমার আকুলতা দেখে, ঠোঁট দিয়ে বিশ্রী

রকম শব্দ ক'রে কুৎসিত ইঙ্গিত করে। শিটি দেয়, মুচকি হাসে। কাজ থেকে মুহূর্তের জন্য যদি অবসর পায়, ভাবে, আমি ওর সঙ্গে যেতে আপত্তি করেছি বলে রাগ করল নাকি ? কই এল না তো।

শাশুড়ী সোমাকে ডেকে বলল— এক ডালা মকাই দানা ঝেড়েঝুড়ে জল-চাকি থেকে পিষে আন গে যা। পাহাড় অঞ্চলে খুব বৃষ্টি হয় বলে বাড়ির ছাদগুলি একটু ঢালু। ঢালু ছাদের নিচের দিকে শাল কাঠের বড় বড় তক্তা বিছিয়ে মাচান তৈরি করা হয়। গৃহস্থরা সেখানে ঘরের শস্য ও অন্যান্য জিনিসপত্র রাখে। সোমা মাচায় বসে মকাই দানা কুলো দিয়ে ঝাড়ছিল। নীচে মাদুর বিছিয়ে শাশুড়ী বিশ্রাম করছিলেন। মকাই ঝাড়ার ছড়ছড়, কুলোয় ঝাড়ার ঝপ্‌ঝপ্‌ সুরেলা শব্দে শাশুড়ী তন্দ্রায় ঢলে পড়লেন। শ্বশুর কাজে বাইরে গেছেন। শাশুড়ীর চোখ বুজেছে দেখে বড় আর মেজ বউ পাড়া বেড়াতে বেরুল। বড় বউ যাবার সময় ওর একটা কাঁথা ও সুঁচ-সুতো সোমার কাছে রেখে বলল— মকাই ঝাড়াবাছা হলে এতে কয়েকটা ফোঁড় লাগিয়ে দিস তো।

সোমা ভাবল, জল-চাকি থেকে ফিরতে যদি দেরি হয় বড় জার গোঁসা হবে। তাই মকাই বাছা শেষ করে সোমা কাঁথা সেলাই করতে বসল। এ কাজটা চুকলে তো পাঁচ-সেরি ডালাটা মাথায় চাপিয়ে টিলার চড়াই-উৎরাই পথে সওয়া মাইল যেতে হবে। তবু নিরালায় বসতে আজকাল বড় ভালো লাগে ; তখন পরদেশীর কথা ভাবতে পারে। এক-এক দিন করে আটটি দিন কেটে গেল কিন্তু তবু তো সে এল না !

খক্ খক্ কাশি শুনে বুঝল শ্বশুর ফিরলেন। বুড়ি শুয়ে আছে আর ঘরটাও নিঝুম হয়ে পড়েছে আঁচ করে বুড়ো গজগজ করতে লাগল, সব যেন মরে পড়ে আছে। খিল দেবার কথাও কারুর খেয়াল নেই। কুকুর-বেড়াল এলেও কেউ টের পাবে না। সোমা তক্তার ফাঁক দিয়ে শব্দ শুনে সব বুঝতে পারছে। বুড়ো উনুন থেকে ঘুঁটের আগুন

নিয়ে কল্কে সাজাল। হাতে গড়গড়াটা নিয়ে চলে গেল উঠোনের দিকে। দেয়াল-ঘেঁষা মাটির চত্বরে বসে গড়গড়াটা টানতে লাগল।

—রাম নাম, কেহর মিয়া। সোমা টের পেল কেউ এসেছে।

শ্বশুরের জবাব কানে এল— পেন্নাম হই, সাহজী, আসুন, আসুন! বসুন। বলেই হাঁক দিলেন— আরে কেউ আছিস, না সব মরে গেছিস। মন্নু সাহকে বসতে একটা মোড়া দে তো।

মন্নু সাহ শ্বশুরের চেয়ে দু-চার বছরের ছোট। এর সামনে পড়ে গেলে বউরা ঘোমটা টেনে দেয়। শ্বশুরের হাঁকডাক শুনে সোমা আঁচলটা মাথায় দিয়ে উঠতে যাচ্ছিল। ঠিক সেই সময়ে শাশুড়ীর গলার আওয়াজ পেল। মন্নু সাহের নামে আগেই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। উঠে এসে তিনি মন্নু সাহকে ভেতরে আসতে বললেন।

সাহ ভেতরে এসে বলল— রাম, রাম মিয়ানী। তারপর চলল কুশল-বিনিময়ের পালা। ততক্ষণে শ্বশুরও গড়গড়াটা হাতে নিয়ে ভেতরে এসে বসলেন। সাহের জাতের কথা মনে পড়ায় কেহর গড়গড়া থেকে বাঁশের নলটা বার করে সেটা এগিয়ে দিয়ে বললেন— নাও সাহজী, টান দিয়ে দেখ, মজা আসবে। একেবারে বাড়ির খেতের তামাক।

মন্নু সাহ ক্ষত্রী— নানা জায়গায় শস্য আর ঘি বেচে রোজগারপত্র বেশ জমিয়ে তুলেছে। এ ছাড়া লেনদেনের কারবার তো আছেই। কেহর ওর কাছ থেকে তিনশো টাকা সুদে ধার নিয়েছিল। মন্নু প্রায়ই এসে সুদের বদলে ঘি নিয়ে যায়। বড় ও ছোট জা মন্নু সাহকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না। ওর আড়ালে গালিগালাজ করে, কারণ সাহের হিসাবের ঠেলায় এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে ওদের বাচ্চাদের নামমাত্র দুধ জোটে। ঘি তৈরি করতে প্রায় সব দুধই লেগে যায়, বাড়ির লোকেদের ভাগ্যে জোটে ঘোলটুকু। ঘি নিয়ে যাবার সময় সাহের মুখে মিষ্টি মিষ্টি কথা শোনা যায়; কথার জাল বুনতে ওস্তাদ। ভাবখানা

এমন যে ও কেহরেরই সেবা করছে, নিজের লাভ-লোকসানের তোয়াক্কা পর্যন্ত করছে না। এদিকে বুড়ি তখন থেকে একটা মোড়া খুঁজে বেড়াচ্ছে ; সাহ তার কোনো প্রয়োজন দেখল না। সুন্দর লেপাপোছা ঘরের মেঝেতে অক্লেশে বসে পড়ে বলল– আরে মালকিন, অত ঝামেলা করার কী দরকার শুনি ? বউরা কই ? বাচ্চারা ভালো আছে তো ? ছোট বউকেও তো দেখছি না।

—মাগীর মরণ হয় না। হাত ঘুরিয়ে একটা বিশেষ ভঙ্গী করে বুড়ি বলল— এক মুহূর্ত যদি আমি বিশ্রাম পাই ! ছোট বউকে বলেছিলাম এক মুঠ মকাই পিষে নিয়ে আয়। ঐ তো ডালা হাতড়ে দেখো গে, বিকেলের জন্য এক মুঠো আটা নেই। একটু চোখ বুজতেই তো অন্য দু'জন তো পাড়া বেড়াতে বেরুল। আর সেই সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালাবার আগে ফিরবে না।

সাহজীর আসবার আসল অভিপ্রায় বুঝতে পেরে বুড়ো ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বলল— কী করব, সাহজী ভাই। কী পোড়া সময় পড়েছে দেখছেন তো। এবারকার সুদের জন্য একটু কিন্তু অপেক্ষা করতে হবে।

গড়গড়াটা বুড়োর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে মন্নু বুড়ির দিকে তাকিয়ে বলল— মালকিন ভাবী, মিয়া কী বলছে শুনছ তো ? কোন্ হারামজাদা সুদের কথা তোলে? ভাবলাম অনেকদিন মিয়ার সঙ্গে দেখা হয় না। তাই এমনি দেখা করতে চলে এলাম। বাচ্চারা আমার তো কম আপন-জন নয়। তাই ভাবলাম, যাই, দেখে আসি তারা কে কেমন আছে। কী বল ভাবী, তুমি তো জানোই।

—সাহজী, তোমার ওপরেই তো আমাদের ভরসা। বুড়ি তোষা-মোদের সুরে বললে— কৃষকের ঘাড় তো সব সময় সাহর হাতের মুঠোয়। সাহজী, কী আর বলব, তুমিই আমার কাছে পরমেশ্বর।

—এদিকে তো কিছু বাঁচাতে হবে। মন্নু যেন ভরসা দিচ্ছে এমন ভঙ্গীতে বলল— লগ্নের দিন যাচ্ছে যে, দু-চার পয়সা করার এই তো সময়। মিয়ার কাছ থেকে আমি তো বেশি দাম দিয়ে জিনিসপত্র নিয়ে যাই। নিই, কারণ ভাবি, তোমারও দু'পয়সা ঘরে আসুক। তা ছাড়া তুমি তো জানো মালকিন, হাঁটু তো পেটের দিকেই মোড়ে, কি, ঠিক কিনা?

একটা অসহায় ভঙ্গী করে বুড়ি হাত ঘুরিয়ে বলল— কোথায় আর পয়সা বাঁচাতে পারি সাহজী। বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে ঘর, তাই তো বলি, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। দুই-আড়াই সের দুধ যদি কখনও হয় সেই ঢের। বেশির ভাগ মোষগুলোই শুকিয়ে কাঠ, এর বেশি কিছুতেই বেরোয় না।

মন্নু গড়গড়াটাতে আর-একবার কষে টান মেরে কেহরের হাতে সেটা ফিরিয়ে দিয়ে বলল— বাঃ সত্যি চমৎকার তাজা তামাক। নাও, এবার তুমি খাও।

একটু পরে রহস্য-ভরা স্বরে বলে উঠল— কি, মুরলীর কথা শুনেছ নিশ্চয়!

—হ্যাঁ, মেয়েটাকে বিয়ে দিয়েছে, না? শুনেছি ছেলের তো বয়স খুব বেশি, না? এ নিয়ে তিনবার বিয়েতে বসল। কেহর ধুঁয়ো ছেড়ে কাশতে কাশতে গড়গড়াটা সাহর হাতে দিয়ে মন্তব্য করল।

আঙুল দিয়ে ঠোঁট চেপে যেন কোনো গোপন রহস্য ফাঁস করছে এমনভাবে বুড়ি শুধোল— মেয়েটার তো কম বয়স হয় নি! ওর সমবয়সীদের দু-দুটো কাচ্চাবাচ্চা হয়ে গেছে।

মন্নু গড়গড়াটা হাঁটুর উপরে নামিয়ে রাখল। গোপন কোনো কথা বলতেই বোধ হয় মন্নু কেহরের কাছে একটু সরে বসল। গড়গড়ায় হালকা একটু টান মেরে বুড়িকে বলল— হ্যাঁ, তাতেই বা কী এসে গেল ভাবীজি, মুরলী তো গুণে গুণে ছ'শো টাকা নিয়েছে। নিশ্চয় তুমি

শুনেছ। আরে, মেয়েরা পরের ঘরেরই সঞ্চয়। তার তো আমাকে তিনশো টাকা দেবার কথা। তা যাক, লোকটা ভালোই বলতে হবে। নিজেই এসে একদিন হাজির, বলল, নাও সাহজী, এ জন্মে তোমার দেনা শোধ না করলে পরের জন্মে একের জায়গায় দ্বিগুণ শুধতে হবে। তা মালকিন, তুমি তো জানোই, দু-চার পয়সার যা আমার লেনদেন, এরকম ভালো মানুষ আছে বলেই না সম্ভব।

বুড়ি হাত দিয়ে কপাল চাপড়াল— কী আর বলব সাহজী, হ্যাঁ, তবে বলি, কল্যাণ হোক। আমরাও তো ঐ হারামজাদীকে গুণে গুণে চারশো দিয়েছিলাম। তার মধ্যে তোমার কাছ থেকেই তো তিনশো নিয়েছিলাম। পেট চাপড়ে এখন সেই টাকার সুদ গুণে যাচ্ছি। আমার বাঘের মত জওয়ান ছেলেটাকেও গিলে ফেলল অভাগী। অতীত স্মৃতি মনে পড়ায় বুড়ির বুকটা ব্যথা করে ওঠে, শুকনো চোখে আঁচল চেপে ধরে। জওয়ান ছেলেটার জন্য বুড়ি খুব কেঁদেছিল। এখন আর চোখে জল আসে না। ভেবেছিল এ দুঃখের কথা উঠলে চোখের পাতা ভিজে উঠবে। চোখ থেকে আঁচল নামিয়ে আবার বুড়ি দুঃখ করে বলল — যাও-বা বাচ্চা হল, তাও আবার মেয়ে। সেটাও অনেক জ্বালিয়ে দু'মাসের মধ্যেই মরল। সাহজী, সবই আমার কপাল!

সোমা উপরের মাচানে বসে রুদ্ধ নিশ্বাসে সব শুনছিল। সাহ গড়গড়াটা ঠোঁটে চেপে আস্তে আস্তে বলল— মেয়েরা পরের ঘরের গচ্ছিত সম্পদ। দেওয়া-নেওয়া দুনিয়ার নিয়ম। কিন্তু ভাই, সারা জীবন বিধবা বউ পোষা কত যে ঝঞ্ঝাট তা কী আর বুঝি না। মন্নু কেহরের দিকে একটু ঝুঁকে গলার স্বর নামিয়ে বলল— মিয়া আশে-পাশের গ্রামে হরেক রকমের লোক আছে। সবাই কি আর ভালো মানুষ? আরে মিয়া, তোমার এই বিধবা বউ সোমার যদি কখনও কিছু একটা হয়ে যায়, তা হলে তোমাদের নাককান কাটা পড়বে,

পরিবারের কলঙ্ক তো হবেই, আর ছ্যা ছ্যা পড়ে যাবে। তা নয় তো সারা জীবন তোমাদের গলগ্রহ হয়ে থাকবে। কী বল ভাবী, মন্নু কি খারাপ কথা বলছে?

—ঠিকই তো বলছ সাহজী, একি আর হচ্ছে না। ইনিয়ে-বিনিয়ে বুড়ি বলল— সত্যি কথা বলতে কী, ভয়ে সারাক্ষণ বুকটা আমার কাঁপে। দেখতেশুনতে ডাগড়াই বউ। আমি তো হরদম বলি, মায়ের কাছে গিয়েই মরুক। এখানে নিজেদেরই পেট ভরে খাবার জোটে না।

মন্নু একটু সাহস পেয়ে আস্তে আস্তে বলল— তবে একটা কথা বলি?

উপরে বসে সোমার বুকটা ধড়াস করে উঠল। সাহ কী বলছে তা শোনার জন্য তক্তার ফাঁকে কান পেতে সোমা যেন নিশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগল। সাহ বলে গেল— আরে মিয়া, আমি যা বলছি তা যদি কর, গলার কাঁটাটাও খসবে আর ধারের বোঝাও কিছু কমবে।

গড়গড়াটা মুখেরে কাছ থেকে সরিয়ে কেহর উৎসুক দৃষ্টিতে মন্নুর দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল— হুঁ। দু'হাতে চোয়াল চেপে বুড়ি মন্নুর দিকে তাকিয়ে রইল।

মন্নু বলল— একজন পাঞ্জাবী মণ্ডীতে এসেছে। তিনশো টাকা তো তার কাছে হাতের ময়লা।

বুড়ি উৎসাহী হয়ে বলল— সাহজী, তোমার মঙ্গল হোক। কিন্তু ওর জন্যে আমরা তো চারশো টাকা খসিয়েছিলাম। ঠোঁটে আঙুল চেপে বুড়ি লম্বা একটা নিশ্বাস নিল।

বুড়ির মোটা বুদ্ধির দৌড় দেখে এক চোট হেসে নিল মন্নু, বলল —নাও, ভাবীর কথা শোনো। কোথায় কুমারী মেয়ে আর কোথায় বিধবা। আমি তো বলি, ঘি ছড়িয়ে পড়েছে, এখন যতটা বাঁচানো যায়।

কেহর খক্ খক্ করে কাশতে লাগল। মন্নু বলে গেল— বলো তো আমি ব্যবস্থা করে দিই। আমার এতে কীই-বা স্বার্থ! তোমাদের একটু সুরাহা হয় সেটাই আমি ভাবছি। গাঁয়ে রটিয়ে দিলেই হবে যে তোমরা সোমাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছ।

কী যেন চিন্তা করে কেহর মাথা নাড়ল, বউয়ের দিকে তাকিয়ে বলল— মণ্ডীতে ওকে কী করে নিয়ে যাবে শুনি?

মন্নু কথাটা শুনে না হেসে পারল না।— নাও মিয়ার বচন শোনো। আরে ওকে বলবে, বাপের বাড়ির থেকে তোকে ডেকে পাঠিয়েছে। ফিরে এসে গাঁয়ে ঠিক একই কথা বলবে। বিধবার তো ভাগ্য, শ্বশুর বাড়িতেও যেমন কাটে, বাপের বাড়িতেও ঠিক তেমনি।

শুনতে শুনতে সোমার যেন অসহ্য মনে হচ্ছে। মাথাটা কেমন যেন ঘুরে উঠল। চোখের সামনে যেন অন্ধকার নেমে আসছে। মন্নু চাদরটা সামলে এবার উঠে দাঁড়াল। কেহর ওর সঙ্গে কথা বলতে বলতে উঠোনের বাইরে গেল। বুড়ি পেছন থেকে চেঁচিয়ে উঠল— কোথায় যাচ্ছ? পাশের বাড়ি গিয়ে আমি না-হয় বউদের ডেকে আনছি। এমন এরা বদমাশ, সুযোগ পেলেই বামুনের বাড়িতে গিয়ে বসবে।

—সাহকে একটু রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি। এ কথা বলে কেহর বাইরের দিকে পা বাড়াল।

শাশুড়ী দরজাটা খোলার সঙ্গে সঙ্গে একটা কুকুর ভেতরে ঢুকে পড়ল। বিড়বিড় করে কী-সব গালাগালি দিয়ে বুড়ি বউদের ডাকতে বেরিয়ে গেল। সোমা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। শাশুড়ী যদি টের পেত সোমা তার কথা শুনছে তবে আর রক্ষে ছিল না। গালি তো দিতই, হয়তো ধরে বেদম মারত। সোমা তাড়াতাড়ি মাচান থেকে নেমে এল। মক্কার ডালাটা মাথায় চড়িয়ে তড়িঘড়ি উঠোন পেরিয়ে

পাকদণ্ডীর পথে জল-চাকির দিকে এগিয়ে চলল। তখনও মন্নু সাহ্ ও শ্বশুরের কথা কানে বাজছে।

সোমা তার বুক ধড়ফড়ানি টের পাচ্ছে। চোখ দুটো দিয়ে অঝোরে জল পড়ছে। সরু পাহাড়ী রাস্তায় চলতে গিয়ে বারবার হোঁচট খাচ্ছে। হায়, শত্রুরা আমাকে বেচে দেবে? কার কাছে বেচবে কী জানি? নিশ্চয় মুসলমানের হাতে গিয়ে পড়ব. আর নয়তো কোনো নীচ জাতির হাতে। আমাকে যে কিনবে, কী জানি আমাকে নিয়ে সে কী করবে! এর চেয়ে যে গলায় দড়ি দিয়ে মরাও ভালো। ইস্, যদি ঐ পরদেশী ড্রাইভারের সঙ্গে চলে যেতাম। ও তো আর ফিরে এল না! ও কি কিছু মনে করেছে? ভগবান আমাকে সব দিক থেকে মেরে রেখেছে। হায়, হায়, কী করি, কোথায় মরতে যাই।

এ-সব কথা ভাবতে ভাবতে সোমা জল-চাকির কাছে পৌঁছে গেল।

পুব দিকের টিলার ওপর মুর্কী গ্রামের ছেলেটা সেই বাদলও আটা পেষাতে এসেছে। সোমা ওর দিকে তাকিয়েও দেখে নি। কিন্তু বাদল ওর আশেপাশে ঘুরঘুর করতে করতে নানা রঙ্গরস ও ফাজলামি শুরু করে দিল। কাছে এসে বলল— আরে, মিয়ানী যে কাঁদছে! আহা! ডালাটা খুব ভারী বুঝি?

অন্য গ্রামের বুড়ি ব্রাহ্মণী মথরী কাছে বসে ছিল। ও সহানুভূতি দেখিয়ে বলল— গরিব বিধবার কাঁদা ছাড়া আর গতি কী! খুব কষে খাটাবে কিন্তু খেতে দেবে না।

মথরীর কাছে যে মহিলাটি বসে ছিল নিজের দুঃখে সে চোখে আঁচল চাপা দিল— কী যে এখন অবস্থা হয়েছে! আগে গ্রামে দু-একটির বেশি বিধবা দেখা যেত না। কিন্তু ঐ পোড়া লড়াইয়ের পর এখন এই গোটা জেলাটা বিধবায় ভরে গেছে। যুদ্ধের পর প্রথম প্রথম আর্যসমাজীরা বিধবাদের বিয়ে দেবার তোড়জোর করেছিল। এখন

যা হচ্ছে তা তো দেখছই। আমার দু-দুটো ছেলে দুটি বিধবা রেখে চলে গেছে। মহিলাটি বেশ জোরে জোরে কাঁদতে শুরু করেছিল কিন্তু নিজের নম্বর এসেছে দেখে তড়াক করে উঠে চাকির দিকে চলে গেল।

বাদল এবার সোমার আরও কাছে এগিয়ে এসে বলল— মিয়ানীর আজকাল কি রুটিতে কম পড়ছে নাকি? একে তো দেখি ঘি-চিনির রসে ডুবিয়ে দিতে হবে। এ তো দেখছি আবার কথাই বলে না!

সোমা কোনো জবাব না দিয়ে রাস্তার দিকে মুখ ফিরিয়ে মুখে আঁচল টেনে বুড়ির কাছে এগিয়ে বসল। বুড়ি তো রেগে টঙ। বড় পাথরের একটা টুকরো হাতে উঠিয়ে বাদলের দিকে ছুঁড়ে মেরে গালি পাড়তে লাগল— এখনও নাণ্ডির নাড়ী শুকোয় নি আর হারামজাদা ছেনালী করতে এসেছে। বুড়ি চিৎকার করে সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল— এ-সব যুদ্ধের ফল। গাঁয়ে গাঁয়ে পুরুষমানুষদের সরকার ঝেঁটিয়ে নিয়ে গেছে এখন বদমাশগুলোর ভয়ডর পর্যন্ত নেই। কেউ যে এদের দাঁত ভেঙে দেবে তার ভয়ও নেই।

সোমা চাকি থেকে ফেরার সময়ও নিজের ভাগ্যকে শুধু দোষারোপ করল, ভাবতে লাগল, বিপদ থেকে বাঁচাতে ভগবান যাও-বা একজন ভালো লোক পাঠাল, আমার যে কী পোড়াকপাল, ওর কথা আমি শুনি নি। সময় খারাপ হলে এরকম দশাই হয়। ওর বিষণ্ণ মুখ দেখে শাশুড়ী ওকে জিজ্ঞেস করল— তোর কী হয়েছে রে? কাঁদছিস কেন?

সোমা চেপে গেল— কিছু না। সকাল থেকে মাথাটা কেমন যেন ধরে আছে।

বড় বউ বলে উঠল— হাড়গোড়ে মক্কার আটা সেঁটে গেলে এরকমই বাহানা শোনা যায়। ভারি তো এক সের আটা পিষে এনেছে, তাও আবার বাহানা।

পরের দিন দুপুরবেলা সোমা উঠোনের এক কোণে বসে বাসন

মাজছিল। কেহর ঘরের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে চত্বরে বসে হুকো টানছিল। তাই দেখে সোমা ঘোমটা টেনে দিল। বুড়ি ঘরের মধ্যে কী একটা কাজে ব্যস্ত। কেহর তাকে ডেকে বলল— এই যে শুনছ, ঐ ব্যাপারে কী— বলবটা কী ?

ভেতর থেকে শাশুড়ী জবাব দিল কোন্ ব্যাপারে ?

—আরে এখন বলছ কোন্ ব্যাপারে ? বলি তুমি কি ঘুমিয়ে থাক ? গতকাল দুপুরে মন্নু সাহ কামেটা থেকে খবর আনে নি ? কেহর রেগে-মেগে বউকে স্মরণ করিয়ে দেবার চেষ্টা করল।

সোমা কান খাড়া করে শুনছিল। কামেটায় ওর মা থাকে। কামেটার সঙ্গে মন্নু সাহের নাম করা হচ্ছে কেন ? ভিতর থেকে শাশুড়ীকে বলতে শোনা গেল— এতে অত ভাববার কী আছে ? ওরা কত ভালো লোক। ওরা যদি মেয়েকে নিতে চায়, না কি করা যায় ? ওর বাপ পুজো করবে। রোজ রোজ কি আর কেউ পুজো করে ? পুজোতে ছেলেমেয়েদের ডাকতেই তো হয়। বারণ করবে কী করে ?

মেজ বউ বড় বউকে শুনিয়ে প্রবল আপত্তি তুলে বলল— বড় পুজোরী এসেছে রে, মেয়েদের যে বেচে দেয়, সে তো পুজো করবেই, বড় ধর্মাত্মা কিনা। আমরা তো দু'বছর হয়ে গেল মায়ের উঠোন দেখি না। ওখানে তো বড় পুণ্যাত্মা থাকে কিনা।

বড় বউ কাজ বেড়ে যাবার আশঙ্কায় ঝাঁঝি মেরে উঠল— সারাদিন জল ভরা আর মাথায় করে ময়লা-আবর্জনা নিয়ে যাওয়া -- ও আমার দ্বারা হবে না।

শ্বশুর ধমক দিয়ে উঠল— কাজ করতে হলেই দেখি বিড়বিড় করে। ছোট বউ কি ঘরের কাজের ঠিকা নিয়েছে নাকি ? ওর মধ্যে কি জান-প্রাণ নেই ! ওর কি মা-বাপ থাকতে নেই ? ডাকলেও যাবে না নাকি ?

বুড়োর সমর্থনে শাশুড়ী বলে উঠল। আর শাশুড়ী-বউদের মধ্যে

জোর ঝগড়া শুরু হয়ে গেল। সোমা ঘোমটার মধ্যে কাঁপতে কাঁপতে বাসন-কোসন মাজতে থাকল। তুই জায়ের প্রতি আজ প্রথম সোমার হৃদয়ের গভীরে কৃতজ্ঞতার অস্ফুট স্বর প্রতিধ্বনিত হল; ও মনে মনে প্রার্থনা করল— তোমাদের কল্যাণ হোক বোন। সুখে-সমৃদ্ধিতে থাকো। তোমাদের ছেলে-মেয়ে দীর্ঘজীবী হোক। তোমাদের তুটি পায়ে পড়ি আমাকে তোমরা যেতে দিয়ো না। আমাকে বাঁচাও। এখানেই আমি মরব। তোমাদের সবার আমি গোলাম হয়ে থাকব।

শাশুড়ী-বউদের ঝগড়া বেড়ে গিয়ে এখন স্রেফ্ গালিগালাজ শুরু হয়েছে। শাশুড়ী আর সহ্য করতে না পেরে একটা লাঠি উঠিয়ে মেজ বউয়ের পিঠে তু'ঘা বসিয়ে দিল। মেজ বউ তখন চিৎকার করে কান্না জুড়ে দিয়ে এক হাত নিতে লাগল। বড় বউ সুযোগ বুঝে ঘরের ভিতরে কেটে পড়ল। ঝগড়ার ফয়সালা করে শাশুড়ী তার রায় স্বামীকে শুনিয়ে দিল— এই হতভাগীদের আর কী? ওদের বকতে দাও। ছোট বউ কি ওদের মায়ের বাঁদী নাকি? জী, তু-চারদিনের মধ্যে তুমি ওকে পৌঁছে দিয়ে এসো।

সোমার হৃদয় জুড়ে কান্না উঠল, মনে মনে ভাবল— আমি যাব না। আমি কিছুতেই যাব না। আমার বাপ আমাকে বেচে দিয়েছে। এখন তোমরা আবার বেচতে চাও। আমাকে না-হয় নাই খেতে দিলে। ভুখা মরব তাও সই। কিন্তু আমাকে তোমরা আর কেউ বেচতে পারবে না। ও ধোঁকাবাজির মধ্যে আমি আর নেই। আমি কিছুতেই যাব না। কিন্তু শ্বশুরের সামনে এ-সব কথা বলব কী করে? ও ভেতরে গিয়ে হেঁশেল লেপতে লাগল। বুকটা কেমন যেন কাঁপছে। হৃৎপিণ্ড ঠেলে একটা কান্না গুমরে উঠতে চাইছে। অনেক কষ্টে কান্না সামলাল।

বিকেলে সোমা মোষগুলোকে ডেকে ডেকে পুকুরের দিকে চলল।

ওদের জল খাওয়াতে হবে। মনে মনে ভাবল, ঐ পরদেশীকে ভগবান যদি আজই পাঠিয়ে দেয়। অনেকক্ষণ রাস্তার কিনারে দাঁড়িয়ে রইল; গাড়ির শব্দ শুনবে বলে সোমা অপেক্ষা করতে লাগল। প্রথমে গাড়ি এল বৈজনাথ থেকে, পরে মণ্ডী থেকে। সোমা ঘাড় তুলে দেখল, চোখের সামনে হাত রেখে তাক করে ড্রাইভারদের চিনবার চেষ্টা করল। ড্রাইভাররা হেসে টিট্‌কিরি মেরে শিস্ দিয়ে কুৎসিত ইঙ্গিত করে সোমার চোখেমুখে ধুলো উড়িয়ে চলে গেল। কিন্তু সোমা সেই ভালো মানুষটির দেখা পেল না।

গাড়ি চলে যাবার সময় সোমা রোজই ব্যাকুল হয়ে রাস্তায় প্রতীক্ষা করে কিন্তু কাউকে দেখতে না পেয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে। ওকে বাপের বাড়ি পাঠাবার কথা ওর শ্বশুর-শাশুড়ী রোজই একবার করে বলে। আর জায়েরা ঝাঁঝি মেরে ওঠে— রাণীর বাপের বাড়ি পুজো যে। রাণীকে নিয়ে যেতে বাপের বাড়ি থেকে পালকি আসবে যে। মঝেরা গ্রামের বস্তির সব লোক এরই মধ্যে জেনে গেছে যে সোমার বাপের বাড়িতে বিরাট করে যজ্ঞ হবে।

সোমা ভাবল, জায়েদের সত্যি কথাটা বলে দেবে নাকি? কিন্তু ওরাই বা কী করতে পারে? শাশুড়ীকে বললে উল্টে ওর হাড়গোড় ভাঙবে··· ওর গলায় দড়ি বেঁধে যদি ওকে টেনে নিয়ে যায় তখন না-হয় দেখা যাবে। ভগবানই ভরসা। দুঃখের ভারে কখনও-বা ক্লান্ত হয়ে ভাবে— এখানেই বা কী সুখ পাচ্ছি? এখানেই-বা কোন্ মানুষটা ভালো? আমাকে খরিদ করে কেউ কি ছাগলের মত কেটে ফেলে মাংস খাবে? মাথাটা কেটে ফেললে তো বেঁচে যাই, ঝুটঝামেলা তো সব তা হলে মিটে যায়। কিন্তু মেয়েদের কি কেউ কেটে খায়?··· কিন্তু এর বেশি আর ও ভাবতে পারত না··· শ্বশুরবাড়িতে আর কিছু না হোক আমার কদর তো হয়েছে। বিধবাকে যে কিনবে সে কি আর ভালো

মানুষ হতে পারে? বিয়ের সময় জিনিসপত্র কেনার একটা রেওয়াজ আছে বটে কিন্তু আমি যে বিধবা! আমার যা হবার ছিল তা তো হয়ে গেছে। নতুন করে আর কি হবে? মুসলমান ছাড়া বিধবাকে কে আর কিনবে! এর চেয়ে মরে যাওয়া ভালো ছিল।

শাশুড়ী ওর চেহারা দেখে বারবার জিজ্ঞেস করতে লাগল— হতচ্ছাড়ি, তোর কী হয়েছে? জ্বর হয় নি তো? সোমার গায়ে হাত দিয়ে মনে হল একটু যেন জ্বর হয়েছে। শাশুড়ী এটা সেটা প্রশ্ন করে বলল —গুড়-মৌরী ফুটিয়ে খেয়ে নে।

সোমা এড়িয়ে গেল— কিছু না। সামান্য একটু মাথা ধরেছে।

সোমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে শাশুড়ী সহানুভূতির সুরে স্বামীকে বলল —শুনছ, ছোট বউকে তুমি একদিনের জন্য কামেটায় ছেড়ে এসো। ওর শরীরও ভালো যাচ্ছে না। জলহাওয়ার ফারাক হবে। বিয়ে হয়ে আসার পর ও তো আর বাপের বাড়ি যায় নি।

সোমা শুধু নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করে।

* * *

ধনসিং-এর এই মোটর দুর্ঘটনার ব্যাপারটা অনেকদূর গড়াল। এটাকে কেন্দ্র করে মালিকপক্ষ ও ড্রাইভারদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল; ড্রাইভারদের নিজেদের মধ্যে বাধল ঝগড়া। পঞ্চায়েত বসল ও বাগ্‌বিতণ্ডার ঝড় উঠল।

ড্রাইভারদের বক্তব্য, এক তো লম্বা সফরের রাস্তা; খারাপ রাস্তা, এবড়ো খেবড়ো, আঁকাবাঁকা ও উঁচু-নিচু। যুদ্ধ চলছে; নতুন মোটর বা যন্ত্রাংশের আমদানী বন্ধ। পুরনো জিনিসকে ধরে অত টানাটানি করলে ভাঙবেই।

মালিকদের বদ্ধমূল ধারণা, ড্রাইভাররা বড় বেশি বেপরোয়া; আসলে ওরা বোধ হয় ভাবে চাকরিবাকরির অভাব কী? এ কোম্পানীর

কাজ জুটবে না ? ঠিক আছে, অন্ত বিশটা জায়গা পড়ে আছে। আর কিছু যদি না-ই জোটে, যুদ্ধে নাম লেখালেই লেঠা চুকবে। সৈন্যদলে ভিড়লে টাকাও বেশি। তা ছাড়া অনেক ড্রাইভার নিচ্ছে। বেশ কয়েক মাস ধরে ট্রানস্পোর্ট কোম্পানিগুলিকে মেরামতের পেছনে বহু টাকা ঢালতে হচ্ছে। তাই কোম্পানির ম্যানেজাররা সবাই মিলে এর থেকে বাঁচবার একটা উপায় ঠাওরেছে; বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালিয়ে ড্রাইভাররা যদি দুর্ঘটনা করে বসে, তবে তার মেরামতের জন্য যা খরচ, তার অর্ধেকটা ড্রাইভারদের মাইনে থেকে কাটা যাবে যদিও সে টাকা কাটা হবে মাসে মাসে, কিস্তিমাফিক।

ড্রাইভারদের নিজেদের মধ্যে দু'রকম মত দেখা গেল। এক দলের নেতা মিয়া কুন্দনসিং ও মোহসিন খাঁ; অন্য দলের কর্তা ওস্তাদ মজহর। কুন্দনসিং ও মোহসিন খাঁ ড্রাইভারদের ছোটখাট ব্যাপারেও কোম্পানির সঙ্গে লড়াই করতে প্রস্তুত। ওস্তাদ মজহরের এটা মোটেই মনঃপূত নয়। এমনিতেই মজহর ঝগড়াঝাঁটি থেকে একটু দূরে দূরে থাকতে চায়। ওর কথা, মালিকের সঙ্গে কর্মচারীর আবার কী সব ঝগড়া! যার একবার নুন খেয়েছি তার সঙ্গে আবার লড়াই কেন? মালিকের গাঁটে পয়সা এলে সে তো কর্মচারীকেই দেবে। কিন্তু রোজগার না হলে দেবেই বা কী ? এই যে কেউ মালিক আর কেউ কর্মচারী, এ তো খোদারই ইচ্ছা। আর খোদার এই ধর্ম যে মালিক চিরকাল রক্ষা করবে আর কর্মচারী করবে সেবা। তাঁর ইচ্ছার খেলাপ করবে কার এমন হিম্মত? খোদার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কে মাথা তুলতে চায়, কে লড়তে চায়, আসুক। আসল কথা সবুরে মেওয়া ফলে।

মজহরের কোনো বিশেষ দল নেই। ও আবার দলেটলে পড়তে চাইত না। মালিকের ও পুরোনো ও বিশ্বস্ত লোক। মালিকও ওর কথা ঠেলে না। কারুর যদি মালিককে কিছু বলার থাকে সে মজহরকে এসে

ধরে। ধনসিং মজহরের গাড়িতে একসময় ক্লিনারের কাজ করত। মজহরই ওকে হাতে ধরে কাজ শিখিয়েছে। আর মজহরই ওর কথা বলে কয়ে ওকে ড্রাইভার করেছে। ধনসিং-ও মজহরকে খুব ভালোবাসে। তাই কুন্দনসিং ও মোহসিনখাঁর দলটলকে ও এড়িয়ে চলত। এদিকে ম্যানেজার ধনসিং-এর মাইনে থেকে দশ টাকা করে কেটে নেবার হুকুম দিয়েছে। ধনসিং ভাবল, কুন্দনসিং-কে এবার না ধরে উপায় নেই।

মিয়া কুন্দন সিং ওর কথা শুনে কোম্পানির চৌদ্দ পুরুষকে উদ্ধার করতে লাগল। গালাগালি দিয়ে বলল— জুলুম করলেই হল ? আরে সোজা কথা ; ও-লাইনে দু'দিনের জন্য গাড়ি চলা বন্ধ করে দাও, তো শালারা শুধু ষাট টাকা কেন ষাট হাজার টাকার খেসারত দিতে রাজি হয়ে যাবে। কিন্তু ইউনিয়নের অন্য ড্রাইভাররা ধনসিং-এর জন্য লড়তে রাজি নয়, ও নাকি ইউনিয়নের মেম্বার নয়। তা ছাড়া বোধরাম ড্রাইভারের ছুটির ব্যাপার নিয়ে মালিকপক্ষের সঙ্গে যখন তুমুল লড়াই চলছিল, ধনসিং শালা তাতে কি যোগ দিয়েছিল ?

চার-পাঁচ দিন এভাবেই কেটে গেল। ধনসিং-কে কোনো কাজকর্মই আর দেওয়া হচ্ছে না। ডিউটিতে আসছে না বলেই ধরা হচ্ছে। ধনসিং রীতিমত ঘাবড়ে গেল। দুশ্চিন্তায় পড়ল, ভাবল চাকরিটাই না হাত-ছাড়া হয়ে যায়। মজহরের কাছে গিয়ে বললেই সে উপদেশ দিতে বসে— মালিকের সঙ্গে ঝগড়া করতে চাও, করো, কিন্তু মনে রাখবে তা হলে খোদার কাছে সুবিচার পাবে না। আল্লাই সব-কিছু দেখে। একটু সবুর করো। মালিকের কাছে ক্ষমা চেয়ে নাও, দেখবে মালিকের মন গলে যাবে। এ অপমান মুখ বুজে সহ্য করার মত মনের অবস্থা ধনসিং-এর নেই।

ধনসিং ঘাবড়ে গেছে দেখে মিয়া কুন্দনসিং ওকেই গালি দিল, বলল— শালা, বহিনকা···তুই যদি মালিকের হাতে-পায়ে ধরে ক্ষমা চাস

তবে তোকে কেটেফেটে গর্তে ফেলে দেব ; ও লাশ কেউ খুঁজেও পাবে না। দেখতে পাবি রোজ তোর গাড়ি অ্যাক্সিডেণ্ট লটকে যাচ্ছে। বহন কা দিব্যি, ক্ষমা যদি চাস অন্য ড্রাইভারদের গলায় ছুরি চালাবি। আজ তুই মাথা নোয়াবি, কাল অন্য কেউ। আমরা সব সাফ হয়ে যাব।

কুন্দনসিং তার গোঁফ তা দিয়ে হুমকি ছাড়ল— আরে শালা, তোর যদি এ-ব্যাপারে শাস্তি হয়, তবে পেচ্ছাপ দিয়ে গোঁফ উড়িয়ে ফেলব। ইউনিয়নকে তুই কী ভাবছিস ? হাজারো লোক এক হয়ে হাত তুলব। কুন্দনসিং হাতের মুঠি দেখিয়ে বলল— এই দেখ আমার ঘুষির আঁট, শালারা পাহাড় হেলিয়ে দেখুক না। শালা ঐ কোম্পানি তো আমাদের রোজগারের টাকা খায়। মাকে একটা কুৎসিত গালি দিয়ে বলল— শালারা তো মাগী জড়িয়ে বিছানায় পড়ে থাকে। এই হাত দিয়ে আমরা জান বাঁচাই ; বৃষ্টির সময় যখন পাহাড় বেয়ে ঢাল নামে, পাথর পড়ে তখন মানুষগুলোর প্রাণটা বাঁচিয়ে কারা গাড়ি নিয়ে আসে, শুনি ! আরে আমি যখন এ কোম্পানিতে যোগ দি, তখন মাত্র ছ'খানা গাড়ি ছিল, বুঝলি মোটে ছটা। আর এখন 160টি। কোথা থেকে এসে গেল শুনি ? মালিকের 'ইয়ে' থেকে ? শালা এগুলো মিয়া কুন্দনসিং-এর রক্ত-ঘামের জিনিস, মাথার ঘাম পায়ে ফেলার জিনিস। কুন্দনসিং উত্তেজিত কণ্ঠে নিজের মাথা ঠুকে বলল— তোর মায়ের··· শালা, এটা তোদের মেহনতের ফল ? তা ছাড়া ড্রাইভার যদি একা পড়ে যায়, তবে সে কি আর ড্রাইভার থাকে ? ওরা তবে আখের রস চুষে ছিবড়েটা ছুঁড়ে ফেলে দেবে। তেরী বহিন কা···খবরদার আর যদি এদের মনে দাগা দিয়েছিস। বেটা বুকে সাহস রাখ। ধনসিং সান্ত্বনা ও ভরসা পেয়ে কুন্দনসিং-এর গালিগালাজ শুনতে লাগল, যেন শরণাপন্ন হতে পারলে তার চেয়ে আর সুখ নেই। তা ছাড়া এগুলো

ঠিক গালি নয়, মনের দুঃখ গালি দিয়ে বার করে, কুন্দনসিং ওভাবেই প্রাণের কথা বলে মনটাকে হালকা করে।

ড্রাইভার বাবুলাল ধনসিং-এর বয়সী। ও ভরসা দিল— আরে ইয়ার, ঘাবড়াচ্ছিস কেন? কোম্পানির মায়ের সাধ্য কি যে লটঘট বাধায়। ফৌজে খুব লোক নিচ্ছে। আমার ভাইটাও লোক-ভর্তির দপ্তরে কাজ করে। চাও তো এক্ষুণি ভর্তি করাতে পারি। খানাদানা-উর্দি মুফতে আর পকেটে 45 টাকা।

ড্রাইভারের পঞ্চায়েতে কমরেড ভূষণ গিয়ে হাজির। ও ধনসিং-কে অনেক বোঝাল— সাথী, ইউনিয়নের ওপর ভরসা রাখ। বাবুলালের খপ্পরে পোড়ো না। দু'ভাই লোক ধরে ধরে ফৌজে ভর্তি করায় আর কমিশন লোটে। ওদের জিজ্ঞেস করো না, ফৌজে অতই যদি আরাম তবে তোমরা আগে কেন নাম লেখাও না। যারা একবার গেছে এখন পস্তাচ্ছে। বিদেশী এক সরকারকে আমরা মদত দিই কেন? সরকারও যা আর মালিকপক্ষও তা। ইংরেজরা আমাদের ওপর গুলি চালাবে, আমাদেরই জিনিসপত্র লুট করে খাবে আর আমরা আহাম্মকের মত ওদের জন্য জীবন দেব! আচ্ছা বলো তো, সরকার তোমাদের কোন্ ভালো করেছে? কাদের নিয়ে সরকার? আজ যদি মালিকের সঙ্গে ঝগড়া বাধে, সরকার তার পুলিশ নিয়ে এসে মালিকের দলে ভিড়বে।

পরামর্শদাতাদের সংখ্যা এত বেড়ে গেল যে ধনসিং রীতিমত মুষড়ে পড়ল। এর চেয়ে কুন্দনসিং-ই ভালো, পরামর্শ-ফরামর্শের ধার ধারে না; হুকুম দিয়ে খালাস। কুন্দনসিং-এর হুকুমেই ড্রাইভারদের পঞ্চায়েত বসেছে। বোধরাম অন্য সঙ্গীদের দলে টানার জন্য বলল— প্রথম দিকে যারা আমাদের পাশে এসে দাঁড়ায় নি— তাদের জন্য আমরা অকারণে মরতে যাব কেন?

ধনসিং চটে উঠে তড়াক্ করে দাঁড়িয়ে পড়ল, বলল— মিয়াজি,

রেখে দাও। আমার জন্যে কাউকে আর মরতে হবে না। আমি আমার পথ দেখে নিতে পারব।

মধ্যস্থতা করল ভূষণ আর কুন্দনসিং। মজুর ও মেহনতী মানুষদের মধ্যে একতার যে কত মূল্য তা ও বোঝাল। দু'জন ড্রাইভার কিছুতেই যেন মানবে না। কুন্দনসিং হাত দিয়ে ভূষণকে জোর করে বসিয়ে দিয়ে গালি পেড়ে বলল — এইসব মা···দের আমি বোঝাচ্ছি। কোন্ শালা ইউনিয়নের মাতব্বরী করতে চায়, মায়ের দিব্যি, সামনে এসে দাঁড়া। ইউনিয়ন হল সব ড্রাইভার ভাইদের ইউনিয়ন। ইউনিয়নকে তোমরা কী ভাবো বলো তো? ইউনিয়ন মালিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করার দুর্গ, বুঝলে? যখন মালিক জুলুম করে, তখন ইউনিয়ন গড়ে ওঠে, বুঝলে? সব মালিকই জুলুম করে, যেমন সব ঘোড়া ঘাস খায়, বুঝলে? বহিন-কে-কসম, যারা মালিকের ইয়েতে ঘুসতে চায়, সে সব শালা মজদুরদের দুশমন। যে শালা মনে করে মালিক আমাদের বাপধন, তাকে বল-গে-যা মালিকের মার···ইয়ের কসম খাক্। কিন্তু যখন মালিক জুলুম করে, আবার সে-শালা দৌড়ে আসে ইউনিয়নে আর নিজেদের ভাইয়ের প্রতি দুশমনি ছেড়ে ইমানদার ভাই হয়ে যায়। কোন্ মায়ের···ইয়ে আছে যে শালা মজদুরকে ভাই-ভাই হতে দেবে না, কোন্ শালা এতে বাধা দেবে— আসুক আমার সামনে। কোন্ মা··· আছে যে চায় আমাদের মজদুর ভাই মালিকের ইয়ে···তে ঢুকে পড়ুক? যদি কোনো বেইমান থাকে খাড়া হয়ে যাও।

ব্যস, কেউ দাঁড়াতে সাহস করল না।

কুন্দনসিং চ্যালেঞ্জ দিল — সাবাস, ঠিক আছে, সব ভাই একমত হয়েছে। ধনসিং-এর টাকা কাটার কারুর হিম্মত নেই। মালিকদের যে চর এখানে বসে আছে সে যেন তার বাপকে এক্ষুণি বলে আসে যে ধনসিং-এর টাকা কাটলে হরতাল হয়ে যাবে। লাইনে একটাও গাড়ি

চলবে না।

বংশীলাল ড্রাইভার দাঁড়িয়ে উঠে বলল— ভাইসব, মিয়াজী ও কম-রেডের কথা আমরা মেনে নিয়েছি কিন্তু মালিক চালাকি শুরু করেছে। ম্যানেজার বলছে ধনসিং বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালাচ্ছিল বলে অ্যাক্সি-ডেন্ট হয়েছে। ছাগল-ভেড়া চরায় যে বউটা তার সঙ্গে ও নাকি ইয়ার্কি করছিল। ম্যানেজারের সামনে কর্মূ এই কুচলি করেছে। এই ব্যাপার-টাও পঞ্চায়েতে ফয়সলা করুক।

ধনসিং উঠে দাঁড়াল— কর্মূ গঙ্গাজল ছুঁয়ে আমার সামনে কথাটা বলুক তো। গঙ্গাজল ছুঁয়ে আমি বলছি এ ডাহা মিথ্যা কথা।

মোহসিন আর থাকতে পারল না, উত্তেজিত হয়ে বলল— ধনসিং যদি এরকম অন্যায় করে তবে ইউনিয়নের তরফ ওকে আমরা শ'ঘা জুতোর বাড়ি মারব। কিন্তু মালিকের সামনে আমরা সব এক।

পঞ্চায়েত ফয়সলা করল, কর্মূ যতদিন না ইউনিয়নের সামনে এসে মাপ চাইছে ততদিন কোনো ড্রাইভার তাকে নিজের গাড়ির ক্লিনার রাখবে না।

ম্যানেজার খুব বুঝদার লোক। হাওয়া উল্টো দিকে ঘুরছে দেখে তার গলার সুরই পালটে গেল। বিস্ময় প্রকাশ করে বলল— এসব ঝগড়া আবার কেন? আমি তো ধনসিং-কে কাংড়া-কুলুর লাইন থেকে সরিয়ে পাঠানকোট-ধর্মশালার লাইনে বদলি করছি। কাংড়ার লাইনের রাস্তাটা খুব খারাপ তো আর এ লাইনের পুরনো ড্রাইভার গুলজরীও এসে গেছে।

ধনসিং জরিমানার হাত থেকে রেহাই পেল বটে কিন্তু এখন অন্য সড়ক দিয়ে গাড়ি চালাতে হয়। এটা ওর মনঃপূত হয় নি। মণ্ডীর দিকে যেতে পারে না বলে সোমাকেও আর দেখতে পায় না। কিন্তু লাইন বদল হবার জন্য তো আর অভিযোগ করা চলে না। কাজে

যেখানেই পাঠাক সেটা মালিকের মর্জি। চাকরির ব্যাপারে কি এটা-নয়-সেটা-নয় করা যায়? ওর ওপর জুলুম করা হয়েছে এই-বা কে বলবে? কাংড়ার এবড়োখেবড়ো ও ভাঙাচোরা পথের চেয়ে সব ড্রাইভারই পাঠানকোট-কাংড়া এবং পাঠানকোট-ধরমশালার সড়কে গাড়ি চালাতে ভালোবাসে। ছ'মাথায় বেশ বড় শহর, খাওয়া-থাকার কোনো অসুবিধে নেই, দিল-খুশ্ করার অঢেল সুযোগ যা-দরকার সব হাতের কাছে পাওয়া যায়। মূর্খ, ঘর্মাক্ত, বোটকা-গন্ধ-ছড়ানো যাত্রীদের চেয়ে ফ্যাশনেবল ও সভ্যভব্য যাত্রী অনেক বেশি লাভদায়ক। নিজের মনে শুধু এ-কথাই ভাবে ধনসিং।

নানা কোম্পানি ও নানা পথের ড্রাইভাররা পাঠানকোট আর ধর্মশালায় একত্র হয়। গাড়ি ছাড়ার আগে রোদ্দুর সেঁকতে ড্রাইভাররা গোল হয়ে বসে; চিনেবাদাম ভেঙে ভেঙে সিগারেট ফুঁকে গল্পসল্প খিস্তিখেউড় করে। রাস্তায় যে-সব ঘটনা ঘটে কেউ-বা ফলাও করে বলে। দু-একজন পড়ুয়া ড্রাইভার কাগজ পড়ে যুদ্ধের খবর শোনায়। ইউনিয়নের ঝগড়ার কথা ওঠে। মহিলা যাত্রীদের চলা-ফেরা নিয়ে হাসাহাসি হয়। বড়লোকের ঘরের বউদের গলার স্বর, রূপ, কাপড়-চোপড় আর হাল-চাল ব্যবহার নিয়ে আলোচনাটা একটু যেন রয়েসয়ে চলে। কিন্তু গরিব মহিলাদের কথা বলতে ওদের যেন একটু বেশি উৎসাহ, গলার স্বর বিন্দুমাত্র কেঁপে ওঠে না, জমজমাট খোসগল্প শুরু হয়ে যায়। এ-সব কথা বলতে ওরা সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার করে। যে মহিলাকে দেখে মনে হয় বেশ বড়ঘরের বউ, ওমনি কেউ মন্তব্য করে ওঠে, "রোলস্-রয়েস" আসছে। কোনো মোটাসোটা মহিলা দেখলে, "সরে যা, সরে যা, ট্রাক আসছে।" আবার কোনো মহিলা ওদের সাংকেতিক ভাষায় "উড়ো-জাহাজ"। কেউ-বা "গাঁট-বোঝাই ঘোড়া", আবার কেউ-বা স্রেফ "মোষের বোঝা"। কোনো মেয়েকে দেখে খুশি হয়ে বলে, "ঘুঁড়ী ওড়ে"

বা "ঐ দেখ্ কত বড় একটা ঘুঁড়ী।" আর সুতো কাটা, সুতো টানা বা সুতো ধরে রাখতে বলে মুখ দিয়ে নানারকম আওয়াজ তোলে। ধনসিং-ও আগে এ-সব আলোচনায় অংশ নিত কিন্তু এখন আর ভালো লাগে না। ভাবে, সোমাকে নিয়ে যদি কেউ এরকম ঠাট্টা-ইয়ার্কি করে, তবে ?

* * *

মণ্ডী-বৈজনাথের পথে কৃষক-মেয়ের সঙ্গে ধনসিং-এর প্রেম-পীরিতের কাহিনী ড্রাইভারদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। ওদিকে যারা গাড়ি নিয়ে যায়-আসে তারা প্রত্যেকেই দেখেছে একজন মেয়ে সড়কের কিনারে দাঁড়িয়ে কার জন্য যেন প্রতীক্ষা করে। ওরা ধনসিং-এর সঙ্গে ঠাট্টা-ইয়ার্কি শুরু করে দিল— কী ভাই, খুব যে ভালোমানুষটি হয়ে থাক। আমরা তো আগুনে চোখ সেঁকি আর তুমি তো হাত সেঁকে নিচ্ছ, দাদা। কেউ বলে— আসল শিকারী, বুঝলে। উড়ন্ত পাখিকে মাটিতে ফেলেছে। অন্য জন কুৎসিত ইঙ্গিত দেয়— কসম খেয়ে বল তো দোস্ত, রাতটা কেমন কাটে ?

ইয়াসিন বলে বসে— দোস্ত, বল তো শালীকে একদিন মালের ট্রাকে বস্তায় পুরে একেবারে ধরে নিয়ে আসি ?

প্রথম প্রথম ধনসিং লজ্জা পেয়ে চুপ করে যেত কিন্তু আজকাল এ-সব কথা শুনলেই ও বিগড়ে যায়। ড্রাইভার গুরুচরণ একটা অশ্লীল রসিকতা করায় রেগে গিয়ে তাকে দু'ঘা লাগিয়ে বসল। এতে অন্য ড্রাইভাররাও বিগড়ে গেল— শালা তুই গায়ে হাত তোলার কে-রে-বাপ ? মায়ের···ইয়ে কি তোর পরিবার নাকি ? আমরা বহিন··· রসিকতাও করতে পারব না ? শালা ওখানে রাত কাটিয়ে আসবে আব

বসিয়ে বিয়ে করে এনেছ নাকি, বহিন ? কোন্ মাকে ড্রাইভাররা ইয়ার্কি-ঠাট্টা করে না শুনি ? আমরা তো এই বহিনের···ইয়ের জন্য মালিকের সঙ্গে লড়াই করার ঝুঁকি নিলাম, এখন শালীকে রাণী বানিয়ে ফেলেছে। আরে ভাই, তোমার মা-বোন বা ঘরের লোককে কিছু বললে না-হয় দু'কথা শুনিয়ে দিতে। ড্রাইভাররা যদি চোখে ঢুলি বেঁধে চলে, প্রত্যেক কথায় পরোয়া করে, ভয় করে, তবে দু'দিনেই যে খতম হয়ে যাবে। এটা কি কোনো জীবন নাকি···বহিন ! গাঁ-ঘর থেকে দূরে, সকালে এখানে, তো সন্ধ্যাবেলা শ'মাইল দূরে। সব সময় ধুলো-ময়লা, সময়মত না-খাওয়া, না-শোয়া। নিজের বউকে দেখি নি কত মাস হয়ে গেল··· আমরা শালারা মুখ বুজে থাকব ? ওকে অগ্নিসাক্ষী করে ডুলিতে আর মাদর···দুনিয়ার ছুঁত-অছুঁতদের নিয়ে কারবার। বুকে ছুরি বেঁধে ···দু'টো কথা বলে মনটা হালকা করি···এ ছাড়া আর কী !

ড্রাইভার বলকীরাম হামীরপুরে তহশীলের লোক। ধনসিং-এর চেয়ে বয়সে প্রায় কুড়ি বছর বড়। অন্য ড্রাইভাররা ধনসিং-এর খুব পেছনে লেগেছে দেখলে ওদের মনোমত কথাবার্তা বলে একটা আপস রফা করে দিত। ধনসিং-কে একান্তে ডেকে তার কাঁধে হাত রেখে বোঝাল-- আরে ভাই, কী ছেলেমানুষি করছ ? ভালোবাসার একটা দাবি-দাওয়া আছে তো ; ওকি আর ড্রাইভারদের পোষায় নাকি ? ড্রাইভারদের আর আছেটা কী, ওরা তো মৌসুমী পাখি। সব সময় জান নিয়ে টানাটানি। নেশা আর মেয়েমানুষের বশে আসা খুব ভুল। সময় আছে, পয়সা আছে, স্ফুর্তি-আহ্লাদ করে নাও, কিন্তু ভালোবাসার ফাঁদে কখনও পা দিয়ো না। জমি-জর-জরুকে কে সামলাতে পারে ?— যার জমিয়ে বসার ফুরসৎ আছে। ড্রাইভাররা এ-সব কী করে সামলাবে ? ওরা তো উড়ন্ত পাখি, বুঝলে, স্রেফ পাখি। মুখে যদি একটু দানাপানি পড়ে, সেটা খুব ভাগ্য। জালে না জড়িয়ে পড়লে তবেই তো খোলা

আকাশে উড়তে পারে। যত পারো খেলাও, খরচ করো কিন্তু সারা জীবনের জন্য জড়িয়ে পড়া রোগটা থেকে সাবধান। বুঝলে ভাইয়া, রোদে পুড়ে পুড়ে আমার এই চুল পাকে নি। এখানকার ঘর, বাজার, গাঁ শহর সব ভালো করে দেখে নিয়েছি। যতক্ষণ সব-কিছু হাতের মুঠোয় ততক্ষণই মজা লুটতে পারবে। ফেঁসেছ কি মরেছ।

ধনসিং একবার ভাবল চাকরি-বাকরি ছেড়ে ফৌজে ভর্তি হয়ে যায় কিন্তু তা হলে সোমার সঙ্গে যে আর দেখা হয় না।

ধনসিং পাঠানকোট থেকে তৃতীয় প্রহরের সার্ভিসের গাড়ি নিয়ে ধরমশালায় যাচ্ছিল। নুরপুরে যাত্রী ওঠা-নামার জন্য গাড়ি দাঁড় করাল; রাস্তার কিনারে একটা দোকান থেকে এক গ্লাস লস্যি কিনে খেল। কাঁধের ওপর কারুর হাতের ছোঁয়ায় চমকে উঠে পেছন ফিরে দেখে মণ্ডী লাইনের ড্রাইভার বাবুলাল।

—আরে, শোনো তো এদিকে। বাবুলাল ধনসিং-এর হাত ধরে ওকে এক কোণে নিয়ে গিয়ে বলল— পালটা যাবার পথে যে ছোট চড়াই পড়ে সেখানেই কি তোমার গাড়ির অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল? ঐ যেখানে টিলার ওপর একটা আমলকী গাছ ও বাঁশঝাড় আছে? বাবুলাল ধনসিং-এর মুখের দিকে তাকিয়ে কী-যেন আঁচ করে বলল— ঐ মেয়েটা হয় কোনো বিপদে পড়েছে নয়তো স্রেফ পাগল হয়ে গেছে। সব সময় পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকে। আর গাড়িগুলোর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। মুখ চোখ ফোলা ফোলা, কান্না কান্না নিঃস্ব ভাব। ভাইয়া, যদি নাম বলতে বল বলব না কিন্তু। তবে কয়েকজন গুণ্ডা-বদমাশ ওকে কিন্তু লোপাট করার তালে আছে। ওরা সলা-পরামর্শ করছে, মণ্ডীতে নিয়ে যাবে, না ধরমশালায়। ভাইয়া এ-সব খুব খারাপ, অন্যায়। আরে হারামীরা ওর সঙ্গে দু-চারদিন খেলবে আর তারপর বেচে দেবে। আচ্ছা তোমাকে বলেই দি, কী আর লুকোব। ঐ শালা

বিহারী আর অফজল এই ফন্দি আঁটছে। বিহারী মাল-গাড়ির ডিউটি নেবার ফিকিরে আছে। দেখো, আমার নাম যেন আবার ফাঁস করে দিয়ো না। ব্যস, বলে দিলাম, যা করার হয় কোরো।

ধনসিং-এর পক্ষে গাড়ি ঠিকমত চালিয়ে নিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে উঠল। যেমন-তেমন করে ধরমশালায় পৌঁছল। গাড়িটা যথাস্থানে রেখে কোম্পানির অফিসে গিয়ে চারদিনের ছুটির দরখাস্ত দিল। ধনসিং এক ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে আছে, কখনও এ-পায়ে ভর দিচ্ছে, কখনও ও-পায়ে। কিন্তু ম্যানেজার ওর মুখের দিকে তাকিয়েও দেখছে না। ধনসিং আর ধৈর্য ধরতে পারল না, বলেই ফেলল— হুজুর ছুটি চাই।

—কেন? ম্যানেজার কাগজপত্র দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করল।

—কাল সকালে গাঁয়ে যাব, জরুরি কাজ।

—এটা চাকরি না তামাশা? ম্যানেজার ধনসিং-এর দিকে তাকিয়ে বলে উঠল— বিকেলে এসে সরকার হুকুম দিতে এলেন যে কাল সকাল থেকে হুজুর আসতে পারবেন না। তোমার কাজটা জরুরি আর কোম্পানির কাজটা ফ্যালনা, অ্যাঁ? মিয়াজী এখানে···ইয়ে-তে শ'টাকার লোকসান হয়ে যাবে। ছুটির জন্য নোটিশ চাই, জানো না নাকি?

ধনসিং খোসামোদ করে বলল— জনাব, ঘর থেকে খবর আসবে কী করে জানব?

—এভাবে ছুটি চাই তো বদলি লোক দাও। ব'লে ম্যানেজার আবার কাজে মন দিল।

—সাহেব, আমি কোথার থেকে বদলির লোক আনব? এক্ষুণি পাঠানকোট থেকে ফিরে এসেই বাড়ির অসুখের খবর পেলাম। কার কখন অসুখ হয়, তা কি কেউ বলতে পারে?

—আঃ জ্বালাতন কোরো না তো। যা বলার একবারে বলে দিয়েছি। দেখছ না, কুলু পর্যন্ত পঞ্চাশটার গাড়ির হিসাব পড়ে আছে।

আর তোমার কাজটাই জরুরি হয়ে গেল! তোমাদের ওখানেই তো বেশি করে লোকসান। হাঃ বড় সাহেব এলেন জরুরি কাজের হিসেব নিয়ে। ম্যানেজার ধনসিং-এর দিকে আর ফিরেও তাকাল না। কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে থেকে দাঁতে দাঁত পিষে ধনসিং বাইরে বেরিয়ে এল। সামনের দোকানে মোহসিনখাঁ পাগড়ির খুঁট দিয়ে গরম চায়ের গ্লাসটা সামলে আরাম করে চা খেতে খেতে শ্যামসুন্দরের সঙ্গে কথা বলছিল। ধনসিং কাঁদ কাঁদ স্বরে নালিশ করল— আচ্ছা খাঁ সাহেব, কারুর বাড়িতে অসুখ-বিসুখ করলেও কি ছুটি পাওয়া যাবে না?

—কী ব্যাপার? মোহসিন চোখ তুলে চাইল। ম্যানেজার যে বলেছে বদলির লোক দিলে তবে ছুটি পাবে, সে-সব কথা খুলে বলে খাঁ সাহেবের মুখের দিকে চেয়ে ওর উত্তরের অপেক্ষায় রইল।

শ্যামসুন্দর ঠাট্টা জুড়ে দিল— আরে তোর আবার কবে বউ এল যে বাড়িতে অসুখ বলছিস।

মোহসিনখাঁ ঠাট্টার জবাব দিয়ে বলল— ভোঁদাই-মাদার···বউ নেই বলে কী, ঘর তো আছে। বহিন···এ-কি সোজা আকাশ থেকে টুক করে পড়েছে নাকি, অ্যাঁ! যেখানে লোক পয়দা হয়, সেটাই ঘর। মোহসিন খাঁ ধনসিং-এর দিকে তাকিয়ে বলল— কী-রে, বাহানাবাজী করছিস মাদারের ইয়ে···না সত্যি কথা বলছিস? কি-রে মিয়া, তোর মনে রঙ ধরেছে নাকি···সেদিন গাড়ির ইউনিভারসাল জয়েন্ট ভেঙে নিয়ে এলি, কোম্পানিকে সওয়া শো টাকার বাঁশ দিলি। আজ আবার বিনা-বদলির ছুটি চাইছিস। শালা তুই নম্বর ওয়ান হারামী। মোহসিন সস্নেহে হাসতে লাগল।

ধনসিং খুব নম্র সুরে বলল— খাঁ সাহেব, আমি অসহায়, তাই। অসুখ-বিসুখ হলে কে কী করতে পারে···বলো।

—কিন্তু ভাই বদলির লোক চাই যে। লোক ছাড়া মাদার···—

কম্পানি কি নিজেই গাড়ি চালাবে নাকি ? এদের মায়ের···ইয়ের শালা কোম্পানি তো আবার স্পেয়ার লোকও রাখে না। মোহসিন বোঝাতে চাইল।

শ্যামসুল মাথা নেড়ে বলল— কেন, স্পেয়ার লোক আছে তো !

—তো কার জায়গায় কাজ করছে রে ? কোন্ শালা ছুটি নিয়েছে ?

শ্যামসুল গোঁফে তা দিয়ে বলল— আমার জায়গায়।

—তুই ছুটিতে যাচ্ছিস ? তোর আবার কিসের কাজ ? মোহসিন একটু যেন অবাক হল।

—ওস্তাদ ; আছে, খুব জরুরি কাজ। শ্যামসুল চোখ মারল।

খালি গ্লাসটা রেখে পাগড়ির খুঁটে গোঁফটা ভালো করে মুছে নিয়ে মোহসিন বলল— আরে কী জরুরি কাজ বলবি তো।

—ওস্তাদ, শরীরটা একটু কাবু হয়ে আছে। শ্যামসুল মুচকি হাসল। শ্যামসুলের পেছনে হরনাম দাঁড়িয়েছিল। সে হেসে বলল— ওস্তাদ, এর কী জরুরি কাজ বলে দেব ?

শ্যামসুল একটা ধমক দিল— দূর শালা, চুপ। কী জানিস রে তুই ? আমার একটা প্রাইভেট কাজ আছে। ওস্তাদ, বেটা মিথ্যে কথা বলছে। এ জানে না।

মোহসিন হরনামের মুখের দিকে তাকাল।

—ওস্তাদ, আজ বটালেওয়ালী মীরণ মাগীর কাছে যাচ্ছে। আজ মণ্ডী থেকে দেশী মদের বোতল এনেছে। হরনাম হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিল।

শ্যামসুল তীব্র প্রতিবাদ করে নিজের সাফাই গাইল— সাচ্চাইয়ের কসম, ও মিথ্যে বলছে, কিচ্ছু জানে না।

মোহসিন এক তোড়ে অনেকগুলো কুৎসিত গালি ঝেড়ে বলল— তেরী মা···কা ··উপরি টাকা খুব জুটছে, না ? হারামী মাগীবাজি করবে।

অবে, হরনাম, 'নিয়ে আয় শালার বোতল। শালা মাগীকে খাওয়াবে! উস্‌ কী মা···খা-বে, শালা, তোকেই খেয়ে যাবে যে। নিজের ভাইকে মদত দেবে না আর মেহনতের টাকা ঐ মাগীর পেছনে ঢালবে। শালা, রোগ এঁটে যাবে আর তখন ওটাকে ধরে চেতুর মতো চলে-ফিরে বেড়াতে হবে, বুঝলি ?

শ্যামসুল তোবা তোবা করতে থাকল। মোহসিনের ইশারায় হরনাম ও জহর ওর বোতলটা বার করল। তখন ধনসিং-কে আশ্বাস দিয়ে মোহসিন বলল— বেটা ঘাবড়িয়ো না। শালা ম্যানেজারকে বলে দাও-গে যাও, মোহসিনখাঁ আমার বদলি ডিউটি করবে। এখানে শালা শ্যামসুল আর আমি না-হয় একটা চক্কর লাগিয়েই আসব। পরশু বলকীরামের ছুটি সেদিন ও-বেটা সামলাবে। আরে এ বড় ভালো লোক বেচারা। বেটা তুমি যেন আর সপ্তাহ লাগিয়ে দিয়ো না। যদি দাও তবে কুন্দনসিং-এর কান ধরে টান মারব, বুঝলে!

ধনসিং সারা রাত ঘুমোতে পারল না। মনে নানা চিন্তা ভিড় করে এল। ভেবে চিন্তে একটা প্ল্যান তৈরি করল। পোস্ট অফিসে ওর 70 টাকা পড়ে আছে। কিন্তু রাতে সে টাকা উঠাবে কী করে ? ড্রাইভার-দের কাছ থেকে দু-চার টাকা ধার করে ও কুড়ি টাকার মতো জোগাড় করল ; নিজের কাছে যা আছে তা নিয়ে গোটা চল্লিশ টাকা হয়েছে। পরের দিন ভোরবেলা অন্য কোম্পানির বৈজনাথ যাবার বাসে চড়ে বসল। এই গাড়ির ঠিক দু'ঘণ্টা পরে ওদের নিজেদের কোম্পানির পাঠানকোট-কুলু সার্ভিসের গাড়ি যায়। ওর কেবলই মনে পড়ছে, বাড়ি যাবার সময় সোমা রাস্তার কিনারে গিয়ে দাঁড়ায়। আগেই ও পৌঁছে গেলে সোমার সঙ্গে দেখা হবে। ওর সঙ্গে সোমা যদি যেতে রাজি না হয় তা হলে ওর মাথার দিব্যি দিয়ে বলবে— তুই জেনে রাখ আমার মরণ-বাঁচন এখন থেকে তোকে নিয়েই।

ধনসিং যে গাড়িটায় বৈজনাথ পর্যন্ত গেল তার ইঞ্জিনটা সুবিধের না হওয়ায় পৌঁছতে আধ ঘণ্টা দেরি হয়ে গেল। এক মুহূর্ত দেরি না করে ও উল্টো দিকে হাঁটতে থাকল। খুব দ্রুত হাঁটছে। এদিককার রাস্তাটা খুব সরু; তাই গাড়িগুলি এককে সময়ে একদিকে চলে। সেদিন প্রথমে মণ্ডী থেকে বৈজনাথের দিকে এবং পরে বৈজনাথ থেকে মণ্ডীর দিকে গাড়িগুলি যাচ্ছিল। সড়কটা পাহাড়ের কোল ঘেঁষে ঘুরে-ঘুরে চলে গেছে। কোনো একটি জায়গা থেকে শুধু কয়েক হাত পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে; আবার এমন জায়গাও আছে যেখান থেকে মাইল-খানেক পথ চোখে পড়ে, যেন হেলাফেরা করে কেউ একগাছা দড়ি ফেলে রেখেছে। সামনে একটা গাড়ি ধুলো উড়িয়ে এদিকেই আসছে। পরিচিত লোকের চোখে না পড়ে যায় সেই ভয়; ধুলোও উড়বে খুব, তাই খেতে নেমে গেল। গাড়িটা বেরিয়ে যাবার পর আবার রাস্তায় উঠে এল। চড়াইয়ের পথে উঠতে ঘাম ছুটে যাচ্ছে। ঘণ্টা দেড়েক ধরে পথ হাঁটছে তো হাঁটছেই। বৈজনাথ থেকে যে-সব গাড়ি ছেড়েছিল সেগুলির এখন চড়াইয়ে উঠবার সময় হয়ে এসেছে। ওর গাড়ি সময়মত এলে ও এতক্ষণে অর্ধেক রাস্তা পার হয়ে যেত। আরও জোরে হাঁটছে ধনসিং। বারবার কপালে হাত রেখে দূরের টিলাটা দেখবার চেষ্টা করছে। টিলাটা দেখা যাচ্ছে কিন্তু এখনও দু'মাইলের কম নয়। রাস্তাটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে; চুনকাম-করা ফার্লঙের ফলকগুলি রোদে চকমক করছে। পিছনে গাড়িগুলির ইঞ্জিন ঘড়ঘড় আওয়াজ করতে করতে আসছে। ও আরও জোরে পা চালাল। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে; ঘামে নেয়ে উঠেছে; ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জুতোয় ঝরে পড়ছে।

পিছন থেকে ছুটে আসছে গাড়িগুলি; এবার ওর সামনে এসে পড়ল। সামনের রাস্তায় টিলার নীচ দিয়ে একটি বউকে আসতে দেখা যাচ্ছে। হাত দিয়ে চোখ দুটোকে আড়াল করে রোদ্দুরের তেজ থেকে

বাঁচতে চাইছে। গাড়িগুলিকে উঁকি-ঝুঁকি মেরে দেখছে। হয়তো তাকেও দেখতে পাচ্ছে। আসবে জানলে দূর থেকে হয়তো ওকে চিনতে পারত। ধনসিং চেঁচিয়ে ডেকে উঠতে চেয়েছিল। এত দূর থেকে ডাকলেও শুনবে না, উচিতও হবে না। ধনসিং হাঁপাচ্ছে এবং আরও জোরে পা চালাচ্ছে। একটা গাড়ি এক রাশ ধুলো উড়িয়ে ওর সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল। মানুষ তো আর গাড়ি হতে পারে না; মোটর মোটরই :- ইঞ্জিন লোহার নল দিয়ে গ্যাসের দম নেয়; আর মানুষ মানুষই, নিশ্বাস নেয় শ্বাসনালী দিয়ে। মানুষ গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দেবে কি করে? একটু পরে পরে বাস আসছে আর ওর দুর্বলতাকে যেন ব্যঙ্গ করে ধুলো উড়িয়ে চলে যাচ্ছে। ও গাড়িতেই তো সবসময় যায়-আসে; যারা ওর মতো পায়ে হেঁটে চলে, ধনসিং-ও গাড়ি নিয়ে তাদের ওপর ধুলো ছড়িয়ে যায়, তখন ভুলে থাকে নিজের কথা, নিজের শক্তি-সামর্থ্যের কথা। পথটা ভেতরের দিকে মোড় নিয়েছে। ধনসিং এখন আর টিলাটা দেখতে পাচ্ছে না। আশঙ্কায় ওর বুক কাঁপছে। গাড়িগুলি বেরিয়ে গেলে সোমা আবার না ফিরে যায়। ঘরে ফিরে গেলে সেখানে যাবে কী করে?

এতক্ষণ ধনসিং যে রাস্তাটা দিয়ে আসছিল তার দু'পাশে ঝোপ-ঝাড়। এখন সে খোলা রাস্তায় এসে পড়েছে। গাড়িগুলি টিলার থেকে এখন বহুদূরে বেরিয়ে গেছে। একটু আগে ধুলোর আস্তরণ পথ ঢেকে ফেলছিল। বাতাসের ঝাপটায় এখন ধুলো-টুলোও সাফ। সোমাকে আর সেখানে দেখা যাচ্ছে না। ঝোপঝাড় রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে গেছে বলে ধনসিং সোমাকে আর দেখতে পায় নি। কোথায় গেছে সোমা, ঘরে, না পুকুরের দিকে? জোরে পা চালিয়ে আর লাভ নেই। ধনসিং স্বাভাবিকভাবে চলতে লাগল। দ্রুত কদমে হাঁটায় গলা শুকিয়ে কাঠ। চলতে চলতে ভাবছে, সোমা কখন আবার

পথে নেমে আসবে বা পুকুরে জল আনতে যাবে তার তো ঠিক নেই; তবে সে সময়টুকু ও কোথায় অপেক্ষা করবে? ও ভাবল, পুকুরে গিয়ে আগে জল খাবে, তারপর না-হয় গাছের নিচে অপেক্ষা করবে। কী আর করা।

ধনসিং পুকুরের ধারে গিয়ে কাপড় কাচার থপথপ শব্দ শুনতে পেল। বুঝল, একজন বউ একখণ্ড কাঠের মুগুর মেরে মেরে কাপড় কাচছে। ও বউটিকে জানাতে চাইল ও পুকুরে যাবে; গলা খাঁকারি দিয়ে ঘাড় উঁচু করে দেখল। এক যুবতী বউ ময়লা একটা ওড়না দিয়ে শরীরটাকে লেপটে, মাথাটা একটু কাঁধের দিকে ঝুঁকিয়ে আন-মনে ধীরে ধীরে ভেজা ময়লা কাপড়ে মুগুরেব বাড়ি মারছে; অন্য হাতে অঞ্জলি ভরে পুকুরের জল তুলে নিয়ে কাপড়ে ঢালছে। মাথার চুল উস্কোখুস্কো; ঝুঁকে আছে বলে মুখটা দেখা যাচ্ছে না।

বউটি ধনসিং-এর গলার খাঁকারি ও পায়ের আওয়াজ বোধহয় শুনতে পায় নি; এই অবস্থায় বউটির সামনে যেতে ধনসিং-এর সংকোচ হল। কাপড়-চোপড় সামলে নেবার সময় দিতে ও আবার গলা খাঁকারি দিল। মুগুরের থপথপ শব্দে এবারও ওর গলার ইঙ্গিত বউটি শুনতে পেল না। আবার গলা খাঁকারি দিতে গিয়ে ভাবল সোমা নয়তো? কাঁধ ও শরীরের গড়ন দেখে সোমাই মনে হচ্ছে। ধনসিং-এর চোখ, কান, নাক উত্তেজনায় গরম হয়ে উঠল। ও অধীর হয়ে মাটিতে পা দিয়ে শব্দ করল।

চমকে উঠল সোমা। আগন্তুকের দিকে দৃষ্টি ফেরাল। এক মুহূর্তের জন্য চোখে-মুখে ফুটে উঠল একটা আতঙ্কের ছায়া। কিন্তু ধনসিংকে চিনতে পেরে লজ্জায় আরক্তিম হল। ওড়নার আড়ালে নিজেকে লেপটে নিতে চাইল। লজ্জায় মাথাটা দু-হাঁটুর ফাঁকে লুকোল।

ধনসিং এক লাফে পুকুরের ধারে চলে এসে সোমার উস্কোখুস্কো

চুলে হাত দিয়ে ধরা গলায় ডাকল— সোমা!

গলা কেঁপে উঠল সোমার, বলল— জী, কাপড়চোপড় গায়ে নেই, কেউ এসে পড়তে পারে।

ওর কাপড়চোপড় ভেজা পড়ে আছে দেখে ধনসিং ওর কথাটা ধরতে পারল। একটা ডেকচিতে এক রাশ ভেজা ময়লা কাপড়। দু-তিনটে কপড়ে ও মুগুরের বাড়ি মেরে কাচছিল। নিজের কাপড়টাই আগে ধুয়ে রাখছে। ভেবেছিল, তাড়াতাড়ি ধুয়ে নিয়ে ঘাসে শুকোতে দেবে। অন্য কাপড়গুলো ধোয়ার আগেই কাপড়টা শুকিয়ে যাবে।

ধনসিং বলল— তো কাপড়টা আগে পড়ে নে-না।

—ধুয়ে দিয়েছি। রোদ্দুরে দেব। একটু শুকিয়ে এলে পরব। লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে সোমা। কচ্ছপের মতো ঘাড়টা সামনের দিকে তুলে ধরে ব্যাকুল স্বরে বলল— কতদিন তোমার পথ চেয়ে আছি।

—এই তো আমি এসে গেছি।

—কী যে ভালো লোক তুমি। এখন একটু আড়ালে যাও, কাপড়টা একটু রোদ্দুরে মেলে দি। ধনসিং গভীর একটা শ্বাস নিয়ে মজনু গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। রোদ্দুরে তেতে উঠেছে পুকুরের পাথরে-বাঁধানো ঘাট। তাতে ও তার ভেজা কাপড়টা মেলে দিল। বাকি কাপড়গুলো ধোয়া-কাচা পড়ে রইল; এক কোণে সেঁটে রইল।

সোমার কাছ থেকে একটু দূরে পুকুরের ধারে এসে ধনসিং অঞ্জলি ভরে জল খেয়ে নিয়ে বলল— তোকে নিতে এসেছি।

মাথাটা ঝুঁকিয়ে জলের দিকে চেয়ে থেকে সোমা জবাব দিল— শ্বশুর তো আমাকে বেচতে মণ্ডীতে নিয়ে যেতে চাইছে। মন্নু সাহের সঙ্গে সলাপরামর্শ করেছে। সোমার চোখ ভিজে উঠল— তাইতো

আমি তোমার পথ চেয়ে আছি।

বিস্ময়-ভরা দৃষ্টি নিয়ে সোমার দিকে তাকাল ধনসিং। একটু থেমে কী যেন ভেবে নিয়ে বলল— মরা কাপড়গুলো ফেলে রাখ। কাপড়টা একটু শুকোলে ঝট্ করে পরে নিয়ে চল্ আমার সঙ্গে। চল্, খেত-খাদ পেরিয়ে চলি। পথের লোকেরা তোকে চিনে গেছে, পালটা ছাড়িয়ে না-হয় গাড়ি নেব'খন।

সোমা ওড়নার আঁচলে চোখ মুছল। উস্কোখুস্কো মাথাটা রুদ্ধ কান্নার আবেগে অবাধ্যের মতো কেঁপে কেঁপে উঠল।

ধনসিং আকুল স্বরে বলল— সোমা, তোকে আমি নিয়ে যাবই। তোর জন্য জান দিয়ে দেব। এই কসাইদের হাতে আর তোকে ছেড়ে যাব না।

কোনো কথা বলতে পারল না সোমা। শুধু অঝোরে কাঁদছে। ধনসিং আবার বলল— নে, এখন ওঠ, সময় নষ্ট করিস না, চল যাই। মণ্ডী থেকে ফিরতি কোনো গাড়ি তিন প্রহরের পর পালটায় পাওয়া যাবে, ওখান থেকে বাসে উঠব।

—জী, কোথায় আর যাব! সোমার গলার স্বরে একটা অসহায়তার সুর।

—অন্যের হাতে বিকিয়ে যাবি, না-হয় আমার সঙ্গে চল্। বুকের ধকধকানিতে গলার স্বর যেন কেঁপে উঠল।

সোমা উঠে দাঁড়াল। পুকুরের ধারে মেলে-দেওয়া কাপড়টা হাতে উঠিয়ে নিয়ে ঝোপের আড়ালে চলে গেল। ভিজে কাপড়টাই দু'মিনিটের মধ্যে পরে নিয়ে বেরিয়ে এল। ওরা পুকুরের ধারের নালার পাড় দিয়ে খাদের দিকে নেমে গেল।

এ পথটা ধনসিং ঠিক চেনে না। আঁচলে চোখ মুছে সোমা পথ বাৎলে দিচ্ছে। রোদ্দুর ও বাতাসে কাপড়টা এরই মধ্যে শুকিয়ে গেছে।

পালটা থেকে আধা ফার্লং পেরিয়ে ওরা রাস্তায় এসে পড়ল। এবড়ো-খেবড়ো পথ দিয়ে হেঁটে হাঁপ ধরে গেছে। ঠিক এই সময়ে মণ্ডীর দিকের চলতি বাসের শব্দ পাওয়া গেল। এখান দিয়ে একটা রাস্তা টিলা ঘুরে চলে গেছে। পিছনের গাড়িগুলি দেখা যাচ্ছে না। পথে টিলার লম্বা লম্বা ছায়া পড়েছে। একটু দম নিতে ওরা সেখানে একটু দাঁড়িয়ে পড়ল। সোমার সারা মুখে বিন্দু বিন্দু ঘামের রেখা ; জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছিল। ধনসিং তা দেখে বলল— চল্, বাসে গিয়ে উঠে বসি। ও ভাবল, গাড়িতে না চড়ে বসলে শুধু হেঁটে রাতের আগে কোনোমতেই বৈজনাথ পৌঁছতে পারবে না।

প্রথম বাসটি ওদের সামনে আসতে দেখে ধনসিং মুসাফিরের ভঙ্গীতে হাত তুলে গাড়িটাকে থামতে ইঙ্গিত করল। বাসটা ছিল ওদেরই কোম্পানির। ভয় পেয়ে গেল ধনসিং। কিন্তু হাত একবার যখন উঠিয়েছে বাসটা তো থামবেই। সামনের কাঁচ দিয়ে ড্রাইভারের মুখ দেখার চেষ্টা করল কিন্তু ও রাস্তার বাঁ-দিকে থাকায় যাত্রীদের ভিড়ে ড্রাইভারের মুখ ঢেকে আছে। দেখতে পেল না ধনসিং। একটু আগে গিয়ে বাসটা থামল। বাসের দিকে এগিয়ে যেতেই দেখে স্বয়ং মিয়া কুন্দনসিং গাড়ি থেকে নেমে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে।

আঁতকে উঠল ধনসিং, বলল— মিয়াজী, সওয়ারীর জন্য জায়গা চাই।

মিয়া ধনসিং-এর দিকে কটাক্ষপাত করে একটা গালি পেড়ে প্রশ্ন করল— এ বউটি কে ?

ধনসিং বলল— মিয়াজী আমার বউদি, একে সঙ্গে করে বাড়িতে যাচ্ছি।

কুন্দন সিং একটু গলার স্বর নামিয়ে ধমক দিয়ে বলল— তোর মার-ইয়ে, আমাদের চোখে ধুলো দিচ্ছিস। তেরী বহিন···কে, আর এজন্য

ঘরের অসুখের বাহানা করে ছুটি নিয়েছিস্‌ শালা। অন্যরা তোর জায়গায় বদলি ডিউটি দিয়ে মরবে আর তুই···মা··· কে ছিনতাই করে বেড়াবি, অঁ্যা! এই করতেই তবে গাড়ির অ্যাক্সিডেন্ট করেছিলিস, হারামির বাচ্চা।

—ওস্তাদ···। ধনসিং নিজের সাফাই গাইতে যাচ্ছিল কিন্তু কুন্দনসিং যেন তেড়ে এল— চুপ কর মা···কে··· নিজের বাপকে শেখাচ্ছিস? খবরদার কোনো বাসে পা রেখেছিস কি তোকে দেখে নেব। শালার ঠ্যাঙ খোড়া করে দেব। অন্য ড্রাইভারদের ফাঁসাবি, অঁ্যা? এই এই আম্মাকে নিয়ে শালা হেঁটে চলে যা; শালা, একে ওর ঘরে ছেড়ে আয়, তারপর দেখব।

দুটো বাস আসছে, একটার পিছনে আরেকটা। অন্য গাড়িটা একটু থামতেই কুন্দনসিং তাকে বেরিয়ে যেতে ইশারা করল। বাসটার ড্রাইভার ওর সাফাই না শুনেই গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে গেল। বেশ কয়েকটা বাস এল, চলে গেল। সওয়ারীর জন্য ইশারা করে কাউকে বাস থামাতে ও আর সাহস করল না। বুকের সাহস আর নেই যেন, প্রবল একটা দুশ্চিন্তায় ও যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলছে। তবু সোমাকে ভরসা দিল— এ গাড়িগুলিতে জায়গা পাওয়া যাবে না। বৈজনাথ থেকে না-হয় কোনো বাস নেব।

ওরা পাঁচ মাইল পথ হেঁটেছে। সূর্য পশ্চিমের পাহাড়ের বুকে মুখ লুকিয়ে ফেলছে। শীগগিরই সমস্ত জায়গাটা ঘন অন্ধকারে ছেয়ে যাবে। জোরে জোরে ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। চলতে চলতে দু'জনে ঘেমে উঠেছে। ঘামে-ভেজা কাপড়ে ঠাণ্ডা বাতাস আটকে যাচ্ছে; ওরা দু'জনে ঠকঠক করে কাঁপছে। অন্ধকার হয়ে গেছে; লোকেদের সন্দিগ্ধ চাউনিকে আর ভয় পাচ্ছে না ধনসিং। খালি পায়ে কাঁকরে-ভরা সড়ক-পথে এতদূরে হেঁটেছে সোমা। কেমন যেন বড় মায়া হল ধনসিং-এর। বারবার ও

সোমাকে সাহস দিল— ঘাবড়ালে চলবে না। পথের ক্লান্তির জন্য অত ভেবে কী লাভ ? সোমা হাঁপাতে হাঁপাতে নিজের ঘরের কথা ভাবছে। শ্বশুরের ও মন্নু সাহের মুখটা ভেসে উঠছে, তাদের দুর্ব্যবহারের কথা ভাবলে বুকটা বড় ব্যথা করে ওঠে। সোমা চোখের জল মুছে বলল —বড়ো ভালো লোক তুমি গো। তোমার উপরেই আমি ভরসা করে আছি। মারো, পুড়িয়ে ফেল, তাও তুমিই আমার সব।

ধরমশালায়, কুলু আর পাঠানকোটে ইংরেজ ও বড়ো বড়ো লোকদের স্ত্রীদের হাত ধ'রে হাতের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে নির্বিবাদে চলতে দেখেছে ধনসিং। দেখে ওরও শখ হত, মনে পুলক জাগত। ও অন্য ড্রাইভারের সঙ্গে এ নিয়ে হাসি-তামাসা ও কুৎসিত ইঙ্গিত করত। অথচ ওর মনে কেমন যেন একটা সহানুভূতি জাগছে, একটা কর্তব্য ও অধিকারের আবেগ ওকে যেন পেয়ে বসেছে। সেই ভঙ্গীতে সোমার হাত চেপে ধরে ওকে বলভরসা দিতে থাকল ধনসিং। সংকোচে সোমা যেন কুঁকড়ে গেল নিজের মধ্যে। বলল— জী, এরকম করতে হয় না। বড়ো ভালো লোক গো তুমি।

ধনসিং ওকে বোঝাবার চেষ্টা করল— এতে কী আছে ? কে দেখবে শুনি। বড়ো হাঁপিয়ে গেছিস, ভাবলাম, আমাকে ধরে একটু জিরিয়ে নে, বলভরসা পেয়ে নে। কিন্তু সোমা ঠিক মেনে নিতে পারল না। তা ছাড়া এমনিভাবে চলতেও ও অভ্যস্ত নয়। মনে বাধ-বাধ ঠেকে। অন্ধকারে লজ্জাজড়িত চোখে ধনসিং-এর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে একটু যেন আড়ষ্ট হয়ে বলল— এরকম করে না, জী। একটু সরে গিয়ে জোর কদমে ও ধনসিং-এর পাশে পাশে চলতে থাকল।

বৈজনাথের 'পুন' আর 'বিনয়া' খালের ওপর দিয়ে একটা সেতু তৈরি করা হয়েছে। উপর দিয়ে গাড়ি চলে আর মাঝের প্ল্যাটফর্ম দিয়ে যাত্রীরা। পাথরের-তৈরি সিঁড়ি বেয়ে যাত্রীরা উপরে উঠে খাল পার হয়।

ধনসিং ও সোমা হাঁপাতে হাঁপাতে সিঁড়ি ভাঙতে লাগল। অন্ধকার, চারিদিক নিস্তব্ধ। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। বৈজনাথ থানার ঘড়ি নিস্তব্ধতা ভেঙে ঢন্ ঢন্ করে বেজে উঠল। সাতটা বাজল। জোরে জোরে অনেক দূরের পথ হেঁটেছে, তারপর লম্বা লম্বা সিঁড়ি ভেঙে এখন দু'জনে খুবই ক্লান্ত ; রীতিমত হাঁফ ধরে গেছে। হুল-ফোটানো ঠাণ্ডা হাওয়াতেও ওদের গা-দিয়ে ঘাম ঝরতে লাগল। নিজের ক্লান্তির দিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই ধনসিং-এর ; ও সোমার কথা ভেবেই বলল— অল্প একটু বসে জিরিয়ে নাও।

দূরে ঐ নিচে খাল-বিলের গর্তগুলো সাদা সাদা পাথরে ভরা ; বর্ষার সময় জায়গাটা জলে ভরে যায়। এখন শীর্ণ সংকুচিত 'পুন'-এর জলধারা কুলকুল করে বয়ে চলেছে। চড়াইয়ের আশেপাশে শাল বনে হাওয়া লেগে সর সর শব্দ হচ্ছে। সিঁড়ির সেই দিকে দু'জনে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল : একে অন্যের গায়ের উত্তাপ নিয়ে কুঁকড়ে বসে রইল। ধনসিং-এর গায়ের সান্নিধ্যে ও স্পর্শের উত্তাপ পেতে সোমার এখনও সংকোচ হয়, যদিও ও জানে ধনসিং-ই ওর একমাত্র অবলম্বন। কুন্দনসিং-এর তিরস্কার ধনসিং-এর মনে শেলের মতো বিঁধছে কিন্তু সোমাকে এত কাছে পেয়ে কী যেন একটা সফলতার স্বাদও অনুভব করতে পারছে। মনে মনে ভাবে, 'ওর উপর এখন একটা মস্ত বড়ো দায়িত্ব এসে পড়ল। এই সাফল্য, এই পরিপূর্ণতার জন্যই ও সব-কিছু করতে প্রস্তুত।

—এই শোন্। ধনসিং সোমাকে ডাকল। সোমা সামনে ঝুঁকে পড়ে মাথাটা একটু কাত করে খুব মন দিয়ে ধনসিং-এর কথা শুনল। ও বলছিল— এই পাশেই বাজার। খাবারদাবারও পাওয়া যাবে। তুই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিস। রাতে এখানে সরাইখানায় থাকব, নয়তো কোনো দোকান থেকে চার পয়সা ভাড়ায় খাট নিয়ে নেব। আর হ্যাঁ, শোন, বাজারের লোকেরা খুব একটা সুবিধের নয়। জিজ্ঞেস করলে

আমি বলব স্বামী-স্ত্রী, বুঝলি ? তুই-ও তাই বলবি, কেমন ?

কথাটা শুনে সোমার সারা দেহে একটা রোমাঞ্চ খেলে গেল। মাথা নামিয়ে সায় দিতে কত যে ভালো লাগছে। কথাটা শুনতে মোটেই তো খারাপ লাগছে না। এ-ছাড়া ওরা লোকেদের কাছে আর কীই-বা বলবে।

—বাড়ি বলবি হমীরপুরের তহশীলে বড়সর থানায়। আমরা এখানে মণ্ডীতে আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়েছিলাম বলবি। এখান থেকে বাসে পালমপুর হয়ে আমরা ঘরে ফিরব। ধনসিং ওকে ভালো করে বুঝিয়ে দিল। দু'জনে বাজারের দিকে এগিয়ে চলল।

বাজারের কয়েকটি বাড়ি থেকে টিমটিমে আলো এসে পড়ছে। দোকানগুলির বেশির ভাগ বন্ধ হয়ে গেছে। কয়েকটি দোকানে লণ্ঠন জ্বলছে আর নয়তো কেরোসিন তেলের কুপি। ধনসিং ও সোমা বেশি দূরে আর এগোতে পারল না। রাস্তায় একটা পুলিশ টহল দিচ্ছিল। গায়ে লম্বা কোট। পুলিশটা ধনসিং-কে একটা ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করল— কে তুমি, কোথায় যাচ্ছ ?

ধনসিং টের পেল, পুলিশ! এক নজরে সে পুলিশটার চেহারা ঠাহর করার চেষ্টা করল— রাস্তায় গাড়ি চালাবার সময় ধনসিং এই পুলিশটাকে কখনও দেখেছে কি ? চেহারা দেখে মনে হচ্ছে না। খুশি হয়ে ধনসিং বলল— মুসাফির, মালিক।

—মুসাফির ? সামনের দোকান থেকে লণ্ঠনের আলো এসে পড়েছে ধনসিং-এর মুখে। সেই আলোতে পুলিশটা ধনসিং-এর মুখটা খুঁটিয়ে দেখে বলল— কিসের মুসাফির ? এ-সময়ে কোথা থেকে আসছ ?

—মণ্ডী থেকে।

—মণ্ডী থেকে ? অনেক দূর চলে এসছিস্ তো ভাই। মেয়েছেলে নিয়ে চলেছিস অথচ কোনো পোটলা-পুঁটলি নেই, পিঠে লটবহর নেই।

—জমাদার সাহেব, হ্যাঁ, এভাবেই চলে এসেছি। জিনিসপত্র বাসের সঙ্গীর হাতে দিয়ে দিয়েছি। একটু ভেবে নিয়ে ধনসিং আবার বলল— পিছনের গ্রামে এক আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করার ছিল। তাই বাস থেকে নেমে গিয়েছিলাম।

—হুঁ। অবিশ্বাসের সুরে পুলিশটা জিজ্ঞেস করল— এই মেয়ে-ছেলেটি কে ?

সোমা ধনসিং-এর আড়ালে দাঁড়িয়েছিল। পুলিশটা ধনসিংকে হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিল। এবার সোমার মুখের ওপর লণ্ঠনের আলো পড়েছে। পুলিশটা খুঁটিয়ে সোমাকে দেখতে থাকল। চোখে আলো পড়তেই সোমা একটু সরে দাঁড়াল। মাথার আঁচল টেনে নিল। পুলিশটা ধনসিংকে আর একবার মাথা থেকে পা পর্যন্ত ভালো করে দেখে ওর কোট-পাজামার দিকে নজর দিয়ে বলল— তোকে তো বড়ো জেন্টল-ম্যান দেখতে লাগছে ! কী কাজ করিস ?

—ধরমশালায় চাকরের কাজ করি।

—চাকর? কিরকম চাকর, ভাই।

—এই আর-কি হুজুর। এক পাঞ্জাবী বাবুর ওখানে চাকরি করি।

বউটার দিকে আঙুল দেখিয়ে পুলিশটা বলল— এ তোর কে হয় ?

—আমার পরিবার, হুজুর।

—এখানে রাতে কোথায় থাকবে ? এখানেও আত্মীয়স্বজন আছে নাকি ?

—জী, না। কোনো দোকানে, নয়তো ধর্মশালায় কোথাও একটু জায়গা করে নেব, হুজুর।

—ও, এই ব্যাপার। তো আমার সঙ্গেই চল। থানায় আরাম করার জায়গা পেয়ে যাবে।

—না, হুজুর। ধনসিং হাত জোড় করে মিনতি করল— হুজুরের

মেহরবানি হলে এখানে কোথাও পড়ে থাকব। গরিব লোক আমরা হুজুর।

—গরিব লোক, হক্ কথা, থানায় গরিবরাই যায়। বড়োলোকেরা কবে আবার থানায় যায়? চল, দু'জনেই চল। পুলিশটা হাতের ছড়ি ঘুরিয়ে হুকুম দিল।

ধনসিং পুলিশের মর্জি জানে, ওদের শক্তি-সামর্থ্যের সঙ্গেও ও পরিচিত। এই এলাকায় ও মোটেই বেশি আসে নি। পৌষ মাসে আলুর বস্তা ওঠাতে-নামাতে ও লরি নিয়ে আসত-যেত। তবে পাঠান-কোট, কাংড়া, কুলু, ধরমশালা ও হোসিয়ারপুরের লাইনে আড়াই বছর ধরে ড্রাইভারি করে ও বুঝে গেছে পুলিশ কী চীজ্। পুলিশ ড্রাইভারদের সঙ্গে এমনভাবে খেলা করতে থাকে ঠিক যেন বেড়াল-ইঁদুরের সম্পর্ক, যখন ইচ্ছে ধরবে, যখন খুশি ছাড়বে। আইন-ফাইন আবার কী? পুলিশের মর্জি ও হুকুমই তো আইন। গালভরা কথা, ইংরেজরাজ কিন্তু আসলে তো পুলিশেরই রাজ।

হোসিয়ারপুরের আড্ডায় পুলিশ প্রত্যেক ড্রাইভারের কাছ থেকে এক টাকা করে মাসোহারা আদায় করত; পাঠানকোট, কাংড়া ও ধর্ম-শালাতেও এই একই নিয়ম। না দিলে স্রেফ চালান। কোম্পানির বড়োকর্তারা নিজেদের গাড়ির চালান হয়, তা মোটেই পছন্দ করে না। ওরা নিজেরাও পুলিশকে সবসময় তোষামোদ করে চলে। এতে যা পয়সাকড়ি বেরিয়ে যায়, বড়োকর্তারা তাকে ইনাম বা বকসিস হিসেবেই ধরে। ড্রাইভারদেরও সেলামী দিতে হয়। পুলিশকে কেউ যদি মাসোহারা দিতে রাজি না হয় তবে তার গাড়িটা মাসের মধ্যে চার দিন চালান করে দেওয়া হয়। তখন অপরাধের মাত্রাও বেড়ে যায়, যেমন তীরবেগে গাড়ি চালিয়ে অপরাধ করেছ, ডান দিকে চলে গিয়ে সড়ক-আইন ভঙ্গ করেছ কিম্বা আর কোনো অপরাধ না করলেও একটা

অপরাধ নিশ্চয় করেছ ; যতটা মাল বইবার কথা তোমার গাড়িতে, তার চেয়ে বেশি মালপত্র বোঝাই করা হয়েছে। আর বোঝা যদি বেশি নাও হয়, তবুও পুলিশ যদি তোমার বোঝা তদারকির জন্য গাড়ি আটকায়, তবে সারাটা দিন বরবাদ, রেহাই নেই। পুলিশের হাতে পড়েছ কি সেই বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। এখানে গায়ের জোরের কোনো মূল্য নেই, সাহসেরও কোনো প্রশ্ন ওঠে না। হাত ছাড়িয়ে, ধাক্কা দিয়ে, মারপিট করে কতদূর আর পালাবে ? দশ মাইল, বিশ মাইল বা বড়ো জোর শ' মাইল। পুলিশ তো আরও আগে আছে। কোথায় পুলিশ নেই ? পুলিশের হাত থেকে বাঁচবার একটাই উপায় : বিনীতভাবে মোমের মতো গলে যাওয়া আর নিজের রোজগার খসিয়ে পুলিশের পূজাপাঠ করা। ইউনিয়নের লোকেরা কতবার বলেছে, খবরদার কোনো ড্রাইভার পুলিশকে যেন একটা পয়সাও না দেয়, কিন্তু না দিয়ে উপায়ই-বা কী ? ওরা মণ্ডী থেকে আসবার বা যাবার সময় বলবে মদের বোতল আছে কিনা দেখব, গাড়ি থামাও।

বিবশ মনে ধনসিং পুলিশের পেছন পেছন এগিয়ে যাচ্ছিল. সোমা তার পেছনে, মাথাটা নিচু ক'রে। সোমা কখনও পুলিশের ঝামেলায় পড়ে নি কিন্তু তবুও ও জানত পুলিশ বা দারোগা যা-খুশি তাই করতে পারে, ওদের বাড়া শক্তি নেই। ভগবান নিশ্চয় আছে কিন্তু তাঁকে তো কেউ চাক্ষুষ দেখে নি। গোরুটাকে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে গেলে বাছুরটাও যেমন সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে, ঠিক সেরকম সোমাও ধনসিং-এর পেছন পেছন চলতে থাকল।

ধনসিং-এর বুক ধকধক করছিল কিন্তু নিজেকে আরও প্রকাশ ক'রে ও আর-একটু সাহস সঞ্চয় করতে চাইল। খোশামোদের সুরে বলল— জমাদার সাহেব, আমার শ্বশুর খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তাই বউকে আনতে মণ্ডীতে গিয়েছিলাম। তাড়াতাড়ি পৌঁছানো দরকার।

আপনি হমীরপুরে অনুসন্ধান করতে চান করে নেবেন, আমাদের এখন ছেড়ে দিন।

পুলিশটাও ভরসা দিল— ভাববার কোনো কারণ নেই। আরে ঘাবড়াবার কী আছে? দারোগার কাছে না-হয় এ-সব কথা বোলো। আমি তো তার গোলাম। কীই-বা ক্ষমতা আমার, করবারই-বা কী আছে?

বাঁচার আর কোনো উপায় না দেখে ধনসিং বলল— জমাদার সাহেব, আপনিই আমার মালিক। খুব গরিব লোক আমি। সরকার, গরিবের ইজ্জত ধুলোয় মিলিয়ে যাবে। পকেট থেকে দশ টাকার একটা নোট বার করে ওর হাতে গুঁজে দিল।

পুলিশ বিশ্রীরকম হেসে উঠল, বলল— বা রে, খুবই ভালো লোক দেখছি। দশ টাকায় মেয়েছেলে ভাগিয়ে নিয়ে যেতে চাও, অ্যাঁ। নোট নিতে অস্বীকার করল পুলিশ। তখন ধনসিং পকেটে যা-কিছু ছিল পুলিশের হাতে গুঁজে দিতে চাইল। এবার পুলিশটা একটা বিশ্রী গালি ঝেড়ে ধমক দিয়ে উঠল— অবে···কাকে উল্লুক বানাচ্ছিস।

ধনসিং চাইছিল পুলিশটার গলা টিপে ধরতে কিংবা হাতের কাছের একটা পাথর ছুঁড়ে মাথা ফাটিয়ে দিতে। কিন্তু এ-সব করেও কি পুলিশের হাত থেকে রেহাই পেতে পারবে? পুলিশ কি শুধু সাড়ে তিন হাত লম্বা একটা মানুষ? পুলিশই তো সরকার। ধনসিং মাথার টুপি খুলে পুলিশের পায়ে রেখে দিল। শক্তি ও ব্যক্তিত্বের সামনে এভাবে আত্মসমর্পণ করেও ধনসিং পুলিশের মন টলাতে পারল না।

একা থাকলে ধনসিং অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে এক ছুট লাগাত; কিন্তু সোমাকে এদের হাতে ফেলে ও কী করে পালিয়ে যায়? পুলিশটার সঙ্গে সঙ্গে ওরা থানার ফটকে ঢুকল। ধনসিং এতক্ষণে বুঝল ওরা দু'জনে মানুষের তৈরি একটা ইঁদুর-মারা-কলে আটকা

পড়েছে ; সেই কলের জাল ছিঁড়ে আর বেরোবার কোনো উপায় নেই। একবার মনটা শক্ত করে জোর করে ভাবতে চাইল, এই জালে ও কিছুতেই পা দেবে না কিন্তু সোমার সঙ্গে না গিয়ে উপায় কী? অপমান, মারপিট আর জেল-হবার আশঙ্কায় ওর বুক কাঁপছিল।

থানার সামনে বিস্তৃত অঙ্গন ; সামনে একটা বারান্দা। তাতে বিছানো একটা তক্তাপোষ। খাটে শুয়ে আছেন মোটাসোটা দারোগা সাহেব। কম্বলটা টেনে নিয়েছেন গায়ে। হাতের কাছে বিরাট একটা গড়গড়া। তিনি গুড়গুড় করে গড়গড়ায় সুখ-টান দিচ্ছেন। তক্তা-পোষের সামনে একটা উনুন জ্বলছে। খাটের দুপাশে দুটো স্টুলে হারিকেন লণ্ঠন। ডিউটি-রত সেপাই দারোগা সাহেবের পা আস্তে আস্তে টিপে দিচ্ছিল। এটা দারোগা সাহেবের বিশ্রামের সময় ; এখন একজন সেপাইকে একজন পুরুষ ও একজন মহিলাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে দেখে তার ভ্রূ কুঁচকাল। চর্বিতে-ভরা গলাটা দিয়ে ঘর্ঘর একটা শব্দ বেরুল, মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল একটা কুৎসিৎ গালি -- এই মাকে··· হরিনাম এসময় কেন ধরে আনতে গেলি ?

হরিরাম, ধনসিং ও সোমাকে উঠোনে দাঁড় করিয়ে রেখে বারান্দার কাছে গিয়ে দারোগাকে একটা স্যালুট দিল। খাটের কাছে এগিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বলল— হুজুর এই রাজপুত একজন যুবতীকে ভাগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

দারোগা সাহেব শুয়ে ছিলেন, ভয়ংকর একটা কথা শুনেও তিনি শুয়েই রইলেন। ধীরে ধীরে কাশতে কাশতে হঠাৎ মানুষের মতো শব্দ বার করে জিজ্ঞেস করলেন— যুবতী, না বুড়ী ?

—একেবারে খাসা মাল হুজুর, অবিবাহিত। আবার বলে কিনা, আমার স্বামী। হুজুর ঐ চেয়ে দেখুন, নাকে না আছে নাকছাবি, না নোলক। হালে মাগী হয়েছে হুজুর। স্বামীটা হয়তো লড়াইয়ে মরেছে।

স্বামীর মৃত্যুর খবর শুনেই হুজুর ঘর ছেড়ে পালিয়েছে।

পুলিশের কথা শুনে ধনসিং-এর হৃৎপিণ্ডের ধক্‌ধকানি বেড়ে যেতে থাকল। যে সেপাইটি দারোগা সাহেবের এতক্ষণ পা টিপছিল, সে আগন্তুকদের দিকে মুখ বাড়িয়ে চেঁচিয়ে ডাকল— এখানে বারান্দায় উঠে এসো।

সোমা ধনসিং-এর পিছনে আড়াল করে দাঁড়িয়েছিল। ধনসিং বারান্দায় উঠে আসায় সোমাও এল। ধনসিং যেখানে দাঁড়াল, সোমাও তার ঠিক পিছনে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

দারোগা সাহেব ধনসিংকে জিজ্ঞেস করলেন— বউটি কে ?

—আমার বিয়ে-করা বউ, হুজুর।

—হুঁ, কোথাকার লোক।

—হুজুর রাজপুত।

—এর নাকছাবি কোথায় পড়ে আছে ? ধনসিং হকচকিয়ে গেল। একটু সামলে নিয়ে বলল— হুজুর, সাহু-এর বাড়িতে বন্ধক রেখেছি হুজুর। বড়ো গরিব লোক, হুজুর।

—আ-বে, একেও গয়নার মতো বন্ধক দিয়ে এলে পারতিস। দাঁড়া দেখি। দারোগা সাহেব ধনসিং-এর দিকে পাশ ফিরে শুলেন।

নফীস সেপাই স্টুলের উপর থেকে লণ্ঠনটা হাতে তুলে নিল। ধনসিংকে হাত দিয়ে একপাশে সরিয়ে দিয়ে সেপাই তার লণ্ঠনটা সোমার মুখের সামনে ধরল।

লজ্জায় কুঁকড়ে গেল সোমা। আরক্তিম মুখে মাথর ঘোমটা টেনে মুখটা ঢেকে দিল।

—আরে এত লজ্জা পেলে কী করে চলবে ? দারোগা বললেন— একবার তো দেখি, কে ?

নফীস সোমার পিঠের দিক থেকে ওড়নাটা ছিনিয়ে নিল। সোমার

মাথার ঘোমটা পড়ে যেতে লজ্জায় যেন মরে যেতে থাকল এবং হাত দুটো দিয়ে কোনোমতে মুখ ঢেকে বসে পড়ল। মাথাটা আঁচলে আড়াল করল। ধনসিং আর সহ্য করতে পারল না। ও নফীসের ঘাড়ে প্রচণ্ড একটা ঘুষি বসিয়ে দিল। নফীসের হাতের লণ্ঠনটা পড়ে ভেঙে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে হরিরাম, নফীস ও জওহর— তিনজন সেপাই একসঙ্গে ধনসিং-এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ওকে ডাণ্ডার বাড়ি মেরে, জুতো পেটা করে উঠোনো ফেলে দিল। সোমা দিশেহারা হয়ে ধনসিংকে বাঁচাতে ছুটল। নফীস ওকে একটা গালি দিয়ে ওর হাত ধরে পেছনে ঠেলে দিল।

দারোগা সাহেবের হুকুমমতো ধনসিংকে ধোলাই করিয়ে ওকে জেলখানায় পুরে রাখা হল। বারান্দায় বসে আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে সোমা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। এই ঘটনায় দারোগা সাহেবের মনটা বিরক্তিতে ভরে গিয়েছিল। পাঞ্জাব থেকে বদলী হয়ে তিনি হালে এ জায়গায় এসেছেন। ওঁর পরিবার এখনও পাঞ্জাবেই রয়েছে। মন লাগছে না এখানে। মনটা বিষণ্ণ হলে এই এলাকার চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করে তিনি কষে মদ গেলেন। এই ঘটনায় ওঁর মনটা বিগড়ে গেছে। তীক্ষ্ণ স্বরে গালাগালি পাড়লেন— মা···কে, শরীরটাকে কেমন যেন বিগড়ে দিল। কী যাচ্ছেতাই জায়গা শালা, ভইন···শালা এখানে অক্ষুর বিয়োবার লোক নেই··· না আছে সুখ-সম্ভোগ, না কোনো সোসাইটি।

জহর সেপাই খোসামোদের সমর্থন জানাল— হুজুর, পাঞ্জাবের কথা কী আর বলব! এটা তো বড়ো দীন-দরিদ্রের জায়গা।

—বিকেল ছ'টার থেকে তো, ভইন···এখানে নিঝুম রাত। লোকে এখানে করবেটা কী? দিনটা তবু শুয়েবসে চলে যায় কিন্তু রাতটা যেন আর কাটতে চায় না। এই শালা জহর, এই বোতলটাই বা কি

এনেছিস্? ভইন···স্রেফ্ জল! শালা, ঐ ঠিকাদারটাকে কাল ধরে আনবি, শালা স্রেফ জল মিশিয়ে বিক্রি করে।

জহর সাফাই গাইল— সীল-মোহর ভেঙে বোতলটা তো হুজুরের সামনেই খুললাম। হুজুর, বিলেতের জিনিসে ওটি হবার জো নেই। কিন্তু বিলেতের মালের জন্য শালারা জলের মতো পয়সা নেয়। হুজুর, দেশী জিনিসের এই দোষ···মাদর··· একবার গলায় ঢাললেই তলিয়ে যায় এবং কেমন যেন বেলুন হয়ে যেতে হয়।

করীম দারোগার বিষণ্ণ মনটাকে একটু তাজা করতে চেয়ে দরদী কণ্ঠে বলল— জহর, হজুরের জন্য আরও একটু ঢাল্ না। দারোগা সাহেব মাথা নেড়ে বারণ করলেন। জহর সাহেবকে খুশি করতে মুন্সীখানা থেকে বোতলটা উঠিয়ে এনেছিল।

দারোগা সাহেব সোমার দিকে তাকিয়ে বলল— আর এখন ব্যস্ কর। কেঁদেই যাবি নাকি? থাম তো। আচ্ছা, তোর স্বামীর সঙ্গে না-হয় মিলিয়েই দেব, মাদর··· কিন্তু কান্না থামা। দারোগা সাহেব বিরাট একটা হাই তুলে চোখের ইশারায় হরিরামকে ডেকে বলল— হরিরাম, তুই একে একটু বুঝিয়ে বল তো! জল-টল দে, মুখ-হাত-পা ধুতে বল। কিছু খাবে তো খেতে-টেতে দে। ওদিকে নিয়ে গিয়ে একটু ওকে বোঝা তো। কতক্ষণ আর কাঁদবে?

হরিরাম সোমাকে হাত দিয়ে ধরে সযত্নে বারান্দায় নিয়ে গেল।

জহর লণ্ঠনের আলোয় দারোগা সাহেবকে দেখিয়ে আরো এক পেগ ঢালল, তাঁকে জিজ্ঞেস করে যতটুকু জল চাই, জল মিশিয়ে ওঁর হাতে তুলে দিল। দারোগা সাহেব গ্লাসে চুমুক দিয়ে হুকুম দিলেন— ঐ নেচা নিষ্কর্মাটা নিশ্চয় শুয়ে পড়েছে,···ওকে একটু জাগিয়ে দিস তো। বলে দারোগা সাহেব আবার এই নিষ্প্রাণ এলাকার গালমন্দ শুরু করে দিলেন।

দারোগা জেলারই লোক বলে করিম দু-চার কথা বেফাঁস বলে ফেলে। খোশামোদের সুরে বলল— হুজুর সারা এলাকাটা মেয়েমানুষে ভরে গেল। এ নিয়ে এ মাসে তিনটে কেস। হুজুর, পাঞ্জাবেও কি মেয়ে-মানুষের কিছু কমতি আছে নাকি? জাটেরা এমন এমন সব মাগী ভাগিয়ে নিয়ে আসে, হুজুর, ভালো লোক দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেবে। কিন্তু এই এক বউ দেখছি হুজুর, একে দেখে কিছুই বুঝতে পারছি না···। এদিকের লোকেরাও আজব প্রকৃতির। যুদ্ধে যেতে একটুও ভড়কায় না। ছাগল-ভেড়ার মতো ফৌজে ভর্তি হয়ে যুদ্ধে চলে যায়। কিন্তু হুজুর একটা ধমক দিলেই এদের পেচ্ছাব বন্ধ হয়ে যায়!

দারোগা সাহেব এক চুমুকে গ্লাসের পানীয় নিঃশেষ করে বললেন— আরে তুই বুঝতে পারছিস না, এখানকার লোকেরা ভীতু নয়, বেকুব। ভৈইন··· এরা কামানের গোলার সামনে দাঁড়াতে ভয় পায় না কিন্তু আইনকে বড়ো ভয় পায়, কারণ আইন এরা বোঝে না।

—হুজুর, পাঠানদের দেখুন। ও শালারা কাউকে ডরায় না।

—ওটা অন্য ব্যাপার। ওখানকার লোকেরা ছোটোখাটো পেশা নিয়ে থাকে। ওদের জীবন অভিশপ্ত। শুকনো জমি, অনাবাদী-অনুর্বর জমি। ওরা যদি লুটতরাজ, চুরিচামারি না করে, করবেটা কে? আর এদিককার লোকেরা নিরাপত্তার কাঙাল। তাই বহীন··· ভয়ে মরে। গুণ্ডারা ভয়ডর বলে কিছু জানে নাকি? আর ভদ্রলোকেরা কিরকম ভয়ে কাঁপে দেখিস তো।

নফীস আবার কলকে ধরিয়ে নিয়ে এল। গড়গড়ায় কষে একটা টান মেরে দারোগা সাহেব বললেন— হ্যাঁ, আগের চেয়ে ভালো। নফীস যা, তুই এখন আরাম করগে যা। আজ টহল দেবার পালা কার?

দারোগার নজরে পড়ার এ মহামূল্যবান সুযোগটা হাত-ছাড়া করল না হরিরাম। মস্ত জোরে এক স্যালুট মেরে বলল— হুজুর।

দারোগা ওকে বলল— হুঁ, একটু দাঁড়া।

সেপাই জহরসিং মুন্সী ডিউটি দিচ্ছিল। দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে বড়ো বড়ো হাই তুলছিল। ওর দিকে তাকিয়ে দারোগা সাহেব বললেন—এই জায়গায় মানুষ থাকে নাকি? রোদ্দুর পড়ল কি জন্তুজানোয়ারের মতো গর্তে গিয়ে শুয়ে পড়ল। যাও মুন্সী, তুমিও যাও।

জহর বলল— হুজুর, আরাম করবেন না?

দারোগা বিকৃত মুখে উত্তর দিলেন— আরাম করব কি? এখানে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছি, বাড়িতে গিয়েও তাই।

হরিরাম সোমার মুখেচোখে জল দেবার ব্যবস্থা করে ওকে বারান্দার এক কোণে বসিয়ে রেখেছিল। মাথার ঘোমটা টেনে ও মেঝের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ ও বিষণ্ণ হয়ে বসে ছিল। কান্নার দমকে ওর শরীর ফুলে ফুলে উঠছে। ওর দিকে ইঙ্গিত করে জহর বলল— হুজুর, একে এখানেই রাখব কি জেলখানায় বন্ধ করে যাব? কালকের তারিখে না-হয় এদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া যাবে, হুজুর।

একটু ভেবে দারোগা সাহেব ললেন— হ্যাঁ, সব ঠিক হয়ে যাবে। দারোগা একটু যেন উপেক্ষার ভঙ্গীতে বললেন— করীম বসে আছে, ও করে দেবে কিংবা ঠিক আছে কালই সব হবে। জহরসিং হাজতের চাবি স্টুলের ওপর ঠিক লণ্ঠনের সামনেটায় রেখে একটা মস্ত সেলাম ঠুকে বেরিয়ে গেল।

পরের দিন দারোগা সাহেব দুপুরের পরে থানায় এলেন। রিপোর্ট লিখতে পাঁচ-সাত জন লোক বসে ছিল। মুন্সী একটু এগিয়ে বলল— হুজুর ঐ বউয়ের শ্বশুর কেহর রাজপুত মঝেরা গাঁয়ের চৌকিদারকে সঙ্গে নিয়ে রিপোর্ট লেখাতে এসেছে। বলছে, কাল দুপুর থেকে ওর বিধবা বউ গায়েব।

দারোগা সাহেব বললেন— কী, বলছে কী?

—হুজুর, আমি বলেছি কিছু খরচপত্র কর তো খোঁজখবর করতে পুলিশদের ভাগ-দৌড় করাই। আমি জিজ্ঞেস করেছি কার ওপর সন্দেহ হচ্ছে ? তো বলে কি গয়নাপত্র নিয়ে কেটে পড়েছে। বলছিল, আমি গরিব লোক। আমার ছেলে সরকারী কাজ করে। ব্যস্, দু'টাকা আমাকে দিতে চাইছে। দারোগা সাহেব একটা হুংকার ছেড়ে না শোনার ভান করলেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

সারাদিন অপেক্ষা করে যখন সূর্য ডুবো ডুবো, তখন কেহর পাঁচটা টাকা বার করে রিপোর্ট লেখাল। ওর যা বক্তব্য লিখে রাখা হল। ওকে আশ্বাস দেওয়া হল যে খোঁজখবর করা হবে এবং খোঁজ পেলে ওর জিনিসপত্র ওকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এর তিন দিন পরে সোমা ও ধনসিং পুলিশের হাতে ধরা পড়ার রিপোর্ট রোজনামচায় লেখা হল।

* * *

কেহরসিং থানা থেকে খবর পেয়ে বৈজনাথের তহশীলে গিয়ে হাজির হল। ধনসিং ও সোমাকে তহশীলদার সাহেবের ইজলাসে পেশ করা হল। ধনসিং-এর হাতে হাত-কড়া। ধনসিংকে দেখে সোমা কান্নায় ভেঙে পড়ল। সোমাকে দেখে ধনসিং-এর চোখের পাতা ভিজে উঠল। সাতদিনের খোঁচাখোঁচা দাড়ি ওর মুখে। ওর শিরা-উপশিরা ফ্যাকাশে হলদেটে হয়ে গেছে, যেন কোনো বন্য অসুস্থ ইঁদুর। রুগ্‌ণ ও মলিন দেখাচ্ছে সোমাকে, মনে হচ্ছে যেন বহুদিন অসুখ থেকে ভুগে উঠল। ফরিয়াদি কেহরসিং ওকে চিনে ফেলল। কেহরসিং-এর মামলার জন্য একজন মোক্তার হাজির; তাঁর মাথায় বিরাট পাগড়ি, চোখে কাজল, গায়ে গলাবন্ধ কোট।

কেহরসিং বয়ান দিল যে ওর বউ ঘরের গয়নাপত্র নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। ও ছ'শো টাকা দিয়ে বউকে কিনেছিল। মন্নু সাহ সাক্ষী দিতে হাজির হয়। যাতায়াত ও খাওয়াদাওয়া বাবদ এক টাকা দিয়ে ওকে তলব করা হয়েছিল।

কেহর বলল, আসামী ওর বউকে ভাগিয়ে নিয়ে ওর ইজ্জত নষ্ট করেছে। ওকে সমাজে উঠতে হলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে এবং তার জন্য পাঁচশো টাকা চাই। আদালত অভিযুক্তের কাছ থেকে সেই ক্ষতিপূরণ আদায় করুন। সোমাকে ঘরে ফিরিয়ে নিতে সে রাজি নয়, কারণ তার সতীত্ব নষ্ট হয়েছে।

সোমার অবস্থা দেখে পুলিশের দয়া হল। পুলিশ ওকে শিখিয়ে-পড়িয়ে নিয়েছিল যে ও যেন বলে, শ্বশুরবাড়িতে ওকে মারপিট করা হত ও খেতে দেওয়া হত না। ধনসিংকে সোমা যদি বাঁচাতে চায় তবে সে যেন আদালতের সামনে এই বয়ান দেয়। ওর শ্বশুর-শাশুড়ী গত রাতে ওকে মণ্ডীতে বেচে দেবার তাল করেছিল। সেই ভয়ে ভোরবেলা পুকুর থেকে জল নিয়ে আসার অছিলায় ও পালিয়ে যায়। পথে ধনসিং-এর সঙ্গে দেখা। ও যেন আরো বলে যে ধনসিং-এর কাছে ও মণ্ডীর রাস্তা জানতে চায় এবং ওর সঙ্গেই মণ্ডী চলে যায়। ওর শ্বশুরবাড়ির দুঃসহ নির্যাতনের কাহিনী শুনে ধনসিং সহানুভূতি দেখিয়ে বলে আমার ঘরে যাবি চল। ওখানে বুড়িরা ও বয়স্করাও আছে। তুই ওদের সঙ্গেই থাকিস। আদালতে এও বলবি যে একদিন রাতে দু'জনে মণ্ডীর সরাইতে ছিলাম। পরে বৈজনাথ চলে আসি। পুলিশ সেখানেই দু'জনকে দেখতে পায় ও থানায় ধরে নিয়ে আসে। ও এখন শ্বশুর-বাড়িতে কিছুতেই যাবে না, কেটে মেরে ফেললেও না।

ধনসিং ও সোমাকে ধরে এনেছিল সেপাই হরিরাম। সে বয়ান দিল —থানায় ইত্তেলা দেওয়া হয়েছিল যে মঝেরা গাঁয়ের এক রাজপুত বিধবা

বউ পালিয়ে গেছে! এই কারণে টহল দেবার সময় আমি খুব সতর্ক ছিলাম। রাত ঘনিয়ে এলে একজন বউকে নিয়ে আমি আসামীকে আসতে দেখি। বউটির নাকছাবি না থাকায় আমি বুঝে ফেললাম, এ বিধবা। বউটির বিষয়ে আমি আসামীকে কয়েকটি প্রশ্ন করলাম। যখন সে বউটিকে নিজের বলে চালাল তখন আমার মনে সন্দেহ জাগল, আমি দুজনকেই থানায় ধরে নিয়ে এলাম। পরে রাজপুত কেহরসিংকে খবর পাঠানো হল। সে তার বউকে চিনতে পারল। গ্রেপ্তারের সময় আসামী বা বউটির কাছ থেকে কোনো গহনাপত্র পাওয়া যায় নি। আসামীর পকেট থেকে সর্বসাকুল্যে 2 টাকা 9 আনা পাওয়া যায় এবং তা থানায় জমা করে নেওয়া হয়।

আদালতের সামনে সোমার বয়ান শুনে ধনসিং ঠাহর করে নিল যে. পুলিশ ওকে যা শিখিয়েছি ও তাই বলে যাচ্ছে। সেপাই হরিরাম হাজতে ধনসিংকে বলেছিল যে সে যেন এই একই বয়ান দেয়, এই রকম বয়ান দিলে ও ছাড়া পাবে, নয়তো সাত বছরের জেল হয়ে যাবে।

সোমার বয়ান থেকে এটা অবশ্য প্রমাণিত হয় নি যে, ধনসিং বিধবাটিকে তার ঘর থেকে বার করে নিয়ে গেছে; তবে আদালতের সামনে এর যথেষ্ট প্রমাণ ছিল যে, আসামী চলতিপথে বউটিকে ভাগিয়ে নিয়ে গেছে। পলায়নপর বউটির এত্তেলা মণ্ডীর থানায় ধনসিং লেখায় নি; বরং চুপিচুপি তাকে ভাগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। বিশেষ করে আসামী থানায় ভুল বিবৃতি দেওয়ায় ওর বদ মতলবের প্রমাণ পাওয়া গেছে। আদালত ওর প্রতি সহৃদয়তা দেখিয়ে ওকে শুধু ছ'মাসের সাজা দিলেন।

আদালতের সামনে একটা বড়ো সমস্যা ছিল যে, অল্প বয়সের এই বউটিকে কার হাতে সমর্পণ করেন? সোমা বলল, কাটারি দিয়ে ওর গলা কেটে ফেললেও ও তার মায়ের কাছে যাবে না। যে বাপ ওকে বেচে দিয়েছে তার কাছে ফিরে যাবার কোনো প্রশ্ন ওঠে না; শ্বশুর-

বাড়িতে ও যেতেও রাজি নয়। তা ছাড়া শ্বশুরও ওকে ঘরে ফিরিয়ে নিতে চায় না। সোমা ধনসিং-এর সঙ্গেই যেতে চেয়েছিল। ও শুধু কাঁদতে কাঁদতে অনুনয় করল যে, ধনসিং-এর সঙ্গে ওকেও যেন জেলে পাঠানো হয়। অবুঝ বউ জানে না যে অপরাধ না করলে কাউকে জেলের সাজা দেওয়া যায় না। তা ছাড়া হাজতে মেয়ে-পুরুষ একসঙ্গে থাকার নিয়ম নেই। সোমা আদালতের দেয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে কাঁদতে লাগল।

আর্যসমাজের প্রতিনিধি মন্ত্রী চৌধুরী নির্ভয়রায়ের ঐ জেলায় খুব সুনাম। তিনি পলায়নপর এরকম কুড়ি জন মহিলাকে বাঁচিয়েছেন, কয়েকজনকে তাদের ঘরে ফেরত পাঠিয়েছেন, কাউকে-বা গুণ্ডা-বদমাশের কবল থেকে বাঁচিয়ে বিধবাশ্রমে পাঠিয়েছেন। বৈদিক মতে কয়েকজন বিধবাকে বিয়েও দিয়েছেন। আদালত থেকে চৌধুরী নির্ভয়রামকে ডেকে সোমার একটা বন্দোবস্ত করতে বলা হয়।

আদালতের কীরকম ন্যায় বিচার তা সোমার মাথায় ঢোকে না। যার সঙ্গে ও যেতে চায়, থাকতে চায়, লোকেরা চাইছে না, আদালত তাকে যেতে দিচ্ছে না; যাকে চেনে না, জানে না তার সঙ্গে যেতে ওকে বাধ্য করা হচ্ছে। সোমা কপালে হাত রাখল, গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ও বুঝল ও যা চায় তা হবার নয়। এর আগে কেউ ওকে এমন করে চায় নি, ওরও কিছু চাইবার সাহস হয় নি, সামর্থ্যও ছিল না। এমন একটা অবস্থায় ও পড়েছে যে কাউকে আর আপন করে চাইবার ক্ষমতা নেই; এখন ও যা চায়, যা ভাবছে তাই করবে, তা যা হবার হবে। আদালত, পুলিশ, চৌধুরী নির্ভয়রাম— সবার উপর ওর সন্দেহ হল যে, সবাই মিলে ওকে বেচে দিতে চাইছে। ধনসিংকে ছেড়ে ও চৌধুরীর সঙ্গে যেতে চায় না। কিন্তু ও যখন দেখল, পুলিশ ধনসিং-এর হাত দড়ি দিয়ে বেঁধে গাড়িতে বসিয়ে ধরমশালায় নিয়ে গেল, তখন

ওর সামনে পৃথিবীটা যেন অন্ধকার হয়ে এল ; কেঁদে ভাসিয়েও যখন দেখল খোলা রাস্তা ছাড়া কারুর কাছে গিয়ে দাঁড়াবার মতো ওর আর কেউ নেই, তখন চৌধুরীর সঙ্গে না গিয়ে ওর আর উপায় রইল না।

চৌধুরী নির্ভয়রাম সোমার মাথায় হাত রেখে সস্নেহে ওকে নিজের মেয়ে বলে সম্বোধন করলেন। সোমা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল ; তিনি ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, বেটি, ঘাবড়াচ্ছ কেন ? মাত্র ছ'মাসের ব্যাপার। ছ'মাস দেখো দু'দিনেই কেটে যাবে। ধনসিং দূরে তো চলে যাচ্ছে না। এই ধরমশালাতেই থাকবে। ছয় মাস পরে আবার এসে যাবে। সোমাকে একটু শান্ত হতে দেখে তিনি আরো বুঝিয়ে বললেন— বেটি, এরকম ভাবে জীবন নষ্ট করে কী লাভ ? ভালো ঘরের মেয়েরা কি আর পুরুষের পিছনে ছোটে ? এতে কি জাত-কুলের মর্যাদা রক্ষা পায় ? ওরকম মেয়েরা এমন কাজ করে নাকি ? যদি চাও ভালো ঘরের কোনো লোকের সঙ্গে তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারি।

পাঞ্জাবের একজন স্কুল মাস্টার আছেন, দুটি বাচ্চা রেখে তাঁর স্ত্রী মারা যায়। তিনি সেই মাস্টারের গুণগান করে বললেন -- তার সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারি। এই প্রস্তাব শুনে সোমা আরো ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে লাগল। চৌধুরী নির্ভয়রাম তখন এ মাস্টারকে ছেড়ে একজন স্টেশন মাস্টারকে নিয়ে পড়লেন। সেই স্টেশন মাস্টারের নাকি অনেক জমিজমা আছে। তিনি সোমাকে আরো বোঝালেন, পাঞ্জাবের লোকেরা পাহাড়ের লোকেদের মতো অত সংকীর্ণমনা হয় না। এখানে ভদ্র ও অবস্থাপন্ন বিধবাদেরও আবার বিয়ে হয়। সোমা এ কথা শুনেও কাঁদতে লাগল। বলল বিধবার আবার বিয়ে এ কথা কখনো শুনি নি। ভাবখানা এই যে যা ওর জাতের মধ্যে কখনো হতে দেখে নি, তা নিজে ও কী ক'রে করে ?

চৌধুরী নির্ভয়রাম তখন কাংড়ার আর্যসমাজের অন্য একজন বিশিষ্ট

ভদ্রলোক লালা গোপীচাঁদ সরাফের কাছে সোমার থাকার বন্দোবস্ত দিলেন। লালজীও উপদেশ দিলেন, একবার যা ভুল হবার হয়ে গেছে, সে যাক ; সে-সব কথাও ভুলে যাও। বিয়ে করে ধর্মপথে থেকে আবার সংসারধর্ম পালন করো। তাঁর বিশ্বাস হয়েছিল বউটি কিছুদিনের মধ্যে সৎ পথে ফিরে আসবে। কিন্তু তাঁর নিজের স্ত্রীর কুচলিপানার জন্য সোমার সেখানে থাকা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। এরকম একজন পতিতার হাতে জল খেলেও পাপ। তাঁর স্ত্রী সোমাকে জলের কলসি বা অন্য কোনো জিনিস ছুঁতে দিত না।

লালজী স্ত্রীকে বোঝাতে চাইল, যাই হোক, হিন্দুঘরের বউ তো, একে ঘরে স্থান না দিলে নিশ্চয় কোনো মুসলমানের হাতে গিয়ে পড়বে। ধর্মও যাবে আবার জাতও। কিন্তু লালজীর স্ত্রীর কাছে স্বর্গই বড়ো আর নিজের পুণ্যও ; কোনো হিন্দুর ঘরের বউয়ের জাতধর্ম বজায় রইল কিনা, বজায় রাখতে কী করতে হবে তা নিয়ে তার বিশেষ মাথাব্যথা আছে বলে মনে হল না। সে বুড়ি সোমাকে নিজের কাছে কিছুতেই থাকতে দিল না।

চৌধুরী নির্ভয়রাম ভাবলেন, জেলার মধ্যে বর্ধিষ্ণু জায়গা এই ধরমশালা ; তা ছাড়া এখানে শিক্ষিত পাঞ্জাবীদের সংখ্যাও বেশি। তাই কাংড়ার চেয়ে এখানকার লোক অনেক বেশি উদার। এখানে কোনো গৃহস্থ পরিবারে কয়েকদিনের জন্য যদি সোমার থাকার বন্দোবস্ত করা যায়, তবে সব দিক থেকে ভালো হয়। তিনি ভাবলেন, ওর বিয়ে পরে না-হয় দেওয়া যাবে ; একসময় না-হয় পাঞ্জাবের কোনো বিধবাশ্রমে পাঠিয়ে দিলেই হবে। সোমা যাতে কোনো মুসলমান বা খৃস্টানের হাতে গিয়ে না পড়ে সে আশঙ্কায় চৌধুরী সাহেব, লালা গোপীচাঁদ ও অন্য হিন্দুসমাজের সেবকরা অধীর হয়ে উঠলেন। কিন্তু হিন্দু ভদ্রসমাজের পরিবারে কুলত্যাগী সোমার কিছুতেই আশ্রয় জুটল না। শেষ পর্যন্ত

এক উদার উকিল সাহেবের সন্ধান পাওয়া গেল। তাঁর ঘরে অত ছুঁতমার্গের বালাই ছিল না।

কৌতূহলী প্রতিবেশিনীরা একজোট হয়ে সোমার মতো অদ্ভুত বস্তুকে দেখতে আসে। একজন অন্য জনকে শুনিয়ে, ভয় ও আতঙ্কের ভাব প্রকাশ করতে হাত নেড়ে নেড়ে বলে— ওরে বাবাঃ বল কী গো ? কী রকম মেয়েমানুষ বাবা, নিজের ভালোবাসার জনের সঙ্গে বেরিয়ে আসা, সে আবার কী ? কেউ-বা লজ্জায় নাকেমুখে হাত চাপা দিয়ে বলে ওঠে-- এরকম বেহায়া মেয়েমানুষের মরণ হয় না কেন ? এ আবার কিরকম বাবাঃ ! কেউ-বা আবার দেখতে আসে জেলখাটা কয়েদি বউকে। এক মাসের মধ্যেই উকিলসাহেব এই তামাশাপ্রিয় মানুষদের ভিড় দেখে ভড়কে গেলেন। তিনি বললেন, ওঁর ঘরে সোমত্ত মেয়েরা আছে। সোমার মতো কুলত্যাগী বউয়ের কুসঙ্গ তাদের ভবিষ্যতের পক্ষে শুভ হবে না।

জেল থেকে ছাড়া পেতে ধনসিং-এর আরো চার মাস বাকি। সোমা দু'মাস যাবৎ সমানে উপদেশ-পরামর্শ শুনেও ধনসিংকে ছেড়ে আবার ভালো মেয়ের মতো ঘর-সংসার করতে রাজি হল না। সমাজের হিতকারী ও আচার-ধর্ম-রক্ষকরা মহা ভাবনায় পড়লেন ; ঐ বদমাশ ড্রাইভার ধনসিংটা ছাড়া পেলে এই উদ্‌ভ্রান্ত মেয়ে আবার তার কাছে নির্ঘাৎ ছুটে যাবে আর অযথা পাগলামিতে মেতে উঠবে। এর চেয়ে অনেক ভালো হবে যদি ওকে আগেভাগে পাঞ্জাবের কোনো বিধবাশ্রমে পাঠিয়ে দেওয়ার বন্দোবস্ত করা যায়। আসল প্রশ্ন হল এই যে, এমন একজন বিশ্বাসী লোক চাই যে পাঞ্জাবে যাচ্ছে এবং তার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস রাখা যায় এবং যে সেটার মূল্য দিয়ে সোমাকে নিরাপদ কোনো আশ্রমে পৌঁছে দিতে পারবে।

চৌধুরীজী ধরমশালার থানার বাজারের গাড়ির আড্ডার পাশ দিয়ে

যাচ্ছিলেন ! কমরেড ভূষণকে যেতে দেখে তিনি ডাকলেন। বললেন— এই-যে, পাঞ্জাবের দিকে যাচ্ছ নাকি ?

চৌধুরীজী ভূষণের বাবার বন্ধু ও সম্মানিত মানুষ। কিন্তু কমরেড ভূষণ তাঁকে দেখে হাতের সিগারেট ফেলে দেবার কোনো চেষ্টা করল না ; কাংড়ার রেওয়াজ অনুসারে গুরুজনদের পায়েও প্রণাম করল না। শুধু জানতে চাইল— বলুন কাকাবাবু, কোনো কাজ আছে নাকি ?

ভূষণের ব্যবহারটা রুক্ষ হলেও চৌধুরী জানতেন ভূষণ খুবই বিশ্বাস-যোগ্য ছেলে। পাঞ্জাব থেকে আসে-যায় এমন অনেক লোকের সঙ্গে ভূষণের পরিচয়। লালাজী সেটা জানতেন বলেই সোমার আদ্যোপান্ত কাহিনী ভূষণকে শোনালেন এবং বললেন— ওকে যে-ক'রে হোক লাহোর বা ফিরোজপুরে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

ভূষণ জিজ্ঞেস করল— ও কোথায় যেতে চায় ?

—কোথাও যেতে চায় না। চৌধুরীজীর গলার স্বরে হাতাশা— ঐ বদমাশটার কাছেই ও যেতে চায়। আর চার মাসের মধ্যে জেল থেকে ছাড়া পাবে। তার আগেই যদি মেয়েটাকে পাঠিয়ে দেওয়া যায় তবেই ওর কল্যাণ। আর তা ছাড়া এখানে রাখবই বা কোথায় ?

তবে ওকে বাধা দিচ্ছেন কেন ? লোকটার কাছে যেতে দিন না। এত বড়ো নির্লজ্জ কথা বলতে ভূষণের একটুকুও বাধল না।

চৌধুরীজী এক গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভবিষ্যদ্‌বাণী করলেন— তোমাদের সময় এলে তো সেটাই হবে। কিন্তু আমাদরে পক্ষে এখনও তো এরকম অনাচার দেখা সম্ভব নয় ! এখানে ওকে চার মাস রাখবে কে ? কোনো ভদ্রলোক এই সার্কাস-প্রিয় বউটিকে নিজের পরিবারে রাখবার সাহস করেই-বা কী করে ?

চৌধুরীজীর স্বরে বিষাদের সুর উপেক্ষা করেই ভূষণ বলল— কাকা-বাবু, যে মেয়ে-পুরুষ একসঙ্গে থাকতে চায়, তাদের যদি জোর করে

আলাদা রাখতে চান তবে এই পরস্পরের সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ না হলে একদিন তারা বদমাশ হয়ে যাবেই। ওদের একসঙ্গে থাকতে দিন, দেখবেন সেই বদ-অভিসন্ধিও আর নেই। কথাটা হল, ওকে তো কোনো পুরুষের হাতেই দেবেন। ও যাকে চায় সেই জনটিই বা কী দোষ করল ; এতে তো আমি কিছু খারাপ দেখি না।

—আরে ভাই, বিয়ে বলে তো একটা ব্যাপার আছে। চৌধুরীজী উত্তেজিত হয়ে নিজের লাঠিটাকে ঘুরিয়েফিরিয়ে বোঝাতে লাগলেন— কথাটা কী জানো ভূষণ, আমাদের এই ঋষি বা শাস্ত্রকাররা অনেক ভেবেচিন্তেই এ-সব ব্যবস্থা চালু করেছিলেন।

চৌধুরীজীকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই কমরেড ভূষণ বলল— ওকে বিয়ে করে নিলেই তো ঝামেলা চুকল, ব্যস। ততদিনের জন্য না-হয় ওর থাকা-খাওয়ার একটা ব্যবস্থা করে দিই, কি বলেন ?

চৌধুরীজীর মুখেচোখে একটা বিস্ময়ের বিদ্যুৎরেখা ঝিলিক দিয়ে উঠল, আবার একটু সন্দেহও যেন মনের ভেতর উঁকি মারল। চৌধুরীজী আবার কিছু বলার আগেই ভূষণ বলল— লালা জওয়ালা সহায়ের বাড়িতে বন্দোবস্ত করে দেব নাকি ? তিনি আমাদের সম্মানিত লোক। ওঁকে তো অন্তত বিশ্বাস করবেন ?

ভদ্রসমাজ

ধরমশালায় যে-সব পাঞ্জাবী বাস করতেন তাঁদের মধ্যে লালা জওয়ালা সহায় সরোলা ছিলেন করিতকর্মা লোক। সারা জেলাময় তাঁর ঠিকাদারী কারবার ছড়ানো। জঙ্গলের কাঠ, পুল ও রাস্তা তৈরি, যুদ্ধের সময় বিদেশ থেকে আগত যুদ্ধবন্দীদের ক্যাম্প বানাবার ঠিকাদারী, সব-কিছুই তিনি করতেন। মধ্যযুগীয় মধ্যবিত্ত পাঞ্জাবী ব্যবসায়ীরা যেভাবে থাকেন সেরকমটাই তাঁর পছন্দ। কিন্তু তাঁর ছেলেমেয়েরা পাশ্চাত্য ও আধুনিক মনোভাবাপন্ন ; তাঁরা থাকতেনও আবার সেভাবেই। লালা জওয়ালা সহায়ের চার ছেলের পর এক মেয়ে। মেয়ে খুবই আদুরে। মনোরমা লাহোর কলেজে এম. এ পড়ত আর বিলেত যাবার স্বপ্ন দেখত।

পরনে প্যান্ট, মাথায় কিছু আবরণ নেই ; একটা বড়ো কুকুরকে চামড়ার চেনে বেঁধে মনোরমা একটা লাঠি নিয়ে নির্জন রাস্তায় একা একা মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ধরমশালার পাহাড়ী লোকেরা ওর কোনো সমালোচনা করত না। নিজের জেলার কিম্বা আত্মীয়স্বজনের কোনো মেয়েব এরকম বেচাল ব্যবহার দেখলে হয়তো ঐ পাহাড়ীরা সেই মেয়ের মাথা কাটার জন্য প্রস্তুত হয়ে যেত। কিন্তু ওরাই আবার মনোরমার সাহসের প্রশংসা করে, বলে, কী মেয়ে বাবাঃ, কোনো-

কিছুতেই ভয়ডর নেই। এটা যেন অনেকটা এরকম: ব্রিটিশ রাজত্বে অন্য কোনো ঘরের ছেলের দেশভক্তি দেখে ভারতবাসী প্রীত হয়, তাকে জেল খাটতে বা ফাঁসিতে যেতে হলে জয়ধ্বনি করে কিন্তু নিজের ছেলেকে ওরকম করতে দেখলে দুঃখে কাতর হয়ে নিজের মাথা কোটে।

মনোরমা, মনোরমার মা আর বউদি যখন একসঙ্গে বাজারে যায়, তখন সামাজিক পরিবর্তনের তিনটি ধাপ এক নজরে চোখে পড়ে। মা পরেন কালো রেশমের ভারী পেটিকোট, মাথার মলমলের ডবল দোপাট্টা ভাঁজ করে গায়ে জড়িয়ে নেন; আধ-হাত ঘোমটা টেনে, পায়ে স্লিপার গলিয়ে চলেফিরে বেড়ান। জওয়ালা সহায়ের ছেলে ব্যারিস্টার। ব্যারিস্টারের স্ত্রী মাথায় রেশমী কাপড়ের ঘোমটা টানে ঠিকই কিন্তু যখন তার মাথায় ঘোমটা থাকে না তখন পায়ে ওঠে হীলওয়ালা জুতো। মেয়ে মনোরমার মাথায় কিছু থাকে না: ঘাড় বেয়ে নামে বিনুনি, ঢিলেঢালা প্যান্ট, কাঁধে ঝোলায় ভ্যানিটি ব্যাগ। এভাবেই সে চলে-ফিরে বেড়ায়।

ভূষণ ও মনোরমার লাহোর থেকেই আলাপ-পরিচয়। ভূষণ কাংড়া জেলার লোক; কলেজে পড়তে গিয়েছিল লাহোর। সে চার বছর আগের কথা। মনোরমার ব্যারিস্টার দাদা জগদীশ সহায় ও ভূষণ যখন বি. এ ক্লাসে পড়ত তখন মনোরমা সবে কলেজে ভর্তি হয়েছে। ভূষণ ও জগদীশের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তাধারার মিল ছিল খুব; দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্বও গড়ে ওঠে। দু'জনেই সাম্যবাদের আদর্শ প্রচার করে বেড়াত। এদিক-ওদিক থেকে কাগজপত্র ও পুস্তিকা জোগাড় করে ছাত্রছাত্রীদের পড়তে দিত। মার্কসবাদী সমাজব্যবস্থা কী বস্তু, তা বোঝাতে ক্লাসও নিত। দাদার পাল্লায় পড়ে মনোরমা কখনো-সখনো সে-সব ক্লাসে যোগ দিত।

জগদীশ বি. এ. পাস করে বিলেতে চলে যায় আর ভূষণ লাহোরে

এম. এ. পড়তে থাকে। মনোরমার সঙ্গে ভূষণের প্রায়ই দেখা হয়, আলাপ-আলোচনা জমে ওঠে। মনোরমা স্টুডেণ্ট ফেডারেশনের কাজ করতে থাকে। লালা জওয়ালা সহায় মেয়ের এতটা উৎসাহ দেখে একটু যেন ভয় পেয়ে যেতেন; সাবধান করে দিতে ছাড়তেন না, যদিও মনে মনে মেয়ের সাহস ও যোগ্যতা দেখে একেবারে যে প্রসন্ন না হতেন তেমনও নয়।

এম. এ.তে দর্শনশাস্ত্র নিয়ে ভূষণ বেশ ভালোভাবে পাস করল। ব্যাঙ্কের ক্লার্কের একটা চাকরিও জুটে গেল। ব্যাঙ্কের চাকরি ও পার্টির কাজ— দুটো একসঙ্গে চলতে থাকল। কিন্তু অনেক সময় সে বুঝতে পারত কমুনিস্ট পার্টির কাজ ও চাকরি— দুটো ঠিক একসঙ্গে পেরে ওঠা যায় না।

1939 সাল; যুরোপে যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠল। ইংরেজ সরকার যুদ্ধে ভারতকেও সামিল হতে বাধ্য করলেন। রাজনীতি-সচেতন ভারতবাসীরা ইংরেজ সরকারের এই মনোভাবের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ জানাল। ভূষণ চিন্তা করে দেখল, ব্যাঙ্কের এই চাকরি নিয়ে পড়ে থাকার চেয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়াটা অনেক বেশি জরুরি; ভারতকে যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলার বিরুদ্ধে এই যে তীব্র প্রতিবাদের জোয়ার, এতে যোগ দেবার অন্য একটা উত্তেজনা আছে। ও চাকরি ছেড়ে রাজনীতি নিয়ে মেতে উঠল।

ভূষণের মা-বাবা থাকতেন কাংড়ার গ্রামে। ওঁরা ভেবেছিলেন ভূষণকে লাহোরে পড়াতে যখন ওঁরা যথাসাধ্য আত্মত্যাগ করে যাচ্ছেন, তখন ছেলে একদিন উপযুক্ত হয়ে একজন বড়ো অফিসার হয়ে বসবে। কিন্তু এত পড়াশোনা করেও যখন ব্যাঙ্কের কেরানির চাকরি ছাড়া ওর ভাগ্যে আর-কিছু জুটল না এবং তাও আবার পঁচাত্তর টাকা মাইনে— তখন ওকে নিয়ে তাঁদের যেটুকু আশাভরসা ছিল সব যেন মাটি হয়ে

গেল। ছেলেকে নিয়ে ওঁরা আর স্বপ্ন দেখতে চান না, স্বপ্ন পুষেও লাভ নেই। কিন্তু ছেলে যখন এ চাকরিটাও নির্বিবাদে ছেড়ে দিয়ে রাজনীতি নিয়ে মেতে উঠল তখন তাঁরা ভাবলেন, ছেলেটা একেবারে নিষ্কর্মা ভবঘুরে। ওঁদের ধারণা, সরকারের চাকরি ক'রে, সরকারের সেবা করেই তো মানুষ বড়ো হয় ; সরকারের বিরুদ্ধে হাঁকডাক ছাড়লে জীবনে কি আর কিছু হবে ?

মধ্যবিত্ত গৃহস্থ লোকেদের মাথায় জীবিকা-নির্বাহের হাজারো দায়িত্ব এসে পড়ে। অথচ দেশের এই যে স্বাধীনতা ও যুদ্ধ-বিরোধী আন্দোলন এ চালিয়ে যাবার সাহস তো ভূষণ ও ওর মতো ছাত্রছাত্রীদেরই। এতে ওরাই শুধু অগ্রণী হতে পারে। এ ব্যাপারে মনোরমার সঙ্গে আলোচনা করতে ভূষণ প্রায়ই সরোলা সাহেবের বাংলোতে যেত। এই আন্দোলনে মনোরমা খুব বেশি সক্রিয় অংশ নিতে পারে নি ; কিন্তু এতে ওর উৎসাহ কম ছিল না, তাই ভূষণের ওপর ওর আস্থা ছিল খুব ; যখনই আসত, আদরযত্ন করে বসাত।

জগদীশ সহায় সরোলা বিলেত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরেছেন। জগদীশ দেশে ফিরলে একজন কর্মঠ ও সহৃদয় কর্মীর সহায়তা পাবে - ভূষণ বোধহয় সেটাই ভেবেছিল। কিন্তু এখন লাহোরের অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া, ধুলোফুলো মাথায় করে চলতে-ফিরতে ব্যারিস্টার সাহেবের আর ভালো লাগে না ; ভিড়ে অস্বস্তি হতে থাকে ; অমার্জিত জনতার হৈ-হট্টগোল-ভিড়ে কেমন যেন গা গুলিয়ে ওঠে। এ-সব ঠিক যেন আর পছন্দও হয় না। বিলেতে থাকবার সময় জগদীশ সরোলা জীবনের একটা নতুন স্বাদ ও অর্থ খুঁজে পেয়েছিলেন, বিদগ্ধ সমাজের স্বীকৃতি পেয়েছিলেন, সেটা তাঁর মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে ; এ পরিচিত জগতের সঙ্গে একাত্ম হবার যে তৃপ্তি তাও তিনি ভুলতে পারেন নি। সমাজবাদের সিদ্ধান্ত ও দর্শনের গোলকধাঁধায় পড়ে তিনি আগের সেই

বিচারশক্তির গভীরতা অনেকটা হারিয়ে ফেলেছিলেন। সর্বসাধারণের কল্যাণে কর্মতৎপর হবার চেয়ে তিনি তখন ট্রট্স্কি ও লেনিনের তুলনা-মূলক আলোচনায় অনেক বেশি উৎসাহ বোধ করেন। এই তুই পন্থার কর্মসূচী নিয়ে ভাবতেন ও মনে মনে তার উপযোগিতা তলিয়ে দেখতেন, তুলনা করতেন। এটা তো তর্কের জগৎ আর এখন সেই আলাপ-আলোচনা ও তর্কে মেতে থাকতে পারলেই তিনি খুশি।

জগদীশের কেন জানি মনে এল, কম্যুনিস্টদের কার্যধারায় বিচারশক্তি ও স্বাতন্ত্র্য বুদ্ধির পরিবর্তে আজকাল এমন কতকগুলি গোঁড়ামি বাসা বেঁধেছে যা যুক্তির ধার ধারে না। তাদের ব্যবহারে বিশ্লেষণের ধারাল যুক্তির কমতি পড়ায় তিনি বেশ বিরক্ত হয়ে উঠলেন। তিনি জেনে কষ্ট পেলেন যে, এই দেশের কম্যুনিস্টরা তাঁর গভীর জ্ঞানভাণ্ডারের ঠিক যেন কদর করতে পারছে না। আর কদর করার সে ক্ষমতাও বোধহয় নেই। এই আন্দোলনের প্রতি মনোরমা যখন সহানুভূতি দেখাত বা তাতে প্রকাশ্যে ভাগ নেবার ইচ্ছা প্রকাশ করত, তখন তিনি মনোরমাকে কোনো বাধা দিতেন না বটে কিন্তু মতামতটাকেও জানাতে ভুলতেন না —এটা কেবল বুদ্ধির ভুল— শক্তির অপব্যয়···।

জগদীশের ব্যবহারে পরিবর্তনের আঁচ পেয়ে ভূষণ তাঁর কাছে ঘন ঘন আর আসত না। যতটুকু দেখাসাক্ষাৎ হত তু'জনের চিন্তাধারার একাত্মতার জন্য নয়; পুরনো বন্ধু, তাই। ব্যারিস্টারের সরোলার শালীনতা-বোধ ভূষণের প্রতি সহৃদয়তা সত্ত্বেও বন্ধুত্বের বন্ধন দিন দিন শিথিল হয়ে যাচ্ছিল। ভূষণের চোখে এ-সবের খুব যে একটা মূল্য ছিল তা নয়; এ নিয়ে মশগুল থাকার সময়ও ওর হাতে নেই।

ভূষণ আগের মতো আর আসে না বলে মনোরমা অভিযোগ করে; ভূষণ কখনো এলেও জগদীশের সঙ্গে আগের মতো তর্কবিতর্ক করতে অতটা উৎসাহ পায় না। শুধু 'হুঁ তা ঠিক' ব'লে মাথা নাড়ে, সিগারেট

মুখ না দিয়েই অ্যাসট্রেতে ঘন ঘন ছাই ফেলে। তর্ক বেধে গেলে মনোরমার দাদার চেয়ে ভূষণের মতবাদের গভীরতার প্রতি ওর পক্ষ-পাতিত্বের আভাস পাওয়া যায়। ব্যারিস্টার তার একটা যুক্তিও খুঁজে পান; ভাবেন মনোরমা ভূষণকে ভালোবাসে বলেই তর্কের সময় ওর দিকেই তার সহানুভূতি।

মনোরমার এখন একুশ বছর বয়স; এ বয়সের মেয়ে ঘরে অবিবাহিত থাকলে তার জন্য যে কারো চিন্তা হয় না, এমনও নয়। তবে মনোরমা এম. এ. পর্যন্ত পড়াশুনা করেছে; এত বছর পর্যন্ত ওকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, ওর ছিল অবিরাম স্বচ্ছন্দ বিহার। এতদিন পরে মা-বাবা জোর করে তাঁদের পছন্দকরা ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেবেন, সে অধিকার তাঁদের বোধহয় আর নেই। এখন যেটা হয় সেটা শুধু দুর্ভাবনা; তা ছাড়া আর বোধহয় কিছু করারও নেই।

জগদীশ তখন বিলেতে। ভূষণ এম. এ. পড়ছে আর মনোরমা এফ. এ.। ভূষণ খুব কৃতিত্বের সঙ্গে বি. এ. পাস করল। ওর মনে একটা ক্ষীণ আশা ছিল যে এম এ টা-ও যদি একইরকম কৃতিত্বেও সঙ্গে পাস করে নিতে পারে তবে যে-কোনো একটা কলেজে অধ্যাপনার চাকরি জুটিয়ে নিতে পারবে। অধ্যাপকদের জীবনে অর্থ হয়তো নেই কিন্তু সম্মান আছে, আরাম-অবসর আছে। মানুষ যদি সঠিক সিঁড়িতে পা ফেলে চলতে পারে তার পক্ষে দৈন্য-দুর্দশার অন্ধকার রাজ্য পেরিয়ে নিরাপদ শান্তি ও সুখের মুখ দেখতে পাওয়া সম্ভব হয়। এই আশায়, এই উচ্চাভিলাষে উদ্দীপ্ত হয়ে ভূষণ নিজেকে অনেক সময় দোষারোপ করত; নিজের এই অনুরাগকে শব্দের মালা গেঁথে, দৃষ্টি ও ব্যবহারের জালে জড়িয়ে মনোরমার সামনে তুলে ধরত। ছোটোবেলা থেকেই মনোরমা ইংরেজী স্কুলে পড়ুয়া মেয়ে; এ-সব শব্দজালের মধ্যে পড়ে সে কখনো আশঙ্কায় অধীর হয়ে উঠত না বা হঠাৎ তার স্রোতে ভেসেও যেত না।

কিন্তু এম. এ. পাস করে যখন ব্যাঙ্কে পঁচাত্তর টাকার একটা সামান্য চাকরি করতে হল তখন ভূষণের ব্যবহারে ও চিন্তাধারায় একটা ক্রূর ভাব বাসা বাঁধল। ও নিজেরই শোষণের শিকার হয়েছে ; ওর কাছে শোষণের এখন যে সংঘর্ষের রূপ ধরা পড়ল, যে সমাজবাদের ভাবমূর্তি তার চোখে ভেসে উঠল, সেই দৃষ্টিতে আর উদারতা অবশিষ্ট ছিল না ; তা আর বুদ্ধিজীবীর চিন্তাধারার স্বপ্ন রইল না। যে সমাজ-ব্যবস্থায় ওর জীবন নিষ্ফল হতে চলেছে তার বিরুদ্ধে একেবারে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নেমে পড়া ছাড়া আর যা-কিছু সব বৃথা। ভূষণের মধ্যে ছিল আত্মসম্মানের একটা আগুন ; জগদীশের সঙ্গে নিজেকে যখন তুলনা করত ওর মনে ঈর্ষার একটা ক্ষীণ শিখা জ্বলতে দেখত ; তাতে ছিল এক ধরনের প্রবল ঘৃণা। এই যে অন্যায়-অবিচার, এর মূলে কে দোষী ? দোষী সমাজের অবস্থার তারতম্য, এই বৈষম্য। জীবনের মধুর উচ্চাভিলাষ ও বর্জন করেছে ; মনোরমার সঙ্গে আর বন্ধুত্ব করার আশা বৃথা।

ভূষণ অনেকদিন আসে না ; সে কথা ভেবে ভেবে মনোরমার মন অধীর হয়ে ওঠে। ও ভাবল, ভূষণের মতো মানুষও ওকে ঠকাবে, এও কি সম্ভব ? নির্মলা ও সত্তা তখন ফেডারেশনের কাজে খুব মেতে উঠেছিল। মনোরমা ভাবল, ভূষণের কাছ থেকেও কি এ-রকম ব্যবহার আশা করা যায় ? এতে যে ওর নিজেরই অপমান।

কিছুদিন মনোরমা রাগ করে রইল। পরে ভেবে ঠিক করল সব ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে যাওয়া দরকার। কয়েকদিন অপেক্ষা করে রইল কিন্তু ভূষণ এল না। একদিন ভূষণের সঙ্গে রাস্তায় দেখা। মনোরমা তৎক্ষণাৎ গাড়ি থামিয়ে জিজ্ঞেস করল— আপনি আজকাল কোথায় থাকেন বলুন তো ? দুটো তো মাত্র কথা কিন্তু মনোরমার চোখের দৃষ্টিতে অনেক কথা ফুটে উঠেছিল।

মনোরমা ভূষণকে গাড়িতে বসিয়ে বাড়িতে নিয়ে এল। ভূষণ মনোরমাকে স্পষ্ট করে কোনো কথা দেয় নি ঠিকই। কিন্তু ওর মধ্যে যে প্রবল একটা আত্মসম্মানবোধ, তার ফলে অতীতের কথা ও ঠিক ভুলে যেতে পারে নি। এ অনুরাগ অস্বীকারও করতে পারে না। মনোরমা চোখেরভাষায় যে মৌন অভিযোগ করেছে তার সাফাই না গাইলেই নয়। ভূষণ অস্পষ্ট সংকেতে ওর অনুরাগ একদিন প্রকাশ করেছিল ; তার অনুকূলেও কিছু না বলে ও পারল না।

…সিদ্ধান্তের চেয়ে ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রবল শক্তি। আমার স্বপ্ন ভেঙে গেছে। বড়ো একটা ভুল করার চেয়ে ভুলকে ভুল বলে স্বীকার করে নেওয়া শ্রেয়। তা হলে ভুলের জালে জড়িয়ে পড়তে হয় না। আমার অবস্থায় যারা জীবন নির্বাহ করে তারা শুধু দিনটা কাটিয়ে দেবার কথা ভাবতে পারে। সমাজের এই হালফিলের অবস্থায় আমার ও আমার মতো লোকের কোনো স্থান নেই। নিষ্পেষিত হয় প্রতিমুহূর্তে আর ভাবে বেঁচে থাকার কোনো সার্থকতা নেই। এ সমাজ আমাকে সামান্যমাত্র বিশ্রাম দেবে না। এর বিরুদ্ধে আমি প্রাণপণ লড়ব। তুমি হয়তো ভাব আমার মূল্য মাসে পঁচাত্তর টাকা।

ভূষণ অনর্গল ইংরেজী বলে যাচ্ছিল। ওর চোখেমুখে বিস্ময়ের চমক। একটু যেন ভেজাভেজা চোখ দুটো, কর্নিয়ায় গোলাপি আভাস। ভূষণ বলে চলল— মাসে পঁচাত্তর টাকায় কি জীবন নির্বাহ হতে পারে? নিজেকে আমি ঠকাতে চাই না। অন্য কাউকেও না।

পরিস্থিতির প্রতি বিবশ অনুরাগ, এবং এ ব্যাপারে ভূষণ একেবারে খাঁটি মানুষ— ভূষণের কথা শুনে মনোরমার এ ছাড়া আর কী মনে হতে পারে?

দু'জনে কথা বলে চলেছে। ওদিকে সূর্য অস্ত গেল। ওরা দু'জনে বাংলোর লনে বসেছিল। ব্যারিস্টার সরোলা ভূষণকে দেখতে পেয়ে

নিচে নেমে এলেন। ব্যারিস্টার এসে দাঁড়িয়েছিলেন ওদের পেছনে ; ওরা দেখতে পায় নি।

—মাপ করো, আসতে পারি? ওরা পেছনে তাকিয়ে দেখল ব্যারিস্টার সাহেবের ঠোঁটে লেগে আছে একটা চুরুট।

—নিশ্চয়। ভূষণ বলল। ব্যারিস্টারের উপস্থিতিতে ওর বিন্দুমাত্র দ্বিধা-সংকোচ দেখা গেল না। ও বলে গেল — আসলে এ লড়াই শ্রেণী-সংঘর্ষের লড়াই। আমি নির্ধন ও সাধনহীন শ্রেণীর মানুষ। সেদিক থেকে বিচার করলে আমি আপনাদের শত্রু।

ব্যারিস্টার একটু হেসে ওদের সামনে এসে বসলেন। তিনি চুরুটে একটা লম্বা টান মেরে ধোঁয়া ছাড়লেন। চমৎকার দামি চুরুট, তার গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। মিষ্টি-তেতো মদের গন্ধও যেন তাতে মেশানো ছিল। কায়দা করে ইংরেজীতে বললেন সরোলা— ভূষণ, তোমার কথার মূল তত্ত্ব আমি সামাজিক দিক থেকে মানি কিন্তু আমরা দু'জনে ভালো লোক। ধর্ম-যুদ্ধের নৈতিক নিয়ম আমাদের মধ্যে না এলেও পারে। শুধু প্রাকৃতিক নিয়মে আমরা দু'জনে দুই শ্রেণী-গোষ্ঠীর মানুষ। এর দায়িত্ব আমার-তোমার ওপর বর্তায় না ; এর মূল কারণ সমাজ। আমরা নিজেদের মতো করে সমাজের এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারি ; তাই বলে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করব কেন? কি মন্নো, ঠিক না?

মনোরমা দাদা আসাতে নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়েছিল। ঘাড়ের উপর বিনুনিটাকে একটুখানি হেলিয়ে মুচকি হেসে বলল— আমি যুদ্ধের বিরুদ্ধে এদের এই চ্যালেঞ্জকে ঠিক মেনে নিতে পারছি না।

ব্যারিস্টার চুরুটে আবার কষে টান মেরে সমর্থন জানালেন— ঠিক বলেছ। এ তো সহৃদয়তার কথা।

সহৃদয়তার এই আক্রমণে ভূষণের মাথায় রোখ চেপে গেল— এই

কুঠির বাতাবরণে। একটু থেমে এই ইমারতের দিকে তর্জনী তুলে বলল— সহৃদয়তা নিভে যেতে পারে। কুঠির এক কোণে চাকরদের বাসার দিকে সংকেত করে ভূষণ বলল— হয়তো সহৃদয়তার আলো ওখানে নেভে না। ওখানে কেবল ভয়, শঙ্কা। এই সহৃদয়তার মূলে কী রয়েছে জানো ? সমাজের যা-কিছু ভালো তা সব ছিনিয়ে নিয়ে তোমাদের মতো ভদ্রসমাজ গড়ে তোলা হয়েছে। যেন কাশ্মীর কিংবা কুলুর কোনো একটা আপেলের বাগানের সব গাছের ফল থেকে রূপ, রস ও গন্ধকে কোনো এক রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বার করে নিয়ে দশ-পাঁচটা গাছের চারাদানি সাজিয়ে রাখা হয়েছে। আর যেটুকু বাকি থাকে, তার মধ্যে সারবস্তু বলে কিছু থাকে না ; জ্বলেপুড়ে সব নিষ্প্রভ হয়ে যায়, সব শেষ হয়ে যেতে চায়। ভদ্রসমাজের ঐশ্বর্যের প্রতীক চারা-দানিতে সজ্জিত সহৃদয়তা থেকে তোমাদের সমাজ সৌরভ ছড়ায়। তোমাদের পক্ষে এটা হয়তো পরম সন্তোষের বিষয় কিন্তু সমাজের অন্য মানুষের কাছে তা নিতান্তই অন্যায়।

ব্যারিস্টার আঙুলের ফাঁকের চুরুটটায় আর-একটা টান মেরে বললেন— বন্ধু, তোমার এই কটূক্তি-ভরা উপমা ঠিক যেন জমল না। একটা কথা তুমি ভুলে যাচ্ছ। সমাজের ক্রমশ যে বিকাশ সাধন হয়ে চলেছে ভদ্রসমাজ তার এক আবশ্যক পরিণতি। সমাজ-সংস্কৃতির সংরক্ষক এই ভদ্র সমাজ। বাগান জ্বলে যাবার পরে দশ-পাঁচটি দানের যে নমুনা থেকে যাবে তার থেকে নতুন সমাজের বীজ পাওয়া যায় বা যাবে, বুঝলে ?

—না, না। গোটা সমাজটাকেই আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, তাদের কাছে অবসরের আশীর্বাদ এনে দিতে হবে। ভূষণ উৎসাহের সঙ্গে বলে যেতে থাকল— দশ-পাঁচটা বৃক্ষদানির প্রশংসা শুনে পুরো বাগানের দুরবস্থা মনে করা যায় না। লেনিন বলেছিলেন,

আমাদের সংস্কৃতি তোমাদের সংস্কৃতির চেয়ে অনেক বেশি উন্নততর হবে, দেখো।

ব্যারিস্টারের আগ্রহ চাপা থাকে না— লেনিন এ কথাও বলেছিলেন আজকের পুঁজিপতি শ্রেণীর সংস্কৃতিতে অনেক কিছু সুন্দর জিনিস আছে উপাদেয় আছে। এই-সব সুন্দর জিনিস সর্বহারাদের সংস্কৃতির অঙ্গ হবে। আর তা ছাড়া বিশ্ব-সংস্কৃতির ভাণ্ডারকে আমরা সামলে রাখছি।

ভূষণ ব্যঙ্গে ফেটে পড়ল— এ-ভাবে ভাণ্ডার রক্ষা হয় না, একে বলে স্রেফ লুটপাট।

ব্যারিস্টার ও ভূষণের তর্কবিতর্ক অনেকটাই রাজনীতি-ঘেঁষা। ব্যারিস্টার বার বার বলছিলেন— ভারতের বাইরে গিয়ে যদি তুমি তাকিয়ে দেখ তবে বুঝবে। ভারতে এখনো শিল্পোৎপাদন হয় নি ; এখানে এখনো সর্বহারাদের সংগ্রামে নেমে পড়ার মতো মনের দৃষ্টির প্রসারতা লাভ হয় নি। এই সংগ্রাম শুধু আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পটে হতে পারবে। ইংলণ্ডে সমাজবাদের যে বিপ্লব চলেছে তার পরিণাম স্বরূপ ভারতেও একটা বিপ্লব হতে পারবে। নাৎসীদের বিরুদ্ধে লড়ছে যে ইংরেজ, তোমরা তাদের বলছ, প্রজাতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধাচরণ। এটা মস্ত বড়ো ভুল।

ভূষণ অপত্তি করল— প্রজাতন্ত্রের সম্মানে ইংলণ্ড এ যুদ্ধ লড়ছে না ; লড়ছে নাৎসীদের সাম্রাজ্যলিপ্সার বিরুদ্ধে, লড়ছে নিজেদের সাম্রাজ্য বাঁচাতে। তার সাম্রাজ্য কী? আমাদের শোষণ। আমরা লড়ছি মুক্তির জন্য।

মনোরমার বক্তব্য প্রকাশ করার অবকাশ ছিল না। চুপ করে না থেকে তার উপায় নেই। ও উঠে পড়ল। নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পরে ভূষণ চলে গেল। মনোরমা জানালা দিয়ে ভূষণকে চলে যেতে দেখল। মনটা বড়ো খারাপ ; বিষণ্ণ। খেতে যেতে

উৎসাহ নেই। অথচ খাব না বললে লম্বা-চওড়া সাফাই গাইতে হবে।

মনোরমা গভীর রাত পর্যন্ত ছাদে হাতের তালুতে মাথা রেখে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল ; নিজের সমস্যা নিয়ে ভাবছিল। ভূষণ অন্য 'কোনো' মেয়ের সঙ্গে ওর তুলনা করে নি ; মনটা কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছে তাতে। অপমান করে নি ভূষণ। কিন্তু ওর কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে ভূষণ। যে যুক্তি দেখিয়েছে, যে কারণে একটা দুস্তর ব্যবধান গড়ে তুলেছে মনে, তা তো মনোরমা যা ভেবেছিল তা নয় : এর পিছনে ওর একটা বড়ো উদ্দেশ্য আছে। মনোরমা চিন্তার রাজ্যে ডুবে গেল। সাধারণভাবে ওর জীবন যে-ভাবে যে-পথে বয়ে চলার কথা ছিল সেই পথে ভূষণ খাড়া করেছে মস্ত বড়ো বাধা। এ পথের বাধাকে লঙ্ঘন করে যাওয়া ওর পক্ষে সম্ভব নয় ; ও হেরে গেছে। এবার জীবনের মোড় ধীরে ধীরে পালটে ফেলবে। নিজের জীবনটা নষ্ট করবে না কিছুতেই। সফলতা চাই ! সময়মতো ভাববে কী করা উচিত, ও কী করবে !

মনোরমা মনের উদাস ভাবটা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করল। পড়াশুনা নিয়ে মশগুল রইল। নিয়ম করে বেড়াতে যায় : সার্বজনীন কাজকর্মে ওর উৎসাহে একটু যেন ভাটা পড়েছিল। এই আন্দোলনের গুরুত্ব, ব্যারিস্টারের ধারণা, এ আন্দোলন মূর্খতা। ব্যারিস্টারের সঙ্গে মতভেদের জন্য ভূষণ আর এ বাড়িতে পা দেয় না। মনোরমা ভাবে, আমার শ্রেণী-গোষ্ঠীর জন্য আমার উপর আস্থা নেই, বিশ্বাস নেই। আমাকে যখন ডাকা হয় না তখন আমিই-বা কেন তার পিছে পিছে দৌড়ব ?

ভূষণ নিজের জেলায় পার্টির সংগঠন ব্যবস্থা আরো সঙ্ঘবদ্ধ করে তুলবার জন্য ধরমশালায় থাকত। মনোরমার সঙ্গে দেখা হলে দু-একবার ওর বাসায় এসেছিল। রাস্তায় কখনো সাক্ষাৎ হয়ে গেলে একজন অন্যজনকে না দেখার ভান করত না। ভূষণের ব্যবহারটা যেন

এ রকম, 'যা হবার তা তো হয়ে গেছে' আর, মনোরমার কথা ? তা তুমিই জানো মনোরমা।

একদিন দুপুরবেলা ভূষণ মনোরমার সমাজের অত্যাচারের প্রমাণ-স্বরূপ সোমাকে নিয়ে এসে মনোরমার সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। সোমা তখন ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। সমাজের অত্যাচারের প্রতিকার মনোরমা নিজের উদারতা দিয়ে করবে, এই ওর সংকল্প। ওর সঙ্গে বন্ধুত্বের সুবিধার প্রশ্ন ভূষণ ওঠাতে চাইল না, তাই স্পষ্ট বলল — তুমি মায়ের সঙ্গে প্রথমে কথাবার্তা বলে নাও। পরে যদি কোনো ঝঞ্চাট হয়, কী লাভ ?

মনোরমা তার ঘন-সন্নিবদ্ধ চুলের বিনুনিটা একটু দুলিয়ে নিয়ে বলল — জিজ্ঞেস করলে দশটা কথা বলবে আর শেষে ঠিক বারণ করে দেবে। একে রেখে দিলে প্রথমে মিনমিন করে প্রতিবাদ করবে আবার পরে মেনেও নেবে।

হলও তাই।

মনোরমা কুঠির একটা ঘরে সোমাকে থাকতে বলল। শুনে মা রাগ করে বলে উঠলেন— তোর আক্কেল বলে কিছু নেই নাকি ? কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করার দরকার বলে মনে করিস না। এরকম একজন বদনামী ও নির্লজ্জ স্ত্রীলোককে আমরা স্থান দেব কোন্ সাহসে ? দুনিয়ায় আমাদের কি থাকতে হবে, না কি ? তোর বাবাকে বলি গিয়ে যাই···

এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল মনোরমা। বলল— দুনিয়া আমাদের কী করবে শুনি ? ও কী এমন নির্লজ্জ কাজ করেছে ? আজকাল মেয়ের সঙ্গে কথাবার্তা ও আলাপ না করে কোন্ ভদ্রঘরের লোক বিয়ে করে বলো ? দুনিয়া তো সতী-পার্বতীকেই পুজো করে। পার্বতী কী করেছিলেন ? তিনি জিদ ধরে বসেছিলেন কী না যে শিবকে

ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবেন না ? এই জিদ বজায় রাখতে গিয়ে তিনি জ্বলেপুড়ে মরে গেলেন। এটুকু ছাড়া মেয়েটা আর কী অনর্থ করেছে ? ও গরিব এটাই তো তার সবচেয়ে বড়ো অপরাধ।

মা চুপ করে গেলেন। লালাজী ও মা, দুজনেরই ধারণা ছিল, তাঁদের এ সন্তানটি বিষয়-আশয় অতটা বোঝে না ঠিকই কিন্তু বিদ্যা-বুদ্ধিতে সেরা, বুদ্ধিমতী ও সৎ। তাই সে সোমার দুঃখে কাতর : ওর অসুস্থ চেহারা দেখে মায়ের পিলে যেন চমকে উঠল।

এই ঘর, এই পরিবার সোমার কাছে অন্য এক ধরনের সংসার মনে হল। মন্নো বিবি ওর জীবন ফিরিয়ে দিয়েছে ; ওর আপনজন যেন। অথচ এ-রকম একজন মেয়েকে সোমা এর আগে আর কখনো দেখে নি। অসুস্থ বাচ্চার জন্য মা যেমন কাতর হয়ে সেবাযত্ন করেন, ওর জন্যে মন্নো বিবি ঠিক তেমনি চিন্তা করে।

সোমা মঝেরা থেকে পালিয়ে এসে পুলিশের হাতে পড়েছিল। পরে কাংড়া ও ধরমশালার সমাজে ওর যা অবস্থা হয়েছিল তা অনেকটা এই রকমের, যেন কতকগুলি কুকুর একটি ত্রস্ত ভীত ছাগলকে ঘিরে রয়েছে ; সেই দুর্দশার কথা ভাবলে ও শঙ্কিত হয়ে ওঠে। ঐ-সব ঘরে ও যা দেখেছে যা ও অনুভব করেছে, কোনো মানুষ তা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না ! ও ভাবতে শুরু করেছিল, ঘৃণিত জীবনে ঘৃণা ছাড়া আর ওর ভাগ্যে কিছু জুটবে না ; সে যোগ্যতাও ওর নেই। দুঃখের কপাল নিয়ে জন্মালে দুঃখই জোটে। অথচ এখানে ও সহানুভূতি ও দরদের উষ্ণ স্পর্শ পেয়ে ভরে উঠেছে। এখানে কারো মুখে ঘৃণার কালো ছায়া দেখে না ; অপরাধের মালিন্য সহ্য করতে হয় না। এই ঘরে কারো কোনো জিনিসের অভাব নেই ; পয়সাকড়ির ভাবনা নেই। এ বাড়িতে ঈর্ষার আভাস যদি কোথাও থেকে থাকে তবে তা অনুভব করা যায় শুধু চাকরবাকরের মহলে — জগ্‌গু, মোহনা আর চাকরাণী জীবানের মনে।

উপেক্ষা দিয়ে সোমা তা সহজেই এড়িয়ে যেতে পারে।

ছোটোবেলা থেকেই সোমা কর্মঠ ; কঠোর পরিশ্রম করার অভ্যাস ওর প্রায় মজ্জাগত। কিছু-না-কিছু ও করতেই থাকে ; চাকরবাকরদের কাজকর্মও ঘুরিয়েফিরিয়ে করায়। এজন্য ওর প্রতি মায়ের করুণা ও বিশ্বাস আরো বেড়ে গেল। মাজী ওকে কিছু পুরনো কাপড়চোপড় দিয়েছিলেন। মন্নো চাইত সোমা পরিষ্কার কাপড় পরে থাকে ; কাপড় পরবার কায়দাও শিখিয়ে দেয়। এজন্য যখন-তখন বকতেও ছাড়ে না। সোমা ভাবে, বড়োলোকেরা সত্যিই দেবতা। গরিব লোকেরা কত সংকীর্ণ ; এইজন্য ভগবানও ওদের এত বেশি দুঃখ দেন।

ভূষণের দৌলতে মনোরমার বাড়িতে সোমা টিঁকে গেল। সোমা কেমন আছে তা জানতে ভূষণ মাঝেমধ্যে বাংলোতে আসে। সোমার সমস্যা নিয়ে মনোরমা ভূষণের সঙ্গে আলোচনা করে। দেখা হলেই সোমার কথা, তাই নিজের মনের কথা আর বলা হয়ে ওঠে না। কথা বলতে বলতে ওর মন ভরে যায় ; নিজের উদাস চেহারা আর ভেজা চোখের দৃষ্টি পরিবারের কারো চোখে পড়লে কিছু ভেবে বসবে— এটা মনোরমা হতে দিতে চায় না। তাই ভূষণকে বলল— চলো, একটু বাইরে বেড়িয়ে আসি। ওখানেই বলব।

দুজনে মকলোটগঞ্জের চড়াইয়ে গিয়ে উঠল। ভূষণ খুব সাবধানে কথাবার্তা বলছে। এমন সব প্রশ্নেরই জবাব দিয়ে যাচ্ছে যা ওর পক্ষে অস্বীকার করার উপায় নেই। কী করেই-বা অস্বীকাব করবে সে কথা ; ও তো নিজেই মুখ ফুটে বলেছিল মনোরমাকে ভালোবাসে। এখন অবশ্য অন্য পরিস্থিতি। এর সাফাইয়ে এখন দু-কথা বলতেও পারে ; জীবনের যে-পথে যাবার স্বপ্ন দেখে ও তার ভালোবাসা প্রকাশ করেছিল, সে-পথ অনেক দূরে সরে গেছে। সে পথ যে ভুল তার প্রমাণও মজুত।

মনোরমা ভূষণের চরিত্রের এই নির্ভীক দিকটা যদি মেনে নিতে না পারে তবে ভূষণই-বা কী করবে ?

ভূষণ সে কথাই যেন একটু ঘুরিয়ে বলতে চাইল সহৃদয়তা জীবনের শোভা। আমাদের সমাজের যে জীবন, যে, পরিস্থিতি আমাদের যে আচার-ব্যবহার তার থেকে এ বউটি আলাদা কোনো জীব নয়। তুমি কিছু অভাব-অনটনে নাজেহাল নও ; কারুর কথায় বা নিন্দায় তোমাদের সামাজিক স্থিতির হেরফের ঘটবে না। ঠিক এই কারণে সোমা তোমাদের পরিবারে ঠাঁই পেয়েছে।

মনোরমা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চুপ করে রইল। ও বুঝল, ভূষণ দিন দিন মেজাজী ও কটুভাষী হয়ে উঠছে। কম্যুনিজমের শ্রেণী-সংঘাতের বিদ্বেষ ওর মনটাকে যেন ঝলসে দিয়েছে।

ভূষণ বলে চলল— সহৃদয়তা আর ন্যায়ের পথকে সমর্থন করার জন্য তুমি নিশ্চয় গৌরব বোধ করতে পারো। সাধনহীনের পক্ষে অতটা করা কি সম্ভব হত ? যে জীবনে শুধু আতঙ্ক, শুধু দুঃখ-দুর্দশা, যা নিয়ে সে প্রতিনিয়ত দগ্ধ হচ্ছে, তার জীবনে উদারতার অঙ্কুর ফুটবে কী করে ? আগে তো আমরা বেঁচে থাকার অধিকার পাই। "আমরা" কথাটা বলে ভূষণ মনোরমার কাছ থেকে, মনোরমার ভদ্রসমাজ থেকে নিজেকে যেন একটু পৃথক করতে চাইল।

মনোরমা এবারও শুধু দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নীরব রইল। এর বেশি অপমান আর কুড়োতে চায় না।

ভূষণ যেন নিজের ভাবেই বলে যেতে থাকল- তোমার মতো লাবণ্য, বুদ্ধি সোমা বা সাধারণ কোনো মেয়ের মধ্যে সঞ্চারিত হবে কী করে ? কয়েক পুরুষের ঐতিহ্য বেয়ে গড়ে উঠেছে তোমার পরিবার, তোমার সৌজন্য-বোধ আর তোমার এই লাবণ্যময়ী রূপ। কিন্তু এ যেন অনেকটা এ রকম : ভালো জাতের চমৎকার গোলাপ। বেড়ে ওঠার

সব রকম পরিবেশ, সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। তা থেকে কলমের পর কলম তৈরি করে যাচ্ছি। কিন্তু শেষ যে সমাজ তা কি সোমার হাতে গড়ে উঠছে? শুধু সহৃদয়তার প্রার্থী হয়ে বেঁচে থাকবে?

মনোরমা আর কথা বাড়াতে চাইল না— খুব হয়েছে, এখন থাক্।

এত কথা এত বাধা সত্ত্বেও ভূষণের মুখ দিয়ে মনোরমা সম্বন্ধে ছু-একটি এমন মধুর কথা বেরিয়ে যায়, যা মনোরমা নিভৃতে অনেক ভাবে, গুপ্তধনের মতো মনের গভীরে যত্ন করে তুলে রাখে। বারবার সে কথাগুলি মনের মধ্যে আবর্তিত হতে থাকে তোমার বুদ্ধিমত্তা তোমার লাবণ্য, তোমার সাহস, তোমার সৌজন্য-বোধ —। এত নৈরাশ্য ও কটূক্তি সত্ত্বেও মনোরমার বিশ্বাস ছিল একদিন ভূষণের আত্মদহন ঘুচে যাবে আর ও শান্তি ফিরে পাবে।

ওর মা-বাবার কাছে মনোরমার স্বামী হিসেবে ভূষণের নাম যদি করা হত কিম্বা সে ধরনের কোনো আকর্ষণে ভূষণ আসা-যাওয়া করত তা হলে তাঁরা কিছুতেই তা মেনে নিতে পারতেন না। মনোরমার জন্য ছেলের তো অভাব নেই। আসলে অন্য কারো ব্যক্তিত্ব থাকতে পারে মনোরমা তা একবারও ভেবে দেখে নি! যার কাছে নারী মাথা নোয়াতে পারে সেই তো শুধু পুরুষ। মনোরমা ভাবে, ও যা চায়, যা নিয়ে ওর জেদ, তা যদি ও পূরণ করতে পারত? মনে ভেসে ওঠে কল্পনার রাজ্য; নিজেকে তাকিয়ে দেখে। গ্রীষ্মকালে ধরমশালার পাহাড়ের গা ছুঁয়ে ঠাণ্ডা হাওয়ায় এমনিতে হয়তো গরম জামা-কাপড় চড়িয়ে, ভেলভেটের স্ল্যাক্স পরে, একগাদা ভালো ভালো বইপত্র পড়ে অ্যাল্‌সেশিয়ান কুকুর-টাকে সঙ্গে নিয়ে পাহাড়ের রাস্তায় বেড়াতে যেত; কিন্তু তা না করে ভূষণের কথায় ও যেন সাধারণ একটা শাড়ী পরেছে, পায়ে সাধারণ এক-জোড়া চটি জুতো, কাগজের বাণ্ডিল বগলদাবা করে রোদ্দুরে লাহোরের

রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। রাস্তার যত রাজ্যের মিহি ধুলো সব এসে জমা হয়েছে ওর মুখে। ঘাম ঝরে মুখের জায়গায় জায়গায় ধুলো ধুয়ে গেছে ; ফর্সা ধবধবে রঙ। এই অবস্থায় ও পার্টির অফিসে হাজির। ওখানে অনেক কমরেড হৈ-হল্লা করে হাসিঠাট্টায় মশগুল। কাপড়-জামা বদলাবার নিরালা জায়গা নেই। কিন্তু ও তার প্রয়োজনও অনুভব করে না। সারাদিন ঘন ঘন কাপড় বদলাবার চেয়ে অনেক জরুরি কাজ করার থাকে··· যেমন নির্মলা পার্টির জন্য চাঁদা চাইতে ওর কাছে আসে ; ও নিজেও পার্টির কাজে সারাদিন ঘুরে বেড়ায়। পার্টির কাগজপত্র ও পুস্তিকা বিক্রি করে। ফিরে আসবে যখন, ভূষণও তখন থলে হাতে ফিরবে। ভূষণ বলবে— মুন্নো, তুমি নিশ্চয় ক্লান্ত। ও মুচকি হেসে জবাব দেবে, একটুও না। মনে মনে এ-রকম একটা চিত্র ভেবে নিতে পারলে ও শক্তি পায়, কর্মঠ থাকার একটা অভিমান অনুভব করে। কিন্তু ভূষণ এ-রকম কোনো শর্ত রাখে না ; এ-রকম কোনো পথের নির্দেশ বা বলভরসাও দেয় না।

লালাজীর কুঠিতে চার মাস থাকার পর সোমার নতুন এক অভিজ্ঞতা হল। সুবিধে ও আরামের জীবন পেয়ে ওর রূপ ও ব্যবহার পালটে গেল। রোদ্দুর, তুষার, আঁধিতে ঝলসানো জংলী ও কড়া-পড়া পা দুটো আর রুক্ষ আর মলিন একটা ভাব যা ছিল তা যেন একে-বারে বদলে গেছে। হাতের ভঙ্গি ও চোখের দৃষ্টিতে চকিত এক আতঙ্কের' ভাব আর নেই। ওর ব্যবহারের মধ্যে সঙ্কোচ ও গাম্ভীর্য এসেছে। মনোরমাকে দেখাশুনা করতে হয় বলে রোজ স্নান করতে হয় ; পরতে হয় পরিষ্কার জামা-কাপড়। মনে হয় যেন অন্য কোনো বউ। সারাদিন কাজ নিয়ে থাকে। এত কাজ কাজ করে হয়রান হয়ে যায় যেন সোমা ? সহানুভূতির স্বরে মনোরমা তাকে সান্ত্বনা দেয়, বল-ভরসা জোগায়। সোমার প্রাণের যে ব্যথা তা অনুভব করার চেষ্টা

করে মনোরমা।

প্রেমের যে দুঃসহ একটা দিক আছে, যেখানে প্রেম দাবি করে সাহস, সেখানে মনোরমা যেন নায়িকা সাজতে চায়। মনোরমা ভেবে ভেবে আকুল হয়ে ওঠে, ওর জীবনে কি এই ঘটবে? সোমার ব্যর্থতা অনুভব করে মনোরমা বোঝে, প্রেমের মধ্যে দুঃখ আছে, ত্যাগ আছে কিন্তু তার যেন একটা মধুর স্বাদও আছে। সোমার এই করুণ নাটকের দিকটা ভেবে ভেবে কল্পনায় ও আরো তাকে গভীর করে তোলে। যদি সোমার সঙ্গী কখনো জেল থেকে ছাড়া না পায়, যদি জেলে না গিয়ে কোনো দুর্ঘটনায় মরে যেত? তা হলে প্রেমের মূল্য ও পরিণাম হিসেবে সারা জীবন সোমার বৈধব্য ও সন্তাপ নিয়ে কি বেঁচে থাকতে হত? আর সত্যিই তো, এটা কত বড়ো ত্যাগ; যদি পেটের জন্য চিন্তা করতে না হত তবে এর এত দুঃখ পাবার কী দরকার ছিল? অশিক্ষিত অর্ধসভ্য হয়েও এর মধ্যে চরিত্রের মহত্ত্ব আছে। এখানে আছে মানুষের ন্যায় আর ঔচিত্যের ভাবনা।

সোমার সংকোচ সত্ত্বেও মনোরমা ওকে জোর করে তক্তাপোষ বা সোফায় বসিয়ে ওর কথা জিজ্ঞেস করত। ও-সব কথায় ও যেন লজ্জায় কুঁকড়ে যেত। এ-সব কথা শুনে লোকে তাকে ঘৃণা করতে শুরু করেছিল। কিন্তু মনোরমার একেবারে অন্য স্বভাব ভিন্ন ব্যবহার। মনোরমা ওকে নিজের কাছে বসিয়ে, ওর কাঁধে স্নেহের হাত রেখে জিজ্ঞেস করত— এ-সব কথা ভেবে তোমার অভিমান হয় না, অদ্ভুত একটা সুখ হয় না? সোমা চকিতে ওর চোখের ওপর চোখ রেখে একেবারে চুপ হয়ে যায়।

মনোরমা তখন বলে— যদি ধনসিং ফিরে না আসে তবে তুমি কি অন্য কাউকে বিয়ে করতে রাজি? সোমার মাথা নত হয়ে যায়, চুপ করে বসে থাকে। চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে থাকে। আঁচলে

চোখ মুছে ও মাথা নেড়ে জানাল যে ওর ঘোরতর আপত্তি।

মনোরমা ওকে বোঝাল— ধনসিং যদি ফিরে না আসে, তোমাকে যদি ও ভুলে যায় তবুও যদি তুমি তাকে ভালোবাসো তবে তাতে তোমার কত বড়ো সুখ, কত তৃপ্তি, এটা ভেবেছ কি ?

সোমা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, বলল— সেদিন যেন না আসে। আমি তখন কোথায় যাব, কী করব ?

মনোরমা সোমার হাতে হাত রেখে তক্তাপোষে আড়ভাবে শুয়ে পড়ে দ্বারের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল, প্রেম কি সুখ না দুঃখ, তৃপ্তি না অভাব-বোধ ? প্রিয়তমকে না পেলে প্রেম তো শুধু অভাব-বোধের শূন্যতা ; অভাব-বোধে সুখ কোথায় ? এ-রকম নানা কথা ওর মনটাকে যেন তোলপাড় করে তুলল। সোমা কখন উঠে চলে গেছে বুঝতেও পারে নি। মনোরমা সোমাকে এত স্নেহ করে, ভালোবাসে ঠিক যেমন ভক্ত তার ঠাকুরকে ভালোবাসে, ভক্তি করে। ভক্ত নিজের মূল্য বুঝতে পারে না বা জানে না ; নিজের কথা সে চিন্তাও করতে পারে না, তার কাছে ঠাকুরই সব।

কয়েক দিন পরে ভূষণ আবার সোমার কথা জানতে এল। সোমার মতো একজন অশিক্ষিত মেয়ের যে এত সংভাবনা ও সদ্‌বুদ্ধি তা ভেবে ও অবাক হয় ; ওর মনের এই পরিবর্তনের কথা বলে তারিফ ক'রে মনোরমা বলল— জেল থেকে ছাড়া পাবার পর ঐ ড্রাইভারের যদি কোনো খবর পাওয়া না যায় তবে এই বউটির কী অবস্থা হবে ?

ভূষণ সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বলল— যদি ভয় পেয়ে বা অন্য কোনো কারণে মানুষটা না আসে তবে এই মহিলার সমস্যা বাস্তবিক খুব দুরূহ হয়ে উঠবে··· । সময় কেটে গেলে ওর মনটা হয়তো অনেক হালকা হবে। তখন যদি অন্য কোনো মুসাফিরের সঙ্গে দেখা হয়, বউটির আবার বিয়ে হয়ে যাওয়াই মঙ্গল। কোনো পুরুষের ঘর-গেরস্থ

সামলানো ছাড়া বউটি আর কীই-বা করার যোগ্যতা রাখে!

এই রুক্ষ স্বর, ব্যবসায়ীর মতো কথা বলার ভঙ্গি মনোরমার পছন্দ হল না। ও না বলে পারল না — তুমি এ-রকম কথাই বা ভাবছ কেন? প্রেমের কি কোনো মূল্য নেই? কোনো মানুষ যদি কোনো-একটা আদর্শ সামনে রেখে চলতে চায় তাকে কি জোর করে আদর্শ-চ্যুত করতে হবে?

ভূষণ কথাটা যেন মেনে নিতে পারল না। বলল— কোনো আদর্শ পূরণ করতেই কি বউটি ঘর থেকে বেরিয়েছিল? বেরিয়েছিল তার কারণ ঘরে সে থাকতে পারছিল না; জীবন ধারণ অসম্ভব ও অসহ্য হয়ে উঠেছিল। অথচ সে বাঁচতে চেয়েছে। তাই ঘর থেকে একদিন সাহস করে বেরিয়ে পড়েছে। প্রেম ছিল বলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়তে পেরেছিল। জীবনে প্রেম একটা সহায়ক বস্তুর মতো; জীবনে শুধু বাধার জালে জড়িয়ে প্রেম কখনো চলতে পারে না।

মনোরমা প্রতিবাদ করে বলে উঠল — ওর উদাহরণ দেখে তো আমার মনে হয়, মানুষ প্রেমের মূল্য দিতে জীবনকে উৎসর্গ করতে পারে। তোমার বিচারে হয়তো এটা পাগলামি, মূর্খামি, অস্বাভাবিক এবং অপ্রাকৃত।

মনোরমার স্বরে কেমন যেন একটা তিক্ততা ফুটে উঠেছিল। ভূষণের কাছ থেকে অপমানিত হয়ে মনোরমা যেন তার প্রতিকার দাবি করছিল।

ভূষণ এই অপ্রসন্ন ভাবটা লক্ষ্য করল। অবজ্ঞা বা তিরস্কার করে যেন হঠাৎ কিছু বলে উঠতে পারল না। একটু থেমে মোলায়েম ও শান্ত স্বরে বলল— জীবনের সব-কিছুর মতোই প্রেম অনাবিল নয়; দ্বন্দ্ব-বিক্ষোভ-ভরা তার গতি। প্রেম জীবনে সফলতার ফসল কুড়িয়ে আনে, সহায়তার ভাণ্ডার খুলে ধরে। প্রেম যদি থিতিয়ে যায়, যদি সংকীর্ণ পথে

চলতে বাধ্য হয়, তবে সে অশান্ত বাসনার রূপ ধরে! যদি জীবনে প্রেম শুধুমাত্র আকর্ষণ, বিবেকের সংযম নয়, তবে সে জীবনে ঘাতকের বেশেও আসতে পারে। যেমন ধরো জল। জলের উষ্ণতা যদি এতটুকু না থাকে তবে তা বরফ হয়ে যায়; ওতে আর কোনো গতি থাকে না। উষ্ণতা যদি একটা সীমার বাইরে যেতে চায় তবে তা বাষ্প হয়ে উড়ে যায়।

—উড়ে যেতে চায় তো উড়ে যাক। নিরর্থক জীবনে কী লাভ?—মনোরমা উদাস স্বরে বলল।

ভূষণ আবার একটা সিগারেট ধরাল— উড়ে যদি যেত তবু না-হয় কথা ছিল; যেমন ধরো এই বউটির জীবন। কয়েকটি ঘটনার পরিণাম ধনসিং-এর সঙ্গে তার প্রেম; আবার কয়েকটি ঘটনার কারণও বটে। যদি তার স্বামী বেঁচে থাকত তবে হয়তো এই প্রেম কোনোদিন হতে পারত না। যদিও-বা হত, ওর প্রতি তোমার এতটা সহানুভূতি জাগত না। প্রেম শরীরের অনুভূতি আর তার প্রয়োজন ছাড়া পৃথক বস্তু বলে কি মনে হয় তোমার?

ভূষণ যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন হল। একটু থেমে আবার বলল—বিরহের প্রবল ব্যথায় প্রাণ বিসর্জন দেওয়া এক কথা। কিন্তু যখন প্রেম প্রতি দিনের জীবনে অসহ্য পরিস্থিতি সৃষ্টি করে তখন জীবনের সে প্রবল বাধা হয়ে আসে। একসময় জীবন থেকে প্রেম খসে পড়ে। প্রেমের পরিবর্তে তখন আসে শুধু ঘৃণা। একটা সত্য ঘটনা বলব?

মনোরমা মাথা নেড়ে সায় দেয়। ভূষণ আস্তে আস্তে বলে যেতে লাগল— আমার এক পরিচিত বন্ধু আছে। একটি মেয়েকে সে ভালোবাসত। মেয়েটির মা-বাবা ওর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে রাজি ছিলেন না। এই নিদারুণ হতাশায় হয়তো-বা প্রতিবাদে মেয়েটি বিষ খেয়েছিল। জীবনটা তার বেঁচে গিয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত বিয়েও হয়েছিল। তার পর ছয় বছর কেটে গেল। স্বামীটি খুব ভালো লোক নয়।

মেয়েটির এখন এমন অবস্থা হয়েছে যে স্বামীর সঙ্গে থাকার চেয়ে সে এখন কুয়োতে ঝাঁপ দিয়ে মরতে পারলে বাঁচে। স্বামীর ব্যবহার এত খারাপ যে তার নাম শুনলেই ও পালিয়ে যেতে চায়। কোনো মানুষকে হয়তো আমি ভীষণ ভালোবাসি কিন্তু ঐ মানুষটির কাছ থেকে দুর্ব্যবহার পেয়ে প্রতিদিনের জীবন যদি আমার সংকটময় হয়ে ওঠে, তবে তার প্রতি আমার মন বিরূপ হয়ে ওঠে, বিরক্তির কালো ছায়া পড়ে। যদি সোমা খুব কষ্টে-দুঃখে না পড়ত, যদি ধনসিং ওর জীবনে একটা মস্ত বড়ো সান্ত্বনার আশীর্বাদ না হত, যদি সোমার এই অসহায় অবস্থায় একমাত্র অবলম্বন বলে ওকে না মনে হত, তবে সোমা কি ওকে ভালোবাসতে পারত? ধনসিং ওর জীবনে শুধু ভবিষ্যৎ অবলম্বনের মতো।

মনোরমা নীরব রইল। ও যেন বুঝতে পারল, ভূষণ ইঙ্গিতে এই কথাই ওকে বোঝাতে চাইছে যে, ওরা পরস্পরের কখনো সহায়ক হতে পারবে না, কখনো ওরা এক হতে পারবে না। সে রাতেও মনোরমা অনেকক্ষণ জেগে ছিল। চিন্তার আবর্তে ডুবে গিয়ে ও মনে মনে স্থির করল— নিজের অপমান ও আর কিছুতেই হতে দেবে না।

* * *

জেলে বন্ধ হবার সময় ধনসিং যতটা অসহায় বোধ করেছিল, নিরুৎসাহিত ও লজ্জিত হয়েছিল, ধরমশালা জেলার ফটক থেকে ছাড়া পাবার সময়ও তার মনের অবস্থা ঠিক সেরকমই দাঁড়াল। হাতে অবশ্য এখন হাতকড়া নেই; জেলের অপ্রতিহত বোবা দরজাও ওর দিকে আর তাকিয়ে থাকে না; কিন্তু সংসারের দিকে তাকিয়ে ও কোনো পথ দেখতে পেল না। ওর বিশ্বাস ও ভালোবাসার ক্ষমতা সব কেড়ে নিয়ে,

ওর বুকে বদমাশ দাগী মানুষের ছাপ মেরে ওকে জেল থেকে বাইরে বার করে দেওয়া হয়েছে। এখন কোথায় যাবে, কার দরজায় গিয়ে দাঁড়াবে? একটা পাখিকে তার পাখা ছিঁড়ে ফেলে খাঁচার বাইরে কতকগুলি বেড়ালের সামনে যদি ছেড়ে দেওয়া হয়, তার ধড়ফড়ানি যেরকম দুঃসহ বাঁচার সংগ্রাম, ঠিক তেমনি জেল থেকে মুক্তি পেয়ে ধনসিং-এর অবস্থা হল। মার্কামারা দাগী ও বদমাশের কলঙ্ক মাথায় করে চাকরির জন্য আবার কোম্পানির দরজায় গিয়ে দাঁড়ানো সম্ভব নয়। এটা ভাগ্য ছাড়া আর কী! অপমান ললাটে ধারণ করতেই যার জন্ম, সে সম্মান পাবে কী করে?

ছোটোলোকের ঘরের ছেলের মতো যদি ঘরে থাকতে পারত তবে সে-রকম ঘরের কোনো মেয়েকেই বিয়ে করতে পারত। ও রাজপুত সেজে রাজপুতানীর সঙ্গে বিয়েসাদি করার স্বপ্ন দেখেছে··· কাকা তো বলতই, মেয়েদের ফাঁদে পড়লে আর রক্ষে নেই।

ধনসিং ধোঁকা দিতে চায় নি। কাউকে ঠকাবার মতলব যদি থাকত তবে এত লজ্জিত হত না, আর তা ছাড়া ধোঁকা দেবার হলে অনেক বেশি চতুর হবার কথা ভাবত। কিন্তু লোকেরা এখন তো ওকে দাগাবাজ বলেই জানবে। পরিচিতদের কাছে কোন্ মুখে গিয়ে দাঁড়াবে? একমাত্র সোমাই হয়তো ওকে বিশ্বাস করবে। কিন্তু না-জানি সোমাকে কোথায় নিয়ে গেছে? ওর মনের অবস্থাই বা কী রকম আছে?··· শত হলেও মেয়ের জাত তো!

শুধু একজন-দুজনই নয়, ধনসিং এরকম বেশ কয়েকজন ড্রাইভারকে জানে যারা অন্যের স্ত্রীর সঙ্গে, এমন-কি বেশ্যাদের সঙ্গে নির্বিবাদে কুকর্ম করে বেড়ায়। সমাজের কাছ থেকে অপবাদ এদের জোটে না, ভয়ও পায় না, কারণ এ-রকম গর্হিত কাজ করেও তাদের জেল খাটতে হয় নি। ধনসিং জেল খেটে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। ছয় মাস ধরে জেলের

জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা ওর হয়েছে, সুতীব্র মানসিক যন্ত্রণায় ছটফট করেছে। পুলিশের উপর ওর জাতক্রোধ। সারা জীবন ধরে পুলিশের কাছে ওর হয়রানি পোহাতে হয়েছে। ওর ছোটোবেলায় পুলিশ মিয়া বজরসিং-এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে ওকে ঘর-ছাড়া করেছিল। গাড়ি চালাবার সময় পুলিশ চালান করে দেবার ধমক দেখিয়ে ঘুষ নিত; এই পুলিশই ওকে থানায় বেদম প্রহার দিয়েছিল আর তাদের প্ররোচনায় সোমা ওকে মণ্ডীতে নিয়ে যাবার মিথ্যা বয়ান দিয়েছিল। যদি সোমা মণ্ডী যাবার ব্যাপারে মিথ্যা কথাটা না বলত তবে ওর সাজা হত না। থানায় পাঁচদিন ধরে পুলিশরা ওকে নিয়ে যে কী করেছে, তা কে জানে? এখন সোমাই বা কোথায়?

বেশ কয়েকবার জেল খেটেছে বা মকদ্দমায় নাজেহাল হয়েছে এমন ভুক্তভোগী সঙ্গী ধনসিং-এর সঙ্গে বাজি রেখে বেশ কয়েকবার বলেছে—পুলিশের জিম্মায় কোনো মহিলা থাকলে তাকে খারাপ করে নি এটা হতেই পারে না। আরে শালা··· পুলিশরা নিজেদের মাকেই ছেড়ে কথা বলে না তো অন্যরা কোন্ ছাড়। সঙ্গী কয়েদীরা ধনসিংকে জেরা করে সব শুনে ওকে বুঝিয়েছিল— যে-সময় মহিলার শ্বশুর রিপোর্ট লেখাতে এসেছিল, তখন তোমরা তো ওখানেই ছিলে। তবে কেন পুলিশ ওদের ভাগিয়ে দিলে। তোমার মণ্ডী যাবার কাহিনী পুলিশরা কেন ফেঁদেছিল? তোমাকে ও ঐ বউকে প্রথম দু'রাত থানায় রেখে পুলিশ ওকে কেনই-বা গায়েব করে দিয়েছিল? তোমাকে গ্রেপ্তার করার ব্যাপারটা শ্বশুরের রিপোর্টের পরে কেন দেখিয়েছিল? এটুকুও কি তারা বোঝে না? আর ধনসিংকে এও তারা বুঝিয়ে বলেছিল— বেটা, এখন জেল থেকে বেরিয়ে দুনিয়ায় আবার ফিরে যাবে তো তোমার সঙ্গে সঙ্গে 'নম্বর'-টাও যাবে। পুলিশ এখন তোমার ওপর হামেশা নজর রাখবে! সম্ভব হলে শুরুতেই ঘুড়ির সুতো কেটে দিয়ে যেয়ো।

নয়তো বেটা এক মাসের মধ্যে আবার এখানে ফিরে আসতে হবে।

সোমার সঙ্গে না-জানি পুলিশ কত দুর্ব্যবহার করেছে। ভাবলে ধনসিং-এর মাথায় খুন চেপে যায়। সোমা মণ্ডীতে যাবার মিথ্যে কথা বলে ওকে জেলে পাঠিয়েছিল। সোমার এ-কথা ভাবলেও রাগে ওর শরীর জ্বালা করে ওঠে কিন্তু আদালতের সামনে সোমার কান্নায় ফেটে পড়ার মুখখানা যখন ভেসে ওঠে তখন রাগ পড়ে যায়। আদালত সোমাকে চৌধুরী নির্ভয়রামের জিম্মায় সমর্পণ করেছিল। ধনসিং ভাবল, চৌধুরীর ঘরে গিয়ে সোমার ঠিকানা নেবে। যদি পুলিশ ওকে খারাপ করে দিয়ে থাকে তবে থানাদারের মুণ্ডুপাত করে আসবে। এবার কেউ ওকে ধরতে পারবে না। সেবার তো সোমার জন্যই নিজে থানায় গিয়ে হাজির হয়েছিল। জেলের অভিজ্ঞ ও দরদী সঙ্গীদের কাছ থেকে এবার অনেক কিছুই শিখে নিয়েছে; কী করে পালিয়ে যেতে হয়, আর পুলিশ থেকে বাঁচতে হয় তার অন্তত বিশ রকম উপায় জেনেছে। সবচেয়ে যেটা বড়ো শিক্ষা ও পেয়েছে তা এই যে, যারা অপরাধকে ঘৃণা করে অথচ নিজেরা অপরাধে লিপ্ত হয় এমন সমাজের জন্য কোনো তোয়াক্কা কোরো না!

ধনসিং জেল থেকে বেরিয়ে যা ভেবেছিল সেইমতো চৌধুরী নির্ভয়-রামের কাছ থেকে খবরাখবর নিতে যাচ্ছিল। পরিচিত মুখ এড়িয়ে ও চলছিল। কিন্তু বাজারে ও শুনতে পেল ওর নাম ধরে কে যেন ডাকছে। ধনসিং মুখ ফিরিয়ে দেখল কমরেড ভূষণ। পরিচিত মানুষ দেখেই ওর মন সংকুচিত হয়ে উঠল, ভাবল এক্ষুনি গালমন্দ শুনতে হবে। কিন্তু ভূষণের মনে ও-সব কিছু ছিল না।

ভূষণ ধনসিং-এর কাঁধে হাত রেখে বলল— আমি তোমার পথ চেয়ে ছিলাম। কবে এলে? দেখা-সাক্ষাৎ করতে কোম্পানির দপ্তরে যাচ্ছ নাকি?

জেল থেকেই ধনসিং মনে মনে ঠিক করেছিল প্রাণের কথা কাউকে মুখ ফুটে বলবে না। তাই সংক্ষিপ্ত জবাব দিল— না, এই আর-কি। এই তো আসছি।

ভূষণ জানতে চাইল— তবে তুমি কি কাংড়ায় যাচ্ছ নাকি ?

ধনসিং এ প্রশ্নের আসল অর্থ বুঝেও এড়িয়ে যাবার জন্য বলল— দেখুন, এখনই কী করে বলব ?

—কাংড়ার চৌধুরীর ওখানে যেতে চাও তো ? ভূষণ প্রশ্ন করে উত্তরের অপেক্ষা না করেই বলল — মেয়েটি সেখানে নেই কিন্তু।

ধনসিং-এর মুখে নিরাশার ছাপ পড়ল। ভূষণ তা বুঝতে পেরে ওর কাঁধে হাত রেখে বলল— এসো, কিছু খাবে তো ? চা খেয়ে নাও, তার পরে না-হয় যাওয়া যাবে।

ছ'মাস জেলখানায় থাকতে কতবার ধনসিং-এর মিষ্টি ও ফল খেতে ইচ্ছে হয়েছে। এ-সব খেতে ওর যে খুব শখ হয়েছিল তা নয় ; খেতে চাইত কারণ এ-সব জিনিস চোখেও দেখতে পেত না। ও ভেবেছিল রেহাই পেলে এ সব কিছু প্রাণ ভরে খাবে। কিন্তু কমরেডের কাছ থেকে কিছু খাবার অনুরোধ শুনে ও ভেবে দেখল ওর কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না। ও শুধু শুনতে চায় সোমা কোথায় ? তার কী হয়েছে ?

দোকান থেকে বেরিয়ে এসে ভূষণ রহস্য-ভরা স্বরে আস্তে আস্তে বলল -- শোনো, মেয়েটি এই ধরমশালায় লালা জওয়ালাসহায় সরোলার কুটিরে খুব আরামে আছে। চলো, তোমার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিই। এখন তোমাকে খুব বুঝেশুনে চলতে হবে, বুঝলে ? যা হয়ে গেছে, তা নিয়ে আর ভেবে লাভ কী ?

ধনসিং সরোলা সাহেবের কুঠিতে গিয়ে সোমার সঙ্গে তিন-চার দিন দেখা করেছে। বারান্দায় ওদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয় ; সেখানে চাকর-বাকর ও অন্য লোককেও চলতে-ফিরতে দেখা যায়। ধনসিং ভাবে

সোমা কত পালটে গেছে ; সোমাও ভাবে ধনসিং-এর কত পরিবর্তন হয়েছে। ধনসিং যেন পাথরের মতো নির্জীব হয়ে যায়। মুখে কী যেন একটা চাপা রাগ ঠিকরে পড়ে। দেখে সোমার বুক কেঁপে ওঠে।

ধনসিং-এর মনে হল সোমার চেহারায় শহুরেপনার ছাপ পড়েছে। মুখে একটা বিষাদের ছায়া। কিন্তু রঙটা যেন আরো বেশি ফরসা, চোখ দুটো আরো অনেক গভীর।

ধনসিং-এর মনে যে প্রশ্নটা সবার আগে উঠে এসেছিল তা চাপা দিয়ে বলল কেমন আছ ? অনেক কষ্ট গেছে না ?

— জী, তুমি এসে গেছ তো এখন সব ঠিক হয়ে যাবে। জেলে সিপাইরা তোমাকে আর মারধোর করে নি তো ? সোমার চোখ ছল-ছলিয়ে উঠল।

—তোমাকে পুলিশরা নিশ্চয় খুব জ্বালিয়েছে, না ? ধনসিং গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করল।

সোমা মাথা নিচু করে নীরব রইল। ধনসিং একই প্রশ্ন বারবার করায় সোমার চোখে জলে ভরে উঠল যা ঘটে গেছে তার জন্য কেঁদেই বা কী হবে ? ওরা তোমার সঙ্গে কী না করেছে ! আমি তো কেঁদে কেঁদে মরে গেছি। ওরা বলত চিমটে লাল করে তোমার শরীরে ছ্যাঁকা মারবে। আমি কতবার হাত জোড় করেছি, ঐ রাক্ষসগুলোর পায়ে পড়ে বলেছি, আমাকে নিয়ে তোমরা যা-খুশি তাই করো কিন্তু তোমাকে যেন শাস্তি দিয়ো না। তা ও-সব ভেবে আর চোখের জল ফেলে কী লাভ ? তোমাকে কাছে পেয়েছি এখন মনে হচ্ছে যা পাবার আমি সব পেয়ে গেছি।

ঐ জায়গায় দাঁড়িয়ে আর বেশি কথা বলা সম্ভব ছিল না। ধনসিং-এর মাথায় রক্ত টগবগ করছিল কিন্তু ঠিক যে কী হয়েছিল তা ও বুঝে উঠতে পারছিল না। সোমার কথার ও অনেক রকম অর্থ করার চেষ্টা

করছিল। পুলিশরা একেও মারধোর করেছে নাকি? কিংবা··· ? বদমাশ পুলিশ আমাকে মারবে বলে সোমাকে ভয় দেখিয়েছিল কেন? সেই কথাই ভাবতে লাগল সে। সোমাকে ভয় দেখিয়ে ওকে বশে আনতে চেয়েছিল নাকি? লোকেরা ওকে নিয়ে যদি এই কাণ্ড করে থাকে তবে এই বউয়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক রেখেই-বা কী হবে? রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে ও এই-সব কথা ভাবে। বৈজনাথে গিয়ে থানেদার হরিরাম, করীম আর নফীসের গলা কেটে পাঞ্জাবে পালিয়ে যাবার কথা ভাবতে থাকে। ওর বেঁচে থাকার আর কোনো প্রয়োজন আছে বলে ওর মনে হয় না।

সোমা প্রায় চার মাস লালা জওয়ালাসহায় সরোলার কুঠিতে আছে। ধীরে ধীরে ওর কাহিনী লালাজীর কানে উঠেছে। তাঁর বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল যে, মেয়েটি খারাপ নয়; তবে দুর্ভাগী। কিন্তু ধনসিংকে তিনি ভালোমানুষ আর বিশ্বাসযোগ্য বলে মানতে রাজি ছিলেন না। এরকম একটি লোকের হাতে দশ-পনেরো হাজার টাকার গাড়ি আর নিজের প্রাণটা সঁপে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়, কিন্তু মুন্নো বলল— আমি যে কথা দিয়েছি, বাবা।

লালাজী ধনসিংকে পনেরো দিন বসিয়ে রেখে খামাখা টাকা গুনলেন। আরো পনেরো দিন তিনি ওকে দিয়ে এটা-সেটা কাজ করালেন। কিন্তু মনোরমা যখন একলা বা মায়ের সঙ্গে বাজারে যেত, ও ধনসিংকে ডেকে নিয়ে গাড়ি চালাতে বলত।

কয়েকদিনের মধ্যে ধনসিং ও সোমার দায়িত্ব মনোরমার ওপর এসে পড়ল। যুদ্ধের বিরোধিতা করার অপরাধের জন্য পুলিশ ভূষণ ও আরো কয়েকজন কমরেডকে গ্রেপ্তার করে লাহোরে নিয়ে গেছে। ভূষণ গ্রেপ্তার হয়েছে শুনে মনোরমার বুকটা ফেটে পড়ছিল, কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলার উপায় ছিল না।

সরোলা সাহেবের কুঠি উঁচু জায়গায়। ওখানে শুধু একটি গাড়ির গ্যারেজ। বাকি গাড়ি ও লরির জন্য যে গ্যারেজ, তা কুঠি থেকে এক ফার্লঙ নিচে, কোতোয়ালী বাজারের কাছে। সেখানে কয়েকটি ঘর-বাড়িতে চাকর-বাকর থাকে। মনোরমা একটি ঘর ধনসিং ও সোমাকে দেবার ব্যবস্থা করল।

ধরমশালায় আগস্টের বৃষ্টি লেগেই আছে। ধনসিং ও সোমার আবাসে ওদের মিলিত জীবন শুরু হল। আজকে প্রথম রাত। সোমা রান্না করছে। দু'জনে খেল। দুপুরবেলা থেকে সেই যে বৃষ্টি শুরু হয়েছে এখনো তার বিরাম নেই। বৈজনাথের থানায় পুলিশের দুর্ব্যবহারের সেই নিদারুণ কাহিনী ধনসিং আবার সোমার কাছ থেকে শুনতে চাইল। সোমা সংক্ষেপে উত্তর দিল — হায়, সবই তো বলেছি। একই কথা ভেবে আমাকে কেন কষ্ট দিচ্ছ?

ধনসিং-এর মেজাজ চড়ে গেল— তুমি চালাক হয়ে উঠেছ, না? কথা লুকোচ্ছ? কথা লুকোলে আমার মরা মুখ দেখবে।

সোমা কেঁপে উঠল। কাঁদতে কাঁদতে বলল— আমি তো বলেছি, ওরা যখন ধমকিয়ে আমাকে বলল, যদি কথা না শুনিস তবে চিমটে লাল করে তোমার শরীরে ছেঁকা দিয়ে দেব। আমি তখন বললাম, আমাকে তোমরা যা-খুশি তাই কর কিন্তু দোহাই ওর কিছু কোরো না। আমাকে ওরা ধরতে এল, আমি কাঁদতে লাগলাম। পিপাসায় গলা আমার কাঠ হয়ে গিয়েছিল। একটা লোক ঘটিতে করে জল নিয়ে এল। তেতো-তেতো, কেমন যেন মদের গন্ধ। বলতে লাগল, এখানকার পুকুরে পাতাগুলি পচে গেছে। জলও খেলাম আর মাথাটা ঘুরতে লাগল!··· জেগে উঠে কাঁদতে লাগলাম।

ধনসিং-এর মাথাটা কেমন যেন চক্কর দিয়ে উঠল। উঠে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে শ্বাস নিতে লাগল। বলল -- এইজন্যেই তুই লুকোতে

চেয়েছিলি ? তোর সঙ্গে আমার আর কোনো সম্পর্ক নেই। আমি ঐ দারোগার গলা নিয়ে তারপর জল খাব। নিজের ধর্ম গেল, ইজ্জত গেল, তো বাকি কী রইল।

ধনসিং যাবার জন্যে পা বাড়াল। সোমা ওর দু' পা জাপটে ধরল। ধনসিং ওকে ধমক দিল, গালিগালাজ করল। সোমা তবুও পা ছাড়ল না। ধনসিং ওকে মারল, খুব পিটল। সোমা শরীরের সব শক্তি দিয়ে ওর পা তবুও জাপটে রইল। বারবার বলতে লাগল— আমার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই তো আমাকে খতম করে যাও। যেতে চাও তো আমার গলা আগে কাটো। তার পর যাবে। ধনসিং বিষণ্ণ মনে দেয়ালে মাথা ঠুকতে লাগল। নিজেও অনেকক্ষণ কাঁদল।

ধনসিং দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসে ছিল। সোমা ওর দু'পায়ে দু'হাতের বেড় দিয়ে শক্ত করে ধরে আছে। ধনসিং পা ছাড়াতে ওকে বেশ কয়েক ঘা লাগাল। এত মার খেয়ে সোমার কাঁধ ও কোমর ব্যথা করছিল। কিন্তু ব্যথা-বেদনার কথা ও মোটেই ভাবছে না। এই সংঘর্ষে ধনসিং কেমন যেন শিথিল হয়ে পড়ল। দেয়ালে মাথা ঠেকিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল, ভাবল একে নিয়ে এখন আমি কী করি ? একে কার আশ্রয়ে ছেড়ে যাব ? দুনিয়া যেরকম নিষ্ঠুর, একে শুধু হয়রানি পোহাতে হবে· · লালাজীই বা কী বলবেন ? ভূষণজী কী বলবেন ?

ধনসিং সোমার হাত নিজের পা থেকে ছাড়িয়ে, আশ্বাস দিয়ে বলল —আচ্ছা, বলছি তো যাব না।

কাঁদতে কাঁদতে সোমার চোখ দুটো রক্তজবার মতো লাল হয়ে গেছে ; মুখ ফুলে গেছে। ক্লান্ত মুখে ধনসিং-এর দিকে তাকিয়ে সোমা জিজ্ঞেস করল— জী, আমার মাথার দিব্যি।

ধনসিং মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। সোমা আবার অধীর হয়ে বলল

—এখন আর আমাকে ছেড়ে যাবে তো আগে আমার গলা কাটবে তা যদি না কর তবে গলায় আমি দড়ির ফাঁস লাগাব।

*   *   *

বৃষ্টি পড়ছে তো পড়ছেই। লালাজী ক্বচিৎ-কখনো বাইরে যেতেন। লালাজীর মোটর গাড়িতেই ওর ডিউটি। জরুরি কোনো কাজ পড়লে যদিও-বা বাইরে যেতেন, বৃষ্টি পড়তে থাকলে রাতে আর সফর করতেন না, বাইরেই থেকে যেতেন। এরকম ব্যাপার হলে সোমা একা ঘরে অপেক্ষা করে করে অধীর হয়ে উঠত ; আশঙ্কায়, মনের নানা দুশ্চিন্তায় পায়চারি করতে থাকত।

ধনসিং লালা জওয়ালাসহায় সরোলার ওখানে বেশ ওস্তাদের মতো নিপুণ হাতে কাজ করছিল। এদিক-ওদিক কোথাও যেত না। নিজের ঘরে থাকার প্রচুর অবসর পেত। সোমার সঙ্গে খুব কম কথা বলত। কাজের কথা ছাড়া বলতই না ; তাও দু-একটা। সোমাকে কখনো স্পর্শ করত না ; সুখ-দুঃখের কোনো কথা তার সঙ্গে বলত না, যেন ওকে তিতিক্ষা শেখাবার ভার নিয়েছে। এই দুর্ব্যবহারের জন্য সোমা কোনো নালিশ করত না। কখনো ভাবত, এর স্বভাবই হয়তো এই ; কিন্তু পুরুষমানুষ কখনো তো হাসে। ঐ দিন অন্য রকম কথাবার্তা বলছিল। না, মনটায় দুঃখের বাসা বেঁধেছে। নিজেও ও চুপ থাকে, উদাস থাকে। এও কখনো ভাবে, শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে এসে আমার কী হল, আমি তো শুধু পরের বোঝা হয়ে রইলাম। এত ভালো লোক হয়েও বেচারীর জেল খাটতে হয়েছে। এ সব নানা ভাবনাচিন্তার ভিড় থেকে নিজেকে বাঁচাতে সারা দিন কিছু-না-কিছু কাজে লেগে থাকে সোমা। খালি

হাতে বসে থাকার অভ্যেসও নেই।

বৃষ্টি না থাকলে মনোরমার মা ওকে কুঠিতে ডেকে পাঠান, নানা কাজ করান। কখনো-বা পুরনো লেপের তুলো বা পশমের সুতো তিনি সোমার ঘরে পাঠিয়ে দেন। একটা চরখাও তিনি ওর ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ধরমশালায় বৃষ্টির চার মাসে অবিরাম ধারায় বৃষ্টি পড়ে। সোমা ঘরে বসে খটর খটর চর্খা কাটে। কিংবা পশমের সুতো দিয়ে পশম বোনে। কখনো-বা রান্নাবান্নার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সোমার জীবন এইভাবে ধীরে ধীরে আবর্তিত হয়।

লালাজী কয়েক দিনের জন্যে লাহোরে গেছেন। ধনসিংকে কোথাও আর গাড়ি নিয়ে যেতে হয় না। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। ও চারপায়াতে শুয়ে শুয়ে বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে আবোলতাবোল ভেবে চলেছে। সোমা খাটের মাথার দিকে বসে কী যেন একটা কাজে ব্যস্ত। ধনসিং তার মাথার কাছে ফুঁপিয়ে কান্নার আওয়াজ পেল। মুখ ঘুরিয়ে চেয়ে দেখল সোমা একটা হাত চারপায়ার ওপর রেখে অন্য হাতে আঁচল টেনে মুখ ঢেকে কাঁদছে।

ধনসিং জিজ্ঞেস করল-- কী হয়েছে?

—জী, তুমি বড়ো মনমরা থাক। আমার যা হবার তা তো হয়ে গেছে। তুমি বিয়ে করে পরিবার নিয়ে এসো। তোমার মন বসবে। তুমি সুখে থাকো। সবাইকে বলে বেড়াও, আমার জন্যেই তোমার এত দুঃখকষ্ট। সোমা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকল।

—আমি তোমাকে কিছু বলি?

—তুমি বড়ো ভালো লোক গো। ভগবান তোমার ভালো করুন। আগে তুমি কত ভালো ভালো কথা বলতে। আমার আগেও-বা কী ছিল? আমি না-হয় বেশ্যা, তুমি কেন অত মন খারাপ করে থাকো। সোমা কান্নার দমকে কেঁপে কেঁপে উঠল।

ধনসিং বলল, লোকেরা তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে, তোমার কী দোষ ?

এ কথাটা আগে কেন ভাবে নি ? ধনসিং যত ভাবল, তত যেন লজ্জিত হল। সোমার হাতটি টেনে নিয়ে সান্ত্বনার স্বরে বলল— পাগলী, কাঁদছিস কেন ! সোমাকে টেনে এনে খাটে বসিয়ে দিল।

সোমা আরো আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল।

ধনসিং সোমাকে আদর করে বিহ্বল স্বরে বলল— কাঁদিস তো আমার মাথা খাস। একটু থেমে আবার বলল— তুই ছাড়া এ দুনিয়াতে আমারই বা কে আছে ? ধনসিং ওকে আদরে আদরে ভরে দিল।

সোমা ঘাবড়ে গিয়ে বাধা দিল— এই, দরজা খোলা।

এক মাস ধরে যে ব্যবধান ওদের পিষে মারছিল সেদিন এক মুহূর্তে তা দূর হয়ে গেল।

ধনসিং সোমাকে নিজের খাটে বসিয়ে পরামর্শ দিল -- শোন তো, আর্য মতে বিয়ে করে নিই, কেমন। চৌধুরীজী ব্যবস্থা করে দেবেন।

সোমা লজ্জা পেয়ে বলল— আমি তো তোমারই ; বেশ্যাদের কি কখনো বিয়ে হয় নাকি ?

ধনসিং গভীর স্বরে আপত্তি জানাল— কী, বলিস কী ? আমি কি মরে গেছি ? আমি মরলে নিজেকে বেশ্যা বলিস।

সোমা উপরের দিকে তাকিয়ে ভগবানের স্মরণ নিল।

সেপ্টেম্বর মাস। ধরমশালার আকাশে এতদিন ঘন কালো মেঘের আবরণ ছিল ; এখন সেই মেঘ হালকা হয়ে হয়ে বাতাসে উড়ে যাচ্ছে। শরতের ঠাণ্ডা হাওয়া মেঘগুলোকে যেন ধরে রাখতে চাইছে ; তাই সে হাত বাড়িয়ে মেঘগুলোকে বরফাবৃত চূড়ায় ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছে। এতদিনে, ধরমশালা সূর্যের আলোয় আবার যেন ঝলমল করে উঠল। সোমার প্রাণেও সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়ে। মনোরমা বিবির কলেজ খুলে গেছে

তাই সে লাহোরে। যাবার আগে মনোরমা সোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল। ধনসিং মনোরমাকে মোটরগাড়িতে পাঠানকোটে নিয়ে গিয়েছিল। এই বিচ্ছেদ সোমার পক্ষে খুবই বেদনাদায়ক, যেন মাকে ছেড়ে যাবার দুঃখ চেপে আছে মনে।

সোমা ধরমশালায় আসার পরে কখনো দুপুরে, কখনো সন্ধ্যায়, আশপাশের বাড়িতে গান বাজতে শোনে। কখনো কুঠির ভেতরেও গান কানে আসে। সব সময় গান শুনে ওর খুব বিস্ময় জাগে। ও বুঝতে পারে গ্রামোফোনের গান। এই গানের সুললিত কণ্ঠস্বর সোমার খুবই ভালো লাগে কিন্তু গানের কলি বা তার অর্থ বোঝে না। হাতে একগাদা কাজ সত্ত্বেও সোমা এই-সব গানের অর্থ বুঝতে চেষ্টা করত। কখনো কখনো হয়তো মনোরমার কাছ থেকে শোনা বা গ্রামোফোন রেকর্ডের দু-একটি গানের সুর সোমা গুনগুন করে গায়। একদিন ও-বাড়ি থেকে পাঠানো সুতো তক্‌লিতে জুড়বার সময় আপন মনে গান গাইছিল। সোমা কারো পায়ের শব্দ পেয়ে মুখ ফিরিয়ে দেখল দুজন লোক ওর দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে গান শুনছে। সোমা লজ্জায় মরে গেল। ওর বাপের বাড়ি বা শ্বশুরবাড়িতে কোনো বউ খেতখামারের খোলা আকাশে গান গাইলেও কেউ খেয়াল করত না। কিন্তু সেদিন সোমা বুঝতে পারল যে, শহরে গরিব ঘরের ভদ্র বউরা কেন গলা ছেড়ে গান করে না।

সোমার কখনোই হাত খালি নেই ; দিনরাত কাজ করাই যেন তার স্বভাব দাঁড়িয়ে গেছে। বাপের বাড়ি বা শ্বশুরবাড়িতে ঘুটে দিত সোমা, ধান ভানত, মাথায় করে শস্য বয়ে নিয়ে যেত, জল ভরত, বাড়ির সমস্ত বাসনপত্র ধোয়ামাজা করত, কাপড় ধোওয়া আর গোরু-বাছুর-ভেড়া চরানো কিংবা খেতখামারের কাজ— সবই ওর হাতে। আর এখন নল খুললেই জল ; ধনসিং বাজার থেকে গম কিনে একেবারে পিষিয়ে আনে।

এখানকার খেত মানেই তো দরজার কাছের দু-একটি গাছগাছড়া। দুটি মানুষের রান্নাবান্না বা বাসনপত্র মাজতে কতটুকুই বা সময় লাগে। ও-বাড়িতে যা শিখেছে সে-সব বোনা বা সেলাই নিয়ে থাকে। আগে চার-পাঁচদিনের বাসি কাপড় পরে নির্বিবাদে কাটিয়ে দিত আর আজকাল সাহেব-বাড়ির অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে রোজই চার-পাঁচবার করে কাপড়-জামা কাচতে বসে। সাজতে-গুজতেও শিখেছে।

মন্নো বিবি ও অন্য বউদের দেখে ওদের মতো চুল বাঁধতে ইচ্ছে যায় কিন্তু ঠিক যেন সাহসে কুলিয়ে ওঠে না। কেমন যেন লজ্জাও করে; ভাবে, বড়োলোকের কায়দাকানুন নকল করা গরিবদের ঠিক শোভা পায় না। ধনসিং ওকে একটা বিলিতি সাবান এনে দিয়েছে। পাহাড়ের ঠাণ্ডা শুকনো হাওয়ায় গাল ফাটলে মুখে তখন তেল-জাতীয় কিছু না লাগালে পারা যায় না। শ্বশুরবাড়িতে শাশুড়ীর নজর এড়িয়ে ঘিয়ের হাঁড়ি থেকে আঙুলে ক'রে একটু ঘি তুলে নিয়ে মুখে মেখে নিত। ধনসিং ক্রিম ও পাউডার নিয়ে এসেছে। অন্য লোকের মতোই ধনসিং তার স্ত্রীকেও সাজাতে-গোজাতে চায়। এত আদরে-সোহাগে সোমা দিন দিন তন্বী ও সুকুমারী হয়ে উঠল; আর রীতিমতো লজ্জাবতী এক নারী। আশেপাশের পুরুষেরা ওর পাশ দিয়ে যাবার সময় ওর দিকে ফিরে ফিরে তাকায়; ওর আশঙ্কা হয়, কেমন যেন ভয় করতে থাকে। তাই সোমা বাড়ির দরজার দিকে একটা চিক টানিয়ে নিয়েছে। রোদ পোহাতে রাস্তার দিকে চারপাইটা খাড়া করে পথ-চলতি মানুষদের আড়াল করে বসে। ভদ্র ঘরের বউদের এটাই তো রেওয়াজ।

পাহাড় অঞ্চলে গ্রীষ্মের ছুটিতে লোকজনের আসা-যাওয়া শতগুণে বেড়ে যায়। ভাঙাচোরা ও ঘুমন্ত নির্জীব বস্তিগুলো নতুন প্রাণের

সাড়ায় কলকলিয়ে ওঠে। 1942 সালে যুদ্ধের সময়ে ঐ জেলায় বহু ক্যাম্প খোলা হয়েছিল। সবে যারা সেনাদলে নাম লিখিয়েছে বা যারা ছুটিতে আছে তারা খাকি উর্দি পরে রাস্তাঘাটে ঘুরেফিরে বেড়ায়। এদের জীবনে আশা যেমন নেই, তেমনি নেই দায়িত্ববোধ ; কারো প্রতি শ্রদ্ধা বা লজ্জাশরম বলে বস্তু নেউ। মৃত্যুকে পরোয়া করে লাভ নেই যখন, উচিত-অনুচিতের ধারই বা কে ধারে। এদের উচ্ছৃঙ্খলতার দাপটে ধরমশালায় ভদ্রঘরের মেয়ে-বউরা হাটবাজারে বেরুতে সাহস করত না। এরা অবশ্য মেম ও সাহেবদের ধারেকাছে ঘেঁষত না, ভয় পেত। গরম শুরু হতেই মনোরমা বিবি লাহোর থেকে ফিরে এসেছে। ওর সঙ্গে ওর ছোটো বউদি, তার দুটি বাচ্চা আর ব্যারিস্টার সরোলা। ও-বাড়ির কাজও বেড়ে গেছে। ধনসিংকে সারাদিন বাইরে বাইরে থাকতে হয়, কখনো বা রাতে।

একদিন সন্ধ্যাবেলা সোমা ধনসিংকে বলল— কী রকম সব লোক এসেছে দেখ। রাতে দরজায় কারা যেন কড়া নাড়ে ; যা-তা কথা বলে ! আমার খুব ভয় করে। তুমি রাতে বাইরে যেয়ো না।

ধনসিং খুবই চিন্তায় পড়ল। উদাস স্বরে বলল— অন্যের গোলামি করলে ইচ্ছে অনিচ্ছে বলে কি কিছু আর থাকে ? আমি যদি সন্ধ্যাবেলা না ফিরি তবে তুই ঘরে তালা দিয়ে রাতে ও-বাড়িতে চলে যাস। দিনের বেলায়ও বাইরে বসবি না। নিজের ইজ্জত নিজের হাতে। হাজারে হাজারে এই সৈন্যরা এসেছে ; ট্রাকের ড্রাইভাররাও। এরা তো সব জানোয়ার। কাদের সঙ্গেই বা তুই লড়বি ?

বছর ঘুরে আবার এল বৃষ্টির দিন। ধনসিং সকাল নটার সময়ে এসে বলল— আমি লালাজীকে নিয়ে লাহোরে যাচ্ছি। রাতে হয়তো ফিরতে পারব না। তোমাকে ওখানে পৌঁছে দেব ?

সোমা বলল— এখন চলে গেলে ঘরের সব কাজ পড়ে থাকবে যে।

রাতেও ওখানে থাকতে হবে। কতদিন বাদে আজ একটু রোদ উঠেছে ; কয়েকটা কাপড়চোপড় বরং ধুয়ে নি। দুপুরের পরে না-হয় নিজেই চলে যাব।

ঘরের কাজ ফেলে রেখে ও-বাড়ির কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়া সোমার মনঃপূত নয়। ও-বাড়ির কাজও যেন আজকাল শেষ হয় না। মন্নো বিবি ও লালাজীকে বাদ দিলে ও-বাড়ির এমন একজন নেই যার কাজ সোমাকে করতে হয় না। লজ্জার চোটে সোমা কাউকে মুখ ফুটে কিছু বলতেও পারে না ; কিন্তু ওর যে আর হাত-পা চলে না। এই নিয়ে চার মাস চলেছে। মাজী ঘর-সংসারের দেওয়া-থোয়ার কাজ ঠিকমতো হয় বলে সোমার উপরে আজকাল অনেক বেশি নির্ভর করেন।

মনোরমার ছোটো বউদি অর্থাৎ ব্যারিস্টার জগদীশসহায় সরোলার স্ত্রী, সাহেবের স্বভাবের যেন অন্য এক রূপ। মোটাসোটা মেদবহুল শরীর মন্দগতিতে সে চলে। তার দুটি বাচ্চা— তারা আর ভূপী — সোমা ছাড়া তাদের সামলাতে পারে এমন লোক এ বাড়িতে নেই। বাচ্চাদের জন্য এটা চাই সেটা চাই ; হাতে তাই কিছু-না-কিছু বোনার কাজ থাকেই। এ ছাড়া আছে বাচ্চাদের খাওয়ানো-দাওয়ানো, জামাকাপড় পরানো, বদলে দেওয়া— কাজের কি অন্ত আছে নাকি ? আগে এ-সব কাজ খুশি হয়ে করত ; তখন ছিল মনের একটা দুঃসহ জ্বালা, ভালোবাসার গভীর আবেগ ; মনকে ভুলিয়ে রাখতে এ-সব নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে চাইত। কিন্তু এখনো সে-সব ঝামেলা সামলাতেই নিজের ঘরে ফিরতে কত যে দেরি হয়ে যায়। শুধু কি এই ? ব্যারিস্টার সাহেব যখন-তখন রাগে ফেটে পড়েন, তাঁকে সামলাবার দায়িত্ব সোমার। সাবিত্রী বউদি এ কাজটার দায়িত্ব ওর ঘাড়ে সঁপে দিয়েছে, যেন সোমার নিজের ঘর বলতে কিছু নেই, তার নিজের ঘরের জন্য এক ফোঁটা চিন্তা যেন ওর থাকতে নেই।

ব্যারিস্টার সাহেব একটু যেন তিরিক্ষি মেজাজের মানুষ। ঝকঝকে-তকতকে থাকা ছাড়াও কতকগুলি এমন কায়দা-কানুন তিনি বিলেত থাকতে রপ্ত করেছেন যে তার ঠেলা সামলানো খুব সহজ ব্যাপার নয়; আবার এ-সবের সঙ্গে টেক্কা দেবার হিম্মত বা ক্ষমতা কোনোটাই সাবিত্রী বউদির নেই। তার এ-সব শেখাও হয়ে ওঠে নি। সাহেবের খাস বেয়ারা উধমসিং ছুটিতে গেছে; তাই তাঁর চায়ের বন্দোবস্ত বা কাপড়-জামা ঠিকঠাক করে রাখার কাজে কিছু-না-কিছু খুঁত থেকেই যায় আর তিনি মেজাজ ঠিক রাখতে পারেন না। বাড়ির অশিক্ষিত চাকরবাকর-দের তিনি কথায় কথায় বকাঝকা করেন। সোমার সুবিধে ছিল: সে তো ওঁর চাকরানী নয়, উপরন্তু সে একজন মহিলা। ওর মুখ লজ্জায় আরক্তিম হয়ে ওঠে; সংকুচিত হয়ে ও চোখ নামিয়ে কথা বলে: সব-কিছু মিলিয়ে সোমার সৌম্য রূপ সাহেবের খুব পছন্দ। সোমা যখন বোকার মতো ভুল করে বসে তখন সাহেবও একটু মুচকি হেসে তা বেমালুম বরদাস্ত করেন।

ব্যারিস্টার সাহেবকে বশে আনার এ এক দুর্লভ উপায় যেন খুঁজে পেয়েছেন সাবিত্রী বউ ও মা। ওঁরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ভাবলেন, যতদিন ঐ অপয়া উধমসিং-টা ছুটিতে আছে, ততদিন এটাই চলুক। দুপুরের পরে যদি সোমা এ-বাড়িতে থেকে যায়, ধনসিং কাজে বেরিয়ে গেলে রাতে যদি এ-বাসায় থাকতে হয় তা হলে ব্যারিস্টার সাহেবের বিকেলের চা আর সকালের বেড-টি সোমাই দিয়ে আসে।

ধনসিং লালাজীকে নিয়ে লাহোর যাচ্ছিল: কিন্তু পাঠানকোট গিয়ে জানতে পারা গেল যে, পি. ডব্লিউ. ডি র চীফ ইঞ্জিনিয়ার সাহেব ওখানেই এসেছেন। সেখানেই লালাজীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে গেল তাই আর লাহোর পর্যন্ত গেলেন না। লালাজী ধনসিংকে ধরমশালায় ফিরে যেতে বললেন।

ধনসিং গাড়ি নিয়ে যখন ধরমশালায় এ-বাড়িতে পৌঁছল, তখন রাত সাড়ে আটটা বেজে গেছে। বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। বড়ো বাড়ির গ্যারেজে অন্য গাড়ি বন্ধ। লালাজীর গাড়িটা নিচের গ্যারেজে রাখতে হবে। বদলু চাকরটাকে ডেকে ধনসিং ভিতরে খবর পাঠালো। সোমা তখন কাজে ব্যস্ত।

প্রচণ্ড খিদেয় ধনসিং-এর পেট জ্বলছে। ও ভাবল, সোমা কখন-বা ঘরে ফিরবে আর কখনই-বা রান্না করবে। তার চেয়ে বরং বাজারে গিয়ে কিছু খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়লে হয়। বাড়ির চৌকিদারকে দিয়ে ধনসিং বলে পাঠালে, রাত হয়ে গেছে, এখন সে যেন এ-বাড়িতেই থেকে যায়। সকালে এসে ওকে নিয়ে যাবে। ধনসিং গাড়ি নিয়ে বাজারে গেল। বাজারে রামজীর দোকানে খাওয়া-দাওয়া সারল। এখানে অন্য ড্রাইভার-রাও খানা খায়। খেয়েদেয়ে গাড়ি গ্যারেজে রেখে নিজের ঘরে একটা চারপাইয়ে শুয়ে পড়ল।

ক্লান্তিতে ধনসিং-এর তন্দ্রা এসেছিল। দরজায় কার যেন পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে ভাবল, হাওয়া লেগে নিশ্চয় দরজায় শব্দ হচ্ছে; তাই ধনসিং গা করল না। কিন্তু এবার সিটি বাজাবার শব্দ পেল। ফিসফিস কথাবার্তাও শোনা যাচ্ছে। ধনসিং-এর হঠাৎ খেয়াল হল, রাতে এই বদমাশরা নিশ্চয় দরজায় কড়া নাড়ে, সে-রকম কী-যেন একটা কথা সোমা প্রায়ই তো বলছে। ও ভাবল, আজকে শালাদের শিক্ষা দেব।

আবার সিটি আর পায়ের শব্দ। ধনসিং নিঃশব্দে উঠে দরজায় কান পেতে রইল। বাইরে কে যেন বলছে— আরে বিবিজান্ দরজা খুলে দে। গরিবদের সঙ্গেও দু-চারটে কথা বলে ফেল্। বড়ো বড়ো লোকেদের তুই হাতে করেছিস, তাতেই বা কী! আমরাও তোর ইয়ে মানে প্রেমিক। আমাদের টাকা কি অচল হয়ে গেল নাকি, অ্যাঁ। আমাদের

নোটে কি কাঁটা লেগে আছে ? নে, ধর দশ টাকা।

দরজার ফাঁক দিয়ে একটা কাগজ ভিতরে এসে পড়ল।

ধনসিং বুঝল এই বদমাশরা ভেবেছে ও যখন বাড়িতে নেই, সেই সুযোগে ওর ঘরওয়ালীকে একটু হয়রানি করা যাক। গলার আওয়াজটা যেন চিনতেও পারছে, 'ধৌলি-ধার' কোম্পানির ড্রাইভার শ্যামসুল ও জগ্‌গী। ধনসিং-এর মাথায় রক্ত চড়ে গেল। মনে মনে বলল— জব্বর সময়ে এসেছ বাছাধন। আজ বহীন··· তোমাদের দেখাচ্ছি।

বাইরে থেকে সিটি বেজে চলেছে আর একটা বিশ্রী রকমের ইঙ্গিত। মদের একটা তীব্র গন্ধ দরজার ফাঁক দিয়ে ভেতরে ঢুকছে। ঘরের কোণ থেকে লোহার মোটা ডাণ্ডাটা হাতে নিয়ে ধনসিং এক ঝটকায় দরজার শিকল খুলল। বদমাশগুলো সামলিয়ে নেবার আগেই দুই হাতে ডাণ্ডা উঁচিয়ে দুটো মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

একটা অস্ফুট শব্দ বেরুল— 'হায়'। একটা লোক চক্কর খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল ; অন্য জন ছুটে পালাতে গিয়ে পা টলতে টলতে পড়ে গেল। বহীন··· দরজার সামনেই পড়ে গেছে। এটা নিশ্চয় খারাপ ব্যাপার হল।

ধনসিং তখনো হাঁপাচ্ছে ; হাঁপাতে হাঁপাতে চারপায়ায় একটু বসল। এক মুহূর্ত পরেই খেয়াল হল, বেশি চোট লাগে নি তো ! বহীন··· দরজার সামনে এখনো পড়ে আছে। এটা কিন্তু খুব খারাপ ব্যাপার হল।

নিঝুম রাতে ঠাণ্ডা হাওয়া সোঁ সোঁ করে বইছে। আশেপাশের কুকুরগুলি ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠছে। আকাশটার বুকে মেঘের অভিসার ; চাঁদ এখনো ওঠে নি। বাজারের দিকে রাস্তায় বিজলী ; রাস্তার আলোয় গাঢ় অন্ধকারের কালো মুখ অতটা যেন ভয়ার্ত নয়। চোখের সামনে ম্রিয়মাণ লোকগুলোর কাছে এগিয়ে এসে ধনসিং দেখল,

মাথার থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত পড়ছে ; রক্ত পড়ে পড়ে আশেপাশের মাটিটায় কেমন যেন কালো কালো দাগ পড়েছে। ঝুঁকে দেখল, জগ্‌গীই বটে। শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে এল যে। ধনসিং এবার ঘাবড়ে গেল। অন্য লোকটার সামনের মাটিতেও ঘন রক্তে কালো দাগ।

ধনসিং-এর ক্রোধের তুফান এক মুহূর্তে উবে গেল। এবার ক্রোধের পরিবর্তে অতিকায় একটা ভয় যেন ওকে গ্রাস করে ফেলতে চাইছে। ও ভাবল, এখন কী হবে, এখন? এদের মেরে ফেলতে চায় নি ধনসিং। — মরে গেছি রে! ছুটোর দেখছি একই অবস্থা। এবার গ্রেপ্তার, জেল ও ফাঁসি। ধনসিং-এর সারা শরীর কেঁপে উঠল। মনটাকে শান্ত করে ভাবতে চাইল, লাশ দুটো উঠিয়ে দূরের গর্তে ফেলে আসবে নাকি? কিন্তু রাস্তার দুধারে বস্তি ; রক্তে-ভরা জমিটাকে লুকোবে কী করে? এদের কবর দিয়ে দিলে কেমন হয়? কেউ আসতে-যেতে যদি দেখে নেয়, তবে? লাশ পড়ে থাকলে জোরদার খানা-তল্লাশি চলবে।

পালিয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। ভয়ে থরথর করে কাঁপছে ধনসিং। লাঠি-ছুরির ভয়ে নয়, সরকার ও পুলিশের ভয়ে। পুলিশের হাত থেকে বাঁচার আর কোনো উপায় নেই।··· সোমাকে কি খবর দিয়ে যাবে?··· খুব ঘাবড়ে যাবে যে! ও-বাড়িতে তা হলে হৈ-চৈ পড়ে যাবে।··· বেঁচেবর্তে থাকলে তবে তো আশ আর শ্বাস! আপাতত কোনোরকমে পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে হবে। ধনসিং ঘরের ভিতর ঢুকে লোহার ডাণ্ডাটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

ধনসিং রাস্তায় মুখ বাঁচিয়ে চলতে লাগল ; পাকদণ্ডী থেকে নেমে কাংড়ার পথে অদৃশ্য হল।

*　　*　　*

সোমা যখন বদলুকে দিয়ে হেঁসেল সাফ করাচ্ছে তখন শুনল লালাজী ফিরে এসেছেন। ধনসিং নিশ্চয় বাইরে ওর জন্য অপেক্ষা করছে। আরো তাড়াতাড়ি কাজ সারতে চাইল ; কিন্তু ও যেন আর পেরে ওঠে না। কাজ করতে হলেই তো এদের মাথায় বাজ পড়ে আর তাই নিশ্চয় বিবি ও বউদি ওকে ডেকে বলল— লক্ষ্মী বোনটি সোমা— লালাজী ফিরেছেন। ঘরে তরিতরকারি তো আছেই, কোনো ভাবনা নেই। কয়েকটি লুচি করে দাও তো, সোনা। লুচি হতে হতে বদলু লালাজীর জন্য না-হয় গরম জল রেখে আসবে।

সোমা লালাজীর জন্য লুচি তৈরি করে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে শুনল, ধনসিং ওকে ভোরে নিয়ে যাবে বলে গেছে। সোমার খুব খারাপ লাগল— ভাবল, সকালে পেটে খিদে নিয়ে গেছে আর যদি-বা এল, না খেয়েদেয়ে চলে গেল, এখন গিয়ে বাজারের খাবার খাবে। সত্যি বড়োলোকেরা অন্যের সুবিধে-অসুবিধে কিছুতেই বুঝতে চায় না। সোমা একবার ভাবল, বুড়ো মালিকে সঙ্গে নিয়ে চলে যায়। কিন্তু সংকোচে যেতে পারল না। মাজী ও বউদি হয়তো ভাববে সোমা আজকাল বড়ো বেশি অধৈর্য হয়ে পড়ে। নিজের বাড়ির গুরুজনদের মতোই সোমা এদের সমীহ করে, লজ্জা পায়।

সোমা যদি রাতে এ-বাড়িতে থেকে যায় তবে তার তো সেই এক কাজ : ব্যারিস্টার সাহেব ও মন্নো বিবিকে 'বেড-টি' দিয়ে আসা। দু'জনেই ভোর ছ'টার সময় ওঠে। ধনসিংও ভোর ছ'টা বা সাড়ে ছ'টার সময় এসে যায়। ওরাও এত সকাল সকাল উঠে পড়ে বলে সোমার কোনো অসুবিধা হয় না। আপত্তিও করে না।

মনোরমা ও ব্যারিস্টার সাহেব বলে দিয়েছেন সোমা চায়ের ট্রে খাটের কাছে রেখে ওদের যেন জাগিয়ে দেয়। মনোরমাকে না ডাকলেও চলে, হাত দিয়ে ঠেলে ঘুম থেকে তুলে দেয়। কিন্তু ব্যারিস্টার সাহেবের ঘরে যেতেই ওর সংকোচ, ডাকবে কী করে? চা তৈরি করে চামচটা নেড়ে নেড়ে একটা শব্দ তুলে সাহেবকে ও ডাকে, ঘুম ভাঙায়। সাহেব চোখ মেলে চাইতেই ঘর থেকে পালিয়ে যায়। ব্যারিস্টার সাহেব চোখ খুলে ভালোমানুষি ও সংকোচের এই সরল মুখখানা দেখে খুশিতে ভরে ওঠেন। কখনো বলে ওঠেন, 'লাভলী'। সেদিন সোমাকে পালিয়ে যেতে দেখে ব্যারিস্টার সাহেব বললেন— মিসেস সিং, এক কাপ চা বানিয়ে দাও-না। বলে তিনি একটা সিগারেট ধরালেন।

মিসেস সিং ডাকলে সোমার ভারি লজ্জা করে। মনোরমাও তাকে কখনো-সখনো মিসেস সিং বলে ডাকে : সেটা অবশ্য অন্য কথা। সোমা ঝুঁকে পড়ে চা বানাতে লাগল। ব্যারিস্টার সাহেবকে খুশি রাখা এ-বাড়িতে খুব একটা বড়ো কেরামতি বলে গণ্য। এ সাফল্যে সোমা অনেক সময় গর্বিত। রুদ্ধশ্বাসে সোমা এক কাপ চা তৈরি করে একেবারে বারান্দায় এসে দম নিল।

সোমা নিচে এসে বাজার থেকে পাকদণ্ডী ও যে-বড়ো রাস্তাটা ওদের বাড়ির দিকে চলে গেছে সেই রাস্তাটায় তাকিয়ে দেখল, ধনসিং আসছে কিনা। ভাবল, বউদি ও বাচ্চারা উঠবার আগে চলে যেতে পারলে ও যেন বেঁচে যায় ; এর পরে কোনো-না-কোনো কাজ ওর ঘাড়ে এসে পড়বে। কিন্তু ধনসিংকে দেখতে পাওয়া গেল না। এখনো ভোরের আমেজ রয়েছে ; সূর্য সবে পূর্ব দিকে রঙ ছড়িয়েছে।

সোমা ভাবল, ধনসিং তাড়াতাড়ি এলে খুব ভালো হত। খালি হাতে কী করে? ও মনোরমার ঘরে গিয়ে বিছানাটা ঠিক-ঠাক করে রাখল। সূর্যের প্রখরতা বাড়ল কিন্তু ধনসিং এল না। বারান্দায় দাঁড়িয়ে

রাস্তা ও পাকদণ্ডীর দিকে তাকিয়ে থাকাটা ভালো দেখায় না, কেউ দেখলে কী ভাববে? অস্বস্তিতে সোমা ভেতর-বার করতে থাকল।

বাহারী সূর্যের রঙ এসে পড়েছে। সারা রাত আকাশটা ঝকঝকে ছিল। গাছপালার শীর্ষে ঘন শিশিরের আস্তরণ। বাড়ির ছাদ থেকে শিশির গলে গলে টপটপ করে পড়ছে। বর্ষাস্নাত ঘন সবুজ পৃথিবীতে হরিদ্রাভ সূর্য যেন ঝলমল করে উঠছে। ছোটো ছোটো কালো কালো মেঘের টুকরো বর্ষণের কাজ ফেলে রেখে উঁচুতে উড়ে উড়ে পাহাড়ের গায়ে ঢলে পড়ছে; ঘুরে ঘুরে খেলায় মত্ত হয়ে উঠেছে যেন।

নিম্ন শ্রেণীর বউদের মাটির ঘড়া নিয়ে সামনের নল বা পুকুরের দিকে যেতে-আসতে দেখা যাচ্ছে। ভদ্রঘরের বউয়েরা বর্ষাকালে এমন চমৎকার রোদ দেখে ঘরে-সেলাই-করা জিনিসপত্র ছাদে শুকোতে দেবার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। এ-বাড়ির বউয়েরা মোলায়েম খাটে শুয়ে শুয়ে হাই তুলছে আর চাকরবাকরদের হাঁকডাক দিচ্ছে। মনটা ভীষণ ছটফট করছে সোমার। ও এল, ঘর সামলাবার নানা কাজ সারল কিন্তু তবুও ধনসিং এল না।

বাচ্চারাও এবার উঠল; ভূপী তার চাবি-ওয়ালা মোটরটাকে সযত্নে বালিশের তলায় রেখে পরম নিশ্চিন্তে ঘুম দিয়েছিল। এখন মোটরটা নিয়ে সোমার হাঁটুর ফাঁকে মুখ লুকিয়ে আবদার ধরল— মাছি (মাসি·) এতাকে তালিয়ে দাও না।

সোমা ওকে কোলে তুলে নিয়ে রাস্তা ও পাকদণ্ডীর দিকে তাকিয়ে থাকল। ধনসিং আসছে না দেখে আশঙ্কায় মনটা ভরে উঠছে। চিন্তা তাড়াতে ভূপীর মুখ-হাত ধুয়ে দিতে গেল।

আটটা বেজে গেছে। তবুও ধনসিং-এর পাত্তা নেই। বউদি সোমাকে ডেকে বলল— ভূপীকে একটু দুধ খাইয়ে দে-না। ও যে আর কারুর কথাই শোনে না।

একবার সোমার মনে হল, সকাল সকাল ও ডিউটিতে চলে গেল না তো? ঐশ্বর্যের এই দাপটের উপর ওর ভয়ানক রাগ হতে থাকল। ভুপীকে দুধ খাওয়ানো সোজা ব্যাপার নয়। এক চুমুক দুধ খেয়ে সে সারা বাড়ি টহল দিয়ে বেড়ায়। আর-এক চুমুক খেয়ে মোটরগাড়িটায় চাবি দিয়ে চালিয়ে দেখে ঠিক চলছে কিনা। নটা বেজে গেল। সোমার মনটা এবার অধীর হয়ে উঠল। ও বদলু ও মালিকে ডেকে জিজ্ঞেস করল— সকালে ডিউটিতে যাবার কথা রাতে কিছু বলেছিল নাকি? ভাবছিল, একা চলে গিয়ে নিজের ঘরের ঝাড়পোছটা সেরে নেবে কিনা। মনটা বিষণ্ণ থাকায় মা-বউদির কাছে গিয়ে কথাটা পাড়তে পারল না। যাবার সময় দীপার ফ্রক পালটে ওর চুল আঁচড়ে মাথায় ফিতে বাঁধছিল, এমন সময় বদলু ছুটে এসে বলল— ধনসিং-এর বহু, বাইরে পুলিশ এসেছে। সঙ্গে দারোগা। তোকে ডাকছে।

বিস্ময়ে বিমূঢ় সোমা হাঁ করে ওর দিকে চেয়ে রইল। —কী হয়েছে? কথাটাও মুখ দিয়ে বেরুল না। দীপার মাথার ফিতে হাত থেকে পড়ে গেল। মুখে বিহ্বলতার কতকগুলি রেখা ফুটে উঠল।

পুলিশ বাড়িতে এসে সোমার খোঁজ করছে : সারা বাড়িটায় হৈ-চৈ পড়ে গেল। বউদি ঘাবড়ে গিয়ে সোমাকেই জিজ্ঞেস করলেন— কী হয়েছে? ধনসিং কোথায়? সকালে কি আসে নি? কোথাও গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লেগেছে নাকি? কেউ চোট খেলো নাকি? কী হল, হায় এ কী হল। পুলিশরাই-বা কী বলছে?

মাজী দুধ থেকে মাখন তুলছিলেন। হৈ-চৈ শুনে উঠে এলেন। জানতে চাইলেন কী হয়েছে। সব শুনে মন্তব্য করলেন— আরে, ও তো খুব সাংঘাতিক লোক। আমি প্রথম থেকে খুব ভয়ে ভয়ে ছিলাম। সেই জেল-টেলের ব্যাপার নয় তো? গিয়ে লালাজীকে খবর দাও, আর নয়তো জগদীশকে বলো।

মনোরমা সোমার কাঁধে হাত রেখে সহানুভূতির সুরে বলল— কী ব্যাপার হয়েছে, সোমা ?

সোমা কাঁদতে কাঁদতে বলল— আপনি তো জানেন, কাল বিকেল থেকে আমি এখানে। রাতে কখন এসেছিল আর কী বলে গেছে তাও ঠিক জানি না। সকাল থেকে তার পথের দিকে চেয়ে আছি।

মনোরমা চিন্তিত হয়ে বলল -- তুমি এখানে বসে থাকো, আমি দাদাকে ডাকছি।

ব্যারিস্টার সাহেব এসে সোমাকে পরামর্শ দিলেন— মিসেস সিং, আগে আমি পুলিশের সঙ্গে কথা বলে নিই, তারপর না-হয় তুমি বয়ান দিয়ো। খবরদার পুলিশের কাছে যেয়ো না। একবার ওদের ফাঁদে পড়লে আর বেরতে পারবে না।

সোমা দুই হাঁটুর মাঝখানে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে থাকল। পুলিশের জালে পড়ার চেয়ে নিজের জীবন দেওয়াও অনেক বেশি শ্রেয় মনে করে সোমা।

ব্যারিস্টার সরোলা দারোগার সঙ্গে কথা বলে জানলেন যে, ধনসিং-এর ঘরের কাছে একটা লাশ পড়ে আছে। অন্য জন গুরুতর আঘাত পেয়েছে, তারও অবস্থা সঙ্কটজনক। মাথাটা দু'জনেরই ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। ধনসিং-এর ঘরের দরজা খোলা ছিল। তাকেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। দারোগা এজাহারের জন্য সোমাকে থানায় নিয়ে যেতে চায়।

ব্যারিস্টার সরোলা যুক্তি দেখিয়ে দারোগাকে বললেন— মিসেস সিং কাল বিকেল থেকেই এ-বাড়িতে। রাতে ধনসিং লালাজীকে নিয়ে এসেছিল কিন্তু তক্ষুণি তাড়াহুড়ো করে চলে যায়। ওর সঙ্গে ওর স্ত্রীর দেখাই হয় নি। এদের ধনসিংই খতম করেছে তারই-বা প্রমাণ কী ? এমন তো হতে পারে যে, যারা হামলা করতে এসেছিল তাদের মধ্যে

হু'জনে চোট খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ; আর বাকিরা ধনসিংকে মেরে ফেলে ওর লাশ গুম করে দিয়েছে। মিসেস সিং এ-ব্যাপারে বলবেই-বা কী ? ব্যারিস্টার আরো বললেন— আমিও ব্যারিস্টার। আপনি আইনের পথে এজেহার নিন। আইন রক্ষা করা আমাদেরও কাজ। আপনি মিসেস ধনসিং-কে হাজতে নিয়ে যেতে পারেন না। বড়ো জোর ওর এজাহার নিতে পারেন। উনি ভদ্রঘরের বউ। মিঃ সিং আমাদের গ্যারেজের ম্যানেজার। যদি আপনার কোনোরকম আশঙ্কা হয় যে, মিসেস সিং ফেরারী হয়ে যাবে তবে আমি ওকে নিয়ে আপনার সঙ্গে গাড়ি করে ডিস্ট্রিক্ট কমিশনারের বাংলোতে যেতে রাজি। তাঁর কথায় আমি জামানত দিতেও প্রস্তুত। আপনি কি জামানত চান ? মিসেস ধনসিংকে আপনি যা যা জিজ্ঞেস করতে চান, আমার সামনে জিজ্ঞেস করতে পারেন। ওর হাজিরা দেওয়া যদি একান্ত জরুরি হয়ে পড়ে তবে যে-আদালত বা ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে যেতে হবে আমি ওকে নিয়ে যাব।—

ব্যারিস্টার সরোলার নির্দেশে মনোরমা ভিতরে গিয়ে সোমার হাত-মুখ ধুয়ে দিল। ওকে নিজের কাপড় ভালো করে পরিয়ে দারোগার সামনে হাজির করল। সোমাকে দেখে ব্যারিস্টার সাহেব একজন ভদ্রমহিলার প্রতি সম্মানে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তাই দারোগা-কেও উঠে দাঁড়াতে হল। বয়ান নিতে সোমাকে একটি চেয়ারে সসম্মানে বসানো হল। ওর একদিকে মনোরমা, অন্য দিকে বসলেন ব্যারিস্টার সাহেব নিজে।

দারোগা সোমাকে বেশ সমীহ করে মিসেস সিং বলে সম্বোধন করল। ঝুট-ঝামেলা হতে পারে দারোগা এমন কোনো প্রশ্নের মধ্যেই গেল না। উপরন্তু সোমার দুঃখে সহানুভূতি জানিয়ে ধনসিং-কে খুঁজে বার করতে পুরোপুরি সহায়তা করবে বলে দারোগা আশ্বাস দিল।

সোমার শুধু এটুকুই বক্তব্য ছিল যে, ধনসিংকে যখন রাতে বাইরে থাকতে হত তখন ঘরে ওর একা থাকতে ভয় করত। ধনসিং না থাকলে সবসময় ও রাতে এ-বাড়িতে চলে আসে। সবাই একবাক্যে স্বীকার করল এরকম অবস্থা শুধু একদিনই হয় নি, প্রায়ই হয়েছে। গতকাল সূর্যাস্তের আগে সোমা এ-বাড়িতে চলে আসে। ধনসিং-এর খবর সে পুলিশের কাছ থেকেই শুনতে পেয়েছে।

সোমা ব্যারিস্টার ও মনোরমার সহায়তায় কোনোমতে পুলিশের সামনে বয়ান দিয়ে দিল কিন্তু ওর ঠিক যেন হুঁশ ছিল না। ওর পেটে ভীষণ ব্যথা উঠেছে। বুঝতে পারল কিসের ব্যথা কিন্তু মুখ ফুটে বলে কী করে; মাজী ও বউদিকে ভয় পায়, ওদের কাছে কিছু বলতে সংকোচ আর লজ্জা; আর মনোরমা তো কুমারী মেয়ে। গত বছর মনোরমা ওকে যে ঘরটা ছেড়ে দিয়েছিল এখন সেই ঘরে দুটি বাচ্চা শোয়। ব্যথার চোটে মুখ দিয়ে একটা আর্তনাদ বেরিয়ে আসছে। দোপাট্টার আঁচলটা মুখে শক্ত করে চেপে ধরে কখনো চেয়ারের এদিকে কখনো ওদিকে পিঠ দিয়ে ছটফট করছিল। মনোরমা ওকে ধরে ধরে নিজের ঘরে নিয়ে এল। কিছু বলার যেন শক্তি নেই। মনোরমা মাকে ও বউদিকে ডেকে নিয়ে এল।

মা ও বউদি নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কী যেন বলাবলি করতে লাগল। মনোরমাকে ডেকে বলল— মন্নো, তুই ও-ঘরে যা, নয়তো অন্য ঘরে একে নিয়ে যেতে হবে।

— সোমা এখানেই থাকুক। বলে মনোরমা বাইরে বেরিয়ে এল।

ব্যারিস্টার জগদীশ ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরে মুন্সীজীকে ডেকে বললেন— যাও, শীগ্‌গিরি গাড়ি করে একজন লেডি ডাক্তার ডেকে নিয়ে এসো।

তখন সন্ধ্যা হয় হয়, সোমার চার মাসের গর্ভ নষ্ট হয়ে গেল। ও মুখ

ঢেকে শরীর ও মনের কষ্টে শুধু কাঁদছিল। মনোরমা বারবার ঘরে এসে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছিল। মনোরমাকে এতবার আসতে দেখে বউদি নীচু গলায় ধমক দিল — কীরকম মেয়ে রে বাবাঃ। বারবার বলছি এখানে তুই আসিস না। এ-সব তুই বুঝবি না।

মনোরমা বাড়ির অন্য দিকে চলে গেল। বারান্দায় একটা ক্যাম্বিশের চেয়ারে চুপচাপ বসে রইল। হাত ছুটো মাথার পিছনে রেখে উদাসভাবে তাকিয়ে রইল। মেঘমুক্ত পরিষ্কার আকাশ। মনোরমার অপলক দৃষ্টি দূরের ঐ পাহাড়ের চূড়ায়, যেখানে বরফাবৃত ত্রিচূড় পাহাড়। পাহাড়ের শুভ্র চূড়া সূর্যের কোমল আলোর প্রসাধন-রেণু মেখে যেন গোলাপি সাজে সেজেছে। এপ্রিল মাসে পাহাড়ের চূড়াটা যেন বরফের সাদা একটা প্রাচীর। বর্ষায় পাহাড়ের ওদিকে বরফ গলে গলে পড়ে। এখনো যেটুকু বরফ পাহাড়ের গায়ে সেঁটে আছে তাতে সূর্যের আলো পড়ে অপরূপ লাগছে। টুকরো টুকরো মেঘ ভাসছে পাহাড়ের বরফাবৃত চূড়ায়। সূর্যের আলোয় মেঘগুলি গোলাপি-রঙা। মনোরমা সূর্যাস্তের এই রঙের সমারোহ দেখতে এখানে এসে বসে থাকে ; কতবার এসে বসেছে তার হিসেব নেই।

গত বছর ভূষণ গ্রেপ্তার হবার আগে এই জায়গাতেই নিজের ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবত। এই জায়গাতে বসে ও ঠিক করেছিল, লেখক হয়ে জীবনের সার্থকতা খুঁজে পেতে হবে। এখানে বসেই ও অনুভব করেছিল, সূর্য ও পৃথিবীর এই যে বিচ্ছেদ-ভরা মুহূর্ত— এও কত সৌন্দর্যে ভরপূর। প্রেমের স্থৈর্যে বিরহের বেদনা হৃদয়ের অন্তস্থলে চিরকালের ঐশ্বর্য হয়ে থাকে। মনোরমা ভাবে, বেচারী সোমার কল্পনারাজ্যের পরিধি কত সীমিত! দুঃখের গভীরে যে সুখের অব্যক্ত প্রকাশ তা তো সে জানে না। প্রত্যেকটি সন্ধ্যা আসে অন্য একটি দিনের সূর্যোদয়ের আশ্বাস নিয়ে। এটাই তো জীবন।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা এখানে বসে মনোরমার মনে হয়, নারীর কাছে প্রেম শুধু রক্তক্ষরণ ছাড়া আর কিছু নয়। এ রক্তক্ষরণ হৃদয়ের, নয়তো শরীরের। পুরুষ শুধু আঘাত দিয়ে সরে পড়ে। ভূষণও তাই, ধনসিংও তাই ! এই যে সূর্য, সেও নির্লিপ্ত পুরুষের মতো পশ্চিম আকাশে রঙ ছড়িয়ে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যায়। পৃথিবী তার মমতায় আর গভীর প্রেমের আবেগে নিঃশব্দে রক্তক্ষরণ করে চলেছে। এটাই নারীর স্বভাব, তার ভাগ্যও।

এই ঘটনার পরে মনোরমা ও ব্যারিস্টার সোমাকে আর এ-বাড়ি থেকে যেতে দিল না। নিজেও যেতে চায় না সোমা। পুলিশের দুই চেহারা দেখেছে। বৈজনাথের থানার কথা মনে পড়ে যায়। দারোগা খাটে শুয়ে, সোমা তার সামনে দাঁড়িয়ে কাঁপছে। কৌতূহলী পুলিশ ওর আঁচল টেনে ধরে মুখে ফেলছে লণ্ঠনের আলো। ওখানে ওর কান্নার কোনো অর্থ নেই, আপত্তির কোনো মূল্য নেই। ঐ থানার ঘরটিতে দুঃসহ পাঁচটি রাত জীবনের সবচেয়ে মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা হয়ে আছে। দুঃস্বপ্ন ভেবে সোমা তাকে ভুলে থাকতে চায়।

পুলিশের অন্য রূপ — সোমা চেয়ারে, দারোগা সাহেব সামনে দাঁড়িয়ে ! কথা বলার ধরনটা এমন যেন দারোগাই ওর চাকর, ওর কাছে মাপ চাওয়ার ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। মনোরমা ও ব্যারিস্টারের জন্যই এটা সম্ভব হয়েছিল, নয়তো নিজের ওর কতটুকু ক্ষমতা। মিষ্টি খেয়ে ঠোঙাটা হাতের মুঠোয় আমরা যেমন দুমড়ে ফেলি, সোমার অবস্থাও তাই। সেই রাতে নিজের ঘরে পেয়ে পুলিশ যদি ওকে হাজতে নিয়ে যেত তা হলে ওর অবস্থাটা কী হত, ভেবে আঁতকে ওঠে সোমা। ধনসিং ছাড়া জীবন অসহ্য ঠিকই ; কিন্তু ধনসিং ছাড়া হাজতের জীবন আর মনোরমা ও ব্যারিস্টারের স্নেহছায়ায় থাকার মধ্যে পার্থক্য আছে বই-কি ! সোমা তা স্পষ্ট অনুভব করতে পারে।

সোমা এও জানে, এই-সব ঝুট-ঝামেলায় লালাজী ও মা মোটেই প্রসন্ন নন। তাঁরা বলেওছেন, অফিসারদের সঙ্গে খামোখা ঝঞ্ঝাট করে কী লাভ? ভরা-যৌবনা সোমাকে নিয়ে লোকেরা হাজারো গুজব রটাতে পারে। কিন্তু মনোরমা ও ব্যারিস্টারের মতো সমাজের মানুষেরা নীচু তলার লোকের নিন্দা-পরচর্চার খুব যেন পরোয়া করে! নিম্ন ও মধ্যবিত্ত সমাজ এই উঁচু শ্রেণীর লোকেদের একটু যেন অন্য চোখে দেখে। নিজেদের সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা বা অনাচার বরদাস্ত করতে পারে না ঠিকই। কিন্তু বড়োলোকেদের ব্যাপারে ওদের অন্য মাপকাঠি; তাদের যেন সাত খুন মাপ। রাস্তায় কেউ যদি একমুঠো ধুলো কারুর মুখে ছুঁড়ে মারে সেটা বরদাস্ত হয় না; কিন্তু আঁধির ঝড়ে চোখ-মুখ-মাথায় ধুলো ভরে গেলেও ভাগ্যকে আমরা দোষারোপ করি, আঁধির বিরুদ্ধে কোনো কথাই বলি না।

সোমা মন-মরা হয়ে থাকে; ভাবে, বিনা অধিকারে এদের উপরে ও বেঁচে আছে। এই অধিকার পেতে নিজের দুঃখকষ্ট ভুলে সারাক্ষণ কিছু-না-কিছু কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে চায়। বউদিও ওর গুণের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ওর ধারণা, সোমা যেন ভগবানের দান। শুনে মনোরমা চটে ওঠে। সোমাকে বাসন-কোসন মাজতে দেখলে মনোরমা ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে আসে। কতদিন এমন হয়েছে মনোরমা ওর হাত থেকে বালতি, ময়লা কাপড় কেড়ে নিয়েছে, ছুঁড়ে ফেলেছে। ময়লা কাপড় জোর করে ছাড়িয়ে নিজের কাপড় ওকে পরতে দিয়েছে, বলেছে— তুমি আমাদের অতিথি, চাকরাণী নও।

সোমার দু চোখ জলে ভরে যায়। কার ঘরে অতিথি কতদিনই-বা থাকে। আতিথেয়তা আবার সমানে সমানেই হয়।

মনোরমা ওর মনটাকে খুশিতে ভরিয়ে তুলতে ওকে সবসময় কাছে কাছে রাখে। একা একা কখনো থাকতে দেয় না। ওকে লেখাপড়া

শেখাতে চায়। মনোরমাকে সোমা ঠিক চিনে উঠতে পারে না, ওর জীবন টাকেও নয়, ওর সমস্যাও সোমার অজানা। মনোরমা এমন সব কথা বলে যা ওর মনে লাগে, যাতে ওর আগ্রহ বাড়ে। কখনো-বা মনোরমা সোমাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে যায়। সোমার নিজের ইচ্ছে-অনিচ্ছে বলতে যেন কিছু নেই। ও কাতর দৃষ্টিতে মনোরমার দিকে তাকিয়ে থাকে, বলে— আপনার যা ইচ্ছে। মনোরমার প্রত্যেক কথায় সোমার সায় দেবার স্বভাবটা ওর ঠিক পছন্দ হয় না ; ও চায় মনোরমা যা বলবে তা সব মেনে নেবে কেন? আপত্তি করবে, ওজর দেখাবে তবে তো সুখ। বিনা-প্রতিবাদে সায় দেয় বলে ও কেমন যেন দমে যায়।

মনোরমাকে সোমা আগেও ভালোবাসত। কিন্তু তখন মনোরমা বাইরে বেড়াবার কথা বললে সোমা লজ্জায় মরে যেত, হেসে আপত্তি জানাত। গরিব, নিম্নশ্রেণীর লোকেরা কি কখনো বেড়াতে যায়? সোমা আগে কোনোদিন বেড়াতে বেরোয় নি : ওদের শ্রেণীর লোকদের ও কখনো বেড়াতে দেখে নি। মনকে খুশি রাখাও যে একটা কাজ তা ও জানত না। বিয়েসাদীতে মেয়ে-বউদের গান গাইতে দেখেছিল ; নিজেও গাইত কিন্তু সেটা খুব জরুরি কাজ, তাই কোনো অনুষ্ঠানে-উপলক্ষে হাতের অন্য কাজ ফেলেও গান গাইতে ছুটত।

মনোরমা সোমার রূপ ও সৌষ্ঠব দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়। সোমার অপরূপ সৌন্দর্যের তারিফ করে মনোরমা একদিন ব্যারিস্টারের ইচ্ছায় নিজের মতো করে শাড়ি পরিয়ে ওকে সাজাতে চাইল। সোমা সংকোচ ও লজ্জায় যেন মরে গেল— এ আবার কী ধরনের শাড়ি পরা ; কোমরের কাছে অতটা খোলা···। মরে গেলেও ওরকমভাবে কাপড় পরতে পারব না।

সোমা মনোরমাকে নির্লজ্জ ভাবতে পারে না। বড়োলোকের কথা যে আলাদা— তা ও জানে। ধনসিং ফেরারী হয়ে যাবার দিন মনোরমা

যখন ওকে শাড়ি পরিয়ে দারোগার সামনে হাজির করেছিল, তখন আপত্তি করে নি। তখন ওর লজ্জা-সংকোচের সময় নেই ; কোন্‌টা ভালো বা মন্দ, কোন্‌টা উচিত বা অনুচিত সোমা আর যেন ভাবতে পারে না। যা বলা হয় ও আজকাল তা মুখ বুজে করে। মনোরমা এতে খুব কষ্ট পায় ; রাগ করে ঝামটা দিয়ে ওঠে। কৃতজ্ঞতায় সোমা চোখের জল মোছে।

ব্যারিস্টার সরোলাও সোমাকে ভরসা দিয়ে বললেন — মিসেস সিং, ঘাবড়িয়ো না। কোনো ঝগড়া-বিবাদ নিশ্চয় হয়েছিল। নিজে থেকে ধনসিং নিশ্চয় খুন করে নি। কয়েক দিনের মধ্যেই মামলা চাপা পড়ে যাবে। ধনসিং ফিরে আসবেই। ততদিন নিজের বাড়ি মনে করে এখানেই তুমি থাকো।

ধরমশালায় অক্টোবরের সোনার দিনগুলি আবার ফিরে এল। নীল আকাশ, এখানে-সেখানে ফুলের সমারোহ, হাওয়ায় প্রাণ-মাতানো সাড়া। ছুটির শেষে আদালত আবার খুলেছে। ওদের লাহোর চলে যাবার কথা উঠছে ; কিন্তু পাহাড়ের এই মৌসুম খুবই স্বাস্থ্যকর ; তাই পাহাড় ছেড়ে যাবার কথাটা কাল-পরশু করে পিছিয়েই যেতে লাগল। ব্যারিস্টার মনোরমাকে বোঝাল যে, ওরা চলে গেলে মা ও লালাজী সোমার সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করবেন তা ঠিক বলা যায় না। ওঁরা সোমাকে এখানে রাখবেন কিনা কে জানে আর রাখলেও হঠাৎ একদিন জঞ্জাল ভেবে ওকে নিজের ব্যবস্থা নিজেকেই করে নিতে বলবেন কিনা তারও তো ঠিক নেই। মনোরমা বলল— না, আমরা ওকে সঙ্গে করে লাহোর নিয়ে যাব।

মনোরমার বউদি মুটিয়ে গেছে ; কাজকর্মও তেমন করে উঠতে পারে না। সোমার পরিশ্রম করার ক্ষমতা আর ওর এই হাল দেখে বউদি ওর প্রতি খুব অনুরক্ত হয়ে পড়েছেন। এত বড়ো একটা গৃহস্থালি আর

দুটো অবাধ্য ছেলেমেয়ের দেখাশুনা করা ওর পক্ষে ঠিক সম্ভব নয়। সোমার কাজ করার ধরন দেখেছে, ওকে চিনে নিয়েছে। তাই ঢিলেঢালা শরীরে ছোট্ট ঘাড়ের সঙ্গে লেপটানো বড়ো মুখখানাকে হেলিয়ে দুলিয়ে বলে উঠল— সোমা ছাড়া বাচ্চাগুলো থাকবে কী করে? ওরা ওর কথাই ভাববে, ওর কথাই বলবে। আমি আর কত দিকে সামলাব? সোমা আমাদের সঙ্গেই যাক। এখানে থেকেই-বা ও করবে কী?

অন্য ঘরের বউয়ের দায়িত্ব নিজেদের ঘাড়ে নেওয়া লালাজী ও মাজী মোটেই বুদ্ধিমানের মতো কাজ বলে ভাবতে পারলেন না। কিন্তু সোমাকে লাহোরে নিয়ে যাবার জন্য সারা বাড়ি যখন ক্ষেপে উঠল তখন তাঁরাও বললেন— আমরা আর কী বলব। তোমরা যা ভালো বোঝো, ভেবেচিন্তে যা ঠিক মনে হয় করো।

সোমার কোনো মতামত কেউ চাইল না। মাঝে মাঝে ও সবাইকে বলতে শুনছে, মন্নো, বউদি ও বাচ্চাদের সঙ্গে নিজেও নাকি লাহোর যাচ্ছে।

সোমার আপনজন বলতে পাহাড়ে এখন আর কেউ নেই। পাহাড়ের কাছ থেকে ও শুধু পেয়েছে আঘাত; শুধু দুঃখের স্মৃতি বুক ভরে নিয়ে যাচ্ছে। তবুও নিজের দেশের মাটি ছেড়ে চলে যাবার সময় বুকটা ওর কেমন করে উঠল। গাড়িগুলি পাহাড়ের নিচে যখন নেমে গেল: সোমার মনও গভীর তমসায় ডুবে গেল; বুকটা কেমন যেন মুচড়ে উঠল; আর চোখ দিয়ে অঝোরে জল পড়তে লাগল।

নিজের দেশ ছেড়ে সোমা এবার সত্যিই বোধ হয় চলে যাচ্ছে। চোখের সামনে ওর ঘরসংসারটা যেন পালটে যাচ্ছে। দেশের মাটি ছেড়ে চলে গেলে কী জানি কবে আবার অন্য মাটিতে পা রাখার সুযোগ হবে। কিন্তু কিছু করার ক্ষমতা ওর থাকলে তো! সংসারের এই

আতঙ্কের দুঃসহ জ্বালা থেকে ও যেন মম্মো বিবি ও ব্যারিস্টার সাহেবের কাছে একটা আশ্রয়চ্ছায়া খুঁজে পেয়েছে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ওর আশ্রয়স্থলও কেমন যেন বদলে যাচ্ছে আর তার সঙ্গে পা ফেলে চলতে ওর স্থানও যে বদলে যাবে এটাই তো স্বাভাবিক।

জেল থেকে ছাড়া পেয়ে আবার জেলে

সমুদ্রের তলদেশ থেকে সাত হাজার ফুট উঁচুতে মেঘের আড়ালে লুকিয়ে আছে ধরমশালা। ধরমশালার লোকালয় থেকে রাতের অন্ধকারে পাকদণ্ডীর পথে নেমে ধনসিং পালাচ্ছিল। চলার গতি এত দ্রুত, মনে হচ্ছিল যেন একটা আলাদা পাথরের টুকরো পাহাড়ের ঢাল বেয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে, রাস্তা দেখা বা চেনার কোনো প্রয়োজন নেই। ধনসিং জানে এই রাস্তায় গেলে সে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছবে; প্রচণ্ড বেগে ও আবেগে সে দ্রুত হেঁটে যাচ্ছিল। পথে দু-তিনবার দাঁড়িয়ে সে পেছন ফিরে তাকাল। না, কেউ নেই। কিন্তু সেই ভরসায় চলার গতি শ্লথ করতে পারে না। যে শত্রুর হাত থেকে ও পালিয়ে বাঁচতে চায় তার শক্তি ও সামর্থ্যের সীমা নেই। সরকার ও পুলিশ পাঁচ কেন পঞ্চাশ মাইল পর্যন্ত নিজের জাল বিস্তার করে ওকে ধরে ফেলার ক্ষমতা রাখে। প্রতি মুহূর্তে ওর মনে হচ্ছে পুলিশ আর সরকারের অদৃশ্য হাত যেন ওর ঘাড় ধরতে চাইছে। ওর চলার গতি দ্রুত থেকে আরো দ্রুততর হল।

ধনসিং নিজের ও তার স্ত্রীর সম্মানহানিতে যেন পাগল হয়ে উঠেছিল। নিজের সম্মান রক্ষার জন্য বা অসম্মানের বদলা নিতে ভয়

কী বস্তু ও তা জানে না। শ্যামসুন্দ আর জগ্গী ছিল দুজন, আর ও একা। ওদের কাছে ছুরি থাকাও অসম্ভব ছিল না কিন্তু তবু ও ভয় পায় নি। এখন সরকার ওদের পক্ষে। সড়ক দিয়ে গেলে অনেক সুবিধা হত বটে কিন্তু ও-পথে অনেক বেশি বিপদের সম্ভাবনা।

ধনসিং কাংড়ার লোকালয় থেকে গা-বাঁচিয়ে কোনোমতে বেরিয়ে গেল। জায়গায় জায়গায় ওর গায়ের গন্ধ পেয়ে বা পায়ের আওয়াজ শুনে কুকুরগুলি বিশ্রীরকম ডেকে উঠছে। তাই ও লোকালয় থেকে একটু দূরে থাকতে চায়। জঙ্গলের বাঘ ভালুক নেকড়েকে ভয় নেই, ভয় তো মানুষকে নিয়ে। কিন্তু ধনসিং মানুষ; জঙ্গলে ও গুহায় কাঁহাতক লুকিয়ে থাকা যায়, কিন্তু লুকিয়ে থাকলেই-বা ওর পেট চলবে কী করে? মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ জীব। তাই প্রত্যেক কাজে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, তার প্রয়োজন।

আগস্ট মাস। ধনসিং-এর সৌভাগ্য সে রাতে বৃষ্টি হচ্ছিল না। আকাশে তারার সমারোহ। মাঝে মাঝে এক টুকরো হালকা মেঘ তারার এই আকাশকে ক্ষণকালের জন্য ঘিরে ফেলে আবার কখন কোন্ ফাঁকে উড়ে যায়। বাতাসে আর্দ্রতার স্পর্শ, একটু ঠাণ্ডা আমেজ। ধনসিং-এর কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, সে হাঁটছে তো হাঁটছেই। শরীর বেয়ে ঘাম পড়ছে। পিপাসায় গলা কাঠ; দু-দুবার পাহাড়ী নদীর কিনারে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে টলটলে জল খেয়ে পিপাসা মিটিয়েছে। উঁচু-নিচু পাহাড়; পাহাড়িয়া পথ পেরিয়ে ও দ্রুত নেমে যাচ্ছে। বাতাস বইছে খুব, এখন যেন ঠাণ্ডা একটু কম।

পাহাড়ের বুকে লুকিয়ে থেকে প্রাণ বাঁচানো সম্ভব নয়, ধনসিং তা বুঝতে পারল। এখানে-সেখানে গোনাগুণতি মানুষ ও তাদের পরিবার। এরা দশ-বারো ক্রোশের মধ্যে প্রত্যেকে প্রত্যেকের খবর রাখে; পরি-বারের কে কী করে তাও নখদর্পণে। নতুন কোনো লোক দেখলেই

এদের মনে প্রশ্ন জাগে, এ আবার কে, কোত্থেকে এসেছে, অ্যাঁ? এখানে কেন? এ প্রশ্নে ধনসিং সবচেয়ে বেশি ভয় পায়। ড্রাইভারের লাইসেন্সটা ওর পকেটে; তাতে ওর নামধাম, আকৃতি সব মজুত, সব বিবরণ লেখা। একটা জায়গায় এসে সিগারেট ধরাবার সময় ধনসিং লাইসেন্সটা পুড়িয়ে ফেলেছে। নিজের পরিচয়-চিহ্ন একেবারে মুছে ফেলা দরকার।

বর্ষায় পূর্ণ-যৌবনা বিশাখা: শত ঢেউ তুলে তার নৃত্যলীলা। সূর্যাস্তের সময় ধনসিং একটা শিলারাশির ওপর এসে দাঁড়াল। অন্যধারে দেখা যাচ্ছে দেহরা-গোপীপুরের ছোট্ট শহর আর থানা। ধনসিং থানার দিকে না গিয়ে হোসিয়ারপুরের পথ ধরল। বর্ষায় এ পথে গাড়ির আনা-গোনা বন্ধ থাকে। পাহাড়ী পথের বেশির ভাগই বালি আর কাঁকরে ভরা; নদীনালার উপর কোনো পুল নেই। ধনসিং তবু চলছেই। চলতে চলতে হাঁটু-পা অবশ ক্লান্ত, তবু চলার বিরাম নেই। মাঝে মাঝে রাস্তায় খচ্চরের পিঠে মালপত্র চাপিয়ে বা পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে মুসাফিরদের যেতে দেখা যাচ্ছে। কেউ কেউ মোকদ্দমার তারিখ সামলাতে এক তহশীল থেকে অন্য তহশীলে যাচ্ছে; হাতে নিয়েছে বা বগলদাবা করেছে সরু টিনের ঢাকনী দেওয়া নল; তাতে সযত্নে রাখা মোকদ্দমার জরুরি কাগজপত্র। এ-সব কাগজপত্র এরা পড়তে পারে না, বোঝেও না। অথচ এগুলোর সঙ্গে ওদের ভাগ্য জড়িত। হলে কী হবে, এগুলির অর্থ বুঝবে উকিল, আদালত বা পুলিশ। এই বিধানের সামনে থেকেও লোকগুলো কত অসহায়।

কোনো কোনো মুসাফির বেশ লম্বা আর তাগড়া জোয়ান। নিপুণ হাতে বাহারী পাগড়ী বেশ শক্ত করে বাঁধা। ওরা বৃটিশ সেনাবাহিনীর ডোগরা সেপাই। এদের মধ্যে কেউ-বা ছুটি ভোগ করতে আসছে, কেউ-বা ছুটির শেষে কাজে ফিরে যাচ্ছে। যারা আসছে তার বেশ হাসিখুশি;

যারা কাজে ফিরে যাচ্ছে তাদের চেহারায় বিষণ্ণতা। যুদ্ধ চলছে। তাই ঘর থেকে কাজে যাবার সময় সেপাইদের মনে আশঙ্কা ছায়ার মতো ঘিরে থাকে, মনে মনে ভাবে ঘরে আবার ফিরে আসতে পারবে তো ; রাস্তার ধারে মক্কা আর ধানে ভরা খেতের দিকে ওরা মমতা-ভরা উদাস দৃষ্টিতে দেখছে ; নিজেদের খেতে নিজেদের হাতের ফসল ফেলে ওরা কোথায় দূরে চলে যাচ্ছে। ছুটির সময় ওরা খেতে চাষ করেছে, বীজ পুঁতেছে। ওরা চলে যাবার পর ঘরের লোকেরা ফসল কাটবে। অথচ ফসলের বীজ বোনার সময় ওদের শরীর ধুলো ও মাটিতে মাখামাখি হয়ে থাকত।

ওরা সেপাই-ছাউনিতে পৌঁছে বুট পরবে, উর্দি চড়াবে আর গাড়িতে সওয়ার হয়ে বন্দুক, মেসিনগান চালাবে। যাবার মুহূর্তে মাটি ও ফসলের মোহ, ধুলো-মাটি-ঘাম, দুধ-ঘির গন্ধে ভরপুর বউ-বাচ্চার স্মৃতি ওদের চলার পথ শ্লথ করে দেয়। গ্রামে দীনদরিদ্রর জীবন ; সৈনিক জীবনে যে-কোনো মুহূর্তে মৃত্যুর ভয়। এ ভয় তো আছেই, তা ছাড়াও অন্য জীবনের অন্য কী যেন একটা আকর্ষণে ওরা ছাউনিতে ফিরে যেতে অনিচ্ছুক। ঘরকে বাঁচাতেই ওরা মৃত্যুকে বুকে নিয়ে চাকরি করে ; সেটা দরকার বলেই করে। ওদের টাকা চাই ; জমির যা ফসল হয় তাতে তাদের প্রয়োজনটুকুও মেটে না ; সৈনিক হলে হাতে টাকা আসে। ঘরে এসেও স্বস্তি নেই ; সরকারের আতঙ্কে আবার ঘর ছেড়ে যাচ্ছে। সরকারকে এরা কত গভীর আতঙ্কের দৃষ্টিতে দেখে ; সরকারের নিয়ম কী কঠিন, কী নিষ্ঠুর। ধনসিং সেই আতঙ্কেই ছুটে পালাচ্ছে।

একনাগাড়ে বিশ ঘণ্টা হেঁটে ছেষট্টি মাইল পথ পেরিয়ে ধনসিং হোসিয়ারপুর পৌঁছল। ক্লান্তিতে মনে হচ্ছে যেন ওর শরীরের প্রত্যেকটি হাড়পাঁজরা আলাদা হয়ে গেছে। কোথাও যদি একটিবার টানটান হয়ে শুয়ে পড়া যেত। শহরটা ওর খুবই পরিচিত। কারণ, এই লাইনে ও

কয়েক মাস গাড়ি চালিয়েছিল। গাড়ির ডিপোতে গেলে কোনো পরিচিত মুখের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যাবার ভয়ে ও ও-মুখোই মাড়াল না। মনটা শক্ত করে কিছু খেয়ে নিল। একটা ধর্মশালায় গিয়ে চার পয়সায় একটা খাটিয়া ভাড়া নিয়ে শুয়ে পড়ল। পাহাড় থেকে নেমে এসে ধনসিং-এর বেশ গরম লাগছিল, ঘামে শরীর ভেজা ভেজা। পরিশ্রম করলে ঘেমে ঘেমে শরীরটা যেমন হালকা হয়ে যায়, সেরকম নয়; শরীরে কেমন যেন তেল প্যাচপ্যাচ করছে। আশেপাশে মুসাফিররা খালি গায়ে খাটিয়ায় শুয়ে; গামছা বা পাখা নেড়ে শরীর ঠাণ্ডা করছে, মশা-মাছি তাড়াচ্ছে। মেয়ে-বউরা এই গরমেও গায়ের কাপড়চোপড় সামলেস্থমলে শুয়ে আছে।

গরমে ধনসিং-এর যেন দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, মাথা ঘুরছে। অথচ অত্যধিক ক্লান্তিতে ঘুমও আসছে না। মনে ভেসে উঠছে গতকালের কথা, ঠিক এই সময় ও দু'জন বদমাশকে মেরে খতম করেছিল। পুলিশ ওকে ধরার জন্য ধর্মশালা, কাংড়া, পাঠানকোট এমন-কি হয়তো হামির-পুরেও হন্নে হয়ে খুঁজেছে। ও কোনোমতে পালিয়ে বেঁচেছে। ধরা পড়লে এতক্ষণে হাজতে বন্ধ থাকত। ওর বৈজনাথের কথাও মনে পড়ে গেল। ঠিক এই সময়েই ও ধরা পড়েছিল; থানায় ওকে আটকে রাখা হয়েছিল। যে মারটা খেয়েছিল তার চেয়েও মনে পড়ে সোমার উপর সেই ভয়ানক দুর্ব্যবহারের কথা। ধনসিং ভাবে ঐ থানাদারটাকে যদি কাছে পায় তবে এই জুলুমের ঠিক বদলা নেবে। ঐ বহিনকা···আমাকে শালা মানুষই ভাবে নি!

সোমার কথা মনে পড়ল; যদি পুলিশের হাতে পড়ে তবে কী হবে? পালিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচিয়ে কী লাভ হল? এর চেয়ে সোমাকে আড়াল করে ও যদি পুলিশের সঙ্গে লড়তে গিয়ে মরত সেটা বরং অনেক ভালো হত। বৈজনাথ থানার সেই দারোগার বীভৎস চেহারাটা বারবার

চোখের সামনে ভেসে উঠছে। ঐ দারোগাটা পাহাড়ী দেশকে গাল পাড়ছিল। আর শালার দেশ এই জায়গাটা, যেখানে দম বন্ধ হবার জোগাড়। ধনসিং চাইছিল ধরমশালার ঠাণ্ডা বুকে আবার মাথা রাখতে উড়ে চলে যায়। ওখানে তো মানুষ অন্তত শ্বাস নিয়ে বাঁচে।

কিছুক্ষণ থেকেই একটা লোকের আওয়াজ ওর কানে আসছে। এখন লোকটা বেশ জোরে জোরে কথা বলছে। ধনসিং পাশ ফিরে শুয়ে লোকটার কথা মন দিয়ে শুনছে। লোকটা সৈনিক ও লড়াইয়ের কথা শোনাচ্ছে : উর্দির পুরো পোষাক মুফতে পাওয়া যায় ; খাওয়া মানে মাংস-দুধ আর মেওয়া। কোনো খরচ নেই, মাইনের পুরো টাকাটা পকেটে। চাও তো খুবসুরত মেয়েমানুষ পাবে, কত রঙ ঢঙ তাদের কথায়।

এক আধবয়সী লোক আগের লোকটাকে ধমকে উঠল— তুই নিজে জীবনে কখনো সৈনিক দেখেছিস? যে শালা রংরুট ভর্তি করে কমিশন পেটে তার কথা শোনো একবার? আমি নিজের চোখে ফ্রান্স ও মেসোপটেমিয়ায় যুদ্ধ দেখেছি, বুঝলি বুদ্ধু, তিন দিন জলটুকু পর্যন্ত জোটে নি। শালা খচ্চর বকবক করে কানের পোকা বের করে দিল···।

আশেপাশে যারা বসেছিল তারা দু'জনের ঝগড়া শুনে হাসতে লাগল।

সরাইখানার ফটক দিয়ে চারজন লোক ভিতরে এল। দুজনের হাতে লণ্ঠন, একজনের হাতে টর্চ আর একটা লোকের হাতে একটি রেজিস্টার। ওরা ঘুরে ঘুরে সব মুসাফিরদের দেখছে, নামধাম-ঠিকানা জিজ্ঞেস করে রেজিস্টারে লিখে রাখছে।

সৈনিক জীবনের সুখদুঃখ নিয়ে যে লোকটা গল্প ফেঁদে বসেছিল সে সোজা উঠে গিয়ে নালিশ করল— হাবিলদার সাহেব, দেখুন ঐ লোকটা

সরকারের বিপক্ষে। লোকেদের ফৌজে ভর্তি করার ব্যাপারে লোকটা বাগড়া দিচ্ছে।

ধনসিং বুঝে নিল, এরা সাদা পোষাকে পুলিশের লোক। এরা কি একেই খোঁজ করতে এসেছে নাকি? ওর বুক ঢিপঢিপ করছে।

পুলিশের লোকেরা ধনসিং-এর দিকে এগোলো না। যে লোকটা সেনাবাহিনীতে ভর্তি হবার বিরুদ্ধে দু-চার কথা বলছিল তাকেই ওরা খুব বকাঝকা করতে লাগল। মধ্যবয়স্ক লোকটা নিজের সাফাই গাইতে লাগল, বলল, 36 সালে ডোগরা রাইফেলের ও একজন সৈনিক ছি:.। কাগজপত্রও দেখাল কিন্তু পুলিশ তাকে সরকারদ্রোহিতার অপরাধে থানায় যেতে বাধ্য করল।

ধনসিং শুয়ে শুয়ে পরম নিস্পৃহতায় পুলিশের কথাবার্তা শুনছিল। ও বুঝল, পুলিশ পলাতক সৈনিক ও বিপ্লবীদের তালাশ করে ফিরছে।

ভোরবেলা ধনসিং-এর ঘুম ভাঙল; শরীরের গাঁটে গাঁটে প্রচণ্ড ব্যথা। ও বাজারের দিকে চলল। পুলিশ দেখলেই ওর বুক ধড়ফড় করতে থাকে। এখানকার পুলিশের পোষাক ধরমশালার বা কাংড়ার পুলিশের মতোই।

ধনসিং ভাবল, একটা কাজ না জোটালে খাবে কী? ও তো শুধু গাড়ি চালাতেই জানে। হোসিয়ারপুরে পরিচিত কারো সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। ও যে জেলার লোক, সেটা এখান থেকে আর কতই-বা দূর। মোটরে কয়েক ঘণ্টার পথ। আরো যদি অনেক দূরে চলে যেতে পারে তবে ও নিশ্চিন্ত। ভাবতে ভাবতে স্টেশনের পথে চলে এল। কোথায় যাওয়া যায়, লাহোর না অমৃতসর? জওয়ালাসহায়ের গাড়ি নিয়ে ও অমৃতসর আর লাহোর পর্যন্ত গেছে। তার চেয়ে যেখানে ও কখনো পা দেয় নি সেটাই ওর পক্ষে নিরাপদ।

বিশ ঘণ্টা একনাগাড়ে পায়ে হেঁটে যদি এখন গাড়িতে উঠে বসতে

পারে তার চেয়ে বড়ো সুখ নেই। আশঙ্কা ও ভয় থেকে দূরে সরে যেতে পারছে এটাই এখন ওর সবচেয়ে বড়ো সান্ত্বনা। সোমার জন্য বড়ো দুশ্চিন্তা হচ্ছে, ওর কী হবে ? ওর বিশ্বাস লালাজী, বিশেষ করে মনোরমা বিবি ওকে নিশ্চয় বাঁচাবে। মন্নো বিবি আগেও ওকে সাহায্য করেছিল। ও থাকলেই বা কী করতে পারত ? ট্রেনের এই কামরায় একজন বউ তার স্বামীর সঙ্গে চলেছে ; লোকজনের সামনে সংকোচে কথা বলতে পারছে না ; বললেও খুব আস্তে বলছে। ধনসিং ভাবে, সোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলে এভাবেই ওর কাছে সোমা বসত। কিন্তু ওকে নিয়ে কোথায় যেত ? একা তো কোনো সরাইখানায় কাটিয়ে দিতে পারে কিন্তু সোমা সঙ্গে থাকলে পুলিশের লোকেরা পেছনে তাড়া করত।

গাড়িতে খদ্দরের কাপড় পরা দু'জন যাত্রী খবরের কাগজ পড়ছিলেন। নিজেদের মধ্যে তাঁরা আলোচনা শুরু করলেন— যুদ্ধে ইংরেজরা হেরে যাচ্ছে। জাপানীরা এগিয়ে আসছে দেখে ইংরেজ সরকার ভড়কে গিয়ে কংগ্রেস নেতাদের জেলে পুরেছেন। কিন্তু তবুও ইংরেজ হটাও আন্দোলন থেমে থাকবে না।

ধনসিং ধরমশালায় থাকতে শুনেছিল যে, ইংরেজরা হেরে যাচ্ছে। ইংরেজরা হেরে যাক সবাই এটা চায়। লালাজী তো সরকারের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা কামাচ্ছেন কিন্তু ইংরেজদের হেরে যাওয়ার খবরে ওঁর ঘরের সবাই খুশি। সরকার আর পুলিশের অত্যাচারে সবাই কাহিল ; নিজেরা সামনাসামনি ইংরেজকে তাড়াতে অক্ষম তাই সবাই চাইছে জার্মানী আর জাপান ইংরেজকে যুদ্ধে হারিয়ে দেশটাকে স্বাধীন করে দিক। অন্যদিকে লাখ লাখ লোক ইংরেজদের চাকরি করে তাদের সাহায্য করছে ; না করলে ওদের চলবেই বা কী করে ?

কমরেড ভূষণ ড্রাইভারদের চুপিচুপি অনেক কথা বোঝাত। বলত, অত্যাচারী ইংরেজ সরকারের অধীনে নোকরি করা মানে নিজের পায়ে

কুড়ুল মারা। এই যেমন কুড়ুলের বাঁট, গাছের ডাল কেটে তৈরি, আবার সেটাই কুড়ুলের হাতল হয়ে গাছগুলোকে কাটছে। ধনসিং শুধু একটা কথাই বোঝে, ইংরেজ সরকার আর পুলিশ অত্যাচারী। সবচেয়ে যদেচ্ছাচারী হল পুলিশ, আর পুলিশই তো সরকার।

জলন্ধরে পৌঁছে ধনসিংকে লাহোর থেকে দিল্লীর ট্রেনে চড়ে বসতে হল। ভীষণ ভিড়। বেশির ভাগ কামরাতে খাকি উর্দী-পরা সৈন্য। কার ঘাড়ে দুটো মাথা যে সে-সব কামরায় বসবে ? সৈন্যরা মর্জিমতো যেখানে খুশি বসে পড়ছে। সাধারণ যাত্রীরা ঠেসাঠেসি করে এক-একটা কামরায় বসেছে, তিল ধারণের জায়গা নেই। কিন্তু লোকেরা তবু এই-সব কামরাতেই ঠেলাঠেলি করে উঠবে। যারা আগে গিয়ে জায়গা দখল করছে তারা নতুন যাত্রীদের কিছুতেই উঠতে দেবে না কিন্তু ওরা উঠবেই ; আর এ নিয়ে তুমুল ঝগড়া আর লাঠালাঠি। কিন্তু একজন সৈন্য যদি এ কামরায় ঢুকে পড়ে কেউ বাধা দেবে না। ধনসিং অতিকষ্টে একটা কামরায় উঠল। ওর মনটা খুব খারাপ, লোকেরা সৈন্যদের এত ভয় পায় ? ভয় না পেয়ে উপায় কী, সৈন্যরা তো খাস সরকারি লোক।

গাড়ি চলতে শুরু করল ; যেটুকু জায়গা পেয়েছে তাতেই এরা বসে পড়েছে ; এখন ঝগড়াঝাঁটির কথাও আর মনে নেই ; নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা শুরু হয়ে গেছে। সেই একই কথা— যুদ্ধ। খবরের কাগজের খবরের ওপর রঙ চড়িয়ে বলে যাচ্ছে — বর্মায় ইংরেজরা হেরে ভূত।··· কলকাতার উপরে জাপানীরা বোমা ফেলেছে···। কংগ্রেসী নেতাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে নানা জায়গায় বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে।··· বুক ভরা আশা জাগে ; ভাবে এ সরকার হেরে যাক, রাজ্য বদলে যাক। তবে পুলিশের ভয় আর থাকবে না। ও আবার ফিরে যাবে ধরমশালায় ; সোমাকে নিয়ে ঘর বাঁধবে।

ধনসিং সোমার কথা ভাবতে ভাবতে দিল্লী পৌঁছে গেল। স্টেশনের

চারপাশে শুধু পুলিশ আর পুলিশ। ধনসিং কারো কাছে কোনো কথা জিজ্ঞেস করল না ; অন্য যাত্রীদের সঙ্গ ধরে বড়ো একটা বাজারে এসে পড়ল। দোকানপাট সব বন্ধ। লোকেরা জটলা করে কী-সব কথাবার্তা বলছে। চারিদিকে বন্দুকধারী পুলিশ পাহারা দিচ্ছে, নয়তো টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এই একদিন আগেই ধনসিং বিশ ঘণ্টা হেঁটেছে আর ট্রেনের কামরায় অসম্ভব ভিড়ের মধ্যে কোনোমতে বসে এসে এখন ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে আসছে। কোথাও যদি একটু টানটান হয়ে শুয়ে পড়া যেত।

একটা দোকানের সামনে একজন লোক বসে। ধনসিং তাকে ধর্মশালার রাস্তা বাতলে দিতে বলল। এ ধর্মশালা পাহাড়ী দেশের সেই ধর্মশালা বা সরাইখানার মতো নয়, যেখানে যে-যেমন খুশি একটু গড়ানোর মতো জায়গা করে শুয়ে পড়ে। একদিকে গাধা, বা খচ্চর বা বলদ বাঁধা, তাতে কী ? তাদের পাশেই লোকেরা শুয়ে বিশ্রাম করছে। দিল্লীর এই ধর্মশালা লাল পাথরে বাঁধানো আলিশান ইমারত। ছাতের দিকে তাকিয়ে দেখলে মাথার টুপিই সড়াৎ করে পড়ে যাবে। গেটের কাছে তক্তাপোষে সতরঞ্জি বিছিয়ে আর দোয়াত কলম নিয়ে মুন্সীজী বসে আছে।

মুন্সীজী ধনসিংকে হাঁক দিল— এই, একেবারে যে ভেতরেই ঢুকে পড়েছ !

—মুসাফির, থাকব বলে এসেছি।

—কোথা থেকে আসা হচ্ছে ?

—হোসিয়ারপুর, পাঞ্জাব থেকে।

মুন্সীজী ধনসিং-এর আপাদমস্তক নজর দিয়ে দেখল। চোখেমুখে ক্লান্তির ছাপ। অনুমান সত্য কিনা জানতে চাইল— একলাই তুমি ?

—হ্যাঁ।

—জিনিসপত্র কোথায়, বিছানাপত্র, বাক্স বা গাঁঠরী— কিছুই তো হাতে নেই দেখছি।

—হ্যাঁ, সঙ্গে কিছু নেই।

মুন্সীজী কী একটা আঁচ করে বলল— জায়গা খালি নেই, বাইরে যাও।

ধর্মশালার বিস্তৃত প্রাঙ্গণ আর চওড়া বারান্দার, খালি জায়গার দিকে ধনসিং সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে দেখল। একদিকে মোটা নলে কলের জল পড়ছে। একটি লোক 'হরি' নাম জপতে জপতে খুব আরাম করে স্নান করছে। কিন্তু মুন্সীজী বারণ করায় ধনসিংকে বেরিয়ে আসতে হল।

ধনসিং বাজারের দিকে এগিয়ে চলল। সামনের একটা দোকানে তন্দুরী রুটির সুন্দর গন্ধে ও আর থাকতে পারল না; খেতে বসে পড়ল। অনেকক্ষণ ধাবায় বসে রইল। উঠে এগিয়ে গেল বাজারের দিকে; দোকানপাট বন্ধ। লোকেরা ছড়িয়েছিটিয়ে জটলা করছে, চলছে আর ভিড় বাড়াচ্ছে; ধনসিং এদের মতো উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়াল। পেটে পড়েছে গরম রুটি, শরীরটা কেমন যেন ভারী হয়ে আসছে। ঘণ্টাঘরের সামনে একটা বন্ধ দোকানের কাছে অনেক লোক জটলা করছে, কথাবার্তা বলছে। ধনসিং অন্য একটা বন্ধ দোকানের দরজায় ঠেস দিয়ে বসে কথাবার্তা শুনতে লাগল।

ওর ভাষায় কথা হচ্ছে না; কিন্তু কাংড়া, পাঠানকোট আর ধরম-শালায় নানা লোক ও মুসাফিরদের সঙ্গে থেকে থেকে ও এদের প্রায় সব কথাই বুঝতে পারে। গাড়িতে যা শুনেছে এখানেও সেই একই কথা — সব নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, জাপান জিতছে। নেতাদের গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধেই শহরে আজ হরতাল। নেতাদের যে কোথায় সরিয়ে রেখেছে কেউ জানে না। কেউ বলছে, গান্ধীজীকে বিলেতে নিয়ে গেছে; নেহেরুকে চালান করা হয়েছে আফ্রিকায়। কেউ-বা বলছে

কংগ্রেস সম্মুখ-সংগ্রামের হুকুম দিয়েছে। কেউ বলছে, বিনা হাতিয়ারে কী করে লড়ব? জাপানই শালাদের ঠাণ্ডা করবে। অন্য কেউ যদি জাপানের বিরোধিতা না করে, তবে দেখবে মজা। আরে দেখোই-না কী হয়।

চারদিকে একটা চাপা উত্তেজনা; কংগ্রেস জোর করে মিছিল বার করবে আর পুলিশ আর সৈন্যরা তাদের আটকাবে। খবর ছড়িয়েছে দিল্লীর সব নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধনসিং সব-কিছু শুনে যাচ্ছে কিন্তু এখন ওর মাথায় একটাই চিন্তা, রাতটা কোথায় কাটাবে!

'ইনক্লাব-জিন্দাবাদ' ধ্বনি প্রতিধ্বনি তুলছে। আসমুদ্র-হিমাচলের এই ভারতবর্ষের সব ভাষা এই একটা শব্দে যেন এক হয়ে গেছে। লোকেরা সচকিত হয়ে উঠল: ধ্বনিটা যেদিক থেকে আসছিল, সেদিকে তারা ছুটল।

'ইনক্লাব-জিন্দাবাদ!' 'ইংরেজ সরকার নিপাত যাক।' 'মহাত্মা গান্ধী কী জয়।' আরো কত ধ্বনি শোনা যেতে লাগল। তেরঙ্গা পতাকা হাতে জনতার মিছিল ঘণ্টাঘরের দিকেই আসছে। পুলিশও তৈরি হয়ে ছিল; এক লহমায় মিছিল ঘিরে ফেলল। পুলিশের অফিসারের হুকুমে লাঠি চার্জ শুরু হয়ে গেল। অনেক লোক ভয়ে পালাল আবার কিছু লোক লাঠির বর্ষণ উপেক্ষা করে গলা ফাটিয়ে স্লোগান দিতে থাকল— ইনক্লাব-জিন্দাবাদ। নেতাদের ছেড়ে দাও। ইংরেজ সরকার নিপাত যাক।

যারা স্লোগান দিচ্ছে, তাদেও ওপর প্রচণ্ডভাবে লাঠি পড়ছিল; কিন্তু ওদের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। আশেপাশে যারা মিছিল দেখতে ভিড় জমিয়েছে এই নিরস্ত্র লোকেদের ওপর পুলিশের জুলুম দেখে তারা আর সহ্য করতে পারল না। ইট-পাটকেল-পাথর ছুঁড়তে লাগল। ধনসিং খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। পুলিশকে ও সব সময় অত্যাচার

করতেই দেখেছে। পুলিশ গরিবের শত্রু বলেই ও জানে। যারা পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে তাদের প্রতি গভীর সহানুভূতিতে ধনসিং হাতের কাছে যা পেল তুলে পুলিশের উপর ছুঁড়ে মারতে লাগল।

এতক্ষণ পুলিশের ছোটো ছোটো দুটি দল একপাশে দাঁড়িয়েছিল। তারাও এখন ভিড়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। একটু পরে গুলি চলার আওয়াজ শোনা গেল। লোকেরা লাঠির জবাবে পাথর ছুঁড়ে মারছিল, আর এখন ? লাঠির মারে শুধু জখম হয় আর গুলি যে প্রাণ নেয়।

জনতা ছুটতে লাগল তো ধনসিং-ও পালাতে লাগল ; ভয়ে নয়। লড়াইয়েরও নিয়ম, একবার এগিয়ে যাও আবার বাঁচার জন্য পেছনে হটো। বন্দুকধারী লোকেদের পাথর দিয়ে জখম করা যায় না, তাই পালাও। কিন্তু বেঁচে গেলে আবার পাথর ছুঁড়তে তৈরি হয়ে এসো— এ ভীরু লোকের নীতি নয় বলেই ধনসিং ভাবে। ধনসিং আবার পুলিশদের মোকাবিলা করার জন্য ফিরে এলো কিন্তু কাঁধে প্রচণ্ড মার পড়ায় মাটিতে পড়ে গেল।

ধনসিংকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অনেক লোককেই। ধনসিংকে তাদের সঙ্গে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল। গ্রেপ্তার হয়েও লোকেরা স্লোগান দিচ্ছিল – 'ইনক্লাব-জিন্দাবাদ !' 'ইংরেজ সরকার নিপাত যাক !' 'নেতাদের ছেড়ে দাও।' ধনসিংও ওদের সঙ্গে স্লোগান দিতে থাকল।

জালে-ঘেরা কালো রঙের একটা বাস এসে দাঁড়াল। সব আটক লোকদের তাতে পুরে হাজতে নিয়ে যাওয়া হল। হাজতে বন্দী হয়েও ধনসিং-এর কোনো ভয় করছে না। ওর সঙ্গে আরো বত্রিশ জন লোক। তারা আবার উল্টে পুলিশের ওপর চোটপাট করছে— এমন লোক। বলছে— আমরা কি মানুষ না ? ভীষণ গরম, একটুও হাওয়া নেই। আমরা খোলা জায়গায় থাকব।

সন্ধ্যা হতে না হতে শহরের নানা জায়গা থেকে আরো অনেক লোক

গ্রেপ্তার হয়ে এল। ওদের সংখ্যা পঁচাত্তরের বেশি হবে। সবার নাম-ধাম জিজ্ঞেস করে লেখা হল। লোককে নিজের নাম, বাপের নাম, ঠিকানা জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে আর বেশির ভাগই জবাব দিচ্ছে -- ইনক্লাব-জিন্দাবাদ।

এতে ধনসিং-এর তো খুব সুবিধে। সেও প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরে— ইনক্লাব-জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে উঠল। সন্ধ্যার সময় ওকে আর ওর সঙ্গীদের দিল্লী জেলে নিয়ে যাওয়া হল।

পুলিশের হাতে পড়বে, হাজতে আর জেলে যাবে এই ভয়ে ধনসিং সোমাকে ছেড়ে জান হাতে নিয়ে পালিয়েছিল। ও কোথাও আশ্রয় পায় নি। শেষ পর্যন্ত এই হাজত আর জেলই ওকে ঠাঁই দিল। এখন ও আর জেলের ভয়ে কাঁপে না। ও এখন নারীলুণ্ঠক খুনী অপরাধী নয়; ও এখন একজন সৈনিক -- যে সৈনিক গোলামি আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যাচ্ছে। ত্যাগ আর বীরত্বের মহিমায় ও এখন বুক ফুলিয়ে চলতে পারে।

* * *

ধনসিং-এর মনে পড়ল ধরমশালার জেলের কথা, সেখানে তাকে বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। ওর মনে হত ওর হাত-পা বেঁধে সরকার অন্ধকূপে ফেলে রেখেছে। আর দিল্লী জেলে ও গর্বে মাথা উঁচু করে চলে; সরকারি অফিসারদের অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে। এবার ওদের জেলে বন্ধ করে রাখা মানে ওর বিজয় আর সরকারের পরাজয়। ধরমশালার জেলে, কুকুরকে শেকলে বেঁধে রাখার মতো, ওয়ার্ডাররা ওকে মারত, পিটত আর ধমকাত। আর দিল্লীর জেলে ওর সঙ্গীরা অফিসরদের একেবারে পরোয়া করে না; বরং ধমক দিয়ে ঠাণ্ডা রাখে।

অফিসরদেরও এদের সঙ্গে তুই-তোকারি করে কথা বলার সাহস নেই ; বরং বেশ মিষ্টি করে কথাবার্তা বলে।

ধনসিং ও তার সঙ্গীদের জন্য কয়েদী পোষাক দেওয়া হল ; হাফহাতা গোল গলার বড়োসড়ো কুর্তা আর গোড়ালি পর্যন্ত ঢাকা পাজামা, মোটা মোটা লাল লাইন টানা। এক পোষাক হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ অপরাধী ও রাজনৈতিক বন্দীদের পার্থক্য বোঝা যেত। রাজনৈতিক বন্দীদের চেহারায়, কথাবার্তায় ও ব্যবহারে একটা আত্মনির্ভরতা ফুটে উঠত আর অপরাধীদের ব্যবহারে ফুটে উঠত একটা লজ্জা ও দীনতার ভাব।

যে-সব লোক একবার জেল খেটে গিয়ে দ্বিতীয়বার অপরাধ করে জেলে আসে তাদের "দুবারা" বলা হয় অর্থাৎ অপরাধ করা যাদের মজ্জাগত হয়ে গেছে। ওদের সম্বন্ধে সবার ধারণা, এই লোকগুলি পাক্কা ও দাগী বদমাশ। যে সব অপরাধী প্রথমবার জেলে এসেছে এবং যাদের শোধরাবার আশা আছে তাদের থেকে "দুবারা" কয়েদীদের আলাদা রাখা হয়। "দুবারা"-র কয়েদী পোষাকে কালো বা নীল দাগ মারা থাকে। ওদের দেখে ধনসিং ভাবে, ধরমশালার জেল খাটার কথাটা এখানে যদি আউট হয়ে যায় তবে ওকেও "দুবারা" দেওয়া হবে। ধনসিং ওর জীবনের গোপন কথা ঘুণাক্ষরে মুখ ফুটে বলে না।

জেলে ধনসিং অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীদের মতোই থাকত। জন্ম, দেশ আর ভাষা আলাদা হলেও ওদের মতো ওরও অভিন্ন উদ্দেশ্য, সেখানে ও অভিন্ন। কিছুদিনের মধ্যেই ও তাদের সঙ্গে একটা আত্মীয়তা অনুভব করল। জেলের কর্তৃপক্ষের বিরোধিতা করতে ও-ই এগিয়ে যায়। ওর সঙ্গীরাও ওকে বিশ্বাস করে আর ধীরে ধীরে ওর ওপর নির্ভর করতে থাকে। দিল্লী জেলে যাঁতা ঘোরানো, দড়ি পাকানো ইত্যাদি কাজ করা দুঃসহ মনে হয়। রাজনৈতিক বন্দীরা জেলের অফিসারদের শত কৌশল, শত ধমকানি সত্ত্বেও কোনো পরিশ্রমের

কাজ করতে রাজি নয় ; ওদের পক্ষে দিন কাটানো বোঝার মতো মনে হয় না।

রাজনৈতিক বন্দীরা বুদ্ধি ও কৌশল খাটিয়ে জেল-কর্তৃপক্ষের চোখে ধুলো দিয়ে বাইরে থেকে খবরের কাগজ, বিড়ি-তামাক-চিনি ও আরো অনেক জিনিস আনে। কেউ কেউ গোপনে তাস জোগাড় করে তাস খেলা নিয়ে মেতে ওঠে ; কেউ-বা বটতলা-গল্প পড়ে, গালগল্প করে সময় কাটায় ; কেউ-বা কাপড় ধুতেই ব্যস্ত ; কিছু লোক শুধু বই পড়ে। প্রায় পৌনে দুশো লোক এক ভাবে একত্র হয়ে চলায় জেল কর্তৃপক্ষ বেশ ঘাবড়ে গেছে। ঝগড়া-বিবাদ থেকে বাঁচার জন্য ওদের দাবিদাওয়া মেনে নেওয়া হয় ; জেলের নিয়মকানুন এরা অমান্য করলেও কর্তৃপক্ষ উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখে। এ-সবে ধনসিং-এর মনটা খুশিতে ভরে ওঠে। ধরমশালার জেলে যে দুর্গতি ওকে ভোগ করতে হয়েছিল, ও মনে মনে ভাবে তার যেন বদলা নেওয়া হচ্ছে। অন্য দিকে, রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে সামান্য মতবিরোধ দেখা গেলে জেলের অফিসরদের ভদ্রতার মুখোশ খুলে পড়ে ; ওরা তখন দমননীতি ও ক্ষমতার পরিচয় দিতে পিছ-পাও হয় না। কাউকে হয়তো বেড়ি পরিয়ে রাখে। কাউকে-বা নির্জন জেলে রেখে সাজা দেয়।

রাজনৈতিক কয়েদীদের মধ্যে মতভেদ ও ঝগড়া কিছু কম ছিল না। সামগ্রিকভাবে ওদের জেলের অফিসারদের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ লেগেই আছে। নিজেদের মধ্যেও রাজনীতি ও কংগ্রেসের কার্যপ্রণালী নিয়ে মতবিরোধ বেধে যেত, তুমুল তর্কবিতর্কের ঝড় উঠত। কখনো তর্ক ছেড়ে মারপিট। এই-সব তর্কবিতর্কের গূঢ় অর্থ ধনসিং-এর মাথায় ঢোকে না ; তাই সে চুপ করে থাকে।

ধনসিং জেলে এসে বিরাট এক বিপর্যয় থেকে বেঁচেছে ; আগে যে একটা চাপা উত্তেজনা ছিল, রাজনৈতিক কয়েদীদের সঙ্গে মিশে তা প্রায়

কাটিয়ে উঠেছে। অনেক কিছু শেখার অবসর আছে কিন্তু ও যখন একলা থাকত, ভাবত নিজের কথা, সোমার কথা। ছয় মাস পরে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ও কী করবে? সোমার কী হাল হয়েছে কে জানে? ওকে ওরকম অসহায়ভাবে ছেড়ে এসেছে বলে ধনসিংকে ও কি ভুলে যাবে?

জেলের চারদেয়াল ভেদ করে ক্রমশ বাইরের খবর ভেতরে আসতে থাকে। ধনসিং-এর মনে যে-সব প্রশ্ন জাগে এ-সব খবর পেয়ে তার সমাধান ও নিজেই পেয়ে যায়। খবর পাওয়া গেল, ইংরেজ বর্মায় হেরে গেছে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে ভারত-বর্ষকে স্বাধীন করতে আসছেন। আর তো একমাস দু'মাসের মাত্র ব্যাপার। উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও দক্ষিণ ভারতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেছে। রেল লাইন উপড়ে ফেলা হচ্ছে, থানা জ্বালিয়ে দিচ্ছে। সব জায়গায় ভারতবাসীদের নিজেদের সরকার কায়েম হতে চলেছে।

ধনসিং-এর মনটা ছটফট করে ওঠে— ভাবে, এই সময় ও যদি কাংড়া জেলায় থাকত তো বৈজনাথের থানা উঠিয়ে দিয়ে ঐ বদমাশ দারোগার শয়তানির বদলা নিতে পারত। ওর এবং অনেকের মনে আশা উচলে ওঠে, ভাবে ওদের বোধ হয় পুরো সাজা আর ভোগ করতে হবে না। কোনো-একদিন দিল্লীর জনতা উত্তেজিত হয়ে ছুটে আসবে, জেলের ফটক ভেঙে ওদের মুক্তি দেবে। এই সুখের কল্পনায় ধনসিং নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলে, ও দেখতে পায়, মুক্ত হয়ে ও কাংড়ার পথে চলেছে।

যারা ইংরেজী জানে, বলে, তাদের খুব আদর, খুব খাতির। দিল্লীর আশপাশের গ্রামের জাঠ সঙ্গীরা এবং ঐ যারা ইংরেজী জানে না, তারা কখনো-বা ইংরেজী বলার বিরোধিতা করে। রোতকের ভূরেসিং পুরনো

একজন কর্মী ও নেতা। গ্রামীণ জনতার মধ্যে তাঁর খুব প্রভাব। তিনি খঞ্জনি বাজিয়ে হরিয়ানার কথ্য ভাষায় বিদ্রোহের গান গাইতেন আর জনতা যেন গানের তালে তালে দুলে উঠত। তাঁর সভাতে যত লোকের ভিড় হয়, কোনো বড়ো বড়ো সভাতেও তা হয় না। ভূরেসিং ইংরেজী শুনলেই চটে উঠতেন, বলতেন— কি গিট্টি-পিট্টি করছ হে? সোজাসুজি নিজেদের ভাষাতে কথা বলো-না বাপু, আমাদেরও মগজে তা হলে ঢোকে। নিজেদের ভাইদের সঙ্গে কথা বলবে তো আবার অন্য ভাষার পর্দা কেন, শুনি? জনতা আমাদের কথার নতুন নতুন অর্থ খুঁজে পাবে, তা নয়: কোথায় সেই ইংরেজদের বোঝাতে, তাদের খুশি করতে কেন শুধু গিট্টি-পিট্টি কর হে?

ইংরেজী ধনসিং-ও বুঝত না। ও ভূরেসিং-এর এই কথাটা খুব তলিয়ে দেখার চেষ্টা করত। ধনসিং-ও হিন্দুস্থানীতে কথা বলতে চেষ্টা করত কিন্তু হিন্দিতে একবার তর্কাতর্কি বেধে গেলে ওর মাথায় কিছুই ঢুকত না। সবচেয়ে বেশি তর্ক করত কম্যুনিস্ট পার্টি।

অন্য সঙ্গীদের চেয়ে ধনসিং-এর স্বাধীনতার প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশি। এই আশায় বুক বেঁধেই ও বেঁচে আছে। ইংরেজরাজ কায়েম থাকা মানে সারা জীবন ধরে ঘর-ছাড়া হয়ে দিন কাটানো: তার মানে সোমার সঙ্গে চিরকালের বিচ্ছেদ। যদি ধরা পড়ে তা হলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা ফাঁসি। তাই ইংরেজ সরকারের পরাজয় আর দেশের স্বাধীনতালাভ— এ নিয়ে ওর ঔৎসুক্য একেবারে পাগলামিতে দাঁড়িয়েছিল। খবরের জন্য ও কেমন যেন পাগলের মতো করত। যে-সব কয়েদী নম্বরদার, রাজনৈতিক বন্দীদের এলাকার বাইরে যাওয়া-আসা করত, ধনসিং তাদের ডেকে ডেকে খবর জিজ্ঞেস করত। উর্দু খবরের কাগজের জন্য ও যেন সব-কিছু করতে রাজি ছিল।

জেলে 'সি'-ক্লাস কয়েদীদের খবরের কাগজ দেবার হুকুম ছিল না।

কিন্তু রাজনৈতিক বন্দীদের হাতে কাগজ পৌঁছতই। রাধে চৌধুরীর খুব কাগজ পড়ার নেশা। তিনি নিজের সঙ্গীদের ও জেল অফিসারদের যেন দেখিয়ে দিতে চাইতেন, সরকার আর যাই-কিছু পারুক ওঁর কাগজ পড়া বন্ধ করতে পারবে না। ওঁর বাড়ি দিল্লীতেই। জেলের ওয়ার্ডারদের সঙ্গে তিনি সাঁট করে আর টাকায় চার আনা কমিশন দিয়ে লুকিয়ে টাকা আনাতেন। সেই টাকার জোরে তিনি জেলে যা-খুশি-তাই নিয়ে আসতে পারতেন। যে কয়েদী মাসে ত্রিশ-চল্লিশ টাকা দেয়, সে বিশ-পঁচিশ টাকা মাইনের জেলের ওয়ার্ডারদের মালিকের চেয়ে কম কিসে! খবরের কাগজে জেলের নির্যাতনের কাহিনী ছাপত, তাই জেলে খবরের কাগজ যাতে না পৌঁছায়, অফিসররা সেজন্য বিশেষ সতর্ক ছিলেন। কোনো-কোনো দিন তো রাধে চৌধুরীকে দু'আনার খবরের জন্য দু'দুটো টাকা দিতে হত, কিন্তু নিজের জেদ বজায় রাখতে রাধে চৌধুরী তাতেও পেছ-পা নয়।

কয়েকজন কম্যুনিস্টকে কয়েক মাস আগে থেকেই বন্দী করে রাখা হয়েছিল। আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কাজ উদ্ধার করার এদের আলাদা কলাকৌশল ও সাঁট। খবরের কাগজ ও বইপত্র ছাড়া যেন কিছুতেই থাকতে পারে না। এমন-কি, এমনও হয়েছে যে রাধে চৌধুরীর খবরের কাগজ আসে নি কিন্তু তখনো এরা কাগজ ঠিক জোগাড় করেছে। জেল দপ্তরে কোনো প্রকারে খবরটা পৌঁছে যায়। সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক বন্দীদের ব্যাপারে যে জমাদার ছিল তাকে বদলী করে দেওয়া হল। তার জায়গায় ডিউটিতে এল জেলের সবচেয়ে কড়া আর ইমানদার জমাদার।

তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে। জেলের কারখানার কাজ বন্ধ হওয়ার ঘণ্টা বেজে গেছে! নৈতিক অপবাধে অপরাধী কয়েদীরা কাজ বন্ধ করেছে ; কম-সাজ-পাওয়া-মার্কা কয়েদীরা বাইরে মেহনত করতে যায়,

তারাও এসময়ে ব্যারাকে ফিরে আসে। তাদের কাছ থেকে এটা সেটা খবর পাওয়া যায়। রাধে চৌধুরীর কাগজ দু'দিন ধরে আসছে না। ধনসিং অধীর হয়ে বাইরে থেকে আসা কয়েদীদের পথ চেয়ে আছে ; ও পায়চারি করছে এবং গাছগাছড়ায় ভরা ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে এক-দৃষ্টে চেয়ে আছে।

কম্যুনিস্ট রাজনৈতিক বন্দী দিওয়ানচাঁদ ওর সামনে এগিয়ে এসে বলল— ঠাকুর, আজ দারুণ কাণ্ড হবে।

ধনসিং শঙ্কিত হল— কী ব্যাপার?

দিওয়ানচাঁদ ধনসিংকে এক কোণে ডেকে নিয়ে আস্তে আস্তে বলল— দু'দিন হল রাধে চৌধুরী খবরের কাগজ পায় নি। আজ আমাদের কাগজও নিশ্চয় কেড়ে নেবে। আমাদেরটাও যদি কেড়ে নেয় তা হলে জেলে আর কাগজই আসতে পারবে না। জেলের খবর আসা-যাওয়াও বন্ধ হয়ে যাবে।

দিওয়ানকে একটু যেন চিন্তান্বিত দেখাল।

ধনসিং-এর মন আশঙ্কায় ভরে গেল, বলল— কী রকম?

দিওয়ানচাঁদ বলল— শুনলাম, ঐ জমাদার নিহালসিং নাকি ঝাড়ুদারদের আবর্জনার বালতিতেও তল্লাসী চালায়। ঐ জমাদারটা নাকি তিন নম্বর ব্যারাকে এক ঝাড়ুদারের বালতিতে একটা বিড়ির বাণ্ডিল খুঁজে পেয়েছিল এবং এই বিরাট কাজের স্বীকৃতিতে ওকে নাকি এখানে পাঠানো হয়েছে। আমাদের কাগজ নিয়ে আসে কুন্দন মেথর : কাউকে আবার এ কথা বোলো না যেন। কুন্দন যদি ধরা পড়ে, তা হলে রাজনৈতিক বন্দীদের হাতে এক টুকরো কাগজও আ-স-তে পারবে না। আমাদের নিজেদের লোক যেন ধরা না পড়ে, এটাই চাই।

ধনসিং আগ্রহ প্রকাশ করল— তারপর?

দিওয়ানচাঁদ আঙুলের ইশারায় ধনসিংকে এতক্ষণ বোঝাচ্ছিল।

সামনে একজন নম্বরদার দাঁড়িয়ে ছিল ; তাকেও দিওয়ান ইশারায় ডাকল।

কারখানা ও অন্য জায়গায় কর্মরত কয়েদীরা দলে দলে ব্যারাকে ফিরছে। জমাদার নিহালসিং দু'জন নম্বরদারী কয়েদীর সাহায্যে ফিরতি কয়েদীদের বগল, কোমরবন্দ আচ্ছা করে হাতড়ে তল্লাসী করছিল। কারো কারো পাজামা-লঙ্গোটি পর্যন্ত খুলে তল্লাসী নেওয়া হচ্ছে। তল্লাসী নেওয়া এখানকার রোজকার ব্যাপার। এত কড়াকড়ি সত্ত্বেও কয়েদীদের কাছ থেকে কিছু-না-কিছু আপত্তিজনক জিনিস পাওয়া যাচ্ছে ; কারো কাছে লোহার ধারাল পাত, বা পকেট-কাটার ব্লেড আবার কারো কাছে তামাক। জমাদার এক দাগীর জিম্বায় সে-সব জিনিস রাখছে।

ঝাড়ুদারের দল তল্লাসীর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। প্রথম নম্বর ঝাড়ুদার কুন্দন এগিয়ে এল। হঠাৎ ব্যারাকে এক বিকট চিৎকার শোনা গেল— মেরে ফেলল, মেরে ফেলল। দেখা গেল রোগা-পাতলা দিওয়ানচাঁদ মাথায় জুতো জোড়া নিয়ে ভয়ে দৌড়চ্ছে আর ধনসিং এক নম্বরদারের হাত থেকে ছোটো ডাণ্ডাটা ছিনিয়ে নিয়ে গালি দিতে দিতে ওর পিছু ছুটছে ; ধনসিং-এর পেছনে এক নম্বরদার। দিওয়ানচাঁদকে বাঁচানোর জন্য অন্য দিক থেকে ওয়াজিদ চেঁচামেচি করতে করতে মাঝখানে দৌড়ে এল আর খুব জোর ধমকানি চিৎকার আর ডাকাডাকি শুরু করে দিল।

কী হোল, কী হোল— হৈ-চৈ করতে করতে আরো কয়েকজন রজেনৈতিক বন্দীও সেখানে এসে পড়ল।

জমাদার নিহালসিং ফটকের তল্লাসীর কাজটাজ ছেড়ে সিটি বাজিয়ে ঘটনাস্থলে দৌড়ে এল। ওর ওপর জেলারের নির্দেশ ছিল, রাজনৈতিক বন্দীদের পিটুনী দেবার কোনো সুযোগ যেন হাত-ছাড়া না করে এবং সেরকম সুযোগ এলে ওদের বদমাশ ও দাগী চোর বলে প্রমাণ করার

চেষ্টা করে। জমাদার সিটি বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে সিটি বেজে উঠল; জেল ফটকের ঘণ্টা বাজতে লাগল— ঢং, ঢং, ঢং।

— 'পাগলা ঘণ্টা বাজল রে, পাগলা, পাগলা'— চারিদিকে চিৎকার চেঁচামেচি। কয়েদীরা সব ব্যারাকের দিকে দৌড় লাগাল। ঝাড়ুদারের দল নিজেদের ঝাড়ু বালতি সামলে ভেতরে চলে এল। পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে জেলের আড়াই হাজার কয়েদীকে তালা বন্ধ করা হল।

রাজনৈতিক বন্দীদের ব্যারাকে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল। রাধে চৌধুরী ও তার সঙ্গীরা বলল— যদি কম্যুনিস্ট শালারা ধনসিং-এর সাজা দেওয়ায় তো দেখে নেব।

কেউ কেউ বলল— শালাদের 'কম্বল-ঢাকা-মার' দিয়ে শায়েস্তা করতে হয়।

—ওদের বয়কট করা হোক।

ততক্ষণে সুপারিন্টেনডেন্ট সাহেব, জেলর, জেলের অন্য অফিসাররা, বন্দুকধারী সেপাইদের সঙ্গে নিয়ে রাজনৈতিক ব্যারাকের সামনে এসে গেছেন। ধনসিং, দিওয়ানচাঁদ ও ওয়াজিদকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁদের সামনে হাজির করা হল। ওদের হাতকড়ি পরানো হয়েছে। এই হাঙ্গামায় ধনসিং দু-তিন জায়গায় চোট পেয়েছে।

জেলর সাহেবকে বুঝিয়ে দিয়েছে এটা কম্যুনিস্ট ও কংগ্রেসী বন্দীদের মধ্যে ঝগড়ার ব্যাপার। সাহেব গলায় মধু ঝরিয়ে ধনসিংকে দেখিয়ে দিওয়ানচাঁদকে প্রশ্ন করলেন— এই বদমাশ তোমাকে মেরেছে?

দিওয়ানচাঁদ উত্তর দিল— না, আমাকে কেউ মারে নি।

সাহেব ঠোঁট কামড়ে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে দিওয়ানচাঁদের দিকে তাকালেন, তারপর ঠোঁট চেপে ধনসিংকে জিজ্ঞেস করলেন— তুমি ওকে মেরেছ?

অ্যাসিস্টেন্ট জেলর এগিয়ে এসে বলল— ধনসিং দিওয়ানচাঁদকে মেরেছে। নম্বরদার ধনসিংকে বাধা দিতে যাওয়ায় ধনসিং নম্বরদারের ডাণ্ডা ছিনিয়ে নিয়ে তাকেও ধরে পেটায় এবং দিওয়ানচাঁদের পেছনে ছুটতে থাকে। ধনসিং ওয়াজিদকেও মেরেছে আর নম্বরদার কৃপা বাধা দেবার চেষ্টা করলে তাকেও পেটায়। কয়েকজন কংগ্রেসী কয়েদীও নম্বরদারদের মারার জন্য দৌড়ে এসেছিল। মারপিটের সময় কে কে ছিল এখন সনাক্ত করা মুশকিল।

সাহেব ঘটনার বিবরণ শুনলেন কিন্তু দিওয়ানচাঁদ বা ধনসিংকে আর কোনো প্রশ্ন করলেন না। ইংরেজীতে জেলরকে বললেন— এরা সাংঘাতিক ঘুঘু। নিজেদের মধ্যে আপসে সমঝোতা করে নিয়েছে।

অ্যাসিস্টেন্ট জেলর মন্তব্য করল— হুজুর, এখন তো ওরা একটা বোঝাপড়া করে নিয়েছে কিন্তু ব্যারাকে বন্দী করে রাখলে রাতে মারপিট করতে পারে। হুজুরের হুকুম হলে ওদের নির্জন সেলে আটকে রাখি।

দিওয়ানচাঁদ আপত্তি জানাল— সাহেব, আপনি রাজনৈতিক বন্দীদের নামে কালি দেবার জন্য মিথ্যেমিথ্যে দাঙ্গার বদনাম দিচ্ছেন। আমরা গায়ের জোর বাড়াবার জন্য কপাটি খেলছিলাম। নম্বরদার এসে আমাদের ওপর দাঙ্গাবাজি শুরু করে দিল। সব-কিছু এই জমাদারের কারসাজি। আমাদের শুধু শুধু হাঙ্গামায় ফেলার জন্য জেলর এই জমাদারটাকে এখানে পাঠিয়েছে। এই জমাদার যখনই এই হাতায় আসে তখনই কোনো না-কোনো ফ্যাসাদ বাধে। মিথ্যে বদনাম দিয়ে আমাদের বেইজ্জতি করার চেষ্টা চলেছে। আপনি যদি ন্যায়ভাবে এর একটা ফয়সলা না করেন তো আমরা শহরের কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ করতে বাধ্য হব।

প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়তে পড়তে সাহেব নিজেকে সামলে নিলেন, উত্তর দিতে তাই বোধহয় একটু দেরি হল। কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে

জেলরকে বললেন— এই লোকগুলোকে একসঙ্গে রেখে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-মারামারি করতে দাও। একটা হাঙ্গামা হুজ্জত হলে বাইরের আদালতে পাঠিয়ে এদের সাজা দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

কিন্তু জেলের ভেতরে এই হাঙ্গামার পরেও রাজনৈতিক বন্দীদের একেবারে কোনো সাজা না দিলে জেলের রবরবা বজায় থাকবে না, তাই সাহেব দিওয়ানচাঁদ, ধনসিং আর ওয়াজিদকে দু'দিন নির্জন কুঠুরীতে বন্দী করে রাখার আদেশ দিলেন।

রাজনৈতিক বন্দী-ব্যারাকে আর-একটা উত্তেজনা দেখা দিল। কম্যুনিস্ট জয়রাম আর সোসিয়ালিস্ট অর্জুনলাল বলল— ধনসিং আর দিওয়ানচাঁদ দু'জনেই সাফ জবাব দিয়েছে যে ওদের মধ্যে কোনোরকম ঝগড়া হয় নি। তা হলে এই সাজা কিসের জন্য ? জেলের লোকেরা আমাদের এই ধরনের অপমান করলে আমরা অনশন ধর্মঘট করব।

রাজনৈতিক বন্দীরা এই বিষয়ে আলোচনা করতে একটা সভা ডাকল। রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে সোমনাথজীর কদর সবচেয়ে বেশি। শহরেও ওঁর খুব সুনাম। তিনি কংগ্রেসের একজন প্রবীণ নেতা ও কর্মকর্তা। বাড়িতে সম্পত্তি ও টাকাপয়সার ছড়াছড়ি কিন্তু গরিব দুঃখীর কষ্ট দেখে তিনি স্বেচ্ছায় সব ত্যাগ করে তপস্বীর জীবন বরণ করে নিয়েছেন।

সরকারি হুকুম-মতো সোমবাবু 'এ'ক্লাস রাজবন্দী কিন্তু এটা তাঁর নিজের পছন্দ নয়। তিনি 'সি'-ক্লাস বন্দী হিসেবেই নিজেকে ভাবেন। সোমনাথজী জেলের খানা খেতেন না। নিজের খরচায় আপেল, দুধ আর কিছু ফল কিনে খেতেন। মিলের সুতোয় বোনা জেলের কাপড়ও তিনি পরতেন না। খাঁটি খদ্দরের একটা গামছা মতন পরে নিতেন আর গায়ে পশমের একটা শাল। সারাদিন তকলীতে সুতো কেটে অথবা বই পড়ে কাটত। লুকিয়ে-চুরিয়ে খবরের কাগজ পড়াটা তিনি

আদর্শবিরুদ্ধ কাজ বলে মনে করতেন। অন্যের কাছে খবর জেনেই তিনি খুশি।

সবাই মিলে খুব অনুরোধ করায় সোমবাবু সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। নওজওয়ান সাথী অর্জুনলাল ও জয়রামের অনশন ধর্মঘটের প্রস্তাব তিনি সমর্থন করলেন। জেলওয়ালারা যা অপমান করেছে তার বিরুদ্ধে লড়াই করাই উচিত। কিন্তু অনশন প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন রাধে চৌধুরী। তাঁর বক্তব্য, জেলরকে গালিগালাজ করে কষে যদি উত্তমমধ্যম দেওয়া যায় তবেই এই অপমানের বদলা নেওয়া হয়। নিজেরা অনশন করে শুধু শুধু খিদেয় মরব কেন? রাধে চৌধুরী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন— আমরা ভাত খাব না বলে যদি মেয়েদের মতো ফোঁস ফোঁস করি কী লাভ তাতে? এত বরং সরকারেরই লাভ, কারণ এতে সরকারের দানাশস্য বাঁচবে। গালিগালাজের তুবড়ি ছুটিয়ে বলে গেলেন —কোন মাদর··· আমাদের সাজা দিয়ে দেখুক-না, শালাদের মাথা ফাটিয়ে দেব-না। আমরা লড়াই করে নিজেদের অধিকার বুঝে নেব।

নেশাভাঙ চলে এমন চার-পাঁচ জনের সঙ্গে রাধে চৌধুরীর গলায় গলায় দোস্তি। কষে তেল মালিশ করে কসরৎ করা আর মাঝে মাঝে গান্ধী ও নেতাজীর জয়ধ্বনি ওদের কাজ। বাইরে থেকে মিষ্টি আনা হয়েছে; গপাগপ্ মুখে পুরে ওরা তখন তামাক টানতে ব্যস্ত। ওরা সবাই রাধে চৌধুরীকে সমর্থন জানাল।

জয়রাম আর অর্জুনলাল বোঝাতে লাগল— গালিগালাজ করে সাহেব বা জেলরকে পেটালে অবস্থা শোধরানো যাবে না বরং আরো বিগড়োবে। জেলের লোকেরা আমাদের উপর লাঠি চার্জ করার ছুতো পেয়ে যাবে আর লোকেরা আমাদেরই দোষী ভাববে। অনশন ধর্মঘটে ভীরুতার পরিচয় নেই। সত্যাগ্রহের হাতিয়ার হিসাবে এটা মহাত্মাগান্ধী আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন।

রাধে চৌধুরীর সঙ্গীসাথীরা তালি বাজিয়ে হো, হো করে 'লুলু হৈ, লুলু হৈ' চীৎকার-হট্টগোল বাধিয়ে দিল। তবুও অধিকাংশ যুবক জেলের এই অপমানের প্রতিবাদে অনশন ধর্মঘট করার দাবি জানাল। ওরা চাইছিল ওদের নেতা সোমবাবু ওদের পক্ষ থেকে সাহেবকে গিয়ে অনশন ধর্মঘটের নোটিশ দিন। সোমবাবু তাতে রাজী হলেন না দেখে অর্জুন-লাল আর জয়রাম এই নোটিশ নিয়ে যেতে প্রস্তুত আছে বলে জানাল। তবে ওদের অনুরোধ, সোমবাবু যদি অনশন ধর্মঘট করেন তবে খুবই ভালো হয়।

সোমবাবু কম্যুনিস্ট আর সোসিয়ালিস্টদের চালাকি বুঝে গেছেন। তিনি জানেন যে, এ-সব লোকেরা সব সময় তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি ভণ্ডুল করতে চাইছে। তিনি বোঝালেন — যদি জেলের লোকেরা নিজেদের নিয়মকানুন অনুযায়ী আমাদের কোনো শাস্তি দেয় তবে সে শাস্তি বিনা প্রতিবাদে আমাদের সহ্য করে নিতে হবে। ওটাই আমাদের আত্মিক বল। অত্যাচার যদি বাড়তে দেওয়া হয় তবে তার নিজের নিয়মে নাশ হবে। গীতায় উল্লেখ আছে, যখন অধর্মের প্রাবল্য বাড়ে তখন স্বয়ং ঈশ্বর অবতার হয়ে জন্ম নেন এবং জগতে ন্যায় ও ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন। আমাদের যদি অনশন করতে হয় তবে তা করতে হবে আত্মিক শুদ্ধির জন্য, জেলওয়ালাদের বিরোধিতা করার জন্য নয়। গান্ধীজী কখনো কারো বিরোধিতা করার জন্য উপবাস করেন নি, প্রায়শ্চিত্তের জন্য করেছেন। প্রেম ও ভালোবাসা দিয়েই জেলের কর্তৃপক্ষ ও সরকারের হৃদয় পরিবর্তনের চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু আপনাদের ব্যবহারে হিংসার ভাবই ফুটে উঠছে। আপনারা জেল-ওয়ালাদের ভয় দেখাতে চাইছেন। গান্ধীজীর আদেশ, আমরা যেন জেলে গিয়ে তপস্যা করি, জেলের যা নিয়মকানুন তা যেন আমরা পালন করি। কিন্তু আপনারা তো লুকিয়ে চুরিয়ে খবরের কাগজ আনেন।

অর্জুনলাল বাধা দিল — বাবুজি, যদি জেলের ভেতর নির্দয় নিয়ম-গুলি আমরা মেনে নিই, তবে জেলের বাইরে গিয়ে আমরা নিয়ম ভাঙি কেন ? ইংরেজ সরকারের একটাই নিয়ম : সব ভারতবাসীকে অনুগত গোলাম করে রাখো। তবে এই নিয়মকেই আপনি মেনে চলুন না। স্বাধীনতাই বা চাইছেন কেন ? স্বাধীনতা চাওয়া তো সরকারের বিরোধিতা করা। আমরা খবরের কাগজের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাব ; না মেলে তো তার প্রতিবাদে অনশন ধর্মঘট করব। আমরা জানোয়ার নই, আমরা মানুষ।

সোমবাবু সংযত স্বরে উত্তর দিলেন— যদি আপনারা গান্ধীজীর মতের বিরুদ্ধাচরণ করেন তবে আমি মহাত্মাজী ও অন্য সব নেতাদের এই ব্যাপারে চিঠি লিখে জানাব যে, আপনারা কংগ্রেসের সদস্য হবার যোগ্য নন। যদি আবশ্যক হয় তবে জেলওয়ালাদের প্রতি আপনাদের এই অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আমি আমরণ অনশন করব। যখনই ভারতবাসী ইংরেজ বা সরকারের প্রতি হিংসা বা অন্যায় ভাব দেখিয়েছে, মহাত্মাজী উপবাস করে তার প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। আমাকেও তাই করতে হবে।

জয়রাম, অর্জুনলাল আর ওয়াজিদ সোমবাবুর কথার উত্তর না দিয়ে ছাড়ত না কিন্তু তৎক্ষণে রাধে চৌধুরীর দলবল জোরে চেঁচিয়ে উঠেছে — মহাত্মা গান্ধীজী কী জয়। ওরা কাউকে কিছু বলতেই দিল না। কেউ কিছু বলার উপক্রম করলেই গান্ধীজীর জয়ধ্বনি তুলে ওরা সোর-গোল করতে লাগল। আবার এদিকে শাসিয়ে রাখল— যে শালা স্টালিনের পুত্তুরদের কথায় অনশন করবে তাকে কম্বল ধোলা করে ছাড়া হবে।

"কম্বল ধোলা" জেলের পিটুনির একটা নিজস্ব নিয়ম যাতে শাস্তি-ভোগীদের শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে ; দারুণ কষ্ট হতে থাকে অথচ কে-যে

কোথা দিয়ে হাত চালিয়ে দিচ্ছে তা সে বুঝতেও পারে না। হরতাল হতে পারল না। ধনসিং এই ঘটনায় খুব কষ্ট পেল; দিল্লীর জেলে কখনো এত ব্যথা পায় নি। ওর ইচ্ছে হল, রাধে চৌধুরীকে বেশ দু'ঘা বসিয়ে দেয়। কিন্তু দিওয়ানচাদ, অর্জুনলাল আর ওয়াজিদ মানা করল। ওরা বলল জেলওয়ালাদের সামনে রাজনৈতিক বন্দীর উপর চোটপাট করাটা ঠিক হবে না। সোমবাবুর ত্যাগের জন্য ধনসিং তাঁকে এতদিন শ্রদ্ধা করে আসছিল। কিন্তু এখন ইচ্ছে হচ্ছে সোমবাবুর মুখের ওপর থুথু ছিটিয়ে আসে।

ব্যারাকে রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে মতবিরোধটা জোরদার হয়ে উঠতে লাগল। জেল কর্তৃপক্ষ ওদের ব্যাপারে নিয়মকানুন আরো কড়াকড়িভাবে প্রয়োগ করতে শুরু করল। আগে অল্প-বিস্তর নিয়মভঙ্গ ক্ষমার চোখে দেখা হত কিন্তু এখন ছোটোখাটো অপরাধের জন্যেও তাদের লাইনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হত। রাজনৈতিক বন্দীদের আজকাল জাঁতা ঘোরাতে হয় দড়ি বানাতে বাধ্য করা হয়।

দিওয়ানচাঁদ ধনসিংকে বুঝিয়ে বলেছে, ওদের খবরের কাগজ যে আসছে বা সেদিনকার ঝগড়ার পিছনে যে রহস্য তা যেন কাউকে না বলে। রাজনৈতিক বন্দীদের হাতে কিছু গুপ্তচর আছে কিন্তু।

ব্যারাকে মতবিরোধের ঝড় আর অফিসরদের দৃঢ় মনোভাবের ফলে দিওয়ানচাঁদের খবরের কাগজ আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ধনসিং-এর মনটা খুব খারাপ থাকে। বাইরের দুনিয়ায় বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ছে কিনা, জাপানীদের হাতে হেরে ইংরেজরা কোথায় পালিয়ে যাচ্ছে — এ-সব খবর আসা বন্ধ হওয়ায় ধনসিং-এর মনে হয় স্বাধীনতার দরজা খুলতে গিয়েও হঠাৎ যেন আবার বন্ধ হয়ে গেছে। ভবিষ্যৎ জীবনের আশার রঙিন স্বপ্ন ভেঙে পড়ে; ধনসিং ভাবে সোমার সঙ্গে মিলবার আর কোনো আশা নেই।

খবরের কাগজের সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ধনসিং, দিওয়ানচাঁদ আর ওয়াজিদ ও আরো কয়েকজনের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। জেলে এসে ধনসিং শুনল, এরা কম্যুনিস্ট ; ওর মনে পড়ল ভূষণের সহৃদয়পূর্ণ ব্যবহার, আর এদের প্রতি একটা সুপ্ত আকর্ষণ তখন থেকেই অনুভব করছিল। ও জানত, কমরেডরা মজদুরদের দরদী বন্ধু হয় ; কিন্তু জেলে এসে এ কথাও শুনল, কম্যুনিস্টরা জাপানীদের বিপক্ষে : বড়ো আশ্চর্য, কারণ জাপানীরা আমাদের শত্রু ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়ছে, অথচ রাশিয়ার হুকুম পেয়ে কম্যুনিস্টরা ইংরেজদের সহযোগিতা করতে শুরু করে দিয়েছে। এই-সব বিভিন্নতা ও বিভেদের কারণ অর্জুনলাল ধনসিংকে বুঝিয়ে দিয়েছে।

অর্জুনলালকে ধনসিং খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখে। চাঁদনীচকে পুলিশ যখন বেধড়ক লাঠি চার্জ করছিল তখন ধনসিং অর্জুনলালকে নির্বিবাদে সে লাঠির মার সহ্য করতে দেখেছে। প্রচুর পড়াশুনা করেছে অর্জুন-লাল। ধনসিংকে অর্জুনলাল বলেছে যে, প্রথমে কানপুরে সে মজদুরদের মধ্যে কাজ করত এবং পরে দিল্লীতে মিলের মজদুরদের একজন নেতা হয়ে ওঠে। কম্যুনিস্টদের সঙ্গেও এ-ব্যাপারে ওর মতবিরোধ ও ঝগড়া হয়েছে : ও বলেছে— তোমরা ইংরেজদের সঙ্গে গিয়ে হাত মিলিয়েছ এবং কংগ্রেসীদের গ্রেপ্তার করাচ্ছ। অর্জুনলাল ওকে আরো বুঝিয়েছে যে, কম্যুনিস্টদের লম্বা-চওড়া কথাবার্তা ও তর্ক-বিতর্কের মধ্যে ও যেন না যায়। অর্জুনলাল এও আশ্বাস দিয়েছে যে, যদি আর ছ'মাসের মধ্যে ভারত স্বাধীন না হয় তবে সে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে এবং বিপ্লবের কাজে অংশ নেবার সুযোগ করে দেবে।

রাধে চৌধুরীর পেটে প্রায়ই ভীষণ ব্যথা উঠছিল। কয়েকদিন জেলের হাসপাতালে রইলেন কিন্তু নিরাময় হন নি দেখে তাঁকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। ব্যারাকটা আবার বড়ো নিঃসঙ্গ হয়ে

উঠছিল। চুরিচামারি করে আবার খবরের কাগজ আনা হচ্ছে ; এখন আরো অনেক সাংঘাতিক সব খবর পাওয়া যাচ্ছে। জাপানীরা বর্মা দখল করে আসামের দিকে এগিয়ে আসছে। বাংলার কয়েকটি জায়গায় এবং কলকাতায় বোমা পড়ার খবর আছে। কয়েদীরা এ-সব শুনে উৎসাহিত হয়ে উঠল ; তারা ভাবল, জাপানী সৈন্য ও আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সেপাইরা ইংরেজদের শিগ্গিরই মেরে ভাগাবে। ওদের মনে জেল থেকে মুক্তি পাবার আশা জাগে।

অর্জুনলাল আর ধনসিং-এর জেল থেকে ছাড়া পাবার সময় হয়ে আসছিল। খবর এসেছে যে, গান্ধীজী অনশন শুরু করেছেন। এ অনশনের কারণ লোকেরা ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। দিওয়ানচাঁদ, ওয়াজিদ ও আরো বেশ কয়েকজন কম্যুনিস্ট জেল থেকে মুক্তি পেয়ে চলে গেছে ; কিন্তু তাদের কয়েকজন শিষ্য এখনো জেলে। তারা বলল, কংগ্রেস হিংসার পথ বেছে নিয়েছে বলে ইংরেজ সরকার যে বদ্ধমূল ধারণা করে বসে আছেন— তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতেই গান্ধীজী এবার অনশন শুরু করেছেন।— আমরা তো আগের থেকেই বলছিলাম এ-সব ভাঙো-ফাটাও-এর আন্দোলন কংগ্রেসের হতে পারে না ; শত্রু মাথার ওপরে জেনেও শত্রুদের মোকাবিলা করার শক্তিটাকে এভাবে অপব্যয় করার কোনো মানে হয় ? ভেবে পাই না. কংগ্রেস নেতারা এত মূর্খামি করছিল কেন ! এ যে ইংরেজ গোলামশাহীর ধূর্তোমি তা তো খুবই স্পষ্ট। কংগ্রেস নেতাদের এ অন্যায্য নীতির ফলে জনতা শুধু শুধু মার খাচ্ছে আর দমন ও অত্যাচারে তারা রীতিমতো ভড়কে গেছে। এখন যে-কোনো সমঝোতা বা চুক্তি করার জন্য তারা বাহানা খুঁজছে। সোসিয়ালিস্টরাও এই চালে বোকা বনে গেছে।

তরুণরা এ-সব কথাবার্তা শুনে বিচলিত হয়ে পড়ল। ওরা বুঝে গেল আন্দোলনে ভাগ নিয়ে জেলে যাওয়া মূর্খামি। গান্ধীজী এ-সব পছন্দ

করেন না। ধনসিং-ও খুব বিষণ্ণ। বিবশ হবার তার সবচেয়ে বড়ো কারণ, ও আবার সেই গোলাম দেশ আর আমলাতন্ত্র ইংরেজ শাসনব্যবস্থার মধ্যেই ফিরে যাচ্ছে। নিজের পাহাড়ী দেশে ফিরবার কোনো পথ নেই : সোমার সঙ্গে ঘর করার সাধ বুঝি অপূর্ণ রয়ে গেল।

* * *

অর্জুনলাল ও ধনসিং জেল থেকে বেরিয়ে এসে দেখে চারিদিকে আতঙ্ক ও নিরুৎসাহের ছায়া। মহাত্মা গান্ধীর এ অনশনে জনতা নির্বাক্ হয়ে গেছে। লোকেরা সাধারণভাবে এটাই ধরে নিয়েছে যে, জেল থেকে বেরিয়ে গান্ধীজী যাতে আবার আন্দোলনের হাল ধরতে পারেন সেইজন্যই তিনি অনশন করছেন। সরকার নিরঙ্কুশ দমন-নীতি চালিয়ে জনতার মধ্যে একটা ভয়ানক আতঙ্ক ছড়িয়ে ফেলেছে। স্বাধীনতার আন্দোলন বা সরকার-বিরোধী কোনো মিছিল কোথাও আর বেরুতে দেখা যায় না। সামগ্রিক ও সর্বজনীন আন্দোলন বা মিছিল ও প্রদর্শনী একেবারে বন্ধ হয়ে গেলেও ইংরেজ সরকারের প্রতি জনতার ঘৃণা ও বিদ্বেষ আরো গভীর হল। সরকারের প্রতিটি কাজ জনসাধারণ সন্দেহের চোখে দেখতে লাগল ; সব কাজেই তারা সরকারের দুর্বলতা ও অসহায়তা খুঁজে পেত। খাদ্যশস্যের ভয়ানক অভাব. লুঠ-মার যাতে না হয় সেই আশঙ্কায় সরকার রেশনিং ব্যবস্থা চালু করলেন। আর জনসাধারণ সেটাকে অন্যভাবে নিল : তারা ভাবল, লড়াইয়ের জন্য প্রচুর খাদ্যশস্য সরবরাহ করার প্রয়োজনে সরকার তাদের অন্ন কেড়ে নিচ্ছেন।

জানুয়ারি মাসে জাপানীরা কলকাতার মাথার ওপর এসে তিন-তিনবার বোমা ফেলে গেছে। দিল্লীতে সরকারী ইমারতগুলি বালির

বস্তা ও পর্দা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। বোমা বিস্ফোরণের হাত থেকে বাঁচবার জন্য জায়গায় জায়গায় পরিখা খনন করা হয়েছে। বড়ো বড়ো শহর সরকার অন্ধকার করে রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন ; যাতে শত্রু-পক্ষের বিমান বোমা ফেলার নিশানা খুঁজে না পায়। শত্রু-বিমান যখন বোমা ফেলতে আসবে তখন গোটা শহরটাকে যাতে ঘন অন্ধকারে ঢেকে ফেলা যায় সরকার তারও ব্যবস্থা করেছেন। কখনো কখনো ব্ল্যাক-আউট মহড়া চলে ; এ-বিষয়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে। জনসাধারণ সরকারের এই-সব ব্যবস্থার মধ্যে ভীরু মনের পরিচয় পায় : জনসাধারণের জীবনরক্ষার জন্য সরকার যে-সব হুকুমনামা জারি করেছেন জনতা সেগুলি উপেক্ষার চোখে দেখে ; উপেক্ষা করে নিয়ম ও নির্দেশ লঙ্ঘন করে জনতা খুশি হয়। সমস্ত দেশের জনসাধারণ সরকারের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষে জ্বলতে থাকে কিন্তু বাইরে থেকে তা বোঝার উপায় নেই ; ভেতরে. মনের গভীরে সে ঘৃণা ও বিদ্বেষের প্রবাহ।

অর্জুনলাল. ধনসিংকে নিয়ে দিল্লীতে ওর বন্ধুবান্ধব ও পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা করতে গেল। তরুণসমাজ গত আগস্ট-আন্দোলনের মতো প্রচণ্ড একটা আন্দোলন আবার শুরু করে দিতে যায়। অর্জুন-লাল এক সমাজবাদী নেতার সঙ্গে দেখা করতে গেল। তিনি নাকি অসুস্থ ও এ বিরাট কাজ করতে অসমর্থ। গান্ধীবাদী নেতারা পরামর্শ দিলেন— একটু ধৈর্য ধরো, একটু অপেক্ষা করো। গান্ধীজীর উপর বিশ্বাস রাখো। গান্ধীজী উপবাসের পরে সরকারের সঙ্গে পত্র-বিনিময় করবেন এবং তখন একটা পথ আমরা খুঁজে পাব।

দিল্লীর রেল মজুরদের মধ্যে অর্জুনলালের একসময় খুব প্রভাব ছিল। জেল থেকে বেরিয়ে এসে অবস্থাটা ভালো করে বোঝার জন্য সে মজদুরদের বস্তিতে বস্তিতে ঘুরতে লাগল। এখানে কম্যুনিস্টরা খুব জমিয়ে বসেছে। অর্জুনলাল জেলে যাবার আগে পর্যন্ত কম্যুনিস্ট

পার্টি করা আইনবিরুদ্ধ ছিল। কম্যুনিস্ট মজতুর সভা বা অন্য কোনো সংগঠনের কাজকর্ম লুকিয়ে-চুরিয়ে হত; গোপনে ও আড়ালে সব কিছু করতে হত। এখন এরা খোলাখুলি প্রচারকার্যে নেমে পড়েছে। একটা নতুন র‍্যাডিকাল ডিমক্রাটিক পার্টি গঠন করা হয়েছে। এই পার্টি ইংরেজদের প্রজাতন্ত্রের রক্ষক বলে প্রচার করতে লাগল, এবং বোঝাতে শুরু করল যে, এই যুদ্ধে কেন ইংরেজদের সহায়তা করা উচিত।

জাপানের এই আক্রমণের সময়, শত্রুকে দমন করার এই বিপর্যয়ের দিনে কোনোরকমে শক্তিক্ষয় করা সমীচীন নয়; মজতুর ভাইরা যেন কোনোরকম হরতাল না করে; সরকার, তাদের দেশকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করছেন; এই যুদ্ধে তারা যেন সর্বপ্রকারে সরকারকে সহ-যোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। এই পার্টি এ-সব প্রচার করতে লাগল। এই তুটি পার্টি একই লাল পতাকা নিয়ে চলে অথচ এদের মধ্যে তুমুল মতবিরোধের অর্থ কী— জনতা তার কারণ ঠিক ঠাহর করতে পারত না এবং যারা ইংরেজদের সাহায্য করার জন্য হাঁকডাক ছাড়ছে জনতা তাদের ঘৃণার চোখে দেখতে লাগল।

কংগ্রেস সমাজবাদী নেতাদের বেশির ভাগই ফেরার হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তাঁদের খুঁজে বার করতে অর্জুনলালের তুটো দিন লাগল। অর্জুনলালের পকেটে যা পয়সা থাকে তাতে আজকাল দিন চালানো মুশকিল হয়ে উঠছিল; এতেও অর্জুনলাল বেশ তুশ্চিন্তায় পড়েছে। যুদ্ধের আগে ওর এক টাকা থেকে বারো আনা হলেই দিন চলে যেত; এখন জিনিসপত্রের দাম এত বেড়ে গেছে যে অর্জুনলাল দেড়-তু'টাকায়ও খরচ কুলিয়ে উঠতে পারে না। আগে টাকায় আঠারো সের শস্য পাওয়া যেত আর এখন পাওয়া যায় টাকায় চার সের।

একদিন রাত্রে অর্জুনলাল ও ধনসিং খুব চুপিচুপি আজাদ হিন্দ রেডিয়োর অনুষ্ঠান শুনল। রেডিয়োতে সমাজবাদী নেতারা পরামর্শ

দিলেন ; যে করে হোক আপনারা 42-আগস্টের বিদ্রোহ চালু রাখুন। জাপান আসছে। তারা ইংরেজদের উপড়ে ফেলবে। সেসময় ভারত স্বাধীন হবে। আমাদের মার খেয়েও ইংরেজদের ধাক্কা দিয়ে ফেলতে হবে এবং তাদের হাত থেকে রাজ্যশাসন কেড়ে নিতে হবে। আপনারা জনতাকে বোঝান, সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা করুক। কিষানদের বোঝান, সরকারের সৈন্যদের জন্য, রেশনের জন্য তারা যাতে শস্য না দেয় ; এতে সরকারের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ ফেটে পড়বে। জনতার বিদ্রোহে আর জাপানের মার খেয়ে ইংরেজ সরকার খতম হয়ে যাবে। গ্রামে গ্রামে আন্দোলন ছড়িয়ে দিন। মিলগুলি যদি গ্রাম থেকে কাঁচামাল না পায়, যদি ফৌজের জন্য তারা অন্ন না দেয়, যদি তারা সেপাই ভর্তি করতে না পারে তবে ইংরেজ সরকার সাত দিনও টিঁকতে পারবে না।

সায়গন রেডিয়ো থেকে সুভাষবাবুর বাণী শোনা গেল—"ভারতের কোটি কোটি গ্রামীণ জনতা তরুণ নেতাদের দিকে তাকিয়ে আছে ; তরুণ নেতারা বিপ্লবের নতুন পথ বাৎলাবে এজন্য গ্রামের মানুষ অপেক্ষা করে আছে। এই সময়ে ভারতীয় পুলিশ ও সৈন্যদের মধ্যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও প্রতিবাদের অগ্নিশিখা দাউ দাউ করে জ্বলছে। জনসাধারণ বিপ্লবের একটা বিস্ফোরণে ফেটে পড়ুক — তারা শুধু তারই প্রতীক্ষায়… !"

এ একটা অদ্ভুত পরিস্থিতি, একটা দারুণ সংঘর্ষের দিন। দেশের ভাগ্য নির্ণয়ের পক্ষে এমন প্রতিকূল সময় সহজে আসে না অথচ দিল্লীর নাগরিকরা হয় নৈরাশ্যের অন্ধকারে ডুবে আছে, আর না হয় সব-কিছু ভুলে যে-কোনো উপায়ে দিল-খুশ করার ধান্ধায় ব্যস্ত। বাজারে এত পয়সা যে কোথা থেকে ছড়াল কে জানে ! যেন পয়সার বৃষ্টি হচ্ছে। টাকার মূল্য হু হু করে কমে যাচ্ছে অথচ লোকেরা এমনভাবে পয়সা খরচ করছে যেন তারা রাস্তায় রাস্তায় আজকাল পয়সা কুড়িয়ে পাচ্ছে।

সিনেমা হলগুলিতে এত ভিড় যে, কুম্ভমেলায় তীর্থযাত্রীদের ভিড়কেও ছাড়িয়ে যায়।

অর্জুনলাল আর ধনসিং-এর মনে এই-সব লোকের প্রতি ঘৃণা জাগে। যারা সরকারের দমন-নীতিতে ভয় পেয়ে মাথা নত করে আছে, 'আজাদ হিন্দ' রেডিয়োর বাণী শুনে তাদের মনে আশা জাগে, উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়। ওরা ঠিক করল, গ্রামে গ্রামে গিয়ে বিপ্লবের কাজ করবে।

অর্জুনলাল ধনসিংকে বোঝাল— গ্রামে কাজ করা অনেক সহজ আর ওখানেই কাজ করা দরকার। ভারতের গ্রামে এখনো মনুষ্যত্ব বজায় আছে এবং আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতি বলতে যদি কিছু থাকে তবে সেটা আছে গ্রামেই। কৃষকদের মধ্যে এখনো অতিথিপরায়ণতার উদার গুণ নষ্ট হয়ে যায় নি : ওখানে শহরের মতো অবস্থা নয় ; যেখানে সবাই নিজেদের পেটের খোরাক জোগাড় করতেই ব্যস্ত। আমরা যদি গ্রামে যাই, দু'খানা রুটি আর এক ঘটি দুধ-মাখন অনায়াসে পাব। অর্জুনলাল দিল্লীর আশেপাশে আন্দোলন সংগঠন করার কাজে অংশ নিয়েছিল। তাই সে ধনসিংকে গ্রামের জীবনের কথা শোনাতে থাকল, ওর যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তা সব বলল। ছদ্মবেশী পুলিশ যাতে ওদের পেছনে না পড়তে পারে সেইজন্য ওরা রাত্রিবেলা দিল্লী থেকে মথুরার গাড়িতে চড়ে বসল। ওরা হাথরাস জেলার একটা গ্রামে যাবে ঠিক করেছে। ঐ গ্রামে অর্জুনলালের কিছু পরিচিত লোক আছে।

অর্জুনলাল কিছুদিন হাথরাসের মণ্ডীতে হিসাব-রক্ষকের কাজ করেছিল। ওর ব্যাবসার ব্যাপারটাও একটু মাথায় খেলে। ও ধনসিংকে নিয়ে মণ্ডীতে গেল। ফসলের মরশুম এটা নয় কিন্তু মণ্ডী তবুও খুব কর্মচঞ্চল। সরকারের এজেন্ট শস্য কিনছে ; নগরের পাইকারী ব্যাপারীরাও খুব চড়া দামে যা-পাচ্ছে কিনে নিচ্ছে। সরকারের সৈন্য-বাহিনীর ও রেশনিং-এর জন্য যত দামে হোক খাদ্যশস্য কিনবেই ; এটা

ভেবেই অন্য খরিদ্দাররাও যত পারে কিনে নিচ্ছে। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসের সওদা আরো বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে।

গুজব ছড়িয়েছিল যে, মণ্ডীগুলিতে কংগ্রেসের প্রভাবে কৃষকরা সরকারকে মালপত্র বিক্রি করছে না ; তাই সরকার গ্রামের অফিসরদের দিয়ে জোর করে খাদ্যশস্য কিনে নিচ্ছেন। অর্জুনলাল ধনসিংকে বোঝাতে লাগল — এই সময়ে গ্রামে গ্রামে গিয়ে বোঝাও, যদি তোমরা সরকারকে খাদ্যশস্য না দাও, তবে সরকারের আর্থিক ব্যবস্থার ভিত নড়ে উঠবে। অর্জুনলাল ও ধনসিং সিধেরা গ্রামের দিকে চলতে লাগল ; চোখে-মুখে ধুলো উড়ছে, তবুও তারা হেঁটে চলেছে। খেতের ফসল হাঁটু পর্যন্ত বড়ো হয়েছে। কাঁচা রাস্তা বলে ধুলো পায়ে পায়ে হাঁটু পর্যন্ত উঠে আসছে। ঠাণ্ডার দিন ; রোদের তেজ অতটা অসহ্য লাগছে না। কিন্তু তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে কাঠ। ওরা আখের খেত দিয়ে পাকদণ্ডীর পথে সোজা সিধেরা গ্রামের দিকে চলছে। সামনে দিয়ে আসছিল একজন কৃষক, মাথায় পাগড়ি-বাঁধা।

কৃষক নতুন মুখ দেখে জিজ্ঞেস করল - - আরে ওহে শহরিয়া, কোথায় যাচ্ছ শুনি ?

— গ্রামে যাব। অর্জুনলাল আত্মীয়তার স্বরে বলল।

— তা তো দেখতেই পাচ্ছি। বলি কোন্ গ্রামে যাচ্ছ ? তোমরা কে ? কৃষকের গলার স্বরে কাঠিন্য ফুটে উঠল।

—দাদু, অর্জুনলাল বলল— রাগ করছ কেন ? ভেবে নাও তোমারই দুয়ারে গিয়ে ঠাঁই নেব। আমাদের কেই-বা আপন, কেই-বা পর। কংগ্রেসী লোক। দেশের কথা বলতে এসেছি।

কৃষকটি লাঠিটার আগা উঁচিয়ে এদের ফিরে যেতে ইশারা করে তিক্ত স্বরে বলল— যেখান থেকে এসেছ, সেখানেই ফিরে যাও। নয়তো এই দেখে নাও লাঠি, অনেক লোকের প্রাণ নিয়েছি এই লাঠি দিয়ে।

তোমাদের মতো টুপি-পরা অনেক কংগ্রেস বেনিয়া দেখেছি, খুব দেখেছি। দেহাতীদের অনেক নাচিয়েছ তোমরা আর এদের নাচিয়ে তোমরা খেয়েছ। আজকে কৃষকদের দু'পয়সা ঘরে আনার সময় এসেছে আর তোমরা ছুটে এসেছ। ফিরে যাও। গাঁয়ে পা রাখবে তো মাথা ফেঁড়ে ফেলব।

অর্জুনলাল বিস্ময়ে হতবাক্ ; একটু ভয়ও পেয়েছে। তবুও সাহস করে বলল— দাদু, এত রেগে উঠছ কেন? আট মাইল পায়ে হেঁটে এসেছি। কোথাও এক ঘটি জল তো খেতে দাও ; খিদেও পেয়েছে খুব। দুটি রুটি খেয়ে না-হয় চলে যাব। রেগে উঠছ যখন লেকচার দেব না।

বুড়ো তাতেও রাজি নয়। আবার কষে একটা ধমক দিয়ে বলল— গাঁয়ের দিকে যদি পা বাড়াও, পা একেবারে ভেঙে দেব। আবার লাঠিটা দিয়ে ইশারা করে বুড়ো বলল— সোজা চলে যাও পুব দিকে ঐ 'মসুরিয়া'-তে। ওখানে তোমাদের মতো কংগ্রেসীতে ভরে গেছে।

অর্জুনলালের অনেকক্ষণ ধরে অনেক অনুরোধ-উপরোধ করা সত্ত্বেও বুড়ো কিছুতেই তাদের গ্রামের পথে যেতে দিল না ; উপায় না দেখে ওরা ফিরে গেল। পাকদণ্ডী দিয়ে মাইল খানেক হেঁটে রাস্তায় এসে পড়ল এবং একটা এক্কাগাড়ি নিয়ে জলেসর পৌঁছল। ছোটো এই শহরে যা-পেল, তা খেয়ে জল খেল। রাতে ধর্মশালায় কাটিয়ে দিল। পরের দিন দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে আবার গ্রামের দিকে রওনা হল। সন্ধ্যা হয়-হয় এমন সময়ে ওরা জগবাড়ায় পৌঁছল। এখানেও গ্রামের বাইরে একজন লাঠিয়াল ওদের স্বাগত জানাল। লাঠিয়ালের বয়স বাইশ-তেইশ হবে। অর্জুনলাল ওকে বোঝাল— আমরা ঘর-টর ছেড়ে তোমাদের জন্যই সব বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়েছি, জেল খেটেছি। আমরা চাই গাঁয়ের লোক স্বাধীন হয়ে উঠুক। ওদের যেন কোনো খাজনা দিতে না হয়। জমিদারের জুলুম বন্ধ করতে চাই। আর

তোমরা আমাদেরই মাথা ভাঙতে ঘুরে বেড়াচ্ছ।

নজওয়ান একটু যেন নরম হল, বলল— সড়ক পেরিয়ে ঐ খেতের ভিতরে এক-চালা ছোটো একটা ঘর আছে, তাতে গিয়ে লুকিয়ে থাকো। অন্ধকার হয়ে এলে আমি সেখানে আসব, তখন কথা হবে। এই সময় গাঁয়ে যাবে তো হল্লা হয়ে যাবে। আগ্রার কাছে কিছু লাইন-ফাইন উখড়ে ফেলা হয়েছে; তাই নিয়ে গণ্ডগোল হয়েছে। সেই গণ্ড-গোলের পর তহসীলদার গাঁয়ের লোকদের পাহারায় বসিয়েছে, বলেছে কোনো অচেনা লোক যেন গাঁয়ে ঢুকতে না পারে। গাঁয়ে যদি অচেনা লোক দেখা যায় তবে শিকারী পুলিশ বসে যাবে। গাঁয়ের উপর জরি-মানা বসানো হবে। সব লোক ঘাবড়ে আছে।

নজওয়ান রাত হতেই হাতে করে একটা ঘটি নিয়ে এল। চাদরে ঢেকে দুটো রুটিও এনেছিল, তাও এদের দিল। ঘটিতে দুধ। তরুণ লাঠিয়াল বলল— গ্রামের পথে যাবার বাহানা দেখিয়ে ঘটিটা হাতে করে আনতে পেরেছি। রাতে এ লাইনে টুণ্ডলা থেকে দলে দলে সেপাই যায়। তহসীলদার বলেছে, পুবে যেখানে যেখানে লাইন উখড়ে ফেলা হয়েছে, যেখানে লোকেরা পুলিশদের হয়রানি করেছে— সেখান-কার গাঁও-কে-গাঁও সরকার উড়িয়ে দিয়েছে। লোকেরা খুব ভয় পেয়েছে। কিষান সভার লাল পতাকাওয়ালা দু'জন লোকও এসেছিল। লোকেরা ওদের ঘিরে ফেলে পুলিশের হাতে পাচার করে দিয়েছে।

অর্জুনলাল তখন ওজস্বী ভাষায় নজওয়ানের মনে বিশ্বাস জাগাবার চেষ্টা করে বলল— এখন ভয় পাবার কিছু তো নেই। দেশের আজাদি পাবার সময় হয়ে এসেছে। জাপান নেতাজীকে সাহায্য করছে। নেতাজী ভারতবর্ষের সীমান্তে আদাজ হিন্দ ফৌজ নিয়ে এসে গেছেন। তোমরা সরকারকে শস্যফস্য দেওয়া একেবারে বন্ধ করে দাও।

তরুণ একটু যেন ঝাঁঝাল স্বরে বলল— আহ-জী, লাল পতাকা-

ওয়ালা কিষান সভার লোকেরা তো অন্য কথা বলছিল : বলছিল ঐ-সব বেনিয়ারা, যারা তাদের গোলা ভরে রাখতে শস্য কেনে, তাদের খবরদার শস্য বিক্রি করবে না। এরা গরিবদের পেট কাটছে। এরাই বাংলাকে ভুখা মেরেছে। সৈনিকরা আমাদের দেশকে রক্ষা করতে জাপানীদের সঙ্গে লড়ছে। ওরা বলেছে, এই সৈনিকদের জন্য সরকারকে শস্য বেচ। তোমরা যদি শস্যকস্য না দাও, তবে শহরের মজদুররা ভুখা মরবে। তখন কাপড় আর অন্য সব জিনিস কারা তৈরি করবে।

অর্জুনলাল বলল— লাল পতাকাবাহী কম্যুনিস্ট এখন রুশের দালাল। রাশিয়া ইংরেজদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে তো লাল পতাকা-ওয়ালারাও সরকারের পক্ষ নিয়েছে। জাপান আমাদের মিত্র। ভারতবর্ষ যাতে স্বাধীনতা পায় সেজন্য জাপান নেতাজীকে সাহায্য করছে। ইংরেজরা এখন তল্পিতল্পা গোটাবার তোড়জোড় করছে : আর তাই তারা দেশ থেকে সব সোনা-রুপা গুছিয়ে নিয়ে স্রেফ নোট চালিয়ে দিয়েছে। নোটের বিনিময়ে যদি তোমরা দানাশস্য সরকারকে বিক্রি কর, তবে তোমাদের হাতে অচল নোটের আণ্ডিল জমে যাবে। ইংরেজরা চলে গেলে ওদের নোট ছেঁড়া নেকড়া হয়ে যাবে। দেশী ফৌজ কংগ্রেসের সঙ্গে এক হয়ে গেছে। নেতাজীর সঙ্গে পাঁচ লাখ ভারতীয় সেপাই ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। গ্রামের লোকেরা যদি একটু এগিয়ে আসে তবে এরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এদের পেছনে এসে দাঁড়াবে। সেপাইরা সেই সুযোগের অপেক্ষায় আছে।

হেমন্তের শীতে পাতলা খড়কুটোর এক-চালা তার নীচে বেশ গরম কাপড়জামা ছাড়া রাত কাটানো খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। নজওয়ান বলল— রাতের চার প্রহরে হাথরাস থেকে টুগুলার দিকে গাড়ি যায়। সড়ক দিয়ে সোজা তিন মাইল গেলে পড়বে মিঠওয়ালা স্টেশন। রেল লাইন ঘেঁষে সড়কটা চলে গেছে। বহু মুসাফির ঐ গাড়িতে টুণ্ডলার

যায়। অন্ধকার পক্ষ কিন্তু মাঝরাতের পরে চাঁদ উঠবে। এদিক থেকেই যাত্রীরা বেরোবে, তোমরাও তাদের সঙ্গে এগিয়ে যেয়ো।

যুবক চলে যাবার পরে অর্জুনলাল খুবই নিরাশ হয়ে পড়ল। ক্লান্তিতে ওর শরীর যেন ভেঙে পড়ছে। অর্জুনলাল ধনসিংকে ডেকে বলল — এখন তো কানপুরে যাই চলো। ওখানে অন্য লোকেদের সঙ্গে দেখা করে, কথাবার্তা বলে যা হোক একটা ঠিক করা যাবে।

ঘন অন্ধকার : ভীষণ শীত পড়েছে। অর্জুনলাল ও ধনসিং খুব আস্তে আস্তে কথা বলছিল : ওরা স্টেশনে যাবার মুসাফিরদের পথ চেয়ে রইল। মাঝরাতের পরে মুসাফিরদের চলার শব্দ শুনতে পাওয়া গেল।

ধনসিং তাড়াহুড়ো করে উঠে পড়ে বলল— দাঁড়াও। অর্জুনলাল ওকে বোঝাল— আমাদের যদি এক-চালা থেকে হঠাৎ উঠে যেতে দেখে, এরা হয়তো আমাদের চোর ভেবে ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠবে। কিংবা হয়তো লাঠির বাড়ি বাসিয়ে দেবে। এদের বেরিয়ে যেতে দাও। আমরা এদের পেছন পেছন যাব।

রাস্তা দিয়ে চারজন মুসাফির আসছিল। তিনজন পুরুষের সঙ্গে একজন স্ত্রীলোক। ঠাণ্ডা থেকে বাঁচবার জন্য দু'জন পুরুষ গায়ে বাদামী রঙের লেপ মুড়ে নিয়েছে : অন্য জনের গায়ে সাদা রঙের জোড়াচাদর। বউটিও বেশ কয়েকটি রঙিন কাপড় গায়ে জড়িয়ে নিয়েছে। এদের বিশ-পঁচিশ পা দূরে এরা নিঃশব্দে রাস্তায় এসে নামল। ওরা দিল্লী থেকে ছাই রঙের হালকা শাল নিয়ে এসেছিল ; তাই গায়ে জড়িয়ে নিল।

হেমন্তের শীতের রাত কুয়াশায় ঢেকে গেছে ; আকাশে তারাগুলি টিমটিম করে জ্বলছে। সড়কের বুকে ঘন অন্ধকার ; ধূসর একটা ছায়া ছড়িয়ে পড়েছে। অন্ধকারে গাছগুলিকে যেন আরো বেশি কালো দেখাচ্ছে। মাথার উপরে কুয়াশার পাতলা জাল ভেসে বেড়াচ্ছে ; উপরে

কুয়াশা আর রাস্তার ধুলো মিলে মিশে ধূসর একটা পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। সড়কের কিনারে ঝোপঝাড়গুলি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। অর্জুনলাল ও ধনসিং-এর আগে আগে মুসাফিররা হেঁটে যাচ্ছে; ওদের কতকগুলি অস্পষ্ট ছায়ার মতো দেখাচ্ছে। দো-পাল্লা সাদা চাদরে ঢাকা লোকটাকে দেখে মনে হচ্ছে চুনকাম করা চৌহদ্দীর একটা উঁচু থাম যেন সামনে দিয়ে হেঁটে চলে যাচ্ছে!

ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় গা-কাঁপুনি ভাবটা ভুলে থাকতে ধনসিং ও অর্জুনলাল নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলে এগিয়ে চলেছিল। হঠাৎ অর্জুনলাল কাদের যেন দেখে বলে উঠল— ওরা কে যায়? সড়কের বাঁদিকে মাটির থেকে বেশ ক'হাত উঁচু রেল-লাইনের ওপর থেকে কয়েকটি ছায়া যেন রাস্তার দিকে নেমে আসছে।

ধনসিং অর্জুনলালের হাত টেনে ধরে বলল— সৈনিক নিশ্চয়। সড়কের কিনারে একটা গাছের নিচে ছায়া পেরিয়ে ওরা ওদিকে যাচ্ছে। সেপাইদের গালি ও ধমকি শোনা গেল— চল্, লাইনের উপরে চল্।

অর্জুনলাল ও ধনসিং গাছের ছায়ায় মিশে রইল এবং সেখান থেকে সরে গেল একটা বড়ো ঝোপের আড়ালে। সড়ক থেকে রেল লাইনের দূরত্ব চল্লিশ পা-র বেশি নয়। মুসাফিররা আগে আগে ও সেপাইরা তাদের পেছন পেছন লাইনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। লাইনের উপর ওরা পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক ছোঁড়ার আওয়াজ এল; তিনটে গুলি চলল। তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার শোনা গেল। আরো দু'বার গুলির শব্দ হল।

অর্জুনলাল ও ধনসিং, দম বন্ধ করে, ঝোপের আড়ালে ডুবে রইল; একজন অন্যজনের কাঁধ চেপে ধরেছে; বুক ধুকধুক করছে; ওরা দু'জনে চোখ মেলে চেয়ে রইল। কে যেন ভীষণ কাঁদছে, ঐ বউটা নিশ্চয়। সেপাইরা হাসছে, বীভৎস হাসি ভেসে আসছে।

একজন সেপাই পশ্চিমী পাঞ্জাবী ভাষায় বেশ জোরে জোরে পরিহাস শুরু করে দিল— হারামজাদী, তুই কাঁদছিস কেন? তোর জন্য এই পাঁচ-পাঁচটা ষাঁড় মজুত। চুপ কর। চিৎকার করবি তো সরকারের মাত্র আর একটা কার্তুজ বাজে খরচ হবে, ব্যস।

অন্য একটি সেপাই প্রচণ্ড জোরে হেসে উঠে উল্লাস প্রকাশ করল।

অর্জুনলাল সেপাইদের কথাবার্তা ঠিক বুঝতে পারে না। ধনসিং কান খাড়া করে ওদের কথা বোঝার চেষ্টা করছে। একজন সেপাই হেসে বলল— আরে ইয়ার, ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করলাম; তিনজনের কাছ থেকে মাত্র সতেরো টাকা পাওয়া গেল।

একটা তীক্ষ্ণ উল্লাস শোনা গেল— শোন ভাই, এই মাল লুটের মাল। খুর্শেদের কাছে জমা রাখ। কাল মুরজা থেকে যেন পাঁচটা বোতল পাই।

অন্যজন গালি দিয়ে বলল— আরে লোকগুলো লাইনে পড়ে আছে, কাল এদের নিয়েই দেখিস দিন কাটবে।

—আরে শালাদের কোমর-টোমর ভালো করে দেখ: এই লোক-গুলো কোমরেই বেশির ভাগ পয়সা গুঁজে রাখে।

সেপাই ঐ বউটাকে নিয়ে অশ্লীল সব ঠাট্টা জুড়ে দিল। একজন সেপাই দেশলাই জ্বালিয়ে নিজের মুখের দিকে ওঠাল। ঠোঁট দিয়ে চেপে রেখেছে সিগারেট; দেশলাইয়ের আলোয় এক ঝলক মুখটা দেখা গেল; ধনসিং একটা বীভৎস ভয়ানক মুখ দেখতে পেল। ও সিগারেট বার করে অন্য সেপাইদেব দিল। তারা জোরে জোরে কষে সিগারেট টানছে, মনে হচ্ছে যেন ঐ যে লোকগুলো মরে পড়ে আছে, তাদের চিতার উপর আগুনের হলকা উঠছে।

গাছের মগডালে রুপোলি রঙ ঝলমলিয়ে উঠল। রেললাইনের উপর দাঁড়িয়ে আছে সেপাইগুলি, চাঁদের আলোয় এখন তাদের মুখগুলি দেখা

যাচ্ছে। একজন সেপাই তার রাইফেলটাকে মাটিতে ঠকাস্ করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঝগড়া-রত সেপাইদের গলার চেয়েও তীক্ষ্ণ স্বরে চিৎকার করে উঠল — লাঠালাঠি করার কিছু নেই। লটারী করো, যার আগে নম্বর আসে।

চাঁদের আলো এখন সেপাইদের শরীরের উপর পড়ছে। ওদের উর্দি দেখা যাচ্ছে। একজন সেপাই নিজের রাইফেলটাকে লাইনে ঠেস দিয়ে রাখল এবং গুলি-বিদ্ধ দু'জন গাঁয়ের লোকের গা থেকে লেপগুলো একটানে বার করে নিল। লেপ দুটো নিয়ে সেপাইটা লাইন থেকে নেমে ঝোপের আড়ালের দিকে এগিয়ে গেল ; এই ঝোপের অন্য দিকে অর্জুনলাল আর ধনসিং সেঁটে বসে রয়েছে। দু'জনে শ্বাস বন্ধ করে মাথা ঝুঁকে রইল।

ঝোপের মাঝখানে খালি জায়গায় সেপাইটা একটা লেপ অন্যটার উপর বিছিয়ে দিল। লোকটা আবার লাইনের দিকে ফিরে গেল। বউটি লাইনের পাশে হাতের বেড়িতে মাথা ডুবিয়ে বসে ছিল। সেপাইটা তার হাত ধরে টানতে লাগল ; যেখানে লেপ পাতা হয়েছে সেখানে টানছে।

বউটি হাত জোড় করে মিনতি করছে, কাঁদছে। সেপাইটা ঠিক ঘোড়ার ডাকের মতো হাসছে ; হাসি থামিয়ে গালি দিল ; তাতেও কাজ হল না দেখে ধমকে বলল— এক্ষুণি গুলি মেরে দেব··· মা···কী। অন্য সেপাইরা যেন এমন গালি আর কখনো শোনে নি এমনভাবে অট্ট-হাসিতে ফেটে পড়ল।

সেপাইটা বউটার হাত ধরে টানতে টানতে লেপের ওপর নিয়ে এল। চাঁদের আলোয় বউটাব মুখ দেখা যাচ্ছে ; গালে বহতা চোখের জল। বউটা ফুঁপিয়ে কাঁদছে। সেপাইটা আস্তে করে তাকে তুলে এনে বেছানো লেপের উপর ফেলল। অর্জুনলাল ও ধনসিং-এর

তিন হাত দূরে লেপের এই বিছানা পাতা হয়েছে। ওরা বউটির অসহায় ফোঁপানো কান্না শুনছে ; সেপাইটার বুদ্ধি-ভ্রষ্ট বিড়বিড়ানিও শোনা যাচ্ছে।

এই বরফের মতো ঠাণ্ডা হাওয়াতেও ধনসিং ঘেমে উঠছে। অর্জুনলালকে কিছু বললে এরা শুনতে পাবে ; তাই মুখ ফুটে কিছু বলতে পারছে না। শরীরে অদ্ভুত একটা বিকলতা, কী যেন একটা গ্লানি, একটা ভীষণ গা-জ্বালানি অনুভব করছে ধনসিং। দম বন্ধ হয়ে আসছে। ও আর থাকতে পারল না, অর্জুনলালের হাতটা চেপে ধরল। অর্জুনলাল ওর দিকে তাকাল : ও ইশারায় অর্জুনলালকে বলল সেপাইটাকে দু'হাত দিয়ে গলা টিপে মেরে ফেলে অসহায় বউটাকে মুক্তি দেবে কিনা।

লাইনে দাঁড়িয়ে আছে অন্য সেপাইরা ; একজন অধৈর্য হয়ে অশ্লীল ঠাট্টা করল— অ-বে নৌশের কে বচ্চে, আমার বাবটার খেয়াল রাখিস, শালা। খবরদার, শালা। প্রথমে সব লোক এক-একবার করে যাবে। তাড়াতাড়ি কর বে। কথা যদি না শুনিস তোর কোমরে কষে একটা লাথি মারছি, দেখ্ শালা।

অর্জুনলাল ওদের সংকেত দেখিয়ে আঙুল দিয়ে বন্দুক চালিয়ে দেবার ইশারা করে বলতে চাইল— ওরা গুলি করে আমাদের মেরে ফেলবে।

বউটাকে যে ধরে নিয়ে গিয়েছিল সেই এক নম্বর সেপাই গালি দিতে দিতে ঝোপের আড়াল থেকে উঠে দাঁড়াল। পাতলুনটা কোমরে টেনে তুলে বোতাম এঁটে সে লাইনের ওপারে চলে গেল। লাইনের অন্য সেপাইরা 'এবার আমার পালা' বলে চিংকার করে উঠল এবং এদিকে একটা দৌড় লাগাল। এভাবে এক-একজন করে পাঁচ-পাঁচটা সেপাই এল-গেল। বউটি এতক্ষণ হায় হায়' বলে কাঁদছিল ; কিন্তু তার গলার স্বর ধীরে ধীরে স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে।

পঞ্চম সেপাই তখনো লাইনের ওপারে যেতে পারে নি : আর ঠিক সেই সময় লাইনের ওপার থেকে অন্য সেপাইরা চিৎকার করে পঞ্চমকে ডাকল— অ-বে কাসিম, টহলদারী দল আসছে কিন্তু। শালা, জলদি কর।

লাইনের পুব দিক থেকে একটা বিরাট তারা যেন হঠাৎ জ্বলে উঠল। টর্চের তীক্ষ্ণ আলো এগিয়ে আসছে।

কাসিম পাতলুন সামলে এক দৌড়ে লাইনের ওপারে চলে গেল : সেপাইরা প্যান্ট সামলে কোমরবন্ধ টাইট করে নিল। কয়েক মিনিটের মধ্যে লাইনের উপর একটা ট্রলি এসে দাঁড়াল। পাঁচজন সেপাই তড়িৎ-গতিতে লাইনে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ট্রলির অফিসরদের স্যালুট করল!

ট্রলি থেকে দু'জন অফিসর নামলেন ; একজন ইংরেজ ও অন্য জন ভারতীয়। দু'জনের হাতেই বড়ো বড়ো টর্চ। টর্চ জ্বালিয়ে দু'জন অফিসর নিজেদের মধ্যে কী যেন বললেন।

ভারতীয় অফিসর সেপাইদের জিজ্ঞেস করলেন— কী হয়েছে এখানে?

একজন সেপাই এক-পা এগিয়ে দাঁড়াল এবং বলল— হুজুর, এই বদমাশ লোকেরা লাইনের বল্টু খুলছিল। আমরা ওদিকে টহল দিতে গিয়েছিলাম। একটা লাইন উখড়ে ফেলার শব্দ পেয়ে গুলি মেরে দিয়েছি। ইংরেজ অফিসর টর্চের আলো লাইনের আশেপাশে ফেলে খুঁটিয়ে দেখছিলেন। টর্চের তীক্ষ্ণ আলো ঝোপের দিকে এসে পড়ল, যেখানে ধনসিং ও অর্জুনলাল লুকিয়ে ছিল। তীক্ষ্ণ আলোর প্রকাশ ওদের চোখে যেন কাঁটার মতো বিঁধছে। ওরা ঝোপের আরো আড়ালে সেঁটে রইল। দু'জন অফিসর এই ঝোপের দিকে এগিয়ে এলেন।

ধনসিং ও অর্জুনলালের বুক ধড়ফড় করছে। ইংরেজ অফিসর

ঝোপঝাড় ও উঁচু মাটির ঢিবির দিকে টহল দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। দু'জনের শরীরে ঘাম ছুটছে। মনে হচ্ছে এখুনি এদের ধরে নিয়ে লাইনের ওপারে গুলি করে মারবে। ধনসিং-এর আঙুলগুলো মুষ্টিবদ্ধ হল, ও ঠিক করল, অফিসর এই ঝোপের দিকে এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ও তার নাকের ওপর কষে একটা ঘুষি বসাবে এবং প্রাণপণ শক্তিতে দৌড়বে। পেছন থেকে যদি গুলি মেরে দেয় নাহয় মারুক কিন্তু এদের হাতে নির্বিবাদে প্রাণটা সঁপে দেবে না।

ইংরেজ অফিসর ঝোপের দিকেই এগোচ্ছেন, তাঁর পেছন পেছন ভারতীয় অফিসর। টর্চের আলোর প্রকাশ ঝোপ ছাড়িয়ে লেপ-বিছানো জায়গাটায় গিয়ে পড়ল। ঝোপের আড়ালে মুখ ডুবিয়ে রেখেছে ধনসিং, তাকেও দেখা যাচ্ছে ; লেপে চিত হয়ে নিশ্চল পড়ে আছে সেই বউটা, গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন বা বেহুঁশ কিংবা কে জানে হয়তো মরে গেছে। বউটির হাত-পা ছড়ানো, ঘাঘরা কোমরের দিকে ওলটানো।

ইংরেজ অফিসর বউটার নগ্ন শরীরের দিকে তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিলেন এবং টর্চের আলোর প্রকাশ অন্য দিকে ফেরালেন। ভারতীয় অফিসর টর্চ বুজিয়ে দিলেন। দু'জনের মধ্যে কিছুক্ষণ কথা-কাটাকাটি চলল। ইংরেজ অফিসর উঁচু গলায় কথা বলছেন, ভারি গলার স্বরে ক্রোধ ফেটে পড়ছে! ভারতীয় অফিসর লম্বা-চওড়া কথা বলে তাঁকে কী যেন বোঝাচ্ছেন, জবাব দিয়ে যাচ্ছেন।

দু'জন অফিসর ফিরে গেলেন। প্রচণ্ড ক্রোধে ইংরেজ অফিসর ঘন ঘন থুথু ফেললেন। চুপচাপ দু'জনে এসে ট্রলিতে বসলেন। হিন্দুস্থানী অফিসর সেপাইদের হুকুম দিলেন — তোমরা এখন মার্চ করে সোজা স্টেশনে চলে যাবে। লাইনের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। ভোরবেলার গাড়িতে টুণ্ডলা পৌঁছে স্টেশনের দপ্তরে রিপোর্ট করবে।

অফিসর পকেট থেকে নোটবুক বার করে কী যেন লিখলেন,

কাগজটা ছিঁড়ে টহলদারী দলের নায়ককে দিয়ে বললেন— এই কাগজটা দপ্তরে দেবে। সেপাইরা তড়িৎ-গতিতে এক লাইনে দাঁড়াল, কাঁধে উঠিয়ে নিল রাইফেল এবং একসঙ্গে মার্চ করতে করতে পূর্ব দিকে চলে গেল। ভারতীয় অফিসর এবার ট্রলিতে উঠে এলেন। ট্রলির মোটরের ইঞ্জিন স্টার্ট নিয়ে দ্রুত বেগে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অর্জুনলাল ও ধনসিং ঝোপের পিছন দিক থেকে উঠে দাঁড়াল। এতক্ষণ একইভাবে সেঁটে বসে থাকায় ওদের গিটগাঁট যেন অবশ হয়ে গেছে। শরীরের অবশ ভাবটা কাটাতে ওরা পিঠ ও ঘাড় সোজা করে আড়মোড়া ভাঙল। সামনে লেপের ওপর বউটি এখনো অসাড় অবস্থায় পড়ে আছে। ওরা ওকে দেখল। লজ্জায়-ঘৃণায় মাথাটা একটু কাত হয়ে আছে, ছড়ানো-পা গুটিয়ে নিয়েছে। সংকোচে ওরা পরস্পরের দিকে তাকাতে পারছে না। দু'জনেই ভাবছে, এ বেচারীর কী হবে? এরকম অবস্থায় একে ছেড়ে যাই কী করে? কিন্তু দু'জনের কেউ ওর দিকে তাকাতে পারছে না; ওকে ছোঁবার সাহস কুলিয়ে উঠছে না।

একটু পরে বউটির রুদ্ধ কণ্ঠ দিয়ে 'আহ' শব্দ বেরিয়ে এল: গলায় একটা আর্তনাদ জমাট বেঁধে আছে যেন। বউটি পাশ ফিরল, ঘাঘরা সামলে জড়োসড়ো হয়ে শুয়ে রইল। কনুইয়ে চাপ দিয়ে ঘাড় উঠিয়ে চারদিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকাল।

অর্জুনলাল সাহস করে এগিয়ে গিয়ে ভারি গলায় বলল— আরে ভাই, চলো তোমাকে ঘরে পৌঁছিয়ে দিই।

বউটি কান্নায় ভেঙে পড়ল।

অর্জুনলাল তাকে সান্ত্বনা দিয়ে আবার ঘরে পৌঁছিয়ে দেবার কথা বলল কিন্তু বউটি কপালে হাত দিয়ে কপাল চাপড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল, কাতর স্বরে বলল— আমি মরে গেছি গো, এখন আর কোথায় যাব! এখন তো এখানেই মরব, হায়, হায়, ঐ কুলখেগো

হারামজাদাদের মেরে তারপর নিজে মরব।

অর্জুনলাল ও ধনসিং অসহায় দাঁড়িয়ে রইল। বউটিকে এভাবে ফেলে যেতে মন চাইছে না। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে থেকেই-বা কী হবে ? লাইনে গাড়ি এসে পড়ার সময় হয়ে এসেছে। বিবশ মনে দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে, কোনোমতে চোখের জল সামলে ওরা সড়কে নেমে এল। দ্রুত পায়ে ওরা স্টেশনের দিকে গেল। দূর থেকে ইঞ্জিনের হেড লাইট দেখা যাচ্ছে। ওরা এক দৌড়ে স্টেশনের ভেতরে এল এবং অতি কষ্টে ট্রেনের একটা কামরায় ঢুকতে পারল।

টুণ্ডলা স্টেশন থেকে ছুটি স্পেশাল ট্রেন সৈন্যদের নিয়ে একটা পুব দিকে যাবে, অন্যটা পশ্চিম দিকে। সমস্ত স্টেশন খাকি-উর্দি-পরা সৈন্যসামন্তে ভরে গেছে। এদের প্রত্যেককে এক-একজন হিংস্র পশু বলে মনে হতে লাগল ; ধনসিং-এর সমস্ত মন ঘৃণায় ভরে উঠল।

টুণ্ডলার গাড়িতে প্রচণ্ড ভিড়। অর্জুনলাল ও ধনসিং ঠেসাঠেসি করে কোনোমতে বসে আছে ; এখনো মুসাফিররা জোরজবরদস্তি কামরায় ঢুকতে চাইছে। জানলা দিয়ে কে যেন ছু-তিন বার ডেকে উঠল— পণ্ডিত, পণ্ডিত ! অর্জুন ভাই, আরে চিনতে পারছ না, না চিনতে চাও না ? আরে আমি মেহফুজ। আমার জন্য একটু জায়গা করো।

অর্জুনলাল হাত বাড়িয়ে মেহফুজকে জানলার ভেতর থেকে টেনে কামরায় নিয়ে এল। এমনিতেই কষ্টেসৃষ্টে বসে আছে তার উপর আর-একটা উটকো লোককে টেনে আনতে দেখে লোকেরা আপত্তি জানাতে লাগল। অর্জুনলাল ওদের মুখ বন্ধ করার জন্য বলল— আরে ভাই, জানো এ হল সরকারী লোক। চাইলে আমাদের সবাইকে নামিয়ে দিতে পারে।

—সি. আই. ডি. হবে।

মহফুজ ঘন রুক্ষ চুলে হাত বুলিয়ে বলল— তুমি তো টেনে জুতো মারবে দোস্ত।

অর্জুনলাল হেসে বলল— কী যে বল! দিল্লী থেকে কবে এলে? কেমন কাটল?

—ঘোর অমাবস্যা, বুঝলে? আমার আর কী? যতদিন বাইরে ছিলাম সরকারের সঙ্গে লড়েছি জেলে গেছি সেখানেও লড়তে ছাড়ি নি। এখনো সি. আই ডি-র লোকেরা পিছু ছাড়ে নি। আশেপাশের লোকেরা লোকটিকে একটু যেন আগ্রহের সঙ্গে দেখল ধনসিং-ও।

অর্জুনলাল না হেসে পারল না— পুলিশ খামাখো তোমার পেছনে লেগেছে। এ যুদ্ধে তুমি তো ইংরেজদের সাহায্য করছ। বলও ভাই, 'পিপলস্ ওয়ার'।

মহফুজ গলা চড়িয়ে বলল— হ্যাঁ, ঠিক তো, বলি বই কি? তোমাদের সেই গান্ধী-ভাণ্ডারই ইংরেজদের সত্যিকারের সাহায্য করছে — ঐ যে যারা সৈন্যদের জন্য কম্বল সাপ্লাই করে যাচ্ছে। আমরা তো বলছি, জাপানীদের হাত থেকে এ-দেশটাকে বাঁচাও। আমরা এও বলছি লড়াইটা আমাদের। আমাদের নেতাদের জেল থেকে ছাড়ো, আমরা নিজেরাই জাপানের বিরুদ্ধে লড়ব। ইংরেজরা তো সমস্ত দেশটাকে জাহান্নমে পাঠাচ্ছে, ওরা আবার লড়বে কি!

রাজনৈতিক তর্কের ঝড় শুরু হয়ে গেল।

অর্জুনলাল উত্তেজিত হয়ে বলল— তোমরা বলছ যুদ্ধে ইংরেজদের সাহায্য করো; তবে আমি যা বলছি মন দিয়ে শোনো। বলে গত-কালের ঘটনার পুরোটা বলে গেল।

ধনসিং চুপচাপ শুনছিল। ওর বারবার মনে হচ্ছে, নেতাজী বলে-ছিলেন, ভারতীয় সৈন্যরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ওরা লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য অপেক্ষা করে আছে। অর্জুনলালও

গ্রামে গিয়ে সেটাই বুঝিয়ে এসেছে। ভারতীয় সৈন্যদের কী অদ্ভুত দেশপ্রেম! তর্কফর্ক ও যেন আর শুনতে পাচ্ছে না; মনটা চলে গেছে পাহাড়ী দেশে, ঐ যেখানে সোমা; সেই রাতে যদি ঐ বদমাশ ছুটোকে না মারতাম!··· সোমা আমার ঘরেই থাকত তা হলে; কিন্তু সোমা যদি সত্যিই ভুল করে দরজা খুলে বসত তা হলে কী কাণ্ড হত, ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়।

সেই ইংরেজ ও ভারতীয় অফিসর দু'জনের মধ্যে ইংরেজীতে কী-যে তর্ক হচ্ছিল, ইংরেজী জানে না বলে ধনসিং কিছুই বুঝতে পারে নি। অর্জুনলাল উত্তেজনায় অধীর হয়ে কান খাড়া করে শুনেছিল। ইংরেজ অফিসর হিন্দুস্থানী সেপাইয়ের দুর্ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়ে সেখানেই সাজা দিতে চেয়েছিলেন। ভারতীয় অফিসর তাঁকে বুঝিয়ে বললেন যে, এক মাস ধরে এরা এ-লাইনে পড়ে আছে। যদি এরা গ্রামের লোকেদের সঙ্গে ভাই-বন্ধু সম্পর্ক পাতিয়ে দিন কাটাতে শুরু করে তবে অবস্থা আরো জটিল হয়ে উঠবে। এরাও তবে বিপ্লবীদের মধ্যে হাত মেলাবে।

সব শুনে মহফুজ বলল— এই তোমাদের বিপ্লব আর তার জন্য এত প্রস্তুতি! এবার বলো।

একজন বুড়ো লোক মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলল— ভাই, যা বল মানবো কিন্তু একটা কথা, ইংরেজদের মতো এত সং আর কেউ নয়।

মহফুজ প্রতিবাদ করল— ইংরেজরা যদি নিরপেক্ষ জাত হত, যদি সৎ হত, তবে অন্য একটা দেশ কব্জা করে বসে থাকত না। আপনাদের বিদ্যাবুদ্ধি কব্জা করতে, আপনাদের মনে ওদের ব্যাপারে একটা আস্থার ভাব বজায় রাখতে, একটা মর্যাদাবোধ জিইয়ে রাখতে ইংরেজরা নিজেদের সাচ্চা বলে জাহির করে। আপনারা ইংরেজদের গোলাম কুকুরের ব্যবহার ও দৃষ্টি দিয়ে হিন্দুস্থানীদের চরিত্র বিচার করেন। হায় রে আল্লা! আপনাদের কী আক্কেল! এই-সব সৈনিক একটা কারণে

জুলুম করে ; কারণটা হল, এরা জানে জনতার সৈনিক এরা নয়, যারা জনতার উপর জুলুম করে বেঁচে আছে, এরা তাদের সৈনিক।

মহফুজ অর্জুনলালের কাঁধে হাত রেখে প্রশ্ন করল— এই-সব সৈনিকদের উপর ভরসা করে আপনারা 42 সালের আগস্ট বিপ্লব করতে চেয়েছিলেন, অ্যাঁ ?

অর্জুনলালরা এবার অন্য প্রসঙ্গ পাড়ল। অর্জুনলাল শোনালো দিল্লী জেলের কেচ্ছা-কাহিনী আর মহফুজ দিল্লী ক্যাম্পের কেচ্ছা। ধনসিং কোনো কথা বলল না।

কানপুরে অর্জুনলাল ধনসিং-কে সঙ্গে নিয়ে নানা জায়গায় ঘুরল। কানপুরে অর্জুনলাল রাজনৈতিক জীবন প্রথম শুরু করে। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মিউনিসিপালিটির নির্বাচনে ভাগ নেয়। এখানে ওর বহু পরিচিত লোক। বুকে অনেক আশা-ভরসা নিয়ে ও কানপুরে এসেছিল কিন্তু দেখে দেখে সে আশা নিভে যেতে লাগল, মনে নৈরাশ্যের অন্ধকার ছেয়ে গেল।

কানপুরে পুলিশের জাল দিল্লীর থেকে কিছু কম বিস্তৃত নয়। কংগ্রেসের মধ্যে যাঁরা করিৎকর্মা লোক তাঁদের হয় জেলে পুরে রাখা হয়েছিল আর নয়তো তাঁরা ফেরার হয়ে গা-ঢাকা দিয়েছিলেন। খুব জোর গুজব রটেছে যে, কম্যুনিস্টরা কংগ্রেসীদের ধরিয়ে দিচ্ছে। অর্জুনলাল মোতি ভাইয়ের কাছে গেল। 28 সালে মিউনিসিপাল নির্বাচনে অর্জুনলাল মোতি ভাইয়ের জন্য জান-লড়িয়ে খাটে। মোতি ভাই সময় ও সুযোগ পেলেই নিজের আড়তদারিতে অর্জুনলালের নামে দু-একটা মালপত্র কিনে ওর কিছু আয়ের ব্যবস্থা করতেন। এই সাহায্যের উপর নির্ভর করে অর্জুনলাল নিশ্চিন্ত হয়ে রাজনৈতিক কাজকর্ম চালিয়ে যেত। দিল্লীতে মোতি ভাইয়ের সহায়তায় ও রামু ভাইয়ের ওখানে একটা আশ্রয়স্থান জুটিয়ে নিয়েছিল।

কিন্তু সেই মোতি ভাই শহরের এই অবস্থা দেখে অর্জুনলাল ও তার সঙ্গীকে আশ্রয় দিতে রাজি হলেন না, বললেন— যাকেই দেখ সেই আমাদের খেতে চাইছে। বাজার তো একেবারে চৌপট হয়ে গেছে। সরকার সব কাজকারবার বরবাদ করে দিয়েছে। তোমাদের উচিত গ্রামে গ্রামে গিয়ে কাজ করা ; কিষাণদের গিয়ে বলো, সরকারকে বয়কট করো, অসহযোগ আন্দোলন শুরু করো। ভাঙ-ভাঙ কাট্-কাট্ কংগ্রেসের কাজ নয়। এইজন্যই তো গান্ধীজী অনশন করছেন।

মোতি ভাইয়ের কথা শুনে নিরাশ হয়ে অর্জুনলাল ও ধনসিং লাঠি-মহলের রাস্তার দিকে যাচ্ছিল ; পথে অন্য এক আড়তদারের সঙ্গে দেখা। ভদ্রলোক শহর-কোতোয়ালের মাইফেলে হরদম যাওয়া-আসা করে, এদিকে কংগ্রেসের প্রতি গুপ্ত সহানুভূতিশীল।

অর্জুনলাল তাঁকে 'জয়রাম জী' বলে সম্বোধন করল। তিনি একটু থতমত খেয়ে পরক্ষণে আবার সামলে উঠে অর্জুনলালের হাতটা চেপে ধরলেন। ধনসিং থেকে তাকে একটু আড়ালে ডেকে বললেন— ওহে বাছা, তুমি এভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছ আর ওদিকে যে পুলিশ তোমাকে খুঁজছে।

অর্জুনলাল সচকিত হল— এই তো পরশু এখানে এলাম। সে-রকম কিছু তো হয় নি। কী ধরনের ওয়ারেন্ট ?

—ওয়ারেণ্ট হয়তো নেই কিন্তু ইনস্পেকটার তোমার খোঁজখবর করছিল ; বলছিল তুমি এ শহরে আছ। কংগ্রেসী তুমি, হরতাল-ফরতালে মেতে ওঠ। কানপুরে তোমার ঠিক পোষাবে না, কেটে পড়ো।

—কোথায় যে যাই···। এই তো দিল্লী জেল থেকে আসছি।

—আরে যে-কোনো একটা জায়গায় চলে যাও, আচ্ছা না-হয় বোম্বাইতে চলে যাও। যতদিন না ভালো সময় আসে কিছু রোজগার-টোজগার করে নাও, পয়সা কামাবার খুব ভালো সুযোগ। বোম্বাইতে আমাদের নিজেদের লোক আছে। তাঁর আড়তে গিয়ে কাজ করো-না।

অর্জুনলাল এদিক-ওদিক চেয়ে নিয়ে বলল— আচ্ছা, আপনার সঙ্গে আবার না-হয় দেখা করব।

—বাড়িতে এসো না কিন্তু। বোম্বাইতে শেখ মেনন স্ট্রীটে 69 নম্বর ; বুঝলে। নাম জগজীবন ভাই। তুমি বরং কানপুর থেকে কেটে পড়ো। এখানকার আবহাওয়া ঠিক নেই, বুঝলে।

ওরা দু'জনে সামনে-পেছনে দেখতে দেখতে এগিয়ে গেল।

অর্জুনলাল তিলক হলে উঠেছে। ভাবছিল, ওখানে যাওয়া ঠিক হবে না, কিন্তু আর থাকবেই-বা কোথায় ? গলি দিয়ে বেরিয়ে কর্ণেল-গঞ্জে এক পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করবে ভাবছিল, গলির মোড়ে গণেশের সঙ্গে দেখা। গণেশ সাইকেলটা হাতে নিয়ে হেঁটে আসছিল। এসময়ে একজন কম্যুনিস্টের সঙ্গে দেখা হওয়া খুব সুখের ব্যাপার নয় কিন্তু অর্জুনলাল ভাবল, মুখোমুখি দেখা হলে কী করে এড়িয়ে যাবে। গণেশ অর্জুনলালের কাঁধে হাত রেখে আনন্দ প্রকাশ করল, বলল— বলো দোস্ত, কী খবর ?

অর্জুনলালের সঙ্গে গণেশের পুরনো পিরিত। দু'জনেই 1935 সালের হরতালে একসঙ্গে কাজ করেছিল আবার নির্বাচনে একে অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল।

অর্জুনলাল হেসে বলল— বলো ভাই, স্টালিনের কোনো চিঠিপত্র পেয়েছ নাকি ? এখন কোন্ ফ্রন্ট বদল করার হুকুম এসেছে, শুনি ?

গণেশের সাফ জবাব— না হে, 'তোজোর' চিঠি এসেছে। হুকুম হয়েছে ইংরেজদের ঠেঙাতে। জাপানী শাসন-ব্যবস্থা কায়েম করতে যেসব সোসিয়ালিস্ট ও কংগ্রেসী সহায়তা করছে, তাদের সবাইকে হয় দারোগা বানিয়ে দাও আর নয়তো এক-একজনকে রেশন-শপের পারমিট দেবার ব্যবস্থা করো।

—আর যে-সব কম্যুনিস্ট কংগ্রেসীদের ধরে ধরে গ্রেপ্তার করাচ্ছে,

ইংরেজ সরকার তাদের সব তক্‌শীলদারী দেবে, না ?

গণেশ প্রতিবাদ করে উঠল, একটা গালি ঝেড়ে বলল— কোন্ শালা কোন্ মাদর-কে··· গ্রেপ্তার করাচ্ছে। গণেশ অর্জুনলালের হাতটা নিজের হাতে টেনে নিয়ে আস্তে একটা চাপ দিয়ে কানের কাছে মুখটা এগিয়ে ধরে ফিসফিস করে বলল— কাল সাব-ইনস্পেকটর চৌবে তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিল। আমি বললাম, আমার সঙ্গে তার কী সম্পর্ক ? শুনে বলল, আরে সাহেব, শহরে সে এসেছে আর আপনার সঙ্গে কি দেখা করবে না ? তারপর সেই হারামী বলে কিনা, সেই-সব দিনের কথা কি ভুলে গেলেন, ঐ যখন ওরা আপনাকে গালিগালাজ করত ! কী জানো, কত লোককে যে ওপারে পাঠিয়ে ছাড়ল। ইনস্পেকটর তখন নিজের সাফাই গাইল, বলল, আমার কথা এটুকু বলতে পারি, আমার চোখে সব সমান, নিজেকে বাঁচিয়ে যে চলতে জানে, তাকে আমি অকারণে হয়রানি করি না।

একটু থেমে অভিযোগের সুরে গণেশ আরো বলে যেতে লাগল— আমি বেটাকে খুব ধমকালাম। বললাম, আপনি আমাকে তাহলে খুব চেনেন দেখছি। অন্যদের বলেন, কম্যুনিস্টরা কংগ্রেসীদের ধরিয়ে দিচ্ছে আর আমাকে বলছেন, কংগ্রেসীরা কম্যুনিস্টদের ধরপাকড়ে সহায়তা করছে। সে যাক, আচ্ছা বিশ্বাস না হয়, চলো তোমাদের প্রধান নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দি, ঐ যেখানে গা-ঢাকা দিয়ে আছেন, চলো, দেখা করবে।

—হ্যাঁ, দেখা ক'রে নেব'খন। অর্জুনলাল বলেই ভাবল, তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করলে ভালোই হয়, আলোচনা করে হয়তো ভবিষ্যৎ-কার্যসূচী ঠিক করা যায়।

গণেশ অর্জুনলালকে একটু এগিয়ে নিয়ে এসে প্রধানের ঠিকানা বাৎলে নির্দেশ দিল— ওখানে গিয়ে ওঁর নাম করবে। বলবে, 'বড়ো ভাইয়ার' সঙ্গে একটু কাজ আছে। অর্জুনলাল গণেশের সাইকেলটা

চেয়ে নিল। গণেশের সঙ্গে ধনসিং-কে ভিড়িয়ে দিয়ে অন্য পথ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

ধনসিং গণেশের সঙ্গে এ-গলি-সে-গলি দিয়ে হাঁটতে লাগল। পকেট থেকে দু'টো বিড়ি বার করে ধনসিং-এর দিকে এগিয়ে দিয়ে গণেশ বলল— কমরেড, একটা বিড়ি খাও। বিড়িটা ওর হাতে দিয়ে জিজ্ঞেস করল— তুমি কি এর সঙ্গেই আছ? দিল্লী থেকে এসেছ বুঝি? দিল্লীর কী হালচাল?

- ওখানেও ঠিক এই হাল। এখন তো ইংরেজের বিরুদ্ধে কেউ লড়ছে না, নিজেদের মধ্যেই লড়ছে। কোথাও সেরকম নেতা নেই। আপনাদের একজন সঙ্গী দিওয়ানচাঁদ আমাদের সঙ্গে জেলে ছিল। ধনসিং-এর যেন কথা বলার ইচ্ছে নেই, বলতে হয় তাই বলছে।

—আচ্ছা, দিওয়ানচাঁদকেও চেনো বুঝি? দিওয়ানও এখানে। এলাহাবাদে গিয়েছে, দশ-বারো দিনের মধ্যেই ফিরবে। এখন কী করবে ঠিক করেছ? ও তাই তো, এই সবে জেল থেকে এলে, সেটাও কথা। কিছুদিন দেখেটেখে নাও, বুঝে নাও, তারপর না হয়…। ধনসিং বিড়িটা শেষ করে বলল — হ্যাঁ আমিও তাই ভাবছি, অর্জুন ভাই যা বলবে।

অর্জুনলাল ফিরে এসেছে আরো গম্ভীর হয়ে। গণেশ কৌতূহলী হল - কী হল? বড়ো ভাইয়ের সঙ্গে কথা হল নাকি?

--বলছেন, গান্ধীজীর অনশন আগে শেষ হোক তো, তারপর দেখি। যতদিন না তিনি সরকারের কাছে চিঠিপত্র লিখবেন, ততদিন একটু অপেক্ষা করাই সমীচীন মনে হয়। আরো বললেন, ততদিন গ্রামে গ্রামে যাও, কৃষকদের বলো, তোমরা সরকারকে দানাশস্য বিক্রি কোরো না। অর্জুনলাল উদাস স্বরে কথাগুলো আওড়ে গেল।

গণেশ বলল— ঠিক আছে, কানপুরের কী অবস্থা তুমি তো

দেখছই। দানাশস্যের জন্য যে-কোনো দিন লুঠমার হতে পারে। তুমি যদি শহরে আবো শস্য না আসতে দাও, লুঠতরাজের ধুম লেগে যাবে ; আসামে যদি জিনিসপত্র না পৌছয়, জাপানীরা এগিয়ে আসবে। কলকাতায় তিন-তিনবার বোমা পড়েছে। পূর্ব ভারত থেকে 40 লক্ষ লোক পালিয়ে এসেছে। কাল যদি এখানে বোমা পড়ে তবে এ-সব লোক কোথায় যাবে শুনি ? একদল ইংরেজ মরবে তো দশ হাজার ভারতীয়। বর্মা জাপানকে স্বাগত জানিয়েছে। যখন থেকে জাপান ওখানে এসেছে তখন থেকেই মার্শাল ল জারি করা হয়েছে। জনসাধারণ পালিয়ে জঙ্গলে লুকিয়েছে, আর এখন ? এখন জাপানের হাত থেকে নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে লড়াই করে যাচ্ছে। তবে ওখানকার পুঁজিপতিরা এখন জাপানের খুব খোশামোদ করছে। তোমাদের ঐ সিঙ্গানিয়াঁ, গুপ্তা আর বিড়লা— এরা তো তোজো-কে প্রথমে সেলাম জানাবার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে।

অর্জুনলাল আর কথা বাড়াতে চাইল না। মনটা বড়ো খারাপ হয়ে আছে। একটা সতরঞ্চি বিছিয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়ল। নানা চিন্তা অবশ্য মনে ঘুরতে থাকল। গণেশ ওর পাশে শুয়ে ওর অভিজ্ঞতার কথা জিজ্ঞেস করতে লাগল। ধনসিং অন্য একটা সতরঞ্চিতে শুলো। নিজের জীবনটাকে বড়ো নিরাশ্রয় মনে হয় ; সারা জীবনটাই যেন বরবাদ হয়ে গেল। কিছু করার আর উপায় নেই ; সব দরজাই যেন বন্ধ। অত্যাচারের বিরোধ করতে গেলে সরকার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে, ভাগ্যে পুলিশের দণ্ড জুটবে। সরকার আর পুলিশের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য কারুর কাছ থেকে কোনো সাহায্য পাবার আশা নেই। লোকেরা সরকারের বিরুদ্ধে লড়তে চায় না, খেলতে চায়। কিন্তু ওর কাছে এ-যে জীবন কিংবা মৃত্যুর প্রশ্ন। সোমাকে ছেড়ে এসেছে ধনসিং। ওকে ছাড়া সোমার কী যে অবস্থা হয়েছে তা কল্পনাও করা যায় না।

রেলওয়ে লাইনের উপর রাতে যে বীভৎস ঘটনা ঘটেছিল, তার স্মৃতি চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে। সোমার যদি এরকম কিছু ঘটে থাকে? যদি সোমার কাছে থাকত, তবে ওর জীবন বাঁচাতে নিজের জীবন তো দিতে পারত!

ধনসিং আবার ভাবল, সে রাতে ও তো কিছুই করতে পারে নি। ওর মন ঘৃণায় ও লজ্জায় ভরে উঠল। ও ঝাঁপিয়ে পড়তে তৈরি ছিল, অর্জুনলালই বাধা দিল। অর্জুনলালকে ওর আর পছন্দ হচ্ছে না: ভীষণ ভীরু লোক, এ আবার লীডার! হ্যাঁ, এ ছোটো লীডার আর অন্য জন বড়ো লীডার। গ্রেপ্তার যাতে না করে তার জন্য গা-ঢাকা দিয়ে আছেন। ইনি আবার লড়বেন! সবাই নিজের নিজের প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত। সব শালা বেশ আরামে আছে।

আবার সোমার কথা মনে পড়ল ধনসিং-এর; সরোলা সাহেবের কাছে ছিল। লালাজী আবার ঝামেলায় ফাঁসবেন, এই ভয়ে ওকে যদি ঘর থেকে বার করে দিয়ে থাকেন? কোথায় আছে তবে, কীভাবে ওর চলছে? বদমাশগুলো নিশ্চয় এতদিনে পিছনে লেগে গেছে। আমি এখানে পালিয়ে কী বাহাদুরী করছি! দিনের বেলা অর্জুনলালের সঙ্গে মূলগঞ্জ থেকে ফিরছিলাম। ওখানে কুঁড়ে-ঘরের দাওয়ায় বসে ছিল কুৎসিত সব বারবনিতা, ছেঁড়া কাপড়, নগ্নপ্রায়। এদের মধ্যে কতজনের স্বামী ওদের ছেড়ে চলে গেছে, কে জানে? সোমাই বা কী করছে?

সকালে ধনসিং ঘুম থেকে উঠে দেখে গণেশ গায়েব। অর্জুনলালের মুখে দুশ্চিন্তার কালো কালো রেখা; চুপচাপ বসে আছে। ধনসিং জেগে আছে দেখে অর্জুনলাল বলল— ধনসিং ভাই, এখন আর এভাবে চলবে না। আমি ভাবছি, দু-চারদিনের মধ্যে গ্রামের বাড়িতে যাব এবং সেখান থেকে সোজা বোম্বাই। এখানে থেকে আবার যদি জেলে যেতে হয়, কী লাভ? আমি একলা করবই-বা কী? এখন তুমিও দেখ কোনো

চাকরি-বাকরি পাও কিনা। কানপুরে কাজকাজ পাওয়া যায়। কিন্তু একটা মুশকিল, তোমাকে এখানে চেনেই-বা কে ?

অর্জুনলাল উঠে দাঁড়াল— আমার গ্রামের জন্য সকালের বাস ধরতে হবে। যদি দরকার পড়ে তবে লাঠি-মহলের মোতিবাবুর সঙ্গে দেখা কোরো। আমি তোমার কথা ওঁকে বলেছি। অর্জুনলাল কুর্তাটা হাতে নিয়ে পকেট থেকে দুখানা পাঁচ টাকার নোট বার করে ধনসিং-এর হাতে দিয়ে বলল— এই নাও, যতদিন না কাজধান্দা হয়, ততদিন এতেই চালিয়ে নিতে পারবে। তবে দু-চারদিনের মধ্যে কিছু-একটা করে নিতে পারবে নিশ্চয়। অর্জুনলাল আর কিছু বলল না ; কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেল।

ধনসিং এর চোখ দুটো ভিজে উঠছিল ; ঠোঁট চেপে ধরে সামলে নিল। অর্জুনলালের কাছ থেকে টাকা নিতে ওর অপমান বোধ হচ্ছিল কিন্তু না নিয়ে উপায় কী ? এই দূর দেশে অর্জুনলালই ওর ভরসাস্থল ছিল। লম্বা সফরে বেরিয়ে পথে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে পথিক যেমন অকারণ বোঝা ছুঁড়ে ফেলে এগিয়ে যায়, অর্জুনলাল তেমনি ধনসিংকে ছেড়ে চলে গেল। ধনসিং-এর হাতে বল আছে, হৃদয়ে সাহস আছে কিন্তু শক্তি-সামর্থ্য আর হৃদয় নিয়েও সুযোগের অভাবে মানুষ কীই-বা করতে পারে ? এই সময় এই সামান্য টাকায় খাওয়া জুটবে, আশ্রয় জুটবে আর প্রয়োজনে যাতায়াত, তাও এ-টাকায়।

ধনসিং ঘর থেকে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। চারদিকে দেয়াল-ঘেরা এ বারান্দা। ও মেঝেতে বসে রইল। ফাল্গুনের হরিৎ-রঙা রোদ ; মধুর হাওয়া বইছে। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠতে কাংড়ার মতো এখানকার এই মৌসুম। আশেপাশে উঁচু উঁচু বড়ো বড়ো বাড়ি। কিসের একটা ফরফর আওয়াজে ঘাড় উঁচু করে ডান দিকে তাকাল। পাশের উঁচু ছাদে একজন বউ ভেজা কাপড় শুকোতে দিতে এসেছে ; গায়ে তার আঁচলের

আড় ছাড়া আর কিছুই নেই অথচ একেবারে নির্বিকার।

ধনসিং ওদের পাহাড়ী দেশে এতটা বেআবরু অবস্থায় কাউকে দেখে নি। বউটি কনুইয়ে ভর দিয়ে নিচে ঝুঁকে বারান্দার দিকে দেখছিল। ধনসিং উপরে তাকাতেই তার আঁচলের ফাঁকে উন্মুক্ত ভরাট দুটি বুক দেখতে পেল। চোখ ফিরিয়ে নিল ধনসিং। বুঝল, বউটি কার সঙ্গে যেন কথা বলছে ; কথাবার্তা কাকে নিয়ে হচ্ছে বুঝতে পারল না। অন্য যে জন কথা বলছে সেও মেয়ে কিংবা বউ ; উপরের দিকে আবার তাকিয়ে দেখা ঠিক নয়। কাছেই পতপত জল পড়ার শব্দ হল। চেয়ে দেখে পানের পিক। এক কোণে সরে দাঁড়া- ধনসিং।

ওকে নিয়ে কে যেন ঠাট্টা-ইয়ার্কি করে খিলখিল হেসে উঠছে ; ধনসিং এবার আর উপরে না তাকিয়ে থাকতে পারল না। দেখল, যে-বউটি কাপড় শুকোতে ছাদে গিয়েছিল, তার পাশে আরো একজন অল্প-বয়সী মেয়ে। দুজনে দেওয়ালে কনুইয়ে ভর দিয়ে পান চিবুতে চিবুতে ওকে নিয়ে হাসছে। ধনসিং ভাবল উপযুক্ত জবাব দিয়ে ওদের ঠাণ্ডা করবে কিন্তু দুজনের উন্মুক্ত দুজোড়া বুক দেখে আবার ও নজর ফিরিয়ে নিল। ঘৃণায় মনটা ভরে গেল কিন্তু জোর করে নিজেকে সংযত করল।

একজন বউ ওকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল— জানি না, এ-সব কোথার থেকে যে আসে ; এ মহল্লা বিপত্নীকে ভরে গেল যে। বদমাশ কোথা-কার। কোথা থেকে যে রোজ রোজ নতুন মুখ আসে।

অন্য জন বলল— ভালো লোক হলে কি আর স্ত্রী সঙ্গে থাকত না? বদমাশ তো হচ্ছেই।

মেয়েছেলের মুখের ছেনালী শুনে ধনসিং-এর সেই ড্রাইভারী স্বভাব চাগিয়ে উঠল। একবার ভাবল জবাব দেবে— এখানে এসো-না, তবে বাৎলাই— কিন্তু আবার ভাবল, তা ঠিক হবে না। এ-যা পরিবেশ, ওর চারদিকে পরদেশীতে ঘেরা ; এটা খেয়াল হওয়ায় মুখের কথা মুখেই রয়ে

গেল। বিস্মিত, নির্বাক হয়ে রইল; চোখ দুটো একবার শুধু ঝলসিয়ে উঠেছিল। ওখানে বসে অপমান সহ্য করা আর সম্ভব ছিল না। ধনসিং উঠে দাঁড়িয়ে সিঁড়ি বেয়ে সোজা নিচে নেমে এল।

বাজারে এসে ধনসিং ভাবল, খাওয়া-দাওয়ার একটা জায়গা দেখলে হয়। কোথায় থাকবে, তাও মনে মনে ভাবছিল। এত বড়ো শহরে কার ভরসায় থাকবে? অর্জুনলাল ভরসা দিয়ে সঙ্গে করে এনেছিল কিন্তু ওকে ছেড়ে বেমালুম চলে গেল। ধনসিং-এর ঘর-বার বলতে কিছুই তো নেই; যা-একটা ছিল তাও ভেঙে গেল। একবার ভাবল, কম্যু-নিস্টদের সঙ্গে ভিড়ে গেলে হয় কিন্তু অর্জুনলাল ওকে সাবধান করে দিয়ে বলেছিল, এদের কাছ থেকে দূরে দূরে থেকো, এরা ইংরেজদের দালাল হয়ে গেছে।

অর্জুনলাল ধনসিংকে পথে বসিয়ে গেছে, তাই ওর 'পরে আর শ্রদ্ধা নেই কিন্তু ও ভেবে দেখল, কম্যুনিস্টদের কাছ থেকে ও কতটুকু পাবার আশা রাখে? অর্জুনলাল বলত, ও বড়ো বড়ো বাঘা বাঘা লোককে চেনে আর এঁদের উপর ওর নাকি আশ্চর্য প্রভাব; কত-কী তো বলত; এও বলেছিল, কংগ্রেস ভলেন্টিয়ার সেনাদলে ভর্তি করিয়ে দেবে, কত আশার কথা শোনাল, কত ভরসা দিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী হয়েছে? ধনসিং এও দেখতে পাচ্ছে এখানে কম্যুনিস্টদের তো শোবার জন্য একটা খাট পর্যন্ত নেই। এদের কাছ থেকে তবে কী আশা করা যায়?

মনটা আরো শক্ত করে ধনসিং লাঠি-মহালে মোতি ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেল। বিনীত স্বরে অর্জুনলালের কথা স্মরণ করাল, বলল দরকার পড়লে সে আপনার সঙ্গে দেখা করতে বলেছে। এও বলল, কংগ্রেসী আন্দোলনের জন্য ছ'মাস জেল খেটে এখন বেরিয়ে এসেছে। চাকরি-বাকরি যদি একটা পাওয়া যায় সেই আশায় সে এসেছে।

শেঠজী বললেন — কিছু লেখাপড়া তো জান না যে, হিসাব-কিতাব

সামলে নেবে বা কেরানীর কাজ করবে। তোমার জন্য কেউ জামানত রাখবে না বা তোমার কোনো জানাশোনো লোকও নেই যে তোমাকে দারোয়ানী বা চৌকিদারীর কোনো কাজ করিয়ে দি। চাকরি করতে চাও তো সরকারের হয়ে কাজ করো। এবার তো তোমাকে কংগ্রেস না-হয় একটু সাহায্য করুক। ভগবানের দয়ায় তোমার শরীরটা বেশ শক্ত-মক্ত। এ-বাজারে কাজের তো কমতি নেই : আচ্ছা কিছুদিন না-হয় মুটে-মজুরের কাজ করো। কংগ্রেসের যারা কাজ করে তারা যদি সবাই নেতা হয়ে যায় তবে কাজ কী করে চলবে ?

ধনসিং মোতিবাবুর কাছ থেকে চুপচাপ সরে পড়ল। বৈজনাথের দারোগার নামে ওর যেমন সমস্ত শরীর রাগে জ্বলে ওঠে, মোতিবাবুর কথা শুনে ওর ঠিক সেরকম রাগ হল, আর অপমানও। ও ভেবেছিল স্বাধীনতার সৈনিক হবে। কিন্তু ওকে তিনি উপদেশ দিয়েছেন, হয় সরকারি কাজ করো নয়তো মুটে-মজুর হয়ে লটবহর ওঠাও।

ধনসিং সারা দিন বাজারে ঘুরে বেড়াল। ভিড়ে গায়ের সঙ্গে গা লেগে যাচ্ছে, কাঁধের সঙ্গে কাঁধ। সিনেমা হলের সামনে কুম্ভমেলা বসে গেছে। সব লোকই হাসিখুশি, আর নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত। ইংরেজদের বিরুদ্ধে সমস্ত দেশ জুড়ে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠবে দিল্লীর জেলে বসে আজাদীর এই যে চিত্র কল্পনায় দেখেছিল, তা আজ সব ভুয়ো মনে হয়। ও রাত বারোটা পর্যন্ত ঘুরে-ফিরে বেড়াল। রাতে কোথাও একটু ঠাই না পেলেই নয়। একটাই জায়গা আছে : কম্যুনিস্টদের আশ্রয়নিবাসে গিয়ে সতরঞ্চি বিছিয়ে শুয়ে পড়া।

ধনসিং-এর ঘুম আসছিল ; শিথিল, ক্লান্ত মন। একদিকে গণেশ আর ওর মাথার দিকে কাসিম শুয়ে আছে। কাশিম ওর কথা বলে যাচ্ছে : ও নাকি অর্ডনান্স ফ্যাক্টরিতে ভর্তি হয়ে গেছে। কোনো শালা কোনো কিছু অনুসন্ধান করে নি। সরকার লোকের জন্য মরছে, চাইছে

লাখ লাখ লোক এসে নাম লেখাক।

গণেশ ধনসিকে বলল— কমরেড!

—জী। ধনসিং জবাব দিল।

—কী করবে ভাবছ?

একটু ভেবে নিয়ে ধনসিং বলল — একটা কোনো চাকরি পেতে চাই। ড্রাইভারের কাজ জানি।

—লাইসেন্স আছে?

- না, লাইসেন্স কিন্তু নেই।

—পাঞ্জাবেও কি খুব গণ্ডগোল হয়েছে? কোথায়, খবরের কাগজে তো দেখি নি।

—জানি না। আমি তো অর্জুনলালের সঙ্গে দিল্লী জেলে ছিলাম।

— ও, তুমি দিল্লীতেই বরাবর ছিলে। ওখানে পাঞ্জাব-পার্টির কোনো কমরেডকে চেনো নাকি? পাঞ্জাবে আমাদের খুব ভালো কিষাণ ফ্রন্ট আছে।

— আমি কাউকে চিনি না।

—চাকরি করতে চাও তো, লাইসেন্স নিতে হবে। বলে দিয়ো চুরি হয়ে গেছে।

—পুলিশের কাছে যাওয়া ঠিক হবে না।

—কী, কোনো ব্যাপার আছে নাকি? গণেশ ধনসিং-এর দিকে পাশ ফিরে শুয়ে আবার জিজ্ঞেস করল — তো কে তোমার কোটা নিয়ে বসে আছে শুনি? অন্য একটা নাম বলে দেবে আর তাও যদি না চাও অন্য কোনো চাকরি নিয়ে নাও। আসল কথা, করতে কী চাও?

ধনসিং বিনীতভাবে বলল— আমি পড়াশুনা কিছু জানি না যে।

ধনসিং-এর গলার স্বরে ব্যথার আঁচ পেয়ে গণেশ অন্য কথা পাড়ল। আস্তে আস্তে ও ঘুমিয়ে পড়ল। ধনসিং ঠিক করল, কারো কোনো

কথায় আর নাচবে না, নিজের যা মনে হয় এবার থেকে তাই করবে।

*   *   *

ধনসিং পরের দিন লোককে জিজ্ঞেস করে করে ছাউনিতে গিয়ে হাজির। হাতে মাপ নেওয়ার একটা লাঠি নিয়ে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে ; লোকটা সৈন্যদলে লোক ভর্তি করায়। ধনসিং ওকে জিজ্ঞেস করল— সৈন্যদলে ভর্তি হবার দপ্তরটা কোথায় জানেন ?

—ভর্তি হবে নাকি ?

—ড্রাইভার দলে ভর্তি হব।

—লাইসেন্স আছে ?

—জিনিসপত্রের সঙ্গে সব চুরি হয়ে গেছে। লোকটা ধনসিং-এর দিকে একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিল। নিজেও একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল— আমি সব করিয়ে দেব। বলো, আমাকে কী দেবে ?

ধনসিং একটু মুচকি হাসল— বাবুজী, শুনেছি, ভর্তি করাতে পারলে ইনাম পাওয়া যায়। আর তুমি আমারই কাছ থেকে চাইছ, তা হলে তো আমারই ইনাম পাওয়ার কথা।

লোকটা ধনসিং-এর মাথা থেকে পা পর্যন্ত খুব ভালো করে তাকিয়ে দেখল, তারপর বলল— তুমি পাঞ্জাবী, না ; তাই বলো। তুমিই ইনাম পাবে, না ? আরে ওস্তাদ, ভেবে দেখো তোমার কাছে লাইসেন্স নেই। বিশটা ঝগড়ার মধ্যে পড়বে ; অনুসন্ধান হলে পুলিশের ঘর পর্যন্ত পৌঁছবে, বুঝলে ওস্তাদ। তোমার পকেট থেকে থোড়াই চাইছি। তুমি যা ইনাম পাবে তার থেকে দশ টাকা চাই।

ধনসিং দিতে রাজি হল।

লোকটা জিজ্ঞেস করল— অফিসর যদি লাইসেন্সের কথা জিজ্ঞেস করে তবে কী জবাব দেবে ?

—সত্যি কথা বলে দেব, রেলে জিনিসপত্রের সঙ্গে সব খোয়া গেছে।

—অ-মা। এরকম সিধাসাদা লোক বলেই ভর্তি হবার জন্য পাঞ্জাব থেকে কানপুরে ছুটে এসেছ। রাস্তায় কত ভালো জায়গা তো আছে। তাই তো বলি, আমাকে শেখাতে এসেছ। আরে, এ আমার রোজকার কাজ। কত ফেরারীকে ফৌজে চালান করে দিলাম, তার ঠিক নেই।

কী এক তীব্র আশঙ্কায় ধনসিং মুখ ফুটে কিছু বলল না, মুচকে একটু হাসল। একটু পরে ভেবে বলল— ভাইয়া, আমি মিথ্যে কথা বলছি না। তুমি দশ কেন পনেরো টাকা নিয়ো। লাইসেন্স হারিয়ে গেলে কী আর করব!

—তুমি বলবে, কলকাতায় কাজ করতাম। বোলো, ট্যাক্সি চালাতাম, বুঝলে। বোলো, গাঁয়ে যাচ্ছিলাম ; যা টাকাপয়সা রোজগার করেছি ঘরে রেখে ভাবছিলাম ফৌজে ভর্তি হব। পথে সব টাকাপয়সা ও লাইসেন্স চুরি হয়ে গেছে।

ধনসিং সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়ল।

—কোন্ জেলায় থাকো?

—হোসিয়ারপুর।

—কোন্ জাত?

—রাজপুত।

—ঠিক আছে, যা বলেছি মনে আছে তো?

ধনসিং মাথা নাড়ল—হ্যাঁ।

প্রতিষ্ঠিত লোক

ব্যারিস্টার সরোলা, তার স্ত্রী, মনোরমা বিবি, ভূপী আর দীপা — এদের সঙ্গে সোমা লাহোরে এল। ধনসিং ফেরারী হবার পর আড়াই মাস সোমা লালজীর কুঠিতে ছিল: গত বছর ছিল চার মাস। সেখানে জীবনের এক নতুন, প্রতিষ্ঠিত ঢঙের পরিচয় পেয়েছিল। লাহোরের কুঠিতে এসে অন্য কিছু দেখল। ধরমশালার বাড়িতে ছিল নতুন ও পুরনোর মিশ্রণ; পরিবারের চালচলন ও আচার-আচরণের নিয়ন্ত্রণ করতেন একদিকে লালাজী, অন্যদিকে মা-জী আর অন্য আর-একদিকে মনোরমা। লাহোরের কুঠিতে কিন্তু লালাজী কর্তা নন, কর্তা ব্যারিস্টার সাহেব। এখানে, আধুনিক ঢঙেরই প্রাধান্য, পুরনো ঢঙ খুব কম, বউদির আশেপাশেই একটু যা আছে। ব্যবহার ও বাতাবরণে এক প্রকারের স্বচ্ছন্দতা বর্তমান।

ব্যারিস্টার সাহেব এবং মনোরমা সোমাকে একপ্রকার নিমন্ত্রিত অতিথি হিসেবেই নিয়ে এসেছেন। খুব আদরেই রেখেছিলেন। কিন্তু সোমা নিজের দুর্ভাগ্য, লজ্জা ও সংকোচে, সাহেব ও মন্নোর প্রতি একটা অসীম কৃতজ্ঞতার বোঝায় আনমনা হয়ে থাকে। সাহেব ওর আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নজর রাখেন; সোমা সামলায় তাঁর ঘর; পরিবারের

যাবতীয় কাজ ও কর্তব্য যেন ওরই ঘাড়ে। সোমা সরোলা পরিবারের ব্যবস্থায় নিজের ভাগ্য বিচার করে নিজেকে চাকরবাকরের সামিল করতে চেয়েছিল। ও ভাবে, তা-ই ওর আসল পরিচয়, ওটাই ওর স্থান। সাহেব ও মনোরমা ওর হাত ধরে টেনে ওকে অতিথির আসনে বসাতে চেয়েছিল। এই টানাপোড়েনে সোমা নিজের দুঃখের বোঝা অনেকটা হালকা করতে পেরেছে।

কার্তিক মাস যায় যায়; লাহোরের লোকেরা বলে, আবহাওয়া চমৎকার। কিন্তু সোমার কাছে এখনো খুব গরম বোধ হয়। সারাদিন ঘামে নেয়ে ওঠে; আঁচল দিয়ে মুখ মোছে। একদিন সন্ধ্যার সময় সাহেব ও মনোরমা চায়ের জন্য বারান্দায় বসেছে। সোমা চায়ের ট্রে এনে চা তৈরি করছিল। মনোরমা ওর দিকে চেয়ে মুচকি হেসে বলল —আরে, দেখো তো এই গরমে ওর চেহারা কী রকম সুন্দর হয়ে উঠেছে।

—হ্যাঁ, যত আঁচল দিয়ে মুখ মোছে তত যেন রঙ খুলে যায়। সাহেব সমর্থন করলেন।

লজ্জায় আরিক্তম হল সোমা। কেটলি ট্রে-তে রেখে দিল। চা তৈরি করে মাথা নিচু করে চলে গেল। কিন্তু এবার লজ্জায় ক্রোধ বা অপমানের ভাব জাগে নি, হৃদয়ে অনুভব করছে আশ্চর্য রকমের একটা তৃপ্তি, পুলকের একটা আবেশ মনে ছড়িয়ে পড়ছে। ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেখা। ব্যারিস্টার সাহেবের কাছে আসতে ও সংকোচ বোধ করতে লাগল। ব্যারিস্টার সাহেবের কিছু-না-কিছু বলার থাকেই। মনোরমা সমর্থন করে মৃদু হাসে। সোমার তখন না হেসে উপায় কী? সাহেব যা বলেন তাকে ও অগ্রাহ্য করে কী করে? কয়েকদিন পরে আবার এক সন্ধ্যাবেলায় ব্যারিস্টার ও মনোরমা সিনেমা যাবার জন্য তৈরি হয়ে চা খেতে বসেছেন। সোমা চা এগিয়ে দিচ্ছে। মনোরমা

বলল— এরকমভাবে কাপড় পরলে কত সুন্দর দেখায়।

—একেও সিনেমায় নিয়ে চলো। সাহেব ইংরেজিতে বললেন— কী রকম চমকে চমকে উঠবে দেখো, বেশ মজা হবে।

মনের কথা চেপে রাখার ধাত মনোরমার নেই। উৎসাহে দাঁড়িয়ে উঠে ডাকল, সোমা, সোমা বহিন। রান্নাঘর থেকে ও সোমাকে একেবারে টেনে-হিঁচড়ে নিজের ঘরে নিয়ে গেল। সোমা প্রথমে কিছু বুঝতে পারে নি কিন্তু মনোরমা যখন আলমারি খুলে কাপড়-ব্লাউজ বের করে সোফার উপর ছুঁড়ে ফেলে বলল— 'শীগ্‌গির জামা কাপড় পালটাও' তখন সোমা রীতিমতো ঘাবড়ে গেছে।

সোমা হাত জোড় করে বলল— না, না। ও আমার দ্বারা হবে না। আপনার পায়ে পড়ি।

— হোয়াট্ ননসেন্স! মনোরমা স্নেহের মিষ্টি বকুনি দিল। আর নিজেই ওকে কাপড় পরিয়ে দিতে এগিয়ে এল। সোমা সংকোচে হাঁটুতে মুখ বুজে বসে রইল। মনোরমা একটা ঝাঁকি মেরে রেগে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে পা বাড়াতে সোমা কাতর স্বরে ক্ষমা চাইল।

মনোরমা ফিরে এসে স্নেহ-মাখানো স্বরে বলল— তুমি একটা ডাহা পাগল। দুনিয়ায় কেউ কি কাপড় পরে না?

সোমা বিনীত কণ্ঠে বলল— আমি সালোয়ার পরে নেব'খন। শাড়ি ও একবারই পরেছে, ঐ যখন ধরমশালায় পুলিশের সামনে ওকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তখন ওর হুঁশও তেমন ছিল না। কিন্তু এরকী পোশাকে চলাফেরা করতে ও যেন শান্তি পায় না। ধরমশালায় পাঞ্জাব ও অন্যান্য রাজ্যের মহিলাদের শাড়ি পরতে দেখে ওর দেশ-গাঁয়ের পাহাড়ী মেয়েরা অবাক হয়ে ঠোঁটে আঙুল রেখে বলত— আরে, এ আবার কী ধরনের পোশাক পরা, নীচের থেকে যে একেবারে খোলা।

এ-মা, একটুও হায়া-লজ্জা নেইগো। সোমা ভাবে, ওরকম ভাবে শাড়ি পরা ওর পক্ষে অসম্ভব।

মনোরমা সোমার কথা মেনে নিল। সোমা কাপড় পরল বটে কিন্তু খুবই আনাড়ির মতো। মনোরমা সোমাকে মুখে পাউডার আর চোখে একটু কাজল লাগিয়ে নিতে বলল। সোমা তো অথৈ জলে। সোমা ধরমশালায় নিজের বাড়িতে একটু-আধটু সাজগোজ করত। ধনসিং-এর জন্য সাজতেগুজতে ওর ভালো লাগত। কিন্তু এখন কার জন্যে সাজবে? যাবার সময় মনোরমা ওকে মাথায় ঘোমটা দিতে বারণ করল। তাতে সোমার হল আরো মুশকিল। ও একেবারে কাঁদো কাঁদো হয়ে রইল। সাহেবের সামনে এসে ও যেন মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চাইল।

ব্যারিস্টার হেসে বললেন— এ আবার কী তামাশা?

এত কাণ্ড করে কোনো ফল না হওয়ায় মনোরমার স্বরে নৈরাশ্য ফুটে উঠল— আচ্ছা এই থাক্।

বউদিও বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিল। সেও খুশি হয়ে বলল— আরে, ওকে দেখতে তো বেশ লাগছে। ওকেও নিয়ে যাও না!

মনোরমা মাথা নাড়িয়ে আপত্তি জানিয়ে দাদার সঙ্গে চলে গেল।

মনোরমা ও সাহেব চলে যাবার পর সোমা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে খুব কাঁদল। সোমার পক্ষে এটা কম অত্যাচার নয়; কিন্তু শত হলেও এ তো স্নেহ আর ভালোবাসারই দাবি। ওদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় সোমা প্রাণ দিতেও প্রস্তুত।

বাড়িতে কোনো চাকরবাকর ময়লা কাপড়জামা পরে থাকলে সাহেবের অপমান লাগে। সাহেবের পুরনো কাপড়ের উপরেই কালা উধমসিং-এর নজর। ড্রাইভার বরকত তো ফিট-বাবু। সোমা এমনিতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে; কিন্তু নানা কাজের ঝামেলায় ও আনমনা উদাসী থাকায় ওর কাপড় ময়লা থাকে বা তাতে মসলার দাগ লাগে।

সাহেব তা দেখে মিসেস সরোলাকে বকাবকি করেন— ওর জন্যে কি বাড়িতে অন্য কোনো কাপড় নেই ! ও বাচ্চাদের সঙ্গে থাকে। ওরাই বা কী শেখে ?

মিসেস সরোলা নিজের স্বভাবসিদ্ধ আলস্যে এর জবাব দেয়— বদলে নেবে'খন। ওর জন্যে বউদিকে কথা শুনতে হল ভেবে ও লজ্জায় যেন মরে যায়। কিন্তু সারাদিনের কাজের ফাঁকে কী করে কাপড়ে মাড় দিয়ে তা আবার ইস্ত্রি করে নেয়। ঘরের সব কাজই তো ওকে দেখতে হয়। বউদির স্বভাবটাই এমনি যে যতটা অন্যে ওর কাজ করে দেবে ততটাই ভালো। ক'দিন আগে ওর শরীর খুব খারাপ ছিল। এখনো আবার তেমনি আছে। ভূপী ও দীপার সময়েও ওরকমই হয়েছিল। দুই মাসের পর থেকে ওর শরীরের এমন অবস্থা দাঁড়াল যে জলটুকুও হজম করা মুশকিল।

মাজী এখানে নেই ; তাই দায়-দায়িত্ব সোমার ঘাড়ে। চাবির গোছা সোমারই আঁচলে। এ-সব ব্যাপার নিয়ে মনোরমা মোটেই মাথা ঘামায় না। প্রথম দিকে কলেজে পড়ার সময় একেবারে ফুরসত পেত না। এখন সমাজসেবা আর জনসেবার কাজ নিয়েই থাকে। নুন-তেলের হিসেব রাখা বা ক'খানা কাপড় ধোপার বাড়ি যাবে— সে হিসেব-নিকেশের জন্যই তো মনোরমা এম এ. পাস করে নি !

সাহেবের প্রায় সব কাজ, জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ— সব সোমার ঘাড়ে। সকালে 'বেড টি' দেওয়া থেকে শুরু করে রাতে ঘুমোবার সময় শিয়রে জল রাখা কাপড়চোপড় সামলে রাখা, ঘর পরিষ্কার— যাবতীয় কাজ। সাহেব যদি অতিথিদের সঙ্গে দপ্তরে চা খান, তবে উধমসিং -এর ডিউটি পড়ে। ঘরে মনোরমার সঙ্গে বা একা চা খেলে সোমা চায়ের ট্রে নিয়ে আসে। এরকম অবসরে সাহেব কখনো বলেন— এসো, তুমিও আমাদের সঙ্গে চা খাও। আর সোমার জন্য অন্য একটা চেয়ার

আনতে বলেন। মনোরমাও সায় দেয়। কিন্তু ওর পক্ষে মনোরমা ও সাহেবের সামনে অন্য চেয়ারে বসে চা খাওয়া অসম্ভব ব্যাপার।

স্ত্রীর সঙ্গে চা খাওয়া সাহেব রুচিকর বা সুবিধাজনক মনে করেন না। চায়ের কটু স্বাদ তার মোটেই পছন্দসই নয়। দুর্বল হয়ে যাবার ভয় তো আছে, তাই চায়ের থেকে দুধ বা লস্যিটাই ভালো ও প্রিয়। শরীরটা মোটাসোটা, অসুস্থও বটে। চেয়ারে গা এলিয়ে কায়দামাফিক বসতেও কত অসুবিধে।

চায়ের টেবিলে মনোরমা অনুপস্থিত থাকলেও ব্যারিস্টার সোমাকে চায়ের সঙ্গী হতে বলেন— চা বা সুরা একা একা খেলে ঠিক যেন জমে না। সোমা লজ্জা পায়। ওর সারা শরীর কেমন যেন শিউরে ওঠে। কোনো উত্তর দিতে পারে না। মাথাটা কাত করে নীরবে চা তৈরি করে দেয়, একটু হাসে। হয়তো কাপে একটু কম বা বেশি চা ঢেলে ফেলে, এক-আধ ফোঁটা দুধ পেয়ালার বাইরে পড়ে যায়, হয়তো-বা চিনির দু-একটি দানা ছড়িয়ে পড়ে।

সোমা জানে শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ কোনো কাজ সাহেবের খুবই অপছন্দ। কিন্তু ও কোনো ভুলভাল করলে সাহেব হেসে ফেলেন। সাহেবের এরকম ব্যবহারে সোমা কেমন যেন দিশেহারা হয়ে পড়ে। কখনো কখনো সাহেবের গলার স্বরে একটা গভীর আবেগের ছোঁয়া পায়। সোমা ঘামাতে থাকে। হাত-পা শিথিল হয়ে যায়, শরীর অবশ হয়ে আসে। চেহারায় গোলাপি ছোপ লাগে। ও তখন লুকিয়ে পড়তে পারলে বাঁচে; অন্য কোনো কাজের ছুতো খোঁজে। ভূপী বা দীপাকে ধরে হয়তো ওদের পোশাকই পালটাতে থাকে কিন্তু মন লাগে না।

সোমা ভালো করেই জানে ও সুন্দরী। তাই ওকে সাহেবের এত পছন্দ। মন্নো বিবি কত বড়ো ঘরের মেয়ে, কত লেখাপড়া শিখেছে। রঙ ফর্সা হলেও সুন্দরী নিশ্চয় বলা যায় না। পুরু ঠোঁট, সুন্দর চোখ, মাথা

কী রকম খাড়া। বউদির চেহারায় কী রকম যেন ছেলেমানুষি ছাপ; ভালো লাগে দেখতে। কিন্তু শরীরটা কেমন যেন ফুলে ফুলে গেছে। এলোমেলো ভাবে কাপড় পরে; আর অসুখ তো লেগেই আছে।

…সোমা কারুর ভালো লাগাকে আগে ভীষণ ভয় পেত, অভিমানও হত খুব। ধরমশালায় ওর ঘরের আশেপাশের লোকেরা আসতে-যেতে ওকে দেখত, রাতে ওর ঘরেরসামনের দরজায় এসে যারা জ্বালাতন করত, তাদের সোমাকে না-জানি কত ভালো লাগত। কিন্তু তার পরিণাম কী হল? মঝেরার সেই মার্কামারা ছোকরাও ওর চারপাশে ঘুরঘুর করত। ও ছোকরার গালে কষে একটা চড় বসিয়ে দিয়েছিল। এখন ও কাউকে আর থাপ্পড় মারতে পারবে না। বৈজনাথের থানায় লণ্ঠন উঁচিয়ে ওর মুখে আলো ফেলা হয়েছিল; সোমা দারোগা ও পুলিশদের নজরে পড়েছিল। এ-সব কথা ভাবলে ওর শরীরের রক্ত কেন জানি হিম হয়ে যায়। অথচ ওকে সাহেবের ভালো লেগেছে, এ কথা যখন মনে মনে ভাবে তখন একটা মধুর অনুভূতি হয়, আবার কেমন যেন একটা অস্বস্তি হয়, ; মধুর আবেগের পরিবর্তে মনকে ঘিরে ধরে ভয়, একটা অধীর আশঙ্কা। আবার ভাবে — সাহেব তো খুব ভালো লোক, কত দয়ালু।

ধনসিং-এর স্মৃতি সোমার মনে আলোড়ন তোলে। উদাস হয়ে যায়। কাউকে কিছু বলতেও পারে না। মনোরমা ওকে উদাসী দেখলে আন্দাজ করে; ওর হাত ধরে কাজ ফেলে আসতে বাধ্য করে; টেনে নিয়ে যায় নিজের ঘরে। তিন-চার বার মনোরমা ওকে সিনেমায়ও নিয়ে গেছে। প্রথমবার মনোরমা ও সাহেবের সঙ্গে সিনেমায় যাবার নামে যে ছোটোখাটো ঝগড়া হয়েছিল, সেটা আর কখনো হয় নি। সাহেবের সঙ্গে যেতে না হলে সোমার আর সংকোচ হয় না।

মনোরমা সোমাকে নিজের ঘরে টেনে নিয়ে সোফা বা খাটে শুয়ে ওর সঙ্গে কথা বলে যায়। আশ্বাস দিয়ে বলে, ধনসিং ধরমশালা থেকে

হয়তো পালিয়ে গেছে। ছ'মাস কেটে গেছে। এই জায়গাটা সে চেনেও। কোনোদিন হয়তো এসে পড়বে…!

মনোরমা ঘরে কার সঙ্গেই বা কথা বলে? বউদি ওর সমবয়সী কিন্তু স্বভাবে নিশ্চুপ ও কিছুটা আত্মতুষ্ট। ত্রিশ বছরেও নিজেকে শুধু বিবাহিতা স্ত্রী ও দুটি বাচ্চার মা বলে জানে; মন্নো তো শুধু কুমারী মেয়ে! তাই যখন হৃদয় আনন্দে ভরে ওঠে, তখন সোমাকে নিয়ে দু-কথা বলতে চায়। এই আন্তরিকতায়, দাদার প্রতি সহানুভূতি আর বউদির উপর বিরক্তির ভাব জাগার ফলে সোমাকে একদিন বলেই ফেলল— দাদা তো অন্য একজন মেয়েকে চেয়েছিল, সেও দাদাকে চাইত। কিন্তু মাজী অন্য একটা সম্বন্ধ দেখল। বউদির বাপের বাড়ির লোকেরা একটু সেকেলে ধরনের। ব্যস, একবার মেয়ে দেখাতে রাজি হয়েছিল। সেই সময় দাদা চেহারা দেখেই ভুলে গিয়েছিল। যখন এ-বাড়িতে আসে, বেশ ছিমছাম চেহারা। খুব সুন্দর লাগত দেখতে। কিন্তু চেহারাই কি সব? দাদার সঙ্গে দুটো কথাও তো বলতে পারে না। আট ক্লাস পর্যন্ত পড়েছে। ওদের বাপের বাড়ি থেকে বলা হয়েছিল, ঘরে ইংরেজী পড়ানো হচ্ছে। কিন্তু শরীর তো দেখো। দুটো বাচ্চার মা ঠিকই কিন্তু এদের দুজনের মধ্যে কথাবার্তা হতে দেখি না।

ব্যারিস্টার সাহেব কোর্টে নিয়ম করে যান বটে কিন্তু ওঁর প্র্যাকটিস বিশেষ নেই। মোকদ্দমা যা হাতে আসে তা তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে নির্বাহ করেন। কিন্তু মক্কেল খুব কম আসে। অন্যেরা মক্কেলদের যেভাবে আকর্ষণ করে, তা ওঁর ধাতে নেই; খুব অপমানজনক লাগে। জজদের সামনে তিনি হুজুর বলতে পারেন না। ওঁর অহংকারও কমে আসছিল, কারণ প্র্যাকটিস না জমলেও আর্থিক কষ্টের চিন্তা ছিল না।

লালাজী চাইতেন, জগদীশ সহায়ও দুই বড়ো ভাইয়ের মতো ব্যবসা করুক। বড়োরা যে ব্যাবসা করে ব্যারিস্টারের দ্বারা তা হবার নয়। বড়ো

বড়ো ব্যারিস্টারই-বা কী? ব্যাবসাদারদের টাকাই তো খায়। কিন্তু জগদীশ সহায় ব্যাবসা জগতের কুচক্র সইতে পারতেন না। তিনি সম্মানের সঙ্গে, রোয়াবে ও আরামে থাকতে ভালোবাসেন। যুদ্ধের চাহিদা মেটাতে ঘরোয়া ব্যাবসা খুব বেড়ে গিয়েছিল। লালাজী ধরম-শালাতেই বেশির ভাগ সময় থাকেন। বড়ো ভাই কৃষ্ণ সহায় থাকেন কলকাতায়, মেজ ভাই বিন্দু সহায় করাচীতে কাজকারবার সামলান; তাই লাহোরের ব্যাবসাটা জগদীশ সহায়কে দেখতে হয়। এমনিতে লালা জওয়ালা সহায়ের পুরোনো ও বিশ্বাসী ম্যানেজার পণ্ডিত লজ্জারাম সব কাজটাই সামলায়। ব্যারিস্টারের কাজ দেখাশোনা করা, নজর রাখা। গত তিন মাস ধরে তিনি নিজেও একটা ঠিকাদারীর কাজ নিয়েছিলেন।

ক্লাবে হুইস্কি খেতে খেতে জগদীশ মেজর বাসুর প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। মিসেস বাসু ঘোড়দৌড়ে চার হাজার টাকা খুইয়ে এসেছেন; মেজরের মাইনে মাত্র দু'হাজার। মাসের খরচ এর চেয়ে কিছু কম নয়। মেজর চাইছেন, ব্যারিস্টার কয়েক মাসের জন্য চার হাজার টাকা ধার দেন। ধারের দরকার ছিল মিসেস বাসুর, শোধ দেবার দায়িত্বও তার। তাই জগদীশ ভদ্র ব্যবহার করতে উৎসুক। হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিয়ে তিনি ভাবছিলেন, চার হাজার টাকা নেহাত কম তো নয়··· মিসেস বাসুর উপর নজর পড়তে মুচকি হেসে বললেন— কিছু তো করতেই হবে।

মিসেস বাসু নিজের ভুলের জন্য সংকুচিত। লজ্জা পেয়ে ইংরেজীতে বললেন— আমি খুবই কৃতজ্ঞ থাকব।

মেজর বাসু আশ্বাস পেয়ে নিজের গ্লাস টেবিলে রেখে নিচু গলায় বললেন— তুমি এত বড়ো ব্যবসায়ীর ছেলে, তুমি নিজে কিছু করো না কেন? এরকম সুযোগ তো সব সময় আসে না।

মেজর বাসু লাহোর ছাউনিতে ডাক্তারী বিভাগের জিনিসপত্র খরিদ ও তার সরবরাহের প্রধান ছিলেন। বহু লোক তাঁর পিছনে ঘুরে বেড়ায় কিন্তু জগদীশের এত আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বেও কখনো তার কাছে এ-সব কথা বলেন নি।

কিন্তু আমি কি পারব? জগদীশ অনিচ্ছার স্বরে বললেন।

মেজর বাসু জগদীশের দিকে একটু ঝুঁকে গলার স্বর নামিয়ে বললেন— তুমি বেড়ালের নাড়িভুঁড়ি সাপ্লাই করো।··· দুই-আড়াই লাখ টাকার অর্ডার কালকেই দিতে পারব।

—দু'-আড়াই লাখ টাকার বিড়ালের নাড়িভুঁড়ি?— জগদীশ হেসে ফেললেন, বললেন – বিড়াল মারা আমার দ্বারা হবে না। এত বেড়াল সারা দেশেও খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। বেড়ালের এত নাড়িভুঁড়ি দিয়ে হবেটাই বা কি?

মেজর বাসু ধীরে ধীরে বুঝিয়ে বললেন - কেটেছিঁড়ে গেলে বেড়ালের অন্ত্র দিয়ে সেলাই করা হয়। এই সময় বিলেত থেকে জিনিস আসছে না; বরং ওরাই আমাদের কাছ থেকে চাইছে।

—কিন্তু এত অন্ত্র আসবেই বা কোথা থেকে?

—অন্ত্রের ওজন কম, দাম বেশি। আরে, আর-কিছু না হোক, যা অন্ত্র বলে মনে হবে সাপ্লাই করে দাও-না।

জগদীশ আপত্তি তুললেন— বলছেন কী? জখমের জায়গায় খারাপ জিনিস দিলে কত লোক যে বেমালুম মরে যাবে!

—আরে তুমি একটা আস্ত পাগল! তুমি কি ভেবেছ ঈশ্বর ফিশ্বরে আমার বিশ্বাস নেই? এরকম অন্যায় আমি করতে পারি? অন্ত্র গুদামে জমা হবে। তোমার বিলের টাকা দিন-পনেরোর মধ্যে আদায় হয়ে যাবে। ঐ অন্ত্র গুদাম থেকে আর হাসপাতালে পাঠানো হবে না। কী, মাথায় ঢুকল? গুদামে রাখা অন্ত্রের বাণ্ডিল বেকার হয়ে যাবে।

ওর উপর খারাপ ধরনের অ্যাসিড পড়তে পারে। আমি সেগুলি 'কনডেম্‌ড' বলে নিজের সামনে জ্বালিয়ে দেব। চাও তো পচা সুতো শিরিসের আঠায় ভিজিয়ে সাপ্লাই করো কিন্তু যা করবে খুব সাবধানে, কায়দামাফিক। মুনাফার শতকরা দশ ভাগ স্টাফের। এটা তো রোজ-কার ব্যাপার।

—আচ্ছা ভেবে দেখি, বলে জগদীশ ক্লাব থেকে ফিরে এলেন। রাতে ভাবলেন, বেশি টাকা রোজগার করতে পারছেন না বলে ওঁর দুই ভাইয়ের চোখে তিনি যেন একটু হেয় হয়ে আছেন। এভাবে তো অনায়াসে টাকা রোজগার করা যায়। একবার গাড়ি চালু হলে কাজ-কারবার এগিয়ে চলে। জগদীশ পরের দিন ফোনে মেজর বাসুকে সম্মতি জানালেন। অস্ত্র জোগাড় করার দায়িত্ব পড়ল ম্যানেজার লজ্জা-রামের উপর। এরপর জগদীশ আরো কয়েকটি ঠিকা নিলেন, ব্যাণ্ডেজ ও আরো কয়েকটি জিনিস সাপ্লাই করার ঠিকা। কাজটা খুবই সোজা। আমানত জমা করে পাইকারি ঠিকাটা খুব ভালো দরে নিয়ে নেওয়া এবং ছোটো ছোটো ঠিকাদারদের কম রেটে কাজে লাগানো। পাঁচ লাখের ঠিকাদারিতে শতকরা পাঁচ ভাগও যদি বাঁচে তবে ক্ষতি কী ? নিজের গায়ে তো আঁচড়টি লাগে না। যোগাযোগের সূত্রে জগদীশ বড়ো ব্যবসায়ী হয়ে উঠলেন।

ব্যারিস্টার জগদীশের সান্ধ্য-ডিনার খেতে ক্লাবে যাওয়ার কথা। সোমা কালো স্যুট, স্যুটের সঙ্গে ম্যাচ করা মাড়-দেওয়া সার্ট, মোজা-জুতো— সব-কিছু ঘরের তক্তাপোষের উপর রেখে দিয়েছিল। সন্ধ্যা-বেলা ফিরতে দেরি হল জগদীশের। তাড়াহুড়ো করে কাপড় বদলাতে লাগলেন। জামা পরে দেখলেন, জামার হাতার বোতাম নেই। মাড়-দেওয়া জামার চুড়িতে বোতাম লাগানো সহজ কাজ নয়।

জগদীশ ঝাঁকি মেরে উঠলেন— কাপড় কে রেখেছে ? চুড়িতে

বোতাম যে লাগায় নি। আসল রাগ করেছিলেন তাঁর স্ত্রী বা উধমসিং-এর উপর কিন্তু সোমাই তো সব-কিছু করে। পাশের ঘরে সোমা কী-একটা কাজ করছিল : ভেবেছিল, কোনো দরকারে যদি সাহেব ডাকেন তবে টক্ করে ঘরে যেতে পারবে ; সাহেবের কোনো অসুবিধা না হয় সেটাই ওর সাধনা।

সোমা সাহেবের ক্রুদ্ধ স্বর শুনে লজ্জায় মরে গেল। সাহেব জামাটা পরে নিয়ে এক হাতে বোতাম লাগাবার চেষ্টা করছেন। সামনে পড়ে ছিল অন্য বোতামটা। সোমা সেটা উঠিয়ে জামার অন্য চুড়িতে লাগাতে থাকল। সাহেবের মাথার এত কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে সোমার হাত কাঁপছিল।

সাহেবের রাগ উবে গেছে। হঠাৎ রাগ হওয়ায় এখন যেন একটু অনুতাপ। সোমাকে খুশি করতে, সান্ত্বনা দিতে তিনি একটু মুচকি হাসলেন, অন্য হাতটা সোমার কোমরে জড়ালেন। সোমার হাত থেকে জামার বোতাম ফসকে পড়ল। ও একটু কেঁপে উঠল। জগদীশ তার হাত ধরে কোমর ধরে চাপ দিল। সোমার মাথা জগদীশের বুকে ঝুঁকে পড়ল।

জগদীশ সোমার চিবুক আঙুল দিয়ে তুলে ধরে বললেন— কী হল ?

সোমার চোখ বুঁজে এল ; কপালে জমে উঠল বিন্দু বিন্দু ঘাম।

—পাগল, ঘাবড়াবার কী আছে ? জগদীশ নীচু গলায় বললেন।

জগদীশের ঘন ঘন শ্বাস পড়ছিল ; গলা ভারী হয়ে গিয়েছিল। সোমা তা স্পষ্ট অনুভব করতে পারল। ওর কাঁপুনি এমনিতেই থেমে গেছে। চোখ খুলে তাকাল। এবার সাহেবকে একেবারে অন্য মানুষ মনে হচ্ছে। এত কাছ থেকে সাহেবকে আর কখনো দেখে নি। সাহেব অধীর হয়ে সোমার ঠোঁটে চুমু খেলেন।

সোমার আবার চোখ বুজে এল। ও সাহেবের গলা জড়িয়ে ধরল।

সাহেবের বুকে মাথা রেখে গভীর ও ঘন নিশ্বাস নিল।

এই ঘটনার পর সোমা দু'দিন মন-মরা হয়ে রইল ; নানা চিন্তা মনে ভিড় করে আসে। নিজেকে ধিক্কার দিল— এ তুই কী করে বসলি ? ধনসিং-এর কথা মনে পড়ছে ; বৈজনাথের থানার দারোগার কথা শুনে তাকে খতম করার জন্য ধনসিং কী রকম গর্জাচ্ছিল ; সে দিনটার কথাই বিশেষ করে সোমার মনে পড়ে। সোমা তার পা জড়িয়ে ধরেছিল। ধনসিং দেওয়ালে মাথা ঠুকছিল ; সোমাকে বিশ্রীভাবে মেরেছিল। এ মারধোরের মধ্য দিয়ে ধনসিং-এর যে প্রচণ্ড অভিমান ফুটে উঠেছিল, তার স্মৃতিই যেন আজ মধুর মনে হয়। সাহেবের চুম্বন গ্রহণ করে সেই মধুর স্মৃতিতে কালিমা লেপ দিয়েছে সোমা। কিন্তু সাহেবকে ও কীভাবেই-বা রাগাবে ? ওর জন্য সাহেব কী-না করেছেন। তার প্রতিদান কী করে দেবে ? সাহেবের ঘরের কাজ করে দেয় কিন্তু কাজ তো সব চাকরবাকরই করে। সোমা নিজেকে বোঝাল, সাহেবের কৃপার প্রতিদানে ও আর কতটুকু করতে পারে। শুধু বাধা না দিয়ে, আপত্তি না করে, সাহেবকে না রাগিয়ে তাঁকে গ্রহণ করতে দেওয়া ছাড়া ওর তো আর কিছু প্রতিদান দেবার নেই···। যা একবার হারিয়ে ফেলেছে, তাকে বাঁধ দিয়ে কতদিন আর রুখবে ? শুধু কেঁদেকেটে কতদিন আর নিজেকে সরিয়ে রাখবে ?

*　　　*　　　*

বারবার পাহাড়ে বেড়াতে যাবার কথা ওঠে। কিন্তু ব্যারিস্টার জগদীশ সহায়ের ব্যাবসা দিনদিন বেড়েই যাচ্ছে। টাকাপয়সাও আসছে ; টাকা রোজগারের মোহে তিনি জড়িয়ে পড়েন ; নানা কাজের ফাঁদে পড়ে পাহাড়ে আর যাওয়া হয়ে ওঠে না। ধরমশালা থেকে মা বারবার লিখছেন, বাচ্চাদের না-হয় পাঠিয়ে দাও। কারবারে নতুন হাত দিয়েছেন

জগদীশ ; তা ছেড়ে কী করে যান। সোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলে মায়ের নজরে সোমার প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে। মনোরমারও সে-বছর পাহাড়ে যাবার বিশেষ উৎসাহ দেখা গেল না।

গরমে মিসেস সরোলার খুব কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু একলা তার কিছু করার শক্তি নেই। পাঁচ মাস পূর্ণ হয়েছে। এখনই এমন অবস্থা যে বিছানা ছেড়ে ওঠাই দায়। সারা ঘর-সংসারের কাজ সোমার ঘাড়ে। ঘর তো অনেকদিন থেকেই সোমা সামলাচ্ছে কিন্তু ওর ব্যবহারে সেই সংকোচের ভাবটা আর নেই।

সোমা আগে নিজেই সব কাজ করত : এখন প্রায়ই ও কাজ করায়। অন্য চাকরদের অনুরোধ আর করে না ; হুকুম দেয়। ওরাও জেনেছে, বিবিজির কথা কখনো যদি-বা না মানে সোমা বিবির কথা ঠেলবে কার ঘাড়ে দুটো মাথা।

মনোরমা ধরমশালায় সোমাকে কিছু লেখাপড়া শেখাতে চাইত, উৎসাহ দিত। কাছে বসিয়ে কিছু কিছু শেখাত। সোমা তাতে খুব লজ্জা পেত। এখন ঘরের নানা কাজে উধমসিং বা ড্রাইভারকে ডেকে ধোপার কাপড় লেখাতে বা অন্য কোনো হিসাব লিখিয়ে নিতে ওর খুব অপমান লাগে। সাহেব ওকে যেরকমটি দেখতে চায় সেরকম হয়ে উঠতে হলে লেখাপড়া জানা নেহাত জরুরি।

সোমা এর একটা উপায়ও বার করল। দীপা আর ভূপী কনভেন্টে পড়তে যায়। বাচ্চাদের জন্য বাড়িতে সোমা একজন মাস্টার রেখেছে। মাস্টারমশায় ঠিকমতো পড়াচ্ছেন কিনা সোমা কাছে বসে দেখে। এক মাসের মধ্যেই সোমা মোটামুটি হিসাব লিখতে শিখে গেল।

দিন কেটে যেতে লাগল।

অভ্যাসবশত জগদীশ মিসেস সিং বলে সম্বোধন করলেন। কেউ আশেপাশে আছে কিনা সোমা একবার দেখে নিয়ে মুচকি হাসল, রক্তিম

ঠোঁটে আঙুল রেখে বলল— নো, ডিয়র সোমা। লজ্জা ও হাসিতে ফেটে পড়ল সোমা। সোমার মুখে এরকম কথা শুনে জগদীশ বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গিয়েছিলেন। মিসেস সরোলার অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, বাড়িতে জগদীশের থাকা মানে হয়রানের একশেষ। সাহেবের এরকম অবস্থা দেখে সোমার মনটা দরদে ভরে যেত। সোমার নিজের ঘর ছিল বটে কিন্তু অনেক রাত পর্যন্ত সাহেব সোমাকে নিজের ঘরে আটকে রাখতেন, যেতে দিতেন না।

সোমার কত পরিবর্তন হয়েছে, নিজেকে কত ও সুধরে নিয়েছে, সাহেবের মুখে যখন সে প্রশংসা শুনত, সাহেবের চোখে প্রতিফলিত সোমার নিজের চিত্র দেখত তখন ওর মনে কেমন যেন নেশার ঘোর লাগত। মালিকের মুখে এত প্রশংসা শোনার চেয়ে বড়ো সুখ আর কী আছে? মদের নেশার মতো শুধু কয়েক ঘণ্টাই নয়, অষ্টপ্রহর এ নেশা মনে লেগে থাকে। সোমা যেমন-তেমন করে শরীর ঢাকার জন্যে আর কাপড় পরে না; এখন কাপড় পরে আত্মবিশ্বাস বাড়াতে; নিজেকে সুশ্রী ও সুশোভিত করে তোলার চিন্তাটা মনে সব সময় ঘুরপাক খায়। শরীরের সৌষ্ঠব ও চাহিদার বিচারে সোমা এখন শাড়ীর পাড় বাছে, দোপাট্টা জড়ায়; নিজেকে গড়ে তোলার ক্ষমতায় গর্বিতা; পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মনে অভিমানও জমে ওঠে। বড়োলোকের ঘরের বউদের মোটরে চলতে দেখে; দামী কাপড়ে ঢাকা নড়বড়ে শরীর দেখে তাদের সঙ্গে নিজের সৌন্দর্যের তুলনা করে আর সাহেবের কথা ভাবে। তিনি এদের দেখে বলেন, খুশবুদার জবরদস্ত কাপড়ে লেপটে এরা যখন যায় মনে হয় ময়লা-আবর্জনার এক-একটা গাঁঠরি। ভাগ্যের দোষে বড়োলোকের ঘরে জন্ম হয়েছে, অন্য কোনো বড়োলোকের ঘর শ্বশুরবাড়ি হিসেবে পেয়েছে। এ-সব কথা শুনে সোমার মনে নেশা ধরে; ওর ব্যবহারে ও গলার স্বরে একটা অধিকারের গুঞ্জন ধ্বনিত হয়।

মনোরমার সঙ্গে যখন সিনেমায় বা বাজারে যায় তখন সোমার সঙ্গে যা ব্যবহার করে তা মোটেই চাকরাণীর মতো নয়, বরং মনে হয় ও যেন বোন বা বউদি।

শুধু বউদি সোমাকে নাম ধরে ডাকে। সাহেব কোনো নামেই ডাকেন না। চাকরবাকরেরা ডাকে সোমা বিবি। সোমাকে মনোরমা ডাকে বোন, বাচ্চারা মাসি। চাকরবাকরেরা কখনো ডাকে সোমা বিবি বা মাসিজী!

ঘরের কাজ করতে সোমা আগের মতো অত ভয় পায় না, চিন্তায়ও পড়ে না। এখন মমতা ও অধিকারের দাবিতে করে। আজকাল দরকার হলে চাকরবাকরদের বকেঝকে দেয়। ঘরের চাকরেরা বহুদিনের পুরনো লোক, মার আমলের। তারা সোমাকে চাকরাণী ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না। মাইনে নেয় না, তাতেই-বা কী? চাকর-বাকররা ওকে সাহেবের মেয়েমানুষ মনে করে। সাহেবের দৌলতে তার ঠাটঠমক বেড়ে গেছে এটা তাদের ঠিক বরদাস্ত হয় না। অথচ কিছু বলতে পারে না; ওরা নিরুপায়। বউদির কাছে গিয়ে কিছু নালিশ করারও উপায় নেই, কারণ নালিশ করলেই বউদি তাদের নিমখারাম বলবে। ঘরের যা-কিছু সুব্যবস্থা— সবই সোমার দায়িত্ব, ওর তদারকিতে সব হয়।

ঘরের দরকারি জিনিসপত্র চাকরবাকররা নিয়ে আসে। সোমা এতে নানারকম ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখতে পায়; ওরা বেইমানী করছে বুঝতে পারে। প্রথম প্রথম সোমা মনোরমাকে সঙ্গে নিয়ে মোটরে করে দু'বার জিনিসপত্র কিনে এনেছে। কিন্তু এ ঝঞ্ঝাট মনোরমার একেবারেই পছন্দ হয় না। সোমা তখন থেকে একা একাই বাজারহাট করে। ওর বটুয়ায় ঘরের টাকাপয়সা; খুবই তার ভার। সব-কিছুর চাবি সোমার জিম্মায় রেখে প্রথম দিকে বউদি শুধু টাকা-পয়সার চাবিটা নিজের কাছে

রাখত ; কিন্তু এখন এটাকেও মনে হচ্ছে অনাবশ্যক ঝঞ্ঝাট। তখন থেকে ঘরের টাকাপয়সা সোমার কাছেই থাকে।

সোমা শুধু ড্রাইভার বরকতের সামনে বেরুত। বরকতের সুডৌল চেহারা, কথায়-বার্তায় চৌকস, ব্যবহারে তারুণ্য যেন ফেটে পড়ছে। সিনেমা ও গজলের পাগল। সিনেমা ও এত ভালোবাসে যে, সাহেব বা ঘরের মহিলারা যখন সিনেমা দেখতে যেতেন, তাঁরা সিনেমা হলের মধ্যে ঢুকে গেলে ও গাড়িতে চাবি লাগিয়ে নিজেও আট আনার টিকিট কিনে হলে গিয়ে বসত। ছবি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে গাড়ির কাছে এসে দাঁড়াত। তার প্রজাপতি-মার্কা গোঁফ, সিনেমা তারকার মতো লম্বা জুলফি, কান পর্যন্ত ছড়ানো চুল। উর্দি পরতে চাইত না ; গাড়িতে গিয়ে এমন কায়দায় বসত আর এমন ভঙ্গীতে চালাত মনে হত ও-ই যেন মালিক। যেভাবে সিগারেট টানত, চলত-ফিরত তাতে ওর ছিনালি স্বভাবটাই প্রকট হয়ে উঠত।

বরকত সোমার রূপে, ব্যবহারে আর অবস্থায় পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে। আগে বাজার করা বেশ লাভদায়ক ব্যাপার ছিল কিন্তু সোমার জন্যই তা হাতছাড়া হয়ে গেছে। মনে মনে ভাবে, সাহেবের উপপত্নী হয়ে গেছে তো কী হয়েছে, আসলে তো ও চাকরানী। বরকত তাই মুচকি হেসে সোমার সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করে। গাড়িতে করে নিয়ে যাবার সময় কোনো গজলের কলি আউড়ে সোমার সঙ্গে নিঃসংকোচ ব্যবহার করতে চাইত। সোমার এ-সব মোটেই পছন্দ হয় না, কিন্তু উপেক্ষা করা ছাড়া ওর আর কী উপায়? অপমান স্বীকার করলেই অপমান।

বরকত জানত ঘরে সোমার কথাই চলে। সোমাকে ও খারাপ মেয়েমানুষ ছাড়া ভাবতে পারে না। যদি ওর দিকে একবার ঝুঁকে যায়! সিনেমায় কি এ-রকম ঘটনা ঘটে না? তবে ওর ক্ষমতা আছে

বই-কি! সাহেবের ভালোবাসার জন হয়ে গেছে তো! কোনো উপায়ে যদি ওকে বাগে পাওয়া যায়।…একবার যদি হাসাতে পারি তবে নির্ঘাত রাস্তা পেয়ে যাব।

একদিন বাজারে সোমা কেনাকাটা শেষ করে গাড়িতে ফিরে আসতে দেখে বরকত সেলাম ঠুকে গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে হেসে বলল—সরকার, গরিবের দিকে একটু নজর রাখবেন!

বরকত সবিনয়ে যদি দু-চার টাকা বকশিশ চাইত, সোমা হয়তো দিয়ে দিত। ও জানত, চাকরদের ইনাম-বকশিশ দিলেই ওদের কাছে নিজের ইজ্জত বজায় থাকে। সোমা ভালবাসা ও আদরের স্বাদ পেয়েছে ঠিকই কিন্তু বরকতের ব্যবহারে ভালোবাসা নেই, আছে ইয়ার্কি করার সাহস। সোমার কপালে ক্রোধের কয়েকটি কালো রেখা ফুটে উঠল—কী বকছ! ধমক দিয়ে বলল— যা বলবার সাহেবকে বোলো।

বরকত ভয় পেয়ে গেল। দাঁতে দাঁত পিষে ভাবল— দেখে নেব।

* * *

গত বছর শীত পড়ে আসার সময় মনোরমা পরিবারের সঙ্গে ধরমশালা ছেড়ে লাহোর আসে। কিছুদিন পরে ভূষণ ও তার সহকর্মীরা জেল থেকে ছাড়া পেল। যুদ্ধে সহযোগিতার বিরুদ্ধতা করে কম্যুনিস্টরা আড়াই বছর আগে ইংরেজ সরকারের রোষের কারণ হয়েছিল। 1941 সালের জুন মাসে জার্মানী রাশিয়ার উপর আক্রমণ চালায়। জাপান ভারতের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। কম্যুনিস্টরা ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী ছিল; জাপান ও জার্মানীর ফ্যাসিজমের মনোভাবকেও তারা পরম শত্রু বলে মনে করে। জার্মানীর পরাজয়ে এবং রাশিয়ার বিজয়ের ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্যবাদের শক্তি আরো শক্তিশালী

হয়ে উঠবে, এ রকম একটা আশা জাগে।

তবু কম্যুনিস্টরা দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও জানত, ইংরেজ সাম্রাজ্যের স্থানে যদি জাপান সাম্রাজ্য বিস্তার করে তবে সেটা হবে আরো সাংঘাতিক। তারা চায় নি যে, ভারতের জনসাধারণ জাপানী বোমার শিকার হোক। তারা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির রূপান্তরের জন্য নিজেদের নীতিকেও পালটে নিতে বাধ্য হল। নিজেদের দেশ ও সমাজবাদের স্বার্থে তারা এই যুদ্ধকে জনতার যুদ্ধ বলে মেনে নিল; আত্মরক্ষার জন্য তারা এ যুদ্ধে সহযোগিতা করার সিদ্ধান্ত নেয়। সরকার তাই বেশির ভাগ কম্যুনিস্টদের জেল থেকে ছেড়ে দেন। এই একই কারণে যারা ইংরেজকে ঘৃণা করত, ইংরেজদের সংকটে যারা পরিতৃপ্ত হত, তারা এখন কম্যুনিস্টদের ঘৃণা করতে আরম্ভ করল।

ভূষণ মনোরমার বাড়িতে যেত না! মনোরমা নিজেকে বোঝালো, জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে ভূষণ – তার প্রতি সহানুভূতি জানাতে ওর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়াই বেশি যুক্তিসংগত। এ সময়ে দেখা করতে গেলে ভূষণ জানতে পারবে না ওর সঙ্গে দেখা করার জন্য মনোরমা ব্যাকুল হয়ে আছে। মনোরমা যখন পার্টির অফিসে গিয়ে পৌঁছল, ভূষণ তখন পার্টির সহকর্মীদের নয়া নীতি বোঝাচ্ছিল। মনোরমার সঙ্গে কথা বলার সময় তার ছিল না। শুধু একবার হেসে জিজ্ঞেস করল— তুমি ভালো আছ তো? জগদীশ ভাইয়ের খবর কী? সোমা কেমন আছে? আজ আমি বোম্বাই যাচ্ছি; ফিরে এসে তোমাদের বাড়িতে একবার যাব।

মাঝখানে প্রায় চৌদ্দ মাস কেটে গেছে। ভূষণ তার প্রতিশ্রুতি রেখেছে। মনোরমার বাড়িতে গিয়ে তাকে অভিনন্দন জানিয়ে বলল— আমি সংবাদপত্রে তোমার দু-তিনটে লেখা দেখলাম। তোমার কলমের জোর আছে কিন্তু তোমার বিচারবুদ্ধি এখনো কেমন যেন বিক্ষিপ্ত;

আইডিয়া খুব কনফিউজ্‌ড রয়েছে। আসলে তুমি পার্টির কাগজ নিয়মিত তো পড়ো না, তাই। রায়ের ডেমোক্রাটিক পার্টি ও আমাদের দলের মধ্যে চিন্তাধারার যে পার্থক্য তা তোমার লেখায় স্পষ্ট ধরা পড়ে না। চার্চিলের দৃষ্টিতে যে পথ সে পথ অনুসরণ করে আমরা সমাজবাদী হয়ে যাব, আমরা তা বিশ্বাস করি না। কম্যুনিস্টরা এটা বিশ্বাস করে না যে, পরিস্থিতিটা নিজেই বিপ্লব নিয়ে আসবে। তা কখনো হয় না। মানুষের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টাই একটা জরুরি অবস্থার সৃষ্টি করে। ফ্যাসিজমের মোকাবিলা যেমন করতে হবে তেমনি রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণের অধিকার আমাদের অর্জন করতে হবে। দুটোই আমাদের কাজ।

ভূষণের সঙ্গে আড়াই বছর পরে দেখা। এখন সে পার্টি লাইনের কথা শুনতে মোটেই আগ্রহী নয়। লেখিকা হিসেবেও ওর যে আত্ম-সম্মান তাতেও ভূষণ আঘাত করেছে। এটা অনেকটা কৃতজ্ঞতারও প্রকাশ। পার্টি অফিসে মনোরমা যখন ভূষণের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল, তখন ভূষণ সঙ্গীদের 'নয়া থিসিস' বোঝাতে ব্যস্ত ছিল। তখন মনোরমা সামান্য যা কিছু শুনেছিল তাকে তাকে ভিত্তি করেই, ঘৃণা ও গালিগালাজ থেকে কম্যুনিস্টদের বাঁচানোর উদ্দেশ্য নিয়েই মনোরমা এ-সব প্রবন্ধ লিখেছিল। এখন ভূষণ বলছে, এ-সব লেখার দৃষ্টিভঙ্গি ভুল।

মনোরমা নিজের রুমালটাকে আঙুলের উপরে লেপটে নিয়ে ঠোঁটে চেপে ধরে বলল— আমি তোমাদের পার্টির হুকুমে লিখি নি। যা আমি ঠিক ভেবেছি, তাই লিখেছি। বহু কংগ্রেসী এতে খেপে গেছে! তোমার পার্টিও হয়তো চটে যেতে পারে, জানি না। দাঁড়াও, চা দিতে বলি।

মনোরমার কথা না শোনার ভাণ করে ভূষণ অন্য প্রসঙ্গ পাড়ল— হ্যাঁ, ভালো কথা। সোমার কী খবর? ধনসিং-এর কিছু খবর পাওয়া গেছে নাকি?

একটু ভেবে নিয়ে মনোরমা বলল— দাঁড়াও, সোমাকে ডাকি। ভিতরে গিয়ে একটু পরেই ফিরে এল মনোরমা।

ভূষণ জানতে চাইল — এবার তোমরা পাহাড়ে বেড়াতে গেলে না ? এসময় বম্বের আবহাওয়া খুব খারাপ থাকে। ধরমশালার কথা খুব মনে পড়ে।

ছু-তিন মিনিট পরে এক রূপবতী ভদ্রমহিলা সেলাইয়ের নানা জিনিস হাতে নিয়ে ঘরে এসে বসল। যুবতী ধবধবে ইস্তিরি করা সাদা শাড়ী পরেছে। মুখে একটা অধিকারের ছাপ ; নিঃসংকোচ ব্যবহার। মহিলাকে নমস্কার করে ভূষণ হাতে একখানা কাগজ টেনে নিল। মনোরমা হেসে বলল— শোনো, চিনতে পারলে না তো। এই যে আমাদের কমরেড ভূষণ।

ভূষণ তার দিকে তাকাল। মহিলা খুব যেন সংকুচিত হয়ে পড়ল. চোখেমুখে বিস্ময় ফুটে উঠল। সংকোচের সঙ্গেই ভূষণের দিকে হাত তুলে নমস্কার করল।

ভূষণ প্রতি-নমস্কার জানিয়ে চিনতে না পেরে মনোরমার দিকে অপ্রস্তুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। মনোরমা হেসে উঠে বলল— আপনিও চিনতে পারলেন না যে ?

—সোমা, না ? ভূষণের স্বরে বিস্ময়।

সোমা মাথা নত করে কিছুক্ষণ বসে থেকে আস্তে আস্তে উঠে গেল। ভূষণ কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল— ধনসিং কোথায় ?

ধনসিং-এর ফেরারী জীবনের কাহিনী মনোরমা সংক্ষেপে বলল।

ভূষণ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর বলল— মনে পড়ে, একদিন ঐ লোকটার অভাবে এই মহিলার জীবন ধারণ অকল্পনীয় মনে হত। এখন সে অন্য ছুনিয়ার মানুষ। আমি তোমাকে একদিন বলেছিলাম,

কথাটা হয়তো তোমার মনে আছে, প্রেম শুধু জীবনের পূরক।

মনোরমার বেশ মনে পড়ে। আকাশটা সেদিন মেঘাবৃত ছিল। প্রচণ্ড জোরে হাওয়া বইছিল; হাওয়ায় কাপড় উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল. কাপড়ের ফতফত আওয়াজে কিছুই যেন শোনা যাচ্ছিল না। তবুও কথাটা শুনে হৃদয় যেন বিঁধে গিয়েছিল। কথাটা শোনার পরে মনটা কেমন বিষণ্ণ হয়ে গিয়েছিল; শরীরটা কেমন যেন ক্লান্ত বোধ হয়েছিল। মনোরমা হঠাৎ বসে পড়েছিল। সে কথা আবার বহুদিন পরে মনে পড়ে গেল মনোরমার। নিজের সেই মানসিক ক্লান্তির কথা আর ভূষণের জরুরি কাজের দৃপ্ত অহংকার। মনোরমা কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইল।

ভূষণ তখন তার বিশ্লেষণ শুরু করে দিয়েছে— হতে পারে ধনসিং হয়তো আর কখনো ফিরবে না। প্রাণের ভয় মস্ত বড়ো ভয়; এও হতে পারে ওর হয়তো অন্য কোনো মহিলা জুটে গেছে আর হয়তো ওর এখনকার জীবনের অনেক বেশি সহায়ক।

মনোরমা তীক্ষ্ণ তীব্র আঘাত পেয়ে ঠোঁট দিয়ে মুখটা চেপে রইল।

ভূষণ বলে গেল— যদি ধনসিং আজ ফিরে আসে তবে হয়তো সোমা তাকে সইতে পারবে না। হয়তো ওকে দেখে বিরক্ত হয়ে উঠবে। মহিলা এখন কী করে?

যে সিদ্ধান্তে পৌঁছবার জন্য ভূষণ তর্ক শুরু করে দিয়েছে, তা মনোরমার মোটেই পছন্দ হচ্ছে না।

মনোরমা প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতে চাইল— ঠিক আছে, কিছু একটা করে তো জীবন নির্বাহ করতে হবে, করছেও।

ভূষণ মনোরমার স্বরে বিরক্তির আভাস পেয়ে বলল— মেয়েদের জীবনে এমন একটা অবস্থা আসে যখন যাকে-তাকে বিয়ে করে জীবন কাটানো সম্ভব হয় না। বিয়ে যদি না করতে হয় তবে কিছু-একটা কাজ করে জীবন নির্বাহ করার প্রয়োজন হয়। আজকাল আমাদের

সমাজে মেয়েদের জন্য দুটি কাজ করার সুযোগ আছে : হয় অধ্যাপনা, নয়তো ডাক্তারি। একে নার্সের কাজে ট্রেনিং দিয়ে দাও। নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে। তখন চাইলে বিয়েও করে নিতে পারবে।

ধরমশালায় ভূষণ 'ব্যাবহারিক প্রেম' প্রসঙ্গে যে-সব উপদেশ দিয়েছিল, এখন আবার সে-সব কথা শুরু হতে দেখে মনোরমা বুঝতে পারল যে, ভূষণ যা বলছে তা ওকে লক্ষ্য করেই বলছে। ভূষণের দিকে না তাকিয়েই মনোরমা বলল— কেন এত চিন্তা করছ ; অনুভূতিই মানুষকে পথ দেখায়।

ভূষণ সিগারেট ধরিয়ে বলল— আমি তো ব্যাবহারিক জীবনের কথা বলছি।

মনোরমা আরো চটে উঠল— তোমার গলায় তো কেউ আর ঝুলতে চাইছে না। মুখ দিয়ে কেন জানি বেরিয়ে গেল কথাটা।

ভূষণ চুপ করে গেল। একটু ক্ষুণ্ণও হল। তা লুকোতে মুচকি হেসে ও সিগারেট ধরাল। দু'বার কষে টান মেরে ধোঁয়া ছাড়ল এবং তারপর উঠে পড়ল— আর তিন সপ্তাহ এখানে আছি। আবার দেখা হবে। ভূষণ বিদায় জানিয়ে নমস্কার করল কিন্তু মনটা ওর এত ভারী হয়ে রইল যে একটু হেসে বিদায় জানাতে ভুলে গেল। শুধু হাত জোড় করে উঠে দাঁড়াল।

মনোরমার মনটা বড়ো ভার হয়ে আছে। কোনো বই টেনে এখন আর পড়তে ভালো লাগছে না ; সোমার সঙ্গে কথাবার্তা বলতেও ইচ্ছে করছে না। তা ছাড়া সোমার সঙ্গে কী কথাই বা বলবে। সোমার পুরনো কোনো অতীত বিষয় নিয়ে ভাবতে থাকে মনোরমা ; সত্যিই কি সোমা দাদার সঙ্গে প্রেম করে ? প্রথম দিকে মনোরমা ভাবত দাদাই সোমার প্রেমে পড়েছে। বউদির মতো মেয়ের সঙ্গে দাদার বিয়ে হওয়া

সামাজিক অন্যায় বলেই মনোরমার মনে হয়। কিন্তু গত চার মাস থেকে দাদা যে আবার মিসেস বাসুর প্রতি অনুরক্ত, এটা দেখে মনোরমা কেমন যেন একটা অন্যায় ও গ্লানি অনুভব করে। মনোরনা ভাবে, দাদা প্রেম জিনিসটাকে এধরনের একটা খেলা বলেই মনে করে। দাদা ভালোবাসে বলেই দাদার দোষ ওর অতটা চোখে পড়ে না ; তার প্রতি এই পক্ষপাতদৃষ্টির জন্যই ভাবে. দাদার এই দুর্বলতার দায়দায়িত্ব সবটা দাদার নিজের নয় : এরজন্য অনেকটা দায়ী মা-বাবা। ওঁরাই দাদাকে গায়ত্রীকে বিয়ে করতে দেন নি আর তার ফলেই দাদা আজকাল সব সময় কেমন যেন চঞ্চল, অস্থির।

কিন্তু সোমা ?··· সোমা তো একদিন ধনসিং-কে ভালোবাসত আর আজ ? সত্যিই কি সোমা দাদাকে সেরকমই ভালোবাসে ? এটা কি সম্ভব ?··· মানুষ কি এত সহজে মন পালটে ফেলতে পারে ?··· অন্যের গলগ্রহ ও আশ্রিত হয়ে থাকার মূল্য কি সোমা জুগিয়ে যাচ্ছে ?··· সোমা কি আশ্রয়ের বিনিময়ে নিজেকে বিলিয়ে দেয়, না প্রেমের মূল্য হিসেবেই নিজেকে তার বিকিয়ে দেবার শখ ?

মনোরমা এ-কথা ভাবতে ভাবতে তলিয়ে গেল ; ওর কেন জানি মনে হল, সব মেয়েদের বোধ হয় নিজেদের আশ্রয়ের জন্য প্রেমের বিনিময়ে দেহকে মূল্য হিসেবে দিতে হয়। যাকে মানুষ আশ্রয় হিসেবে চায় না সেটাই তো পরিপূর্ণ প্রেম। প্রেমের মূল্য হিসেবে আমরা সারা জীবনের আশ্রয় নয়তো কিছু অর্থ চেয়ে নিই। যে আশ্রয় চায় না নিজের পায়ে যে দাঁড়িয়ে, শুধু সেই-তো প্রেমের প্রকৃত অধিকারী। নিজের পায়ে দাঁড়াবার কথা বলেছিল ভূষণ, এটা হক্ কথা। মনোরমা নিজের জীবনের দিকে তাকিয়ে দেখল ; বাইশ বছর বয়সে এম. এ পাস করেও সে এখনো নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে নি। বিচার করতে বসলে যে-কথা সোমার ব্যাপারে খাটে, সে কথা ওর বেলাতেও প্রযোজ্য।

মনোরমা ঠিক করেছে শুধু আশ্রয় চাইতে জীবনে বিয়ে করবে না! সোমার পরিণতি ওর চোখের সামনে ভাসে। জেনে বা না জেনে সোমা কী-যে-সব করে যাচ্ছে। কিন্তু অত্যাচারের মাশুল হিসেবে সোমা তো জীবনকে গ্রহণ করে নি। হতে পারে যা ও করছে, আইনের চোখে, সমাজের চোখে সেটা করার ওর অধিকার নেই কিন্তু এটা তো ঠিক যে, দাদা বউদির চেয়ে সোমাকে পেয়ে অনেক বেশি খুশি হয়। মনোরমা আর আগের মতো সোমাকে ভালোবাসে না; এখন ওর জন্যে অবশিষ্ট রয়ে গেছে সামান্য একটু করুণা। নিজের সঙ্গে তর্ক করে মনোরমা: সমাজ হয়তো যা খুশি বলতে পারে কিন্তু অবস্থায় পড়ে সোমার যে রূপান্তর— সমাজ তার কী সমাধান দেবে? কেউ কি সোমার বন্ধু হতে পারে না? দাদার সঙ্গে ওর সম্পর্ক বন্ধুত্ব ছাড়া আর কী? কিন্তু সোমা দাদার হাতের মুঠোয়; তা যদি না হ'ত তবে সোমা সমাজের মুখের ওপর জবাব দিতে পারত।

মনোরমা সন্ধ্যাবেলা সোমাকে ডেকে নিজের ঘরে নিয়ে এল। হঠাৎ ভূষণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যাবার পর সোমার মনে অতীতের অনেক স্মৃতি ভিড় করে এসেছে; গভীর একটা আঘাতে সোমার মন কেমন যেন তোলপাড় করছে। দু'জনের মনই উদাস। আগের মতো সোমার অত সংকোচ নেই; আগে এরকম অবস্থায় একটু দূরে সরে দাঁড়াত, বসতে বললেও বসত না, বোবার মতো নীরবে শুনে যেত। আজকাল নিজের বুদ্ধি অনুসারে সোমা একটু-আধটু জবাব দেয়।

মনোরমা বলল— ধনসিং-এর তো কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছে না; আসবে কি আসবে না তাই বা কে জানে? জীবন যে কাকে কোথায় নিয়ে যায় তা কে বলবে?

সোমা গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মনোরমা বলে গেল— দীর্ঘ জীবন একা কাটাতে হলে কোনো একটা অবলম্বন তো চাই।

মনোরমা বলল— নিজেও সে আত্মনির্ভরশীল হতে চেয়েছিল। কিন্তু বাবা বারবার বাধা দিতে চেয়েছেন। তবুও এখন সে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়। মনোরমা সোমাকে পরামর্শ দিয়ে বলল— নার্সের কাজ তুমি শিখে নিচ্ছ না কেন? জানো, বিদ্যা কৌল নামে একটি মেয়ে নার্সের কাজ করছে। মাসে দু'তিন শো টাকা রোজগার করে।

সোমা উত্তর দিল— বহিনজী ঠিক কথাই বলছ। কিন্তু মেয়েদের যদি কাজ করেই পেট ভরাতে হয় তবে তার জীবনে আর কী বাকী থাকে? এ-ঘরসামলাতেই তো আমার ভালো লাগে।

মনোরমা চুপ মেরে গেল। এই ঘর সামলাবার কোনো অধিকার তোমার নেই— মনোরমা সোমার মুখের উপর এ কথাই বা বলে কী করে? মনোরমার চাকরি করার বিরুদ্ধে যুক্তি দেখাতেই সোমা এ কথা বলেছে। এখন সোমা ভাবতে শুরু করেছে ওর জন্যে যে নিয়ম সেই একই নিয়মে মনোরমাও বাঁধা। নিজেকে আর সে দীনদুঃখী ভাবে না; সে সংস্কারও তার আর নেই। এ অবস্থায় মনোরমা কী-ই-বা বলবে?

মনোরমার লেখার হাত আছে; প্রবন্ধও লিখেছে, আর কিছু গল্পও। এক সময় লেখক হবার স্বপ্ন দেখত; তাতে নিজের কৃতিত্বে, ক্ষমতায় ও আত্মতৃপ্তিতে পরিপূর্ণ হবার হয়তো আশা ছিল। লেখক হয়ে জীবিকা নির্বাহ করার উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা শুনে ব্যারিস্টার জগদীশ হেসে উঠে বলেছিলেন— এ দেশে লেখক হয়ে জীবিকা নির্বাহ করার শক্তি যদি তোমার থাকে তবে তুমি তো রবিঠাকুর হয়ে যাবে! এই পরিহাস শুনে মনোরমা মোটেই নিরুৎসাহ হয় নি।

কিন্তু ভূষণের কথায় বড়ো আঘাত পেয়েছে মনোরমা। জনমতের পরোয়া না করে যেসব কথার সমর্থনে মনোরমা যেসব প্রবন্ধ লিখেছে, তা লেখা অত সহজ ছিল না; ওর বিদ্যাবুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি কি এত কম যে তার কথা উল্লেখ করে তাকে আঘাত দিতে হবে? এর চেয়ে তো

না লেখাই ভালো ছিল। এদের পক্ষ নিয়ে আর লিখেই বা কী লাভ? সব কিছু মিলে কেমন যেন একটা ব্যর্থতা ও অন্যায়ের দংশন মনটাকে ক্লান্ত করে তুলল আর সে সংগ্রামের অস্ত্র নামিয়ে রাখল। ভাবল, লেখক হবার দুরাশা ছেড়ে জীবিকার জন্য অধ্যাপিকার কাজ নিলে কেমন হয়। কাউকে না বলে মনোরমা স্থানীয় একটি মহিলা কলেজে চাকরির জন্য আবেদনপত্র পাঠিয়ে দিল।

যে কলেজ চাঁদার জোরে চলে, সেরকম একটি কলেজের কর্তৃপক্ষের পক্ষে লালা জওয়ালাসহায়ের মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার সুযোগ তো বারবার আসে না। মনোরমা মাসে দেড়শো টাকা মাইনের একটি চাকরি পেয়ে গেল।

জগদীশ আপত্তি তুললেন— তোমার পড়াবার সখ হয়েছে বা তোমার সময় কাটছে না বলে যদি পড়াতে চাও তো কোনো অবৈতনিক কাজ নাও। তুমি চাকরি করছ এটা লালাজী কখনো বরদাস্ত করবেন না।

মনোরমা বলল – এটা তোমাদের শ্রেণী-অহংকার। পড়িয়ে জীবিকা নির্বাহ করা লজ্জাজনক ব্যাপার নয়।

ব্যারিস্টার স্বীকার করলেন— শ্রেণী বিভেদ যেমন আছে তার প্রভাবও আছে। এই মেয়েদের কলেজ থেকে তুমি বছরে 15শো টাকা মাইনে পাবে। লালাজী ওদের বছরে 5 হাজার টাকা দান করেন। এটা পরিহাস নয় তো কী? তুমি আমার বাবার আত্মমর্যাদায় ঘা দিয়ে নিজের আত্মসম্মান বাড়াতে চাও?

মনোরমার চাকরি করার কথা জগদীশ লালাজীকে জানিয়েছিলেন। লালাজী ও মায়ের কাছ থেকে যে পত্র এসেছে তাতে দুজনেই লিখেছেন মনোরমা চাকরি করুক এটা তাঁরা চান না। রাগে-দুঃখে মনোরমার চোখে জল এসে গেল কিন্তু অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করল।

মেজর বাসু ও মিসেস বাসু মুসৌরী গিয়েছিলেন। মিলিটারীর

এক ঠিকাদারি কাজের ব্যাপারে মেজর বাসুর সঙ্গে জগদীশের দেখা করার প্রয়োজন ছিল। জগদীশ মনোরমাকে ডেকে বললেন— দশেরার ছুটি, এবছর আমরা পাহাড়ে বেড়াতে যাই নি। চলো, এক সপ্তাহের জন্য মুসৌরী ঘুরে আসি।

মনোরমাও লাহোরে বিরক্ত হয়ে উঠেছিল, এ-জায়গার প্রতি অনুরাগী হয়ে ওঠার অন্য কোনো কারণ ঘটেনি। এমনিতেই বা সোমার সঙ্গে কী কথা বলে ; তা ছাড়া ঘর সামলাবার অধিকার পেয়ে সোমা আজকাল খুবই ব্যস্ত, অনুরক্তও বটে। কথাবার্তা বলার সময় বা প্রবৃত্তি কোনোটাই মনোরমার আছে বলে মনে হয় না। বউদির চারপাশে আজকাল ডাক্তার আর নার্স ; নতুন মানবশিশুর আগমনে বাড়িতে যতটা উৎসাহ তার চেয়ে অন্য দৃশ্যটাই চোখে পড়ে ; দুশ্চিন্তায় সমস্ত পরিবেশটা ভারাক্রান্ত।

বন্ধুবান্ধবদের প্রতি মনোরমার বেশী আকর্ষণ কোনোকালেই ছিল না। আজকাল তাদের সঙ্গে দেখা করতে আগের চেয়েও সংকোচ বেড়ে গেছে। সমবয়স্কদের বেশীর ভাগেরই বিয়ে হয়ে গেছে। তারা আজকাল মনোরমার সঙ্গে অভিজ্ঞ মানুষের মতো কথা বলে ; ওর বিয়ে হচ্ছে না বলে করুণা করে ; এমন একটা ভাব করে যেন মনোরমা জীবনের মস্ত বড়ো একটা পরীক্ষায় এখনো উত্তীর্ণ হতে পারে নি। পরীক্ষায় ফেল করার মতো যেন অপরাধ। তাই কয়েকদিনের জন্যে লাহোর ছেড়ে অন্য জায়গায় যাবার প্রস্তাবে মনোরমা খুশী হয়ে উঠল।

* * *

ব্যারিস্টার জগদীশ যখন বিলেত থেকে ফিরছেন, তখন বোম্বায়ে তাঁর সঙ্গে হায়দরআলী সুতলীওয়ালার আলাপ হয়। এর কিছুদিন

পরে সুতলীওয়ালা শেয়ার লেনদেনের ব্যবসার ব্যাপারে এক সপ্তাহের জন্য লাহোরে আসে এবং ব্যারিস্টারের অতিথি হয়। বোম্বাই ফিরে গিয়ে সুতলীওয়ালা ব্যারিস্টার ও মনোরমার সহৃদয়পূর্ণ ব্যবহারের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি লেখে। জগদীশের সঙ্গে সুতলীওয়ালার বেশ আত্মীয়তা গড়ে ওঠে। মনোরমারও মনে হয়েছিল সুতলীওয়ালা ভদ্র ও সহৃদয় মানুষ। মাঝখানে বহুদিন কোনো পত্র-বিনিময় হয় নি। কিন্তু মুসৌরীতে গিয়ে হঠাৎ একই হোটেলে সাক্ষাৎ হওয়ায় তিন জনেই খুশী হয়ে উঠল।

স্যাভয় হোটেলে মেজর ও মিসেস বাসু উঠেছিলেন। জগদীশ এবং মনোরমাও একই হোটেলে উঠল। একই হোটেলে উঠল হায়দরজী সুতলীওয়ালা। ইংরেজ অফিসরের সঙ্গেই মেজর বাসুর বেশীর ভাগ সময় কাটত; জগদীশ ব্যস্ত রইলেন মিসেস বাসুকে নিয়ে। তাই মনোরমা ও সুতলীওয়ালা পরস্পরের কাছে আসার সুযোগ পেল।

মনোরমা কিসে খুশি হয়, কী তার পছন্দ, কী তার সুবিধা সুতলী-ওয়ালার সে দিকে বিশেষ নজর। ওর সামনে বসে অভ্যাসবশত যদি একটা সিগারেট বার করে, হঠাৎ খেয়াল হয়, ভাবে মনোরমার অসুবিধা হবে, অমনি সিগারেটটা না জ্বালিয়ে রেখে দেয়। মনোরমা কতবার বলেছে — তামাকের••ধোঁয়া সহ্য করার আমার বেশ অভ্যাস আছে। আপনি জ্বালান, আমার কোনো অসুবিধা হবে না।

সুতলীওয়ালা হেসে বলে— আপনার জন্য কিছুই তো আমি করতে পারছি না। কিন্তু এটুকু নিশ্চয় করতে পারি, যে-জিনিস জরুরি নয়, আপনার খাতিরে তা নয় নাই করলাম।

একবার সুতলীওয়ালা ভুল করে একটা সিগারেট মুখে নিয়েই হঠাৎ মনে পড়ায় ঠোঁট থেকে সিগারেটটা তাড়াতাড়ি সরিয়ে ফেলল। অমনি মনোরমা দেশলাইয়ের একটি কাঠি জ্বালিয়ে সিগারেটটা জ্বালিয়ে

দিয়ে বলল— ঠিক আছে, আপনি সিগারেট খান তো। আচ্ছা, না-হয় আমার জন্যেই খান।

জগদীশ এবার থেকে সুতলীওয়ালার খালি প্রশংসা করেন, বলেন, যেমন ভদ্র, তেমনি মিষ্টি ব্যবহার। মানুষটাকে তাঁর দারুণ পছন্দ। জগদীশের অভিপ্রায় মনোরমা একটু যেন আন্দাজ করতে পারে ; ওর মনটা আশঙ্কায় দুলে ওঠে। মুসৌরী ছেড়ে চলে যাবার আগের দিন জগদীশ তাকে স্পষ্টই বলে বসলেন— সুতলীওয়ালার ব্যাপারে তোমার মতামতটা আমি শুনতে-চাই। ও আমাকে স্পষ্ট করে কিছু বলে নি কিন্তু আভাসে ইঙ্গিতে বলেছে। আমার ধারণা, হলে খুব ভালো হয়। আমি জানি, মা-বাবা জাতি-ফাতির সংস্কারবশত এ বিয়েতে খুব আপত্তি তুলবেন কিন্তু তোমার ভবিষ্যৎ নিয়ে তো আর খেলা করা যায় না। তুমি খুব ভালো করে ভেবে দেখো।

যারা শুধু আরাম ও বিশ্রামের জন্য মুসৌরীতে যায় সুতলীওয়ালা তাদের মধ্যে পড়ে না ; তার সবটাই অবসর বা বিশ্রাম নয়। ধনী লোকেরা মুসৌরীতে একত্র হয়েছেন ; তাই সুতলীওয়ালা তাঁদের কাছে শেয়ারের দালালী করতে এসেছে। যেসব বড়োলোক শেয়ার কেনার ক্ষমতা রাখেন তাঁদের খেতে আমন্ত্রণ করা এবং তাঁদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করাও সুতলীওয়ালার ব্যবসার একটা বড়ো অঙ্গ। সুতলীওয়ালা এত ব্যস্ত থাকে, এত সে পরিশ্রম করতে পারে, মনোরমা দেখে অবাক হয় এবং কেমন যেন একটু দরদও বোধ করে। তাই সুতলীওয়ালার সঙ্গে ঘুরবার ও খাবার নিমন্ত্রণের সময় উপস্থিত থাকার অবসর করে নেয়।

জগদীশ পরম আত্মীয়ের মতো সুতলীওয়ালার সঙ্গে কথা বলেন এবং ওঁর সামনেই মনোরমার উগ্র সমাজবাদ বা কম্যুনিস্টদের নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করতে পেছপা হন না। সুতলীওয়ালা কম্যুনিজম ও সমাজ-বাদের জটিল ভাষা হয়তো বোঝে না কিন্তু সমাজবাদের ভাবনা ও

লক্ষ্যের প্রতি সেও সহানুভূতিশীল। অনেক সময় নিজের উদাহরণ দিয়েই সুতলীওয়ালা বলে— পুঁজিবাদের শোষণ ও অত্যাচারের স্বপক্ষে আমার তো কথা বলার হক নেই। এ অত্যাচার নেই বলি কী করে? আমি নিজেই পুঁজি সঞ্চয় করে পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দিচ্ছি। পুঁজিপতিদের এতে যে লাভ তাতে আমার অংশ কতটুকু? কতটুকু পারিশ্রমিক বা আমি পাই? পুঁজিবাদের সবচেয়ে বড়ো শত্রু পুঁজিবাদী নিজেই। সঞ্চয় ও অধিকার দিন দিন বাড়াবার প্রবৃত্তির জন্যই পুঁজি-পতিদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। বড়ো বড়ো পুঁজিপতির সঙ্গে মোকাবিলা করতে গিয়ে ছোটো পুঁজিপতিরা শেষ হয়ে যাচ্ছে। আর অন্যদিকে পুঁজিপতি-বিরোধীদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে।

মনোরমা কিছু বলতে পারে নি; প্রতিবাদ জানিয়ে শুধু মাথা নেড়েছে। কিন্তু ভেবেছে, অনেক ভেবেছে। ভূষণের সঙ্গে সুতলী-ওয়ালার বার বার তুলনা করেছে। দু'জনে দুই দুনিয়ার দুই ভিন্ন মানুষ। সুতলীওয়ালা খুব ভদ্র, রুচিশীল ও স্বাস্থ্যবান পুরুষ; কিন্তু ভূষণের মধ্যে সাধারণ মানুষের অতিরিক্ত কী যেন আছে। তুলনার জাল বুনে বুনে মনোরমা উদাস হয়ে যায়। জগদীশ ও মনোরমা লাহোরে ফিরে গেল। সুতলীওয়ালাকে আরো এক সপ্তাহ মুসৌরীতে থেকে যেতে হবে। দু'জনের বিদায়পর্বে ওদের কারো কোনোরকম মনঃসংকোচ হয় নি।

* * *

মনোরমা সকালে মুসৌরী থেকে ফিরেছে। সন্ধ্যাবেলায় ড্রইংরুমে বসে নিজের সোয়েটার ঠিক করছিল। বাইরে পায়ের শব্দ পেয়ে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখে ভূষণ দাঁড়িয়ে, সঙ্গে মহিলা কলেজের অধ্যাপিকা

সুখদা। সুখদার গায়ে খদ্দরের শাড়ী। আগের বার মনোরমা ভূষণের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে নি; মনটা খুব খারাপ হয়ে ছিল। সে কথা ভেবেই এবার মনোরমা তাদের খুব খাতির করে বসাল। ভূষণকে খুব গম্ভীর দেখাচ্ছে।

ভূষণ বসতে বসতে বলল— আমার বিশ্বাস আছে আমি যা বলতে এসেছি তা শুনে আমাকে ভুল বুঝবে না। সুখদার সামনে এরকম একটা কথা বলতে শুনে মনোরমা একটু যেন থতমত খেল। ভূষণ জিজ্ঞেস করল— তুমি কি কলেজে বিনে মাইনেয় কাজ করছ?

মনোরমা মাথা নাড়ল।

—তুমি কলেজে বিনে-মাইনেয় কাজ করছ বলে তার পরিণাম কী হয়েছে শোনো। দশেরার ছুটি আরম্ভ হবার দিন কলেজের কমিটি সুখদাকে কাজ থেকে ছাড়াতে এক মাসের নোটিশ দিয়েছে। ওর কাজ কেউ যদি মুফতে করে তবে সে-কাজের জন্য অকারণে পয়সা দেওয়া কেন?

মনোরমা দুঃখ প্রকাশ করতে চেয়েছিল কিন্তু ভূষণ বলে যেতে থাকল— তোমার তো শুধু সখ পূরণ হবে আর এ বেচারীর রুটি-রুজির প্রশ্ন। এই অবস্থায় অন্য কোনো চাকরিও করতে পারবে না, কারণ পুলিশ জানে এর দুই ভাই পার্টির সদস্য এবং পুরো সময়টাই পার্টির কাজ করে।

মনোরমা সুখদাকে ভরসা দিয়ে বলল— আপনি চিন্তা করবেন না। এরকম অন্যায় আমি হতে দেব না। আমি কাজ করব না বলে আজই কলেজের সেক্রেটারির কাছে চিঠি পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমি এও লিখে দেব যে, আপনার প্রতি যে অন্যায় করা হয়েছে তার প্রতিবাদে আমি চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি।

ভূষণ সুখদার দিকে আশ্বস্ত-ভরা চোখে তাকাল— কী, ঠিক আছে?

এখন তুমি যেতে পারো।

মনোরমা আপত্তি জানাল বাঃ— এত তাড়াতাড়ি? বসুন-না। সুখদার দিকে চেয়ে বলল—চা আনতে বলি, কেমন?

ভূষণ সুখদার হয়ে উত্তর দিল— ওকে যেতে দাও। ওর একটা জরুরি কাজ আছে। সুখদা চলে গেল।

ভূষণ খুশি হয়ে বলল তুমি অবৈতনিক কোনো কাজ করতে চাও তো অন্য কোনো সার্থক কাজ করো-না। বি. এ. পাস করা কোনো মেয়ে বা মহিলা সহজেই এফ. এ. র ছাত্রীদের পড়াতে পারে। আর তা ছাড়া তুমি তো অনেক পড়াশুনো করেছ, তোমার যোগ্যতাও আছে।

মনোরমা উদাস স্বরে বলল— বলুন, কী করব?

—আমার তো মনে হয় লেখাই তোমার কাজ; অন্য কোনো কাজের চেয়ে তুমি এটাই ভালো করবে।

—কী লিখব? রোজ রোজ কীই-বা লিখি?

পরম আত্মীয়কে মানুষ যেমন অধিকার নিয়ে বলে, অনেকটা সে-রকমভাবে ভূষণ বলল— প্রান্তীয় পার্টি একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা বার করছে। ওদের তুমি কিছু সময় দিতে পারো।

মনোরমার স্বর বিবশ শোনাল— আমি পার্টির লাইন এখনো ঠিক বুঝি না।

ভূষণ বুঝিয়ে বলল— মোদ্দা কথাটা তো তুমি বোঝো। তবে প্রতিদিনের সমস্যার সঙ্গে তোমার পরিচয় নেই বলে এবং তাদের পার-স্পরিক সম্বন্ধ তলিয়ে দেখতে পারো না বলে দৃষ্টিটা অনেকটা একতরফা হয়ে যায়। কিংবা গোটা সমস্যাকে সব দিক থেকে বিচার করতে পারো না। উপাদানবস্তুর অনুপাত বদলে গেলে সেই জিনিসটার আকারই বদলে যায়। ইট, পাথর আর সিমেণ্ট দিয়ে দুর্গ তৈরি করা যায় আবার একটা কুয়োও করা যায়। লোকের সঙ্গে যদি মেশো,

আর সমস্যার সঙ্গে সম্যক পরিচয় হয়, তা হলে দেখবে এ ভুল আর হচ্ছে না। ঐ কাগজে কমরেড যাবেদও জড়িত আছে জানি।

মনোরমা উৎসাহ দেখাল— তৈরি আছি, কবে যাব? ভূষণ বলল— কাল সকালে নটার সময় এসো। এই সপ্তাহের পরিকল্পনা তৈরি করা হচ্ছে, কিছুটা হয়েও গেছে।

মনোরমা কলেজ ছেড়ে অফিসে যেতে লাগল। ওর বাড়ি থেকে ম্যাক্লড রোড অনেক দূরে ; তাই সে দাদার গাড়িতে যায়। ব্যারিস্টার কোর্টে বা নিজের ব্যবসার অফিসঘরে নেমে যান আর ড্রাইভার বরকত মনোরমাকে ম্যাক্লড রোডে নিয়ে যায়। মনোরমা বেশীর ভাগই গলির মোড়ে নেমে পড়ে ; চল্লিশ-পঞ্চাশ পা হেঁটে অফিসে ঢোকে। ফেরার সময় একটা টাঙ্গা নেয়। গাড়িটাকে পার্টি অফিসের সামনে নিয়ে যায় না। ছেঁড়া জামাকাপড় পরা তরুণদের সামনে ঐশ্বর্যের চমক দেখাতে ভালো লাগে না, তাদের সামনে বড়ো একটা গাড়ি হাঁকাতে কেমন যেন সংকোচ হয়।

এক-একটা প্রবন্ধ লেখার জন্য সাময়িকী-কমিটির মধ্যে খুব এক চোট আলোচনা হয়। কমরেড যাবেদ পার্টির নীতিকে সামনে রেখে লিখতেন এবং মনোরমাকেও সেইমতো লিখতে বলতেন। মনোরমা তখন তর্ক জুড়ে দিত। যাবেদ প্রায়ই বলে— কমরেড, তুমি এখনো 1939-40 সালের পার্টি লাইনে পড়ে আছ, এটা 1944 সাল। এরকম বাঁধাধরা নিয়মে লিখতে মনোরমার কোনো আনন্দ হয় না, তৃপ্তিও পায় না একদম। স্বাধীনভাবে নিশ্বাস নিতে পারে না মনোরমা, শুধু নির্দেশ পালন করে।

পাঁচটি সংখ্যা বার করার পরে পত্রিকার পৃষ্ঠা-সংখ্যা বাড়াবার প্রস্তাব আসায় আর্থিক সমস্যা দেখা দিল। পার্টির অ্যাকাউন্টেন্ট আপত্তি তুলে বললেন, গত মাসে পত্রিকা তিন হাজার ছাপার ফলে সাড়ে পাঁচশো

টাকা বেশী খরচ হয়েছে। তিনি হিসাবটা সবার সামনে তুলে ধরলেন— ছাপাতে 130 টাকা, ব্লক তৈরি করতে 120 টাকা, 250 টাকার কাগজ, ডাকখরচ 80 টাকা, কমরেড যাদেব 45 টাকা, জয়রাম ও নরসিং-এর মজুরি আলাদা। কমরেড মনোরমা মাইনে নেন না। প্রচারের জন্য দুশো কপি বিনামূল্যে বণ্টন করা হয়। এই হিসেবেও 40 টাকার মতো বাঁচার কথা, কিন্তু জেলাগুলিতে যেসব কপি পাঠানো হয়েছে সে-গুলির বিক্রির টাকা এখনো পাওয়া যায় নি। দুশো টাকা বিক্রি বাবদ পাওয়া গেছে। এখন যদি আপনারা খরচ বাড়াতে চান, কোথা থেকে আমি টাকা দেব? কাগজের ফাণ্ডে আমাকে 1 হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। এই হিসেবে আর এক মাস মাত্র পত্রিকা বার করার রসদ আছে। স্থির হল, পত্রিকার দাম বাড়ানো হবে না তবে অর্থ সংগ্রহ করা হবে। বিক্রির টাকা তাড়াতাড়ি পাঠাবার জন্য জেলাগুলিতে সার্কুলার পাঠানো হল।

জয়রাম 45 টাকার ব্যাপারে আপত্তি তুলল। যাবেদ, নরসিং ও তার খরচাপত্র পত্রিকা খাতে কেন ধরা হয়েছে? এরা অন্য ফ্রন্টেও তো কাজ করছে। ম্যানেজার ও সম্পাদক মাসে পনেরো টাকা করে মাইনে পান— এটা মনোরমার কাছে খুব খারাপ লাগে। সারা মাস সমাজ ও দেশের গোটা ব্যবস্থার পরিবর্তন আনতে যাঁরা এত নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেন, তাঁদের মাইনে মাত্র পনেরো টাকা? অথচ এই পত্রিকার প্রতিপক্ষ কাগজে সামান্য কাজের জন্য দেড়শো থেকে পনেরো শো টাকা পর্যন্ত মাইনে আর তারা এত দরদ দিয়ে এত পরিশ্রম করতেও রাজি নয়। গর্বে মনোরমার বুক ভরে ওঠে।

উৎসব-অনুষ্ঠানে দাদার কাছ থেকে মনোরমা অনেক টাকা পায়। দরকার হলে আরো পেতে পারে। আগে সে সব টাকা উড়িয়ে দিত। গত বছর মনটা খুব খারাপ ছিল বলে মনোরমা কোনো নতুন

কাপড় বা অন্য কোনো জিনিস কেনে নি। আগের কেনা জিনিসই কত পড়ে আছে। বেশ কয়েকটা কাপড় তো সোমাকেই দিয়ে দিয়েছে ; বলেছে, বহীন তোর এটা খুব পছন্দ, তুই এটা পর, এ শাড়ীটা এখন আমার আর মোটেই ভালো লাগে না। ওর হাতে দুশো টাকা ছিল ; পত্রিকা তহবিলে দিয়ে দিল।

মনোরমা দেখল তার টেবিলের উপর একটা খোলা চিঠি পড়ে আছে। দাদার নামে চিঠি কিন্তু ওর টেবিলে পড়ে থাকার একটাই অর্থ, মনোরমা যেন চিঠিটা পড়ে। সুতলীওয়ালা লিখছে। বন্ধুর বোনের সঙ্গে খুব সংযত ভাষায় বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে। চিঠিটা পড়ে মনোরমা দ্রুত নিশ্বাস নিতে লাগল ; কী একটা অব্যক্ত খুশীতে হৃদয় তোলপাড় করছে। চোখ বুঁজে বিছানায় শুয়ে রইল। সুতলীওয়ালা ও দাদার কাছে বোম্বাইয়ের অনেক কথা শুনেছে ; সিনেমায় দেখেছে বোম্বাইয়ের নানা বর্ণালী চিত্র। কল্পনায় সেই সব কথা, সেই সব চিত্র ভেসে উঠছে আর মনটা আলোড়িত ও আন্দোলিত হয়ে উঠছে। মুখ ফুটে দাদাকে কিছু বলে নি। কিন্তু মনটা প্রতীক্ষায় অধীর, কল্পনায় রঙিন। এখন মনোরমা পার্টির কাগজে কাজ করতে যায় আর নিজের মনে মনে ভাবে— এই কাজ করে জীবনে আমি কী পাব? পেলেও এই কাজের সঙ্গে জীবনের কি একটা সম্পর্ক গড়ে উঠবে? কিন্তু পার্টির এই পত্রিকার কাজটা তো স্থায়ী কোনো কাজ নয়। ব্যারিস্টার দাদা পরিবারের ঐতিহ্য ও চিরাচরিত বন্ধন তো মোটেই মেনে চলেন না ; তাই তিনি হয়তো খেয়ালের বশে মনোরমার এই কাজ করার ব্যাপারটা মেনে নিচ্ছেন। কিন্তু বাবা-মা, আর অন্য দুই ভাই কি এটা মেনে নিতে পারবেন! মনোরমা ভাবে, জীবনের যে-পথ ওর সামনে খুলে যায়, কিছুদিন সে-পথে চলতে চলতে দেখতে পায় সে পথের দরজায় তালা ঝুলছে।

*   *   *

ব্যারিস্টার জগদীশ সহায়ের তৃতীয় সন্তানের জন্মের সময় মা ধর্মশালা থেকে আসতে পারেন নি। কলকাতা ও করাচি থেকে দু'জন বৌদির আসা হয়ে ওঠে নি। যুদ্ধের সময় ব্যবসার বাজারটা এমন একটা অবস্থায় দাঁড়িয়েছিল যে, কেউ যদি নিজের আসন ছেড়ে যায় তবে তার হাজার-লাখ টাকার লোকসান হয়ে যাবার ভয়। তবে ছেলের নামকরণ অনুষ্ঠানে সবাই একত্র হলেন। সবার আগে এলেন মা-জী।

মা-জী ঘরে এলে সোমা তাঁকে প্রণাম করল। মাজী আশীর্বাদ করলেন কিন্তু চিনতে না পেরে নিচু গলায় মনোরমাকে জিজ্ঞেস করলেন—কে রে মন্নো ? ধনসিং-এর বউ কোথায় ? লাহোর থেকে বউ ও মন্নোর বার বার প্রশংসায় ভরা চিঠি পেয়ে মা মনে মনে ঠিক করেছিলেন, বউটা এত কাজ করে, ফিরে গিয়ে ইনাম দিতে হবে।

মনোরমা হেসে বলল - বাঃ মা তুমি চিনতে পারলে না ? সোমাই তো তোমার সামনে দাঁড়িয়ে। ঘরে সোমার অধিকার ও অনুশাসন দেখে মায়ের সাদা চুলে ভরা মাথাটা কেমন যেন ঝিমঝিম করে উঠেছিল কিন্তু তিনি কিছু বলেন না। তৃতীয় দিনের দিন বাড়িটা লোকজনে গমগম করে উঠল। সোমাকে দেখে সবার মুখে একই প্রশ্ন : এ কে ? উত্তর শুনে বিস্ময় প্রকাশ করল সবাই— চাকরাণী না গৃহকর্ত্রী !

সোমা নিজেও অনেক অসুবিধার মধ্যে পড়ল, ভয়ে ভয়ে সংকুচিত হয়ে রইল। কিন্তু শত চেষ্টা করেও সে আগের সোমা হবে কী করে ? জগদীশের সঙ্গে কথা বলার আর সময় হয় না। একদিন কিছুক্ষণের জন্য কথা বলার সুযোগ পেয়ে অনুনয় করল— বাড়ির লোকেরা

আমাকে কেউ সহ্য করতে পারছে না। কয়েক দিনের জন্য আমাকে কোথাও পাঠিয়ে দাও-না।

জগদীশ দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে রাগ প্রকাশ করল— ড্যাম ইট!

ছেলে হবার খুশিতে জগদীশ বউদিদের, নিজের স্ত্রী, বোন ও আর সবাইকে শাড়ী উপহার দেবেন বলে ঠিক করেছেন। শাড়ী কিনে দেবার দায়িত্ব পড়ল মনোরমার ওপর। মনোরমা বউদিদের, বিশেষ করে বড়ো বউদিকে ভীষণ ভয় পায় ; তাঁর স্বভাবটা খুব একটা সুবিধের নয় ; আলাদা আলাদা শাড়ী কিনলে পাছে ওকে স্বার্থপর বলে এবং পক্ষপাতিত্বের দোষ ওর ঘাড়ে পরে সেই ভয়ে ও ঠিক করল সবার জন্য এক দামের, এক রঙের, এক পাড়ের শাড়ী কিনবে। মনে মনে ভাবল মনোরমা— সবাই একরকম শাড়ী পরলে দেখতেও ভালো লাগবে ও সবাইকে হয়তো খুশিও করা যাবে।

সবগুলো শাড়ী প্রথমে বড়ো বউদি মিসেস কৃষ্ণসহায়ের সামনে রেখে দেওয়া হল। মনোরমা ও মিসেস জগদীশও সেখানে উপস্থিত ছিল। সব শাড়ী একরকম দেখে বড়ো বউদির মনঃপূত হল না, ঠেস দিয়ে বলল— তোমরা নিজেদের সখ মেটাও, আমি তো অনেক শাড়ী পরেছি। এখন তো ঢের বয়স হয়ে গেছে, এখন আবার ভালো-মন্দ কী! এ কথা বলে শাড়ীগুলির রঙ ও পাড় দেখতে দেখতে কয়েকখানা শাড়ী গুনে নিয়ে বলল — এখানে তো পাঁচখানা শাড়ী আছে।

মিসেস জগদীশ আস্তে করে বলল— সোমার জন্যও নিশ্চয় একটা আনা হয়েছে।

বড়ো বউয়ের মাথায় যেন আগুন জ্বলে উঠল ; মুখটা রাগে-অপমানে ফুলে উঠল। সামনে নিজের মেয়েকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হুকুম দিল — জগদীশকে ডাক।

ব্যারিস্টার এসে জিজ্ঞেস করলেন— কী হয়েছে বউদি ?

মিসেস কৃষ্ণসহায় পাঁচটা শাড়ী জগদীশের মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বলল — আমি কি তোমার চাকরাণী, অ্যাঁ ? তুমি আমার জন্য ও তোমার চাকরাণীর জন্য একইরকম শাড়ী এনেছ ? তোমার এত বড়ো আস্পর্ধা !

ক্রোধে দিশেহারা হয়ে বড়ো বউ উচিত-অনুচিত ভুলে গিয়ে চিৎকার করে উঠলেন— টাকা রোজগারের এক পয়সা হিম্মত নেই। অন্যের রোজগারের পয়সা ওড়াবে আর তাদেরই বেইজ্জত করবে, কেমন !

জগদীশের রক্ত টগবগ করে উঠল। বড়ো বউদি আগেও অনেক বার দুর্ব্যবহার করেছেন কিন্তু জগদীশ চুপচাপ সব সহ্য করেছেন। কিন্তু এখন আর সে অবস্থা নেই। তিনিও ক্রোধে ফেটে পড়লেন, চোখে যেন আগুন জ্বলে উঠল, বললেন— মুখ সামলে কথা বলুন। আমাকে কে খাওয়াচ্ছে শুনি ? নিজের ঘরে যেমন চাইব দেব, যেমন চাইব নেব। আমি কারুর চাকর নই।

ঘরে একটা হৈ-চৈ পড়ে গেল। মা ও মেজ বউ ছুটে এল। ভদ্র-মহিলারা সবাই একসঙ্গে ক্রুদ্ধ হাত উপরে তুলে চিৎকার করে বলতে থাকল। চাকর-বাকরেরা দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল। শুধু সোমা এল না। ঝগড়া শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের ঘরে গিয়ে এক কোণে পড়ে ছিল।

সুযোগ পেয়ে চাকর-বাকরেরাও মুখ খুলল। ওদেরও বয়ান নেওয়া হল। ঐ সময় যারা কিছু বলল না, মুখ দেখাল না, তারা খুব বেঁচে গেল। বড়ো বউয়ের চিৎকার তখনো শোনা যাচ্ছে— এই অপমান করতে আমাদের ডাকা হয়েছে নাকি, অ্যাঁ ? বড়ো পণ্ডিত এসেছে রে !

মাজীর গলার স্বরও শোনা গেল - হায়, আমি ধারে-কাছে ছিলাম না, কী করে জানব এত সব কাণ্ড হয়ে গেছে।

ছোটো বউয়ের শীর্ণ শরীর ও মিহি গলার আওয়াজও কানে এল— আরে, আমি সিধাসিধে মানুষ ; কী করে জানব আমার ওপরেই কুড়োল

চালানো হচ্ছে।

মনোরমা এদের মধ্যে সবচেয়ে শিক্ষিত। সেই অধিকারে সে তাদের বোঝাতে চেষ্টা করল। বলল— কাপড় কেনার সব দায়িত্বটা আমার ওপরে ছিল। বড়ো বউ শুনে মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল— এই তো হয়েছে, অর্ধেক বয়স পেরিয়ে গেল, এখনো তো কুমারী হয়ে রইলে. আর যেন সবাইকে জেনে বসে আছ। লজ্জা করে না, দাদার দূত হয়ে বসেছ। একজন আরেকজনের যত ইচ্ছে দোষ ঢাকো, কিন্তু আমাকে ধরে টানাটানি করছ কেন, শুনি?

মনোরমা পাশের এক বাড়িতে ওর এক বন্ধুর কাছে গিয়ে বসে রইল। দু'ঘণ্টা পরেও ঝগড়া মিটল না দেখে বিরক্ত হয়ে নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে বই পড়তে লাগল। ঝগড়া উত্তরোত্তর বাড়তেই থাকল। কৃষ্ণসহায় লালাজীর কাছে গিয়ে হাজির হলেন এবং জগদীশ সহায়কে ডেকে পাঠালেন। উদম সিং তাকে ডাকতে গিয়ে দেখে ব্যারিস্টার গাড়ি নিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছেন।

জগদীশ বাড়ির বাইরে এসে রাস্তায় পড়ে ভাবলেন— কোথায় যাই, ক্লাব? মনের এই অবস্থায় ঠিকমতো কথাবার্তা বলা সম্ভব নয়। তিনি মাল্ রোডে এক নির্জন বারে গিয়ে বসলেন। সামনে টেবিলের ওপর রাখা গ্লাসে হুইস্কি-সোডার বুদ্‌বুদের আলোড়ন। নিজের মনেও অসংখ্য চিন্তার বুদ্‌বুদ উঠছে। ভাবছিলেন, কী সব মূর্খ-অশিক্ষিত লোকের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক। চাকরাণীকে একই ধরনের শাড়ী দেওয়া হয়েছে, সুতরাং অন্য শাড়ীগুলি আর ভালো থাকে কী করে? বাহ্ রে অহংকার!

উত্তেজনায় জগদীশ ডবল পেগের অর্ডার দিলেন। রাগে উত্তেজনায় গলাটা কেমন যেন শুকিয়ে যাচ্ছে; গ্লাসে ভরপুর সোডা ঢাললেন। তিন-চার ঘণ্টার মধ্যে গ্লাসটা অর্ধেকের বেশি শেষ হয়ে গেল; মাথাটা

একটু যেন ভারী ভারী ঠেকল। জগদীশের কল্পনায় বড়ো বউদি সামনে এসে দাঁড়াল। বাড়িতে তিনি কিছুই বলতে পারেন নি ; এখন আর পরিণামের ভয় না থাকায় তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগলেন— চাকরাণী! তোমার চাকরাণী নাকি ?··· চাকরাণীর তুলনায় তোমার ভদ্রতা একবার যাচাই করে দেখো! চাকরাণীকে সামনে রেখে আয়নায় একবার নিজের মুখ দেখো তো! তার তুলনায় তোমার কোন্ জিনিসটা ভালো শুনি ? তোমার মা-বাবা তোমার জন্য একজন পুরুষকে ফাঁসাতে পেরেছিল তাই রক্ষে, নয়তো তোমাকে কেউ বাসনকোসন ধুতেও রাখত না। পয়সার গরম ? যেন আর-কেউ পয়সা কামাতে জানে না। যতদিন খেয়াল করি নি, করি নি, এখন দেখে নেব··· এটা আমার ঘর, এখানে তুমি ফয়সলা করার কে ? তুমি হুকুম দাও কোন্ সাহসে ? মুখ খুলতে চাও, নিজের স্বামীর কাছে মুখ খোলো ; ওর সঙ্গে তোমার বনবে ভালো। সোমার সঙ্গে মোকাবিলা করতে এসেছে ? কোথায় গোবরের ডেলা আর কোথায় হাতীর দাঁতের খেলনা!··· ভারী সতীপনা দেখাতে এসেছে!··· আরে তোমাকে পাত্তা দিচ্ছে কে ?··· বাহ্ রে শ্রেণী অহংকার!

জগদীশের মনে পড়ে গেল— মনোরমা চাকরি করতে চেয়েছিল বলে ঘরে কী প্রচণ্ড একটা ঝগড়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। তখন তিনি শ্রেণীগত সমাজের স্বপক্ষে রায় দিয়েছিলেন। আবার ভাবলেন, এরা আমার উপর কত অন্যায় করে যায়! এদের পাল্লায় পড়ে আমার নিজের মতের বিরুদ্ধে আচরণ করতে হয়। সমাজ শুষে এরা পয়সা করেছে আর সেই টাকার কী দেমাক্। এসব করে গরীব লোকেদের দাবানো যায় কিন্তু তা বলে আমাকে ? এদের যা কাজ-কারবার আমি তা করে দেখাতে পারি, বরং এদের চেয়ে ভালো পারি। এদের তো বুদ্ধি বলে বস্তু নেই।

জগদীশ গ্লাসের বাকী হুইস্কিটুকু শেষ করে দেখলেন ঘড়িতে সাড়টা বাজে। এই জায়গায় একা আর বসে থাকতে ভালো লাগছে না। তিনি নগর পেরিয়ে মডেল টাউন হয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া খেতে খেতে দশ মাইল চক্কর দিয়ে অন্য একটা বার-রেস্তোরাঁ ওলেরিয়োতে গিয়ে বসলেন। এক পেগ হুইস্কির অর্ডার দিলেন। ঘরে ফিরে যাবার ইচ্ছে নেই, সাহসও নেই। এখানেই ডিনার সারলেন। খাবার পরে ওলেরিয়োতে নাচ শুরু হল। সেদিন ছিল লেট নাইট ডান্স।

বিলেতে জগদীশ নাচ শিখেছিলেন। নাচতে তাঁর ভালোই লাগে কিন্তু এখন নয়; এক কোণে তিনি বসে আছেন। নাচের দিকে চোখ, মন ডুবে আছে নিজের সমস্যায়। অরকেস্ট্রায় নাচের সুর বাজছে; নাচের সময় লাল রঙের বাতি জ্বলে ওঠে; একবার নাচ শেষ হয়ে অন্য নাচ শুরু হবার আগে দু'মিনিটের জন্য বাতি নিভে যায়। সবাই প্রায় নাচের পোষাক পরেছে; পুরুষরা পরেছে কালো স্যুট আর মহিলারা রঙ-বেরঙের জামা-কাপড়। মেমরা পরেছেন গাউন, কাঁধের নিচে শরীর একটু উন্মুক্ত। ভারতীয় মহিলারা পরেছেন শাড়ী, নিচু কাটের চোলি। পিঠের দিকটা খোলা। কোমরের কাছে শিরদাঁড়া নেমে এসে যেখানে খাদের মতো সৃষ্টি হয়েছে তা শাড়ীর আড়ালে আবৃত। হাত, কাঁধ নগ্ন; বুকের সন্ধিস্থল অনাবৃত।

ভারতীয় মহিলাদের চোলির নিচে পেট ঝলক দিয়ে উঠছে; য়ুরোপীয় মহিলাদের বগল-খোলা স্কার্টের ফাঁক দিয়ে অনাবৃত বুক ঝলসিয়ে উঠছে। কারুর গায়ের প্রকৃত রঙ দেখা যাচ্ছে না; সব পাউডারে ঢাকা। ঠোঁটে লিপস্টিক, নকল চুল; বিলেতের প্রসাধন সামগ্রীর সবাই খুব সদ্ব্যবহার করেছেন। এসব জিনিস দেখলে জগদীশ আর ঠিক থাকতে পারেন না; নাচার জন্য তৈরি হয়ে যান কিন্তু মনটা এখন খুব বিচলিত, নাচতে ইচ্ছে করছে না। ওদের দেখে তিনি শুধু

একটা কথাই ভাবছিলেন— সোমা এদের তুলনায় কত ভালো। ওর ভরাট চুল যদি এদের দেখানো যেত।

জগদীশকে একা বসে থাকতে দেখে মিসেস গুর্টু একটু অবাক হলেন— কী হয়েছে? মিসেস ওয়াইলিও নাচবার আমন্ত্রণ জানালেন কিন্তু ড্রেস ঠিক নেই আর শরীর খারাপের বাহানা দেখিয়ে জগদীশ ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। চুরুট ধরিয়ে আর-এক পেগ হুইস্কির অর্ডার দিলেন। মনের গ্লানি ও বিরক্তি কিছুতেই ঝেড়ে ফেলতে পারছেন না। কী এক অপদার্থের সঙ্গে ওঁর বিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওরকম স্ত্রীকে নিয়ে এই সমাজের উঁচু মহলে ঘোরা সম্ভব নয়। স্ত্রী, না মোষ? হ'ত সোমা, তবে সেরা সব মহ্ফিলে রানীর মতো দেখাত। ·· কত দিন এরা থাকবে আর কতদিন জ্বালাবে কে জানে?··· আমি যেন এদের বড়ো পরোয়া করি?··· কিন্তু তবু ঘরে ফেরার সাহস হচ্ছে না। মাত্র দশটা বেজেছে।

নেশার আবেশে জগদীশের ঘরে ফিরতে মন চাইছে না। বিবশ নেশায় বাড়ি ফিরে গেলে সোমা তার নরম শরীর নিয়ে ওঁকে কত মমতায় সামলায়; শরীর-মন ভরে যায়, বড়ো আরাম হয়। সোমার অভাব বোঝার মতো মনের উপর চেপে আছে। কিন্তু বাড়ি ফেরার তবুও সাহস নেই। নিজের ওপর কেমন যেন একটা গ্লানি অনুভব করছেন—এরা মূর্খ, সব কুসংস্কার আর আত্মাভিমানে ভুগছে; আমি এদের ভীষণ ভয় পাই।··· এদের অত্যাচারে সোমা শেষ হয়ে যাবে।···· সমস্ত সমাজ পিষে যাচ্ছে।··· বাইরে থেকে মনে হয় আমিও স্বাধীন কিন্তু স্বাধীন হয়েও আমিও পিষে যাচ্ছি।··· এরকম অবস্থার যে একটা অসংগতি ও শূন্যতা তা আমি বেশ অনুভব করতে পারি; আমি বুঝি এর বিরুদ্ধে দাঁড়ানো দরকার কিন্তু আমি জানি আমি দুর্বল, আমি অসমর্থ, তাই বুঝে আমার লাভ?···· লেনিন ঠিকই বলেছেন, 'কর্ম ছাড়া সিদ্ধান্ত মিথ্যা ও নিষ্ফল।' আমি শুধু ভাবি, বিচার করি কিন্তু আমি কর্মঠ

নই ; নয়তো এ সমাজকে আমি বদলে ফেলতাম।... কত আমি নির্বল, কত নিষ্কর্মা, কিন্তু আমি যে সব বুঝি, সেটাই আমার দুঃখ।

রাত দুটোয় নাচ শেষ হলে জগদীশ বাড়ি ফিরলেন। ফটকে চৌকিদার ছাড়া সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। চারিদিক নিঝুম। সোমার ঘর পর্যন্ত যাবার সাহস তাঁর ছিল না। মুখ ঢেকে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। সকালের চায়ের পেয়ালায় চামচের ঠুনঠুন আওয়াজ করে সোমা তাঁকে জাগাল না। উদমসিং ভাবল তার বুঝি আবার দিন ফিরল ; সে চা বানিয়ে নিয়ে এল। জগদীশ তাকে দাড়ি কামানোর গরম জল নিয়ে আসতে বললেন ; আর কোনো কথা নয়। সকালেই তিনি জামাকাপড় পালটে বেরিয়ে গেলেন।

সোমা সারা রাত নিজের ঘরে এক কোণে পড়ে রইল ; বাড়ির ঝগড়ার গুঞ্জনে ও শুধু কাঁদছিল। এ ছাড়া কীই-বা করবে? সাহেব ছাড়া ওর আর আপন বলতে কে আছে? সাহেবকে না জিজ্ঞেস করে, তাঁর সঙ্গে কথা না বলে ও কিছুই করতে পারে না। কিন্তু সাহেবের সঙ্গে দেখা করার কথাই বা বলে কী করে? একবার ভাবল, সাহেব এখন কোথায়? উঠে খোঁজ করলে হ'ত কিন্তু ঘর ছেড়ে যাবে কী করে?

মাঝরাতে ঝগড়াটা থিতিয়ে যাওয়ায় সোমা ড্রইংরুমের ঘড়িতে ঠনঠন করে বারোটা বাজতে শুনল, ক্রমে একটা বাজার ঘণ্টা শোনা গেল ; লোকেরা এখন আস্তে আস্তে কথা বলছে, সোমা তাদের কথা শুনতে পাচ্ছে। সোমা ভাবল, সাহেব বাইরে থেকে হয়তো ফিরে এলেন। কিন্তু তিনি ডাকলেন না, খোঁজও করলেন না। সাহেবের কাছে যাবার সাহস হয় না ; কেউ যদি দেখে ফেলে!

চোখের উপর আঁচল চেপে সোমার রাত কেটে গেল। সকাল হয়ে গেছে : সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু ঘর থেকে বাইরে বেরুবার সাহস হল না সোমার। সব কিছু সেই রকমই আছে, সেই

ঘর, সেই লোকজন কিন্তু কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে সব কিছু যেন পালটে গেছে। জগদীশের দপ্তর বা কোর্টে যাবার সময় হয়ে এল। কিন্তু সোমা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারল না।

বসন্তা চাকরটা সোমার ঘরের সামনে এসে ঝাঁঝি মেরে বলল— মা বলেছেন, নিজের কাপড়চোপড় পোঁটলাপুঁটলি বেঁধে গাড়ি করে চলে যাও। বাইরে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

সোমা কাঁদতে কাঁদতে আকুল হল, অশ্রু-ভরা চোখ দুটি বসন্তার মুখে মেলে ধরে জিজ্ঞেস করল— কোথায় চলে যাব?

—তার আমি কী জানি? বসন্তা চলে গেল। সোমা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল, ভাবল··· হায় রে, কোথায় যাব? পাহাড় থেকে কি আমাকে এইজন্যে এনেছিল? কোথায় আমি যাই? নিজের কাপড়ই বা কী নেব? নিজের কী আছে যে সঙ্গে নিয়ে যাব? বটুয়াটা পড়ে আছে দেখল। ওতে ঘরের প্রায় তিনশো টাকা। এ টাকাও কি তার?··· সাহেবকেই বা কীভাবে ডাকি? সাহেব নিশ্চয় কোর্টে চলে গেছেন! তিনি একবারও আমার খোঁজ নিলেন না!

বসন্তা আবার এল— তাড়াতাড়ি করতে বলছে।

সোমা নিচু স্বরে বিনয়ের সঙ্গে বলল ভাই, সাহেবকে একটু ডেকে দেবে?

—সাহেব তো কখন চলে গেছে। বসন্তা আর দাঁড়াল না।

বাইরে মোটরের হর্ন বার বার শোনা যাচ্ছে, বলছে তাড়াতাড়ি করো। বড় বউয়ের কড়া কথা শোনা গেল— কী এখনও যায় নি যে!

দাই জীবা এসে বলল— তাড়াতাড়ি করো, বড়ো বিবিজী রাগ করছেন।

সোমার বুক ভয়ে শুকিয়ে গেল, ভাবল বড়ো বউ যদি হাত ধরে বাইরে বার করে দেয় তাহলে কী হবে? গত চারদিনেই ও অনেক

কিছু বুঝে গেছে। ভিতর থেকে একটা কান্না ঠেলে উঠছে; ঠোঁট দিয়ে কান্নার বেগ সামলে উঠে বসল, দাঁড়াল এবং বাইরে মোটরের দিকে পা বাড়াল।

সোমাকে আসতে দেখে বরকত নিজের জায়গায় বসে পিছন দিয়ে হাত বাড়িয়ে দরজা খুলে দিল। আগে যেমন কায়দা করে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াত, তা আর করল না। সোমা গাড়িতে উঠে বসলে নির্বিকার ভঙ্গিতে দরজা বন্ধ করল। গাড়ি চলতে শুরু করল।

বাড়ি থেকে গাড়িটা একটু এগিয়ে যেতেই সোমা রুদ্ধ স্বরে ডাকল —ভাই!

বরকত মুখ ঘুরিয়ে দেখল। কপালে ভ্রূকুটির রেখা ফুটে উঠল, বলল— কী হল?

সোমার চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়তে লাগল— কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

—স্টেশনে।

—কোথায় যাব যে স্টেশনে নিয়ে যাচ্ছ?

—যেখানে বলো। গাড়ি একটু থামিয়ে বরকত উত্তর দিল - মা-জী পঞ্চাশ টাকা দিয়েছে, যেখানকার টিকিট কাটতে বলবে কেটে দেব। বাকি টাকা তোমার। আল্লা যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। বরকত গাড়ীর স্পীড বাড়িয়ে দিল।

সোমা রুদ্ধ কণ্ঠে ডাক দিল— শোনো ভাই।

বরকত ওর দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল— কী বলো।

—একবার সাহেবের দপ্তরে নিয়ে চলো না।

বরকতের গলার স্বর নরম হল। অধীর কণ্ঠে বলল— মা-জী তো তোমাকে স্টেশনে ছেড়ে আসতে হুকুম দিয়েছেন। তুমি আচ্ছা ফ্যাসাদে ফেলছ!

—আমি হাত জোড় করছি।

—আমি সাহেবের দপ্তরে তোমাকে নিয়ে যাই আর সাহেব আমাকেই গিলে ফেলুক!

সোমা মিনতি করল - আমার খাতিরে একবার চলো। তোমার পায়ে পড়ছি।

বরকত সামনের মোড়ে গিয়ে গাড়ি ঘোরাল। একটি বাড়ির সামনে গাড়ি থামিয়ে বলল— আমি গিয়ে সাহেবকে খবর দিচ্ছি। একটু পরে বরকত ফিরে এসে বলল -- সাহেব দপ্তরে নেই, এজলাসে গেছে।

সোমা আবার অনুনয় করল— আর দু'মিনিট দাঁড়াও।

—হারামজাদা তো বসেই আছে। বলছে, নেই বলে দাও। বরকত ঝামটা দিয়ে উঠল।

সোমা ডুকরে কেঁদে উঠল। গাড়ি জোরে স্টেশনের দিকে ছুটে চলল। স্টেশনের সামনে গিয়ে বরকত আবার জিজ্ঞেস করল হ্যাঁ বলো, কোথাকার টিকিট কিনব।

সোমা কাঁদতেই থাকল, কিছু বলল না। বরকত গাড়ি থামিয়ে বলল— কিছু বলবে না কাঁদতেই থাকবে।

সোমা মুখ ঢেকে ফোঁপাতে লাগলে, বলল— টিকিট কাটতে হবে না।

—তবে গাড়ির মধ্যেই বসে থাকবে? কোথায় পৌঁছে দেব? যাবার কোনো জায়গা আছে?

—কোথাও যাবার জায়গা নেই। সোমা আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে রইল।

---আরে, আমার তো গাড়িটাকে নিয়ে বাড়িতে পৌঁছতে হবে।

সোমার স্বরে নৈরাশ্য ফুটে উঠল— একটা নদী বা জঙ্গলের কাছে ছেড়ে দিয়ে এসো।

—ওখানে গিয়ে কী করবে?

—মরব।

বরকত একটু ভেবে নিয়ে গাড়িটাকে একটা দিকে ঘুরিয়ে নিল। একটা নির্জন স্থানে গাড়ি থামিয়ে সোমাকে ডেকে বলল— শোনো।

সোমা চাপা কান্না সামলে বলল— হুঁ।

—আমার সঙ্গে যাবে?

সোমা ক্ষণকাল ভেবে মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানাল।

—যেখানে বলব সেখানে যেতে রাজি তো?

সোমা আবার মাথা নাড়ল।

—তবে মরবার কী দরকার। ছুনিয়ায় অনেক জায়গা, অনেক সুযোগ। শোনো, কিছু টাকা এনেছ?

—না।

– কী, তোমার কাছেই তো টাকাপয়সা থাকত।

আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকেই সোমা জবাব দিল— ও টাকা আমার নয়। ওদের টাকা আমি নেব না।

—এ কথা মানছ! বরকতের গলায় আদরের সুর। —হ্যাঁ, মানতেই হয় তোমার হিম্মত আছে। আচ্ছা তোমাকে কিছুক্ষণের মতো একটা জায়গায় অপেক্ষা করতে হবে। বরকত দিল্লী দরওয়াজার দিকে শহরের ভিতরে গাড়িটাকে নিয়ে গিয়ে একটা ছোট্ট বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করাল। বলল— তুমি এখানে অপেক্ষা করো। আমি ছু ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসব। গাড়ি বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে টাকাপয়সা নিয়ে আসি। বেইমানরা আমার নামে গাড়ি চুরির বদনাম দিয়ে ওয়ারেণ্ট বার না করে!

সোমা কাতর কণ্ঠে বলল - আসবে তো! ফিরতে কত দেরি হবে?

বরকত সোমাকে ঠুকে বলল— গরীবের কথা ; এ তো আর আমীরের কথা নয়। তাদের কথায় বিশ্বাস করলে বিপদ ও লোকসানের ভয়। আসব বলেছি আসবই। সব অবস্থাতেই কথা রেখে চলি। খুদা হাফিজ।

গৃহস্থের মরীচিকা

বড়ো বউকে অপমান করার ষড়যন্ত্র করেই জগদীশ ও মনোরমা চাকরাণী ও তার জন্য একই ধরনের কাপড় কিনেছে—এ অভিযোগকে কেন্দ্র করে এ ঘরে যে ঝড় উঠল, তার পরিণামে শুধু সোমাকেই ঘর ছেড়ে চলে যেতে হয় নি, পরিণাম আরও অনেক দূর গড়িয়েছে।

বউদের মধ্যে এ নিয়ে প্রচণ্ড মন কষাকষি শুরু হল; ভাইরাও বাদবিসম্বাদে জড়িয়ে পড়ে শুধু আঘাত পেল। বাবার সাক্ষাতেই ভাগ-বাটোয়ারার কথা উঠল এবং তা নিয়ে তুমুল ঝগড়া। মনোরমা মুখ খুললে বড়ো ও ছোটো বউদি যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঘরের একজন মেয়ে হিসেবেও মনোরমার যে একটা সম্মান আছে, এদের কথা বলার অসংযত ব্যবহারে তা বোঝার উপায় নেই। মনোরমার দোষ কি একটা? ওর এত বয়স বেড়ে গেছে, যখন-তখন একা ঘোরে, কোথায় কোথায় লম্বা লম্বা চিঠি দেয়—এসব কি কম অপরাধ? বড়ো ও ছোটো বউ মাথা নেড়ে নেড়ে হাতের নানা ভঙ্গি করে বার বার বলতে থাকল, কোনো খানদানী ঘরে এত ধাড়ি মেয়েকে তারা অবিবাহিত থাকতে দেখে নি।

এরকম একটা পরিবেশে মনোরমার পক্ষে ঘরে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠল। পার্টি অফিসে গিয়ে পত্রিকার জন্য কাজ করবে তারও তো

উপায় নেই ; ও যে বাউণ্ডুলে, নোংরা, চরিত্রহীন— পার্টি অফিসে গেলে ওদের এ অভিযোগ যে প্রমাণ হয়ে যায়। দু'দুবার মুখের ওপর জবাব দিয়ে মনোরমা বুঝতে পেরেছিল ভুল হয়ে গেছে, কারণ বাক্-যুদ্ধে ডাহা হেরে গিয়ে এক ঘণ্টা শুধু পড়ে পড়ে কেঁদেছে। নিজের ঘর থেকে বাইরে আসার সাহস কুলিয়ে উঠতে পারে নি। তাই পত্রিকার কাজে পার্টি অফিসে সে যেতে পারে নি।

অনেক ভেবেচিন্তে মনোরমা একটা উপায় বার করল। ও সুতলী-ওয়ালাকে টেলিগ্রাম করে দিল— 'প্রস্তাব মঞ্জুর। বিয়ে দু'সপ্তাহের মধ্যে হলে ভালো হয়।'

মনোরমা বিস্তারিত সব ঘটনা একটি চিঠিতে লিখে দাদাকে দিল। এই রুদ্ধ ঘরের পরিবেশ থেকে মুক্তি পেতে মনোরমা ব্যাকুল হয়ে উঠল ; দাদাকেও সে কথা লিখেছে যে ওর পক্ষে আর একদিনও এ ঘরে থাকা সম্ভব নয়। বলেছে, সিভিল ম্যারেজ করার ব্যবস্থা যেন করে রাখা হয় যাতে কিনা অবিলম্বে বিয়ে করে সুতলীওয়ালা ওকে বম্বেতে নিয়ে যেতে পারে।

জগদীশ ঘরের অবস্থা দেখে বিষণ্ণ ও চিন্তিত হয়ে আছেন। তিনি মনোরমার সঙ্গে কথা বললেন— তুমি টেলিগ্রাম পাঠিয়ে তাড়াহুড়ো করে কাজ করলে। আগে বাবা ও অন্য লোকেদের মতামত নেওয়া উচিত ছিল।

মনোরমা মাথা নিচু করে রুদ্ধ কণ্ঠে বলল - তুমি ওদের এ কথা বলে দাও এ-বাড়িতে আমার আর কোনো স্থান নেই। রায় বা বিচারের কথা আর ওঠে না। সাত দিন আগে গিয়ে আদালতে ব্যবস্থা করে রাখা দরকার, তুমি সেটা করো। যদি না পার আমি নিজে গিয়ে ব্যবস্থা করে আসব।

ঘরে আর-একবার ঝড় উঠল। মেঘনাদের আঘাতে লক্ষ্মণের যেমন

অবস্থা হয়েছিল, লালাজীর অবস্থাও অনেকটা সেরকম। মা নিরালায় কান্নাকাটি ও বিলাপ করতে লাগল। কেউ সান্ত্বনা দেবার নেই।

তিন ভাইয়ের একটিমাত্র বোন, তার বিয়েতে কী কী করা হবে, মা না-জানি কত স্বপ্ন দেখত। কত বছর ধরে কত গয়না জড়ো করেছে, কত জিনিসপত্র জোগাড় করেছে, ভেবেছে মন্নোর বিয়েতে কাজে লাগবে। মন্নো তো বিয়ে করতেই রাজি ছিল না আর এখনই-বা এরকম একটা কাণ্ড করছে কেন? দুঃখে কষ্টে মা বুক ও পেট চাপড়ে তার এই পেট-সর্বস্ব জীবনকে গালিগালাজ করতে থাকল।

মেজ বউ এই অকল্পনীয় অনাচারে ক্ষুব্ধ হয়ে দুই গালে দুই আঙুল রেখে বিস্ময় প্রকাশ করল— হায় রে, আমি যে মরে গেছি! জবর-দস্তির রকম দেখলে তো? তিন তিনটে বাচ্চার মা হয়েও আমি পুরুষদের সঙ্গে কথা বলতে ভয়ে মরে যাই। আমার বিয়ের সময় পালকিতে উঠে বসার আগে পর্যন্ত বুঝি নি কোথায় যাচ্ছি। আর আজকালকার মেয়েদের দেখো, তার পাঠিয়ে বিয়ে ঠিক করে।

লালা জওয়ালাসহায় খুবই মন-মরা হয়ে থাকেন। এই দুঃসহ অবস্থাকে তিনি কীভাবে নেবেন ভেবে পেলেন না; মেয়ের বিয়ের সমারোহের কথা ভাববেন, না মেয়ে চলে যাবার কলঙ্কের কথা ভাববেন? কাকে নিমন্ত্রণ করবেন, কাকে মুখ দেখাবেন? মেয়েটা এক বিধর্মী পারসির সঙ্গে চলে যাচ্ছে— এটা কি কম দুঃখের?

রাত্রিবেলা বড়ো বউ ও মেজ বউ মন্ত্রণায় বসল। দুই বড়ো ভাই নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করল। কথা বাড়িয়ে ব্যাপারটাকে আরও জটিল করে তুলে কী লাভ? যেখানে জিজ্ঞাসাবাদ নেই সেখানে আবার মতামত দেবার প্রশ্ন কোথায় ওঠে? সামাজিক মতে মেয়েদের যেভাবে বিয়ে হয়, সেভাবে যদি মনোরমার বিয়ে হত তবে লালাজী হয়তো পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকা খরচ করতেন; উপরন্তু বিশ-পঁচিশ

হাজার টাকা অন্য ভাবে খরচ হয়েই যেত। ভাইদেরও পাঁচ-ছ' হাজার করে দিতে হত। মা তো ঠিকই করেছিল মন্নোর বিয়েতে ফেয়ার প্লেসের বাড়িটা দিয়ে দেবে। এই বাড়িটার ভাড়াও আলাদা করে রাখছিল। এত সব খরচাফরচা তো ঘরের সম্পত্তি থেকেই যেত। আগেই তো পছন্দ ছিল এখন না-হয় নিজের ইচ্ছেতে বিয়ে করছে। আর তো বাচ্চা নেই, বয়স তো কম হল না ; সুটকেসটা হাতে নিয়ে চলে যেতেই বা আপত্তি কী ? তার চেয়ে বরং এটাই ভালো। সমাজের কাছে লজ্জা যতটা ঢাকা যায়।

পরের দিন মেজ বউ ঘোষণা করল — বিয়ে আবার হবে কি ? বিয়ে তো হয়েই গেছে। ব্যস, লোকদের বলাই যা বাকী। ভদ্রলোক তো এ-বাড়িতে এসে থেকেছে। মুসৌরীতে একসঙ্গে চষে বেড়িয়েছে। এ-বাড়ির দেখছি একটাই রীতি, কে কাকে ঢাকে, শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা। আমরা তো পরদেশ থেকে শুধু রোজগার করে টাকা পাঠিয়েই খালাস। ভাইয়াও ঘরে একজনকে রেখে নিয়েছে আর বোনও কি কম যায় নাকি ? সেও একজনের ঠিকা নিয়েছে। আমরা না এলে এসব দিব্যি চলত। বিয়েটিয়ে হয়ে গেছে।

ঠিক হল যেসব আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব এসব জেনে রসিয়ে রসিয়ে বলবে ও আলোচনা করবে, তাদের নিমন্ত্রণ করে লাভ নেই। মনোরমার তার পেয়ে সুতলীওয়ালা বিয়ের তারিখ লিখে পাঠিয়েছে। মাঝখানে আর মাত্র দু'সপ্তাহ বাকী। এর আগেই ভাই ও বউদিরা কেটে পড়তে চেয়েছিল। কিন্তু সবাই যে জিজ্ঞেস করবে মেয়েকে কে কী দিয়েছে। অন্য প্রশ্নও যে আছে ; সম্পত্তি ও কারবারের ভাগবাটোয়ারার প্রশ্ন কি সোজা ব্যাপার নাকি ? এটাকে তো কোনোমতে অবহেলা করা চলে না।

মিস্টার সুতলীওয়ালা নির্দিষ্ট তারিখে দু'জন বন্ধুকে নিয়ে বোম্বাই

থেকে এল। ম্যাজিস্ট্রেটকে কুঠিতে ডেকে পাঠানো হয়েছে। পনেরো টাকায় ও পনেরো মিনিটে লাখপতির মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল। সম্মানিত হিন্দুদের কাছে এর চেয়ে বড়ো অপমান আর আছে নাকি ?

মনোরমা ঘর থেকে বিদায় নেবার সময় ভাইদের ও বউদিদের চোখ জলে ভিজে উঠল। বিয়েটা তো বিয়েই নয়। মালপত্র বলতে তো মনোরমার শুধু আটটি বাক্স ; সেগুলি স্টেশনে নিয়ে বুক করে দেওয়া হল। পাঁচটি বাক্সে মনোরমার কাপড়, বাকী তিনটেতে ওর যাবতীয় বইপত্র।

যাবার সময় বাবা বারো হাজারের একটি চেক দিলেন এবং ভাইদের তরফ থেকে দিলেন বারোশো টাকার একটি চেক। বিয়ে বলতে তো এই-যা। মনোরমা চেকগুলির দিকে তাকিয়েও দেখে নি ; নিজের বটুয়ার মধ্যে পুরে নিল। বড়ো গম্ভীর ও উদাস দেখাচ্ছিল তাকে, কিন্তু চোখের জল সব যেন শুকিয়ে গেছে। ভিতরে গিয়ে মায়ের সঙ্গে দেখা করে এল আর ভূপী, দীপা ও ছোট্ট বাচ্চাটিকে একটু আদর করল। ভাই ও বউদিদের অশ্রুভরা চোখের দিকে মনোরমা তাকিয়েও দেখে নি।

বোম্বাই মেল ছাড়ার আগে পর্যন্ত সুতলীওয়ালা নতুন আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে প্ল্যাটফর্মেই দাঁড়িয়ে ছিল। সুতলীওয়ালা বিনয় ও নম্রতার প্রতিমূর্তি। এত বড়ো পরিবারের সঙ্গে আত্মীয়তা গড়ে তুলতে পেরে সে বারবার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে। আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছে তাদের মেয়েকে আদরে ও আরামে রাখবে। প্রত্যেক আত্মীয়কে বোম্বাইতে যাবার আমন্ত্রণ জানাল। ধবধব করছে ফর্সা রঙ, সুদৃঢ় ও সতেজ শরীরের গঠন আর অমায়িক ব্যবহারে প্রত্যেকে আশ্বস্ত হয়ে ভাবল, তবে তো মেয়ের বর খুব একটা খারাপ হয় নি।

মনোরমা গাড়ির মধ্যে চুপচাপ বসে ছিল। গাড়ি চলার সময় হাত জোড় করে সবাইকে নমস্কার জানাল।

সুতলীওয়ালার দুই বন্ধু ভাবল, একসঙ্গে গেলে নতুন বউয়ের সংকোচ হতে পারে। তাই বর-বধূর সুবিধার কথা ভেবে অন্য কামরায় জায়গা রিজার্ভ করেছিল। কিন্তু ওদের সঙ্গে অন্য যে-সব যাত্রী যাচ্ছিল তাদের কাছ থেকে এতটা শিষ্টাচার তো আর আশা করা যায় না।

রাত এখন দশটা। গাড়ি লাহোর স্টেশন ছাড়িয়ে যাবার পরেই উপরের বার্থের দু'জন মুসাফির শুয়ে পড়ার তোড়জোড় শুরু করে দিল। সুতলীওয়ালা মনোরমার কাছে বসে সস্নেহে ওর পিঠে হাত রেখে একটু মুচকি হাসল; ওর আরামের জন্য ব্যস্ততা দেখাল, ওর কী প্রয়োজন তা জানতে চাইল।

পুরুষের নিঃসংকোচ ও অধিকারের স্পর্শে মনোরমার চোখ বুঁজে এল। একটু হেসে ধন্যবাদ জানাতে ভুলল না। প্রণয়ের আবেগে সুতলীওয়ালা যেন অধীর হয়ে উঠছে; হাত মেলে ওকে আস্তে করে ওঠাল। মনোরমার বিছানা ঠিক করে দিল; মনোরমা তার বাক্স খুলবে, নাইট ড্রেস বার করবে, সব কাজে এখন সুতলীওয়ালা সাহায্য করছে। তার হাত বার বার ছুঁয়ে যাচ্ছে; স্পর্শের মাধুর্যে মনোরমার অদ্ভুত একটা রোমাঞ্চ হচ্ছে। ওর নিশ্বাস গায়ে লাগছে; কাঁধে, ঘাড়ে, মনোরমার সারা শরীরে তড়িৎ-প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে যেন। সুতলীওয়ালা একটু এগিয়ে এসে ওকে বাথরুমের দরজা দেখিয়ে দিল।

মনোরমার কাছে রাতে শোবার বিশেষ ধরনের কুর্তা-পাজামা ও গাউন ছিল কিন্তু ও কোনোদিন তা পরে নি। আগে আগে শখ ছিল। সুতলীওয়ালার সঙ্গে যাচ্ছে বলে এই কাপড় পরে নেবার সময় ভাবল, এটা পরে এখন ওকে কেমন লাগছে দেখতে? বাথরুমের আয়নায় নিজেকে বড়ো মনোরম লাগছে; কাঁধের চুল ঠিক করে মুখে একবার পাউডারের প্রলেপ দিয়ে নিল। এখন কি আর সুন্দর না লেগে পারে? ও চাইছে কেউ ওকে আদর করুক, সুন্দর বলুক। কিন্তু

বাথরুম থেকে বেরিয়ে সংকোচে মাথাটা একটু যেন ঝুঁকে পড়ছে।

সুতলীওয়ালা নিজের বিছানায় বসে ওর জন্মে অপেক্ষা করছিল। একটু হেসে জিজ্ঞেস করল — এখন কি আর আলো জ্বেলে রাখা দরকার ?

মনোরমা মাথা নাড়ল। আলো বন্ধ হয়ে গেল।

মনোরমার মাথায় সুতলীওয়ালার হাত, ঠোঁটে ওর ঠোঁট ; মনোরম স্পর্শের অদ্ভুত একটা অনুভূতির রাজ্যে সবে যেন ডুবে যাচ্ছে, হঠাৎ শুনতে পেল —'গুডনাইট'। অধিকারের নির্ভয় চুম্বন। আগে কখনও তার এই সুখানুভূতি হয় নি ; সুন্দর-করে কাটা গোঁফের উষ্ণ স্পর্শ এখনও ঠোঁটে লেগে আছে। কত তীব্র মধুর এই রোমাঞ্চ। মনোরমা সাঁতার কাটার ভঙ্গিতে হাত হু'টো বাড়াল, কিন্তু বৃথা, পিঠের দিকে একটা স্রোত বয়ে গিয়ে মিলিয়ে গেল।

গাড়িটা অন্ধকারে ডুবে গেছে ; বাথরুমের ভেতরের উজ্জ্বল নীল গোল গোল আলো দরজায় আছাড় খেয়ে পড়ছে ; যেন সফরে বেরিয়েছে এই যে ছোট্ট হুনিয়া, তার হাতে চাঁদের ছোটো ছোটো খেলনা তুলে দিচ্ছে। মনোরমা চোখ বুঁজে নিজের বিছানায় পড়ে আছে ; ফার্স্ট ক্লাসের স্প্রিং-এর গদি গাড়ির গতিবেগের সঙ্গে হুলে হুলে যেন বলছে - 'শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো রাজকুমারী, শুয়ে পড়ো।'

গাড়ি প্রচণ্ড বেগে ছুটে যেতে যেতে একই কথার পুনরাবৃত্তি করছে— শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো।

মনোরমা ঘুমোয় নি, ঘুমতে ও চায় নি, কিন্তু কখন যে ঘুমিয়ে পড়ল, টের পেল না।

মনোরমা চোখ খুলে তাকাল। গাড়ি তীব্র গতিতে ছুটছে আর বার্থের বিছানায় ঘুম-ভেঙে যাবার প্রথম অনুভূতি। বিবাহিত জীবনের প্রথম প্রভাত। ও সুতলীওয়ালার বার্থের দিকে লজ্জাবনত চোখে

তাকিয়ে দেখল। সুতলীওয়ালা এখনও গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। ফর্সা মাথায় কোমল চুলে ঢেউ খেলে যাচ্ছে। ওকে কী যে সুন্দর লাগছে দেখতে, এই মানুষটা ওর নিজের আপনজন। নিশ্চিন্ত বিশ্রামের হাই তুলল মনোরমা, অদ্ভুত তৃপ্তি, সুখ। উপরের বার্থের যাত্রীরা তখনও গাঢ় ঘুমে নিশ্চল। মনোরমা ভাবল, অন্য লোকেরা ঘুম থেকে জাগবার আগে কাপড়-জামা ছেড়ে ফেললে হয়। আনন্দে উচ্ছল মনে বিছানা ছেড়ে উঠল। টুকিটাকি জরুরি জিনিস ও কাপড়-জামা নিয়ে বাথরুমে চলে গেল। কী পরবে তা ভেবে দেখতে অনেক সময় চলে গেল ; যত্ন করে চুল বাঁধতে বেশ সময় পার হয়ে গেল।

মনোরমা সেজেগুজে তৈরি হয়ে এসে নিজের জায়গায় বসল। সুতলীওয়ালা চোখ মেলে তাকিয়েছে। ওকে দেখে একটু হেসে 'গুড মর্নিং' বলল ; মনোরমার মনে হল, কী সুন্দর এ সম্ভাষণ। মনোরমা চাইছিল ওর বাক্স খুলে জরুরি জিনিসগুলো বার করে দেয় কিন্তু বাক্স যে কোথায় রেখে দিয়েছে তা ওর জানা নেই। এরকম কাজও ও কখনও করে নি ; কারুর কোনো অসুখ হলে তার সেবা করে নি বা অন্য কোনো কাজ করে কাউকে সেবা করার অভিজ্ঞতা ওর নেই।

রেলগাড়িতেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সেই থিকথিকে ভিড়। ফার্স্ট ক্লাসেও একা থাকার উপায় নেই ; একান্ত নিভৃতে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ নেই। মনোরমা চাইছিল ওরা দু'জন ছাড়া এ কামরায় অন্য কোনো প্রাণী যদি না থাকত··· এই লম্বা সফর কবে শেষ হবে ? কবে বোম্বাই পৌঁছবে ?

সুতলীওয়ালা ওর কাছে বসে কথাবার্তা বলছিল — তোমাকে প্রথম দিন দেখেই ভেবেছি যদি কোনোদিন বিয়ে করি তোমাকেই করব।

লাহোরে প্রথম সাক্ষাৎকারের সুখের দিনগুলির কথা সুতলীওয়ালা মনে করিয়ে দিল। একটু পরে গম্ভীর হয়ে বলল— তোমাদের পরিবার

একটু প্রাচীনপন্থী ; তারা সংস্কারের বিশ্বাসে চলতে অভ্যস্ত বলে আমাদের বিয়েতে অতটা সন্তুষ্ট হয় নি কিন্তু সময়ে ওদের ধারণা পালটে যাবে ও আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে।

কথাবার্তা দু'জনে ইংরেজীতেই বলছিল। মনোরমা এসব কথা শুনতে চাইছিল না, তাই প্রসঙ্গ পালটাবার জন্য বলল— ওসব কথা থাক্। বলেই নিজের বটুয়া খুলে কলম ও চারটে চেক বার করল। চেকের পিছনে লিখল— হায়দরজী সুতলীওয়ালাকে এই চেকের টাকা দিয়ে দেওয়া হোক। মুচকি হেসে নিজের নাম স্বাক্ষর করল— মনোরমা।

মনোরমা চারটে চেক সুতলীওয়ালাকে দিয়ে দিল। সুতলীওয়ালার ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসি খেলে গেল, বিনয়ের সঙ্গে বলল— এর কি কোনো দরকার ছিল ?

মনোরমা সুতলীওয়ালার চোখে দৃষ্টি ছড়িয়ে বলল— সব কিছুই তো তোমার।

সুতলীওয়ালা ওকে বলল, ওর পরিবারের অন্যান্য লোক ভরোচে থাকে, ব্যবসার প্রয়োজনে ও নিজে একা বোম্বাই থাকে। ঘরের কাজের জন্য একটি চাকর আছে। ও মনোরমাকে বোঝাল, বোম্বাই উদ্যোগ-কারবারের শহর। ওখানকার লোকেরা থাকবার জন্য প্রায়ই জায়গা বাসা পায় না ; কোনোমতে একটু জায়গা নিয়ে পড়ে থাকে। লাহোরে মনোরমাদের মতো আট-দশটা ঘরের বিরাট বাড়িতে বোম্বাইতে থাকা সম্ভব নয়। ও থাকে মালাবার হিলে ছোট্ট একটি বাংলোর উপরের তলায়। সেখানে তিনটে মাত্র ঘর। একটা ঘরের জন্য একশো টাকা ভাড়া দিতে হয়।

তিনটি ঘর কিছু কম জায়গা বলে মনোরমার মনে হল না ; ভাবল, ছোটো জায়গা হলে ও সামলাতে পারবে, সাজিয়ে-গুজিয়ে ফিটফাট

রাখতে পারবে। পরিবারের অন্য আত্মীয়স্বজন নেই তো কি? ওরা দু'জনে থাকবে নিশ্চিন্ত নির্ভীক প্রেম ও সুখের নীড়ে।

* * *

সুতলীওয়ালা মনোরমাকে নিজের ফ্ল্যাটে ছেড়ে দিয়ে অল্পক্ষণের জন্য বাইরে বেরিয়ে গেছে। বারান্দার সামনে অসীম সমুদ্রের ঢেউ গড়িয়ে পড়ছে, অশান্ত উচ্ছল। মেঘের বুকে ছড়িয়ে পড়ছে সূর্যের অস্তরাগ; লাল খণ্ড খণ্ড মেঘের আড়ালে অগ্নিদগ্ধ আগুন লুকিয়ে রাখার মতো দিশেহারা সূর্য যেন সমুদ্রের গভীরে সমাধিতে ডুবে যেতে চাইছে। ফ্ল্যাটের ঘরগুলি গোলাপী রঙে ভরে উঠেছে। নিজের ঘরে স্বামীর সঙ্গে বিবাহিত জীবনের প্রথম রাত্রি আসন্ন। রান্নাঘরে বাবুর্চি ওদের আদেশে রান্নাবান্না করছে। ও তিনটে ঘর সামলে বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়েছে। প্রত্যেকটি ঘরে বার বার ঘুরে এটা ওটা ঠিক করছে। মাঝখানের ঘরটিকে একটু যেন বেশি যত্ন করে সাজিয়ে তোলার সময় লজ্জায় ও পুলকে অধীর হয়ে উঠছিল। ঘরে দুটো বড়ো বড়ো তক্তাপোষ বিছানো···।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে অনুভব করল শরীরটা অনিদ্রায় ক্লান্ত, বিরক্তি ও অবসাদের শৈথিল্য; মনে অদ্ভুত একটা আত্মগ্লানি। ওর স্বচ্ছতায় কে যেন ব্যর্থতার ছাপ মেরে গেছে। সুতলীওয়ালা লজ্জিত কণ্ঠে বলেছিল— কয়েকদিন যাবৎ আমার শরীরটা ভালো যাচ্ছে না; আমি ওষুধ খাব।

সুতলীওয়ালার কথা বলার এ ধরনটা মোটেই ভালো লাগে নি। একটু আগে পর্যন্ত নানা কথা মনে তোলপাড় করছিল, কতরকম খেয়ালে

খেয়ালী হয়ে উঠছিল মন কিন্তু এখন নিজের চুলের গুচ্ছ সামলে সাজিয়ে তুলতেও ইচ্ছে করছে না।

সুতলীওয়ালা ব্যবহারে খুবই বিনয়ী। অতটা উচিত-অনুচিত ভেবে কথাবার্তা বা ব্যবহার করতে জানে না মনোরমা, তাই মনে কুণ্ঠা ও লজ্জা। কুণ্ঠায় ও দ্বিধায় দগ্ধ হয়ে মনোরমা ভাবছিল, কী এমন ব্যাপার, বার বার একই কথা বলার কী দরকার? এও ভাবল, ঘরে মন লাগবার মতো কীই-বা কাজ আছে? চাকরটা তো সবই করে দেয়, করবেও। এসব কথা ভেবে ও হাতে একটা পত্রিকা বা বই টেনে নেয়।

সুতলীওয়ালা সকালে জলখাবার খেয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়। দুপুরে দেড়টায় সময় খেতে আসে, কখনও-বা আসতে পারে না। মনোরমার পড়াশুনা করতে ভালো লাগে না। দিনে ঘুমোবার অভ্যাস নেই। সন্ধ্যাবেলা সুতলীওয়ালা কাজ সেরে ফিরে আসে, চা-টা খায় এবং মনোরমাকে গাড়িতে বসিয়ে বেড়াতে বেরোয়। ক্রিকেট বা সিনেমা বা ডান্স পার্টিতে নিয়ে যায়। কখনো বাইরেই রাতের খাওয়া সারে। দু'জনে মাঝরাতে ঘরে ফেরে।

পড়াশুনা করার জন্য মনোরমায় হাতে এখন অনেক সময়। কিন্তু পড়তে মন লাগে না। নতুন জায়গা, কারুর সঙ্গে বিশেষ পরিচয়ও হয় নি, তাই কোথাও যেতেও পারে না। সুতলীওয়ালা ওকে বলেছিল - বাজারে গিয়ে কিছু কেনাকাটা করতে পারো। মনোরমা ভাবে, কিছু কেনার তো দরকার সেরকম নেই। মনোরমার পক্ষে সময় কাটানো অসম্ভব হয়ে উঠল। কখনো ভাবে কুমারী জীবনে কিসের অভাব ছিল, কী সেই অভাব যা এখন পূরণ হয়ে উঠছে? ওকে বিয়ে করার প্রস্তাব সুতলীওয়ালা কেন করেছিল?... অন্য মেয়েরা বিয়ের পরে কী রকম হাসিখুশিতে ভরে ওঠে, স্বাস্থ্যে-সৌন্দর্যে তারা কত ভরপুর হয়ে যায়...। ওদের দেখে মনে হয় গভীর কোনো একটা রহস্য যেন ঠোঁটের কোণে

উদ্ভাসিত হয়ে ফুটে উঠতে চাইছে। কিন্তু মনোরমা বিবাহিত জীবনে শুধু প্রবঞ্চনা ও গ্লানি সঞ্চয় করছে। কুমারী অবস্থায় সে কোন্ দিক থেকে করুণার পাত্র ছিল, কোন্ দিকে, কিসে? আবার মনোরমা ভাবে, স্বামীর কাজে সাহায্য করলে কেমন হয়।

সুতলীওয়ালা শুনে একটু হাসল, তারপর বুঝিয়ে বলল— আমার কাজটা এমন যে আমিই শুধু করতে পারি। কোনো পুঁজিপতিকে বোঝানো যে এই জায়গার বদলে আপনি অন্য জায়গায় মূলধন লগ্নী করুন, এ কাজটা অন্যের মারফৎ হয় না। মানুষটার গভীরতা কত জানতে হয়, কী রকম স্বভাব তাও দেখতে হয়। কাল যে লোকটিকে সঙ্গে নিয়ে আমি ক্লাবে গিয়েছিলাম ওকে আমি ফিল্মে দু'লাখ টাকা লাগাতে বলছি, বলতে পারো ফাঁসাতে চাইছি। এতদিন আমি অন্যের ফিল্ম বেচছিলাম কিন্তু এবার থেকে আমি নিজে ফিল্ম তৈরি করে বেচতে চাই। ওদের পুঁজি আর আমার মাথা…।

সুতলীওয়ালা ভাবে, ট্রেনে সফর করার সময় মনোরমা ওর কাছে লেগে থাকতে চাইছিল, ওর চোখেমুখে ভালোবাসা ও আদর ঝলসে উঠতে দেখেছিল। কিন্তু এখন ওর মধ্যে কেমন যেন একটা বিরাগ ভাব এসে যাচ্ছে। এর কারণটাও ও বুঝতে পারে। পাঞ্জাবের জলবায়ু ও অন্য পরিবেশে মানুষ হয়ে উঠেছে বলে মনোরমা ওর চেয়ে অনেক বেশি স্বাস্থ্যবতী। সুরক্ষিত যৌবনের পরিপূর্ণ শক্তি নিয়ে ও গৃহস্থধর্মের আরাম ভোগ করতে গিয়ে শুধু শরীরকেই ক্ষয় করেছে; শুধু রয়ে গেছে বাসনা-কামনা আর শখ-শৌখিনতা। বয়সই শুধু বেড়ে যেতে লাগল তবুও বিয়ে করার ফুরসৎ হল না; অবশেষে জীবনের সায়াহ্নে ঘর বাঁধার ইচ্ছে হয়েছিল।

সুতলীওয়ালা সব জায়গায় মনোরমাকে নিয়ে যেত। যুবক-যুবতীদের মহলেও। মনোরমাকে খুশি করতে, ওর মনোরঞ্জন করতে উদ্গ্রীব হয়ে

থাকত। কিন্তু যে পরিবেশে মনোরমা মানুষ হয়েছে, যাতে ও অভ্যস্ত, এসবে ওর যেন ঠিক মন ভরে না। পার্টিতে আর ক্লাবে শুধু তো শেয়ার আর ঘোড়দৌড়ের কথা ; মহিলা মহলে যেসব লোক ও যেসব প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা হয়, তাদের ও কাউকেই চেনে না।

বিবাহিত জীবনের প্রথম রাত্রিতে সুতলীওয়ালা নিজের শারীরিক দুর্বলতার কারণ দেখাতে গিয়ে ওর সামনে যে লজ্জাজনক উক্তি করেছিল, তাতে সুতলীওয়ালা নিজেও একটা গ্লানি অনুভব করছিল। মনোরমার মনকে খুশি রাখতে ও যেভাবে চেষ্টা করেছে তাতেও খুব একটা সন্তোষজনক ফল দেখতে পাচ্ছে না। বিয়ের পরে তৃতীয় সপ্তাহ কেটে যাবার পথে। সন্ধ্যাবেলা সুতলীওয়ালা মনোরমাকে সিনেমায় নিয়ে গেল, তারপর নাচে। সেদিন সন্ধ্যায় ওকে খুবই বিনয়ী ও সহৃদয় মনে হচ্ছিল। ঘরে ফিরে মনোরমা কাপড় পালটে শুয়ে পড়তে চাইল।

নিজের খাটে শুয়ে পড়ার আয়োজন করতে দেখে সুতলীওয়ালা লজ্জা ও সংকোচ-ভরা স্বরে বলল— সেদিন আমার শরীর ভালো ছিল না ; সেদিনের কথা ভুলে যাও। বলে মনোরমার খাটে বসল। অপমানের একটা জ্বালা ধরে গেল মনোরমার সারা শরীরে। ও উঠে বারান্দায় গিয়ে বসল।

সুতলীওয়ালা অপমানিত বোধ করল কিন্তু ধৈর্য ধরে ওকে বোঝাবার চেষ্টা করল। নিষ্ফল হয়ে সে চুপচাপ শুয়ে পড়ল। মনোরমার ব্যবহার অসহ্য অপমানকর মনে হল। কয়েকটা কড়া কথা শুনিয়ে দিল। স্ত্রীর অপমানে মাথাটা যেন জ্বলে যাচ্ছে ; শরীরে কড়া ওষুধের জ্বালা পাক দিয়ে উঠছে ; উত্তেজনায় মন অস্থির। অনেকক্ষণ এপাশ-ওপাশ করে যন্ত্রণায় ছটফট করল ; ঘুম এল অনেক দেরিতে। সকালে উঠে মনোরমার সঙ্গে কোনো কথা বলল না। সাতটার সময় বেরুবার জন্য তৈরি হয়ে সিঁড়ির কাছে চাকরকে ডেকে বলল— মেমসাহেবকে

বলিস আমার জরুরি কাজ আছে, দপ্তরেই জলখাবার খেয়ে নেব। ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে।

মনোরমার মনটা বিষণ্ণ হয়ে আছে ; এক নিথর ও বিষণ্ণ অনুভূতি। বিয়ে করে ও কী পেল··· হায় রে কত বড়ো ভুল, কত বড়ো প্রতারণা···। শুধু একটু চা খেল, অন্য কিছু খেতে ভালো লাগছে না। স্নান করে ভালো একটা কাপড় পরে নিতেও উৎসাহ পাচ্ছে না। ঘরে বসে থাকতেও মন চাইছে না। ঘরটা যেন বদ্ধ খাঁচা— ওকে যেন পিষে মারতে চায়। উঠে পড়ল মনোরমা, কাপড় বদলে নিল। রাস্তায় পা দিয়ে সোজা সমুদ্রের দিকে চলল। মালাবার হিলের চারপাশে ধনী লোকেদের বড়ো বড়ো বাংলো কুঠি ; তাদের ফুটফুটে ছেলেমেয়ে স্কুলে যাবার জন্য বেরিয়েছে ; হাসিখুশি প্রসন্ন মুখে কেমন যেন একটা পবিত্রতার ছাপ। এদের দেখে মনোরমা ভাবল, একেই বলে গার্হস্থ্য জীবন কিন্তু আমি যে গৃহস্থ জীবনে পা দিয়েছি, সেটা শুধু প্রতারণা!

মনোরমা সমুদ্রের তীরে ক্যাণ্ডি বাঁচে গেল। সমুদ্রের ধারে বাঁধের ওপর কয়েকজন বৃদ্ধ, রোদে বসে পশ্চিমের হাওয়া খাচ্ছে। মনোরমাও সমুদ্রের ধারে বাঁধের ওপর বসল। সমুদ্রের মতোই চিন্তার ঢেউ আছাড় খাচ্ছে মনে, ভাবল— এখন কী করব? গৃহস্থ জীবনের মাধুর্য আর জীবনে ফিরে পাবে না, সে ভাগ্য ওর নয় ; জীবনটা যেন শুধু ব্যর্থ প্রবঞ্চনায় ভরে উঠছে। কলেজে পড়াবার কাজ পেলে কত ভালো হত! লাহোরে কিছুদিন কাগজের অফিসে কাজ করে কত ভালো লেগেছিল। মাইনে তো ছিল মাত্র পনেরো টাকা। ভূষণের কথা বলার ধরনটা কেমন যেন রুক্ষ কিন্তু মানুষের প্রতি ওর হৃদয়-জোড়া বিশ্বাস ও ভালো-বাসা। ওর সঙ্গে ধুলোয় আর রোদে হেঁটে যেতে, এমন-কি লড়াই-ঝগড়া করতেও অপমান লাগত না, মনে কোনো হীনতর অনুভূতি জাগত না। পরস্পরের কাছাকাছি এসেও আমরা দূরে ছিটকে গেলাম,

তবুও জানি ভূষণ আমাকে প্রতারণা করতে চায় নি।

রোদে ঝলমল নীল সমুদ্রের দিকে মনোরমা একদৃষ্টে তাকিয়ে ভাবছিল। ভূষণ নিজেকে পরিশ্রমী কর্মঠ আর সহনশীল বলে জানে ; এ নিয়েও ওর অহংকার। এক অভীষ্ট লক্ষ্যের জন্য সে সংগ্রাম করে চলেছে। হয়তো ভেবেছে আমি শুধু পয়সা চাই, বাড়ি চাই, কাপড়চোপড় আর মোটর গাড়ি চাই। ওর কাছে এসব জিনিস থাকলে কি এ নিয়েই ও মশগুল থাকত ? তবে অন্যকে এরকম ভাবে কেন ? কতবার আমাকে আঘাত দিয়েছে, কতবার অপমান করেছে। সেদিন ধরমশালায় সোমার কথা নিয়ে কত বড়ো আঘাতটা দিল···তবুও ওর রুক্ষ স্বভাবে, অন্যকে আঘাত দেবার ক্ষমতার মধ্যে একটা সততা আছে। গমের মতো রুক্ষ চেহারা, রোগা-পাতলা শরীর নিয়ে ভূষণ মনোরমার কল্পনারাজ্যে এসে দাঁড়াল। পাশেই দেখল সুতলীওয়ালাকে ; ফর্সা মোলায়েম চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে ! স্পর্শ করলেই যেন গলে যাবে, বিশ্রীরকম নরম। নিজের শরীরকে ঘৃণার চোখে দেখল মনোরমা ; ওর ইচ্ছে হল থুতু ফেলে। ভাবল, ভূষণ আমাকে বিশ্বাস করতে পারে নি। এইসব জিনিস আমি যে লাথি মেরে ফেলে দিতে পারি, ভূষণ একদিন নিশ্চয় দেখতে পাবে।

মনোরমার হঠাৎ মনে পড়ল ভূষণ তো বোম্বাইতেই আছে। 'পিপলস্ ওয়ার' আর 'লোক-যুদ্ধ' এখান থেকেই তো ছাপা হয়। ঠিকানাটাও যেন মনে পড়ছে— খেতওয়াড়ী, মেইন রোড। দুটি পত্রিকার জন্য চাঁদা এই ঠিকানাতেই পাঠিয়েছে। লাহোরের পত্রিকায় যখন কাজ করত, তখন বোম্বাইয়ের এই দপ্তরের সঙ্গে চিঠিপত্রের আদানপ্রদান চলত, সেটাও মনে পড়ছে। সুতলীওয়ালা সন্ধ্যার সময় ফিরবে বলেছিল, যখনই ফিরুক কী এসে যায় ! মনোরমা বোঝে এখানে বসে এসব কথা ভেবে কী লাভ ? সমুদ্রের ধারে বাঁধের

জায়গাটা থেকে উঠে পড়ল মনোরমা। কম্যুনিস্ট পার্টির রাস্তাটা ওর জানা নেই। ভাবল, ট্যাক্সিওয়ালার তো সব রাস্তাই চেনা। বড়ো রাস্তায় এসে একটা খালি ট্যাক্সি দেখতে পেল। ইশারা পেয়ে ট্যাক্সিটা থেমে গেল। গাড়িতে বসে মনোরমা গম্ভীর চালে বলল— "খেতওয়াড়ী মেইন রোড।"

মনোরমা ভেবে শঙ্কিত হল দপ্তরে এই সময় যদি ভূষণ না থাকে! অফিসে কাজ করে এমন অনেক লোকের নাম ওর মনে আছে। ওদের নাম প্রায়ই খবরের কাগজে বেরোত। আগে জায়গাটা তো দেখা যাক্।

মালাবার হিল থেকে একেবারে অন্য একটি জায়গায় একটা বাজারের সামনে এসে ট্যাক্সিওয়ালা জিজ্ঞেস করল— এটাই খেতওয়াড়ী, কোথায় যাবেন? আশেপাশের সব কিছুই অপরিচিত ঠেকল মনোরমার, বলল— রামভবন কম্যুনিস্ট পার্টি।

—লাল বাউটা? মারাঠী ট্যাক্সিওয়ালা কথাটা জিজ্ঞেস করে একটু আগে গিয়ে একটা বড়ো সাদা বাড়ির সামনের ফুটপাতের কাছে গাড়িটা দাঁড় করাল। বাড়ির সঙ্গে লাগোয়া ঘোরানো চওড়া সিঁড়ি। সিঁড়ির কাছে একজন তরুণ একটা স্টুলে বসে আছে। কিছু লোক আসছে-যাচ্ছে। চারিদিকে একটা নিঃশব্দ ব্যস্ততা। মনোরমা যুবকটিকে জিজ্ঞেস করল— অফিস কি উপরে?

যুবক জানতে চাইল— আপনি কার সঙ্গে দেখা করতে চান?

—কমরেড ভূষণের সঙ্গে।

—কী কাজ করেন?

—সংবাদপত্রে।

—কোন্ সংবাদপত্রে, কোন্ বিভাগে? দরজায় লটকানো কাগজ ছিঁড়ে যুবকটি মনোরমার হাতে দিয়ে বলল — লিখে দিন।

মনোরমা বিস্মিত হয়ে ভাবল, এত বড়ো দপ্তর যে ভূষণ কোথায় কাজ করে তা সবাই জানে না? ভূষণ কী কাজ করে মনোরমা সঠিক জানত না। একটু ভেবে টুকরো কাগজে ইংরেজীতে লিখে দিল – লাহোরের কমরেড ভূষণের সঙ্গে দেখা করতে চাই।—মনোরমা।

সামনে বসে অন্য একজন লোক কাগজের বাণ্ডিল বাঁধছিল। যুবক মারাঠী ভাষায় কী যেন তাকে বোঝাল আর টুকরো কাগজটা তার হাতে দিয়ে দিল। সে সিঁড়ি বেয়ে উপরে চলে গেল। মনোরমা নিজের বটুয়া হাত দিয়ে চেপে ধরে ভূষণের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল।

যুবকটি অনিচ্ছাসত্ত্বে স্টুল ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে বলল – আপনি এসে বসুন, উপরে লোক পাঠিয়েছি।

মনোরমা বসল না, বলল – ধন্যবাদ। আপনি বসুন। আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। উপর থেকে কত লোক এল, কত লোক উপরে চলে গেল। যুবকটি শুধু দুটি মাত্র লোককে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। যারা আসছে-যাচ্ছে তারা সবাই তরুণ কমরেড। কিন্তু লাহোরের কমরেডদের তুলনায় অনেক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। মনোরমা প্রতীক্ষা করতে করতে বড়ো রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিল, হঠাৎ পরিচিত স্বর শুনতে পেল— হ্যালো কমরেড! ভূষণের গলার স্বর। ভূষণ হাসতে হাসতে সিঁড়ি দিয়ে নামছিল। এখনও হাতে কলম। মনো-রমাকে দেখে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল—কবে এলে?

মনোরমা মুচকি হাসল।

—তুমি ফোন করে দিলেই পারতে। কবে এসেছ, কী করে এসেছ? বাড়ির অন্য লোকেরা এসেছে নাকি? জগদীশও এসেছে? ভূষণের গলার স্বরে উৎসুক আন্তরিকতা।

মনোরমা মুচকি হেসে জানতে চাইল— কেমন আছ?

ভূষণকে একটু যেন ক্লান্ত দেখাচ্ছিল, অনেক রোগা হয়ে গেছে।

মনোরমার একটু যেন ঈর্ষা হল, ভাবল এর কাজ করার কত সুযোগ।

—এসো, উপরে এসো। ভূষণ সঙ্গে করে মনোরমাকে উপরে নিয়ে এল। এক তলা পেরিয়ে দোতলা, দোতলা পেরিয়ে তিনতলা। সিঁড়ির থেকে সব ঘর দেখা যাচ্ছে; টেবিলে বসে সবাইকে কাজ করতে দেখছে। টাইপ রাইটারের খটাখট আওয়াজ।

ভূষণ বলল - চলো, আমার ঘরে এসো। একটু ভেবে পরে বলল – না, চলো, কমনরুমেই বসা যাক।

প্রকাণ্ড বড়ো একটা ঘর। সাদা কাপড়ে আঁকা কাস্তে-হাতুড়ির লাল চিহ্ন দেয়ালে টাঙানো। মার্ক্স ও লেনিনের চিত্র। এক কোণে একটা বড়ো রেডিয়ো; খুব ধীরে ধীরে অনুষ্ঠান চলছে। তার সামনে বসে একটি লোক কাগজ-কলম নিয়ে কী-যেন-সব নোট করছে। অন্য দিকে বসে আছে কয়েকজন তরুণ, তারা কাগজ পড়ছে। ভূষণ ও মনোরমাকে কেউ বিশেষ দেখল না। ভূষণ এক আরাম কেদারায় মনোরমাকে বসিয়ে আবার একই প্রশ্ন করল কবে এলে?

—এক মাস হয়ে এল।

—বাবাঃ, তাও দেখা করো নি?

—দেখা করতেই তো এসেছি।

—এক মাস পরে? ফোনও করো নি। খুব ব্যস্ত ছিলে নাকি? কোথায় বাড়ি?

— মালাবার হিল।

—ঠিকানা বলে দাও, যাব।

—নেপিয়ার রোডে লুকমানজী স্ট্রীট, ১৭ নম্বর, উপরের ফ্ল্যাট।

—কী করে এলে বললে না তো।

—এখানে অনেকগুলি দপ্তর আছে নাকি? মনোরমা কথা পালটাল, বলল — তোমার দেখা পাওয়া বেশ মুশকিল হয়ে উঠেছিল।

—হ্যাঁ, এসো, তোমাকে দেখাই। ভূষণ উৎসাহে উঠে পড়ল। ঠিক সেই সময়ে একটি মেয়ে একটি ফাইল হাতে হাজির। ভূষণের পিঠে ফাইলটা দিয়ে কষে এক ঘা মেরে ইংরেজীতে বলে উঠল— এই নাও। নিজে তো ফাঁকি মারছ। জানো, কাল রাত আটটা থেকে মেসিনের সামনে বসেছি আর এই উঠলাম; একসঙ্গে 176 পৃষ্ঠা। দু'দিন আগে দিলে এই হয়রানি হত না।

ভূষণ হেসে উঠল তুমি সত্যিই একটা আস্ত পেত্নী। লিখতে আমার চার দিন চার রাত লেগেছে, তা জানো? এখন একটার সময় এই রিপোর্টটা পি. বি.-কে দিতে হবে।

মনোরমা এই মেয়েটিকে দেখছিল; উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, চেহারায় একটা ক্লান্তির চিহ্ন। বড়ো বড়ো চোখে অনিদ্রার লাল রেখা। মাথায় কোঁকড়ানো চুল অবিন্যস্ত। কাপড়ের আঁচল খসে পড়েছে ভ্রূক্ষেপ নেই, খেয়ালও নেই। মেয়েটি মনোরমার দিকে তাকিয়ে দেখে নি।

ভূষণ পরিচয় করিয়ে দিল— আলাপ করিয়ে দিই, এই হল লাহোরের কমরেড মনোরমা আর এ মাদ্রাজের সাগরপারের মাছ, পারো।

পারো মুষ্টিবদ্ধ হাতে মনোরমাকে স্বাগত জানিয়ে হেসে ফেলল। মনোরমাও লাল সেলাম জানিয়ে প্রতিনমস্কার জানাল।

ভূষণ হেসে বলল— দেখলে পারো আমাদের পাঞ্জাবের মেয়েরা কত সুন্দর!

- হুঁ। পারো মনোরমার দিকে একবার তাকিয়ে ভূষণকে জিজ্ঞেস করল - পনেরো ঘণ্টা সমানে টাইপ করতে পারবে?

—মাত্র পনেরো ঘণ্টা? এ তো ত্রিশ ঘণ্টা সমানে টাইপ করতে পারে। ভূষণ হার মানার পাত্র নয়।

—আমি বাহাত্তর ঘণ্টা পারি। আচ্ছা কমরেড। মনোরমার দিকে মিষ্টি হেসে পারো বলল - আপনি অনেক দূর থেকে এসেছেন। নিজের

দেশের বন্ধুর সঙ্গে কথাবার্তা বলুন। বলেই পারো চলে গেল।

ভূষণ মনোরমাকে বারান্দায় নিয়ে এসে দেখাল— এটা 'পিপলস্ ওয়ারের' ঘর। ওটা মারাঠী পত্রিকা 'লোক-যুদ্ধ', 'কৌমি জংগ' ; গুজরাটী 'লোক-যুদ্ধের' ঘর নিচের তলায়। অরগানিজেশনের দপ্তর উপরে। আমাদের রিসার্চ ব্যুরো-ও উপরে। এটা ফোটো ডিপার্টমেন্ট। ওটা সেক্রেটারির ঘর। ওখানে অন্য কমরেডদের ঘর, সেই সব কমরেড-দের যাঁদের সব সময় হাজির থাকা জরুরি। যাঁরা বিবাহিত এবং যাঁদের স্ত্রীরাও কাজ করেন— তাঁদের এক-একটি ঘর দেওয়া হয়েছে। বাকী লোকেরা একসঙ্গে থাকে। অনেকেই কাছাকাছি 'রেড-ফ্ল্যাগ' হলে থাকে। কয়েকজন সহকর্মী অন্ধেরী-তে থাকে ; কেউ বা তাদের বন্ধুদের সঙ্গে একটা ব্যবস্থা করে নিয়েছে।

ডাক শোনা গেল— কমরেড ভূষণ, আপনাকে কমরেড বি.টি. ডাকছেন।

ভূষণ ক্ষমা প্রার্থনা করল — একটু বোসো, আমি এক্ষুনি আসছি। আজ পি. বি-র মিটিং-এ এই রিপোর্টটা পেশ করা হবে। সেইজন্যই হয়তো ডেকে পাঠিয়েছেন। আমি এটা দিয়ে আসছি। তুমি এই কাগজটা পড়তে থাকো। আমি এক্ষুনি আসছি।

রেডিয়োর কাছে যে লোকটি এতক্ষণ বসেছিল সে কাগজপত্র হাতে করে উঠে দাঁড়াল। ভূষণ তাকে জিজ্ঞেস করল— কোনো খাস্ খবর আছে নাকি ?

—এই আর-কি। বিশেষ কিছু নেই।

মনোরমা কাগজটাকে উলটে-পালটে দেখল। পার্টির অফিসের পরিবেশ ওর কাছে সজীব লাগছে, এখানে এসে মনটা কেমন যেন একটা তৃপ্তিতে ভরে গেছে। লোকেরাও যেন তৃপ্তিতে ভরপুর। টেবিলে টেবিল-ক্লথ পাতা হয় নি, তবুও কর্মীরা নিজের খুশিতে কাজ করেছে ;

কাজ করায় সবার যেন উৎসাহের সীমা নেই। দশ মিনিট হয়েছে ভূষণ গেছে। আবার ঘড়ি দেখল,পনেরো মিনিট। হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসতে চাইছে ; সে নিঃশ্বাস চেপে ভাবতে লাগল, লাহোরের অফিসে কাজ করতে করতে যদি এখানে চলে আসতে পারত! এখানে লোকেরা কত খুশি। পারো-র কত বেশি উৎসাহ, কতটা ও আত্মনির্ভরশীল। অন্য ঘরেও মেয়েদের কাজ করতে দেখছে। একবার ভাবল··· ভূষণ যদি একবার ওকে সাহায্য করত! ··· কিন্তু এ কথা কখনও কি মনোরমা মুখ ফুটে বলতে পারত?

মনোরমা আবার ঘড়ি দেখল, বিশ মিনিট পেরিয়ে গেছে। ভাবল, এদের হাতে সময় কোথায়, আমি বরং চলি।··· এলে বলে যেতাম।··· এখানে এসে কিছু কাজ করলে হয়···। সন্ধ্যাবেলা না-হয় ফিরে যাব।··· ওরা কী ভাববে কে জানে, আমরা দু'জনে যেন আলাদা দুই জগতে বাস করছি।

সন্ধ্যাবেলা সুতলীওয়ালার সঙ্গে ক্লাব, পার্টি, হোটেল, মদ-ব্রিজ, রেসের কথাবার্তা, ঝলসানো শাড়ি আর ঘন মেক-আপ। এখানে সারাদিন কাজ করলে ওরকম একটি সন্ধ্যাকে কেমন লাগবে, কী করে দু'টি মনের মিল হবে? সুতলীওয়ালা নিশ্চয় আপত্তি জানাবে কিন্তু ওর আর আমার কি কখনও মিল হবে?···· 'মিল' হবে কিনা সে কথা ভেবে মনটা ঘৃণায় ভরে উঠল।

ভূষণ চল্লিশ মিনিট পরে এসে বেশ কয়েকবার ক্ষমা প্রার্থনা করল— সারা ভারতে যত ইউনিট আছে এটা তার রিপোর্ট···।

ভূষণ নিজের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল – বারোটা পঁয়তাল্লিশ। তুমি কোথায় খাবে? এসো, আমাদের সঙ্গে খাবে চলো। আমাদের কম্যুনে যত কম খরচে যত ভালো খাবার পাওয়া যায় এমন আর বোম্বাই-এর কোথাও পাবে না। তুমি খেয়ে দেখো, পাঞ্জাবী খাবারের

চেয়ে একটু আলাদা হলেও তোমার ভালো লাগবে। দাঁড়াও, আমি 'ভাই'-কে বলে দি, নয়তো আমাকে ডাঁটবে। এক মিনিট।

ভূষণ আবার চলে গেল। মনোরমা আবার মার্ক্সের দাড়ির দিকে তাকিয়ে নিজের কথা ভাবতে লাগল। ভূষণ ফিরে এসে বলল— আর দশ মিনিটের মধ্যে ঘন্টা পড়বে। উৎসাহে অধীর হয়ে উঠল – যদি কমরেড যোশী খেতে বাইরে আসেন তবে তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব। কিন্তু নিজের ঘর থেকেই বেরুবেন কিনা সন্দেহ। ওঁর ঘরেই খাবার দিয়ে আসা হয়। বাকী সবাই ডাইনিং টেবিলে আসেন।

ঘন্টা পড়ল। ভূষণ মনোরমাকে ডাইনিং হলে নিয়ে গেল। বেশ বড়ো ঘর। লাল রঙের ফরাশের ওপর শণের সূতোর কাপড় বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। একদিকে অ্যালুমিনিয়ামের থালা, বাটি, মগ আর গ্লাস বাজারের দোকানের মতো সাজিয়ে রাখা হয়েছে। সবাই হাতে করে একটি থালা, বাটি আর গ্লাস বা মগ নিয়ে যে-যার বসে যাচ্ছে। নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা, হাসি-ঠাট্টা চলছে, যেন কলেজের ছাত্ররা অর্ধেক দিনের ছুটি পেয়ে নিশ্চিন্ত হাসি-গল্পে মশগুল। বসার জায়গা সব ভরে গেছে। এখনো বহু লোক দাঁড়িয়ে। 'ভাই' মধ্যবয়সী মহিলা) তদারকির দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে রইলেন। দেখেশুনে বললেন -- বাকীরা পরের বারে বসবে। ত্রিশ-চল্লিশ জন যুবকের মধ্যে ছয়-সাত জন তরুণীও ছিল কিন্তু এতে কারুর মনে কোনো সংকোচ দেখা গেল না।

ভূষণ ও মনোরমা যোশীর জন্য অপেক্ষা করছিল, তাই বসবার জায়গা পায় নি। পারো তাড়াতাড়ি এসেছিল। ভূষণকে দেখতে পেয়ে বলল— সাথী, আমার খুব ক্ষিদে পেয়েছে। ভূষণ হেসে বলল— ইউ মিস্‌ড দি বাস। ভেতরে গেলে এখন 'ভাই' মারবে।

পারো ঘরের মধ্যে মুখ বাড়িয়ে দেখে নিয়ে মুখের একটা অদ্ভুত ভঙ্গি করে বলল – তোমার যেন খুব জায়গা জুটেছে!

—তবে একই সঙ্গে খাব।

—তোমার সঙ্গে তো কখনোই নয়, যদি দশবার আমাকে পিছিয়ে পড়তে হয়, তবুও।

—আমারও তাড়াতাড়ি নেই, দেখা যাবে। ভূষণ হেসে বলল।

—দেখে নিয়ো। পারোর স্বরে পরিহাসের সুর।

ঠাট্টা-তামাসা ও পরিহাসের পরিবেশে মনোরমার বিমর্ষ হৃদয় খুশিতে ঝলমল করে উঠল।

পারো মনোরমাকে সম্বোধন করে ভূষণের গুণকীর্তন করে গেল—কমরেড, এই মানুষটা খুব জ্বালাতে ভালোবাসে। এক তো হস্তাক্ষর এত জঘন্য যে সে-কথা বলার নয়; তারপর কংগ্রেস, কমিটি, কোম্পানী—সব ব্যাপারেই ক' লিখে খালাস। অর্থ নিয়ে ভাবব, কি টাইপ করব! রিপোর্ট তো লেখে না, লেখে মহাভারত। একটা ভুল হয়ে যায় তো গোটা পাতাটা আবার টাইপ করতে হবে। যোশীর বলা আর এর লেখা - তুটোই সমান। এরা তো ইশারাতেই সারে। আরে. যোশী এ দিকেই আসছেন।

ভূষণ ও মনোরমা ঘুরে দেখল। ছোটোখাটো মানুষ, খদ্দরের ঢিলে-ঢালা খাকি রঙের হাফ প্যাণ্ট, জামা। চোখে মোটা কাঁচের চশমার ফাঁকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। তুদিন দাড়ি কামানো হয়ে ওঠে নি। মনোরমার মনটা আনমনা থাকা সত্ত্বেও এই মানুষটির সঙ্গে দেখা করতে কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল — যে মানুষটি সারা দেশের পার্টির কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছেন।

ভূষণকে দেখে যোশী কী যেন বললেন, মনোরমা তা বুঝতে পারল না।

ভূষণ বলল— আমি সব কিছু ঠিক করে দিয়েছি।

ভূষণ মনোরমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল - এই যে কমরেড

মনোরমা। আমাদের লাহোরের পত্রিকায় বেশ কিছুদিন কাজ করেছে।

—এখন কাজ করে না কেন? যোশী মুচকি হেসে প্রশ্ন করলেন।

মনোরমার মুখে উত্তর জোগাল না। চুপ করে রইল। যোশী জানতে চাইলেন – বোম্বাইতে কবে এসেছেন।

মনোরমা বলল— প্রায় এক মাস।

—এখানে কী করেন? যোশী আবার প্রশ্ন করলেন।

—স্বামীর সঙ্গে এসেছি। মনোরমা দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে মুচকি হাসি ছড়াল।

—কী? ভূষণের চোখে বিস্ময় ঝিলিক দিয়ে উঠল— কবে?

—এক মাস হয়েছে। মনোরমা যোশীর দিকে তাকিয়ে বলল।

—তোমাকে দেখে নতুন বউ তো মোটেই মনে হয় না! যোশী বড়ো ভাইয়ের মতো মনোরমার পিঠে হাত রেখে সস্নেহে বললেন।

ভূষণ অভিযোগ না করে পারল না— তুমি আমাকে খবর পর্যন্ত দাও নি।

মনোরমা মুচকি হেসে উত্তর দিতে চাইল কিন্তু পারল না।

যোশী আবার হেসে বললেন— তুমি হয়তো জানো না, পার্টি মেম্বরদের বিয়ের ব্যাপারে আমাদের মতামত দেবার অধিকার থাকে।

ভূষণ মনোরমার পক্ষ নিয়ে বলল – ও ঠিক পার্টি মেম্বর ছিল না, তবে পার্টি মেম্বরের মতোই ছিল।

—ওহ্। যোশী ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বললেন— তা আপনি বোম্বাই-এ আমাদের সঙ্গে কাজ করবেন নিশ্চয়। সময়ে মেম্বরও হয়ে যাবেন। কার সঙ্গে আপনার বিয়ে হয়েছে?

—এইচ বি. সুতলীওয়ালা।

—পার্সি জেন্টলম্যান, কোন্ সুতলীওয়ালা? যোশী কৌতূহলী দৃষ্টিতে ভূষণের দিকে তাকালেন।

ভূষণ মাথা নাড়ল— আমি জানি না।

খাবার সময় যোশী মনোরমাকে নিজের কাছে বসালেন এবং লাহোরের ব্যাপারে, লাহোরের সঙ্গীদের সম্পর্কে মনোরমার ব্যক্তিগত মতামত জিজ্ঞেস করলেন, নানা কথা জানতে চাইলেন। মনোরমার পরিবারের বিষয়ে প্রশ্ন করলেন। নিজের ঘরের কথা ছাড়া অন্য জগতের কথা বলতে ওর কোনো আপত্তি ছিল না। যোশী যখন মনোরমার ঘরের কথা নির্বিবাদে জিজ্ঞেস করছিলেন, তখন মনোরমা খেতে পারছিল না, হাত বারবার থেমে যাচ্ছিল।

তা দেখে যোশী বললেন— তুমি পাঞ্জাবী, না! তবে তো তোমার এ খানা নিশ্চয় ভালো লাগছে না।

মনোরমা বারণ করা সত্ত্বেও ওর সামনে রাখা বাটিতে দই দেওয়া হল। খেতে বেশ লাগছিল কিন্তু খেতে পারছিল না। না খাওয়াও সমীচীন নয়। কোনোমতে গিলে উঠল।

যোশী নিজের এঁটো বাসন হাতে উঠিয়ে বললেন— নিজেদের বাসন আমরা নিজেরাই ধুই। কিন্তু অতিথির বেলায় এ নিয়ম খাটে না। দাও, তোমার বাসন আমি ধুয়ে আনি।

মনোরমা লজ্জা পেয়ে প্রবল আপত্তি জানাল না, না— কখনো নয়।

ভূষণ ওর হাত থেকে বাসন নিয়ে নেবার চেষ্টা করল। মনোরমা সসংকোচে বাসন নিজের পেছনের দিকে লুকিয়ে রেখেছিল। পারো তা পেছন থেকে ছিনিয়ে নিল। অনেক অনুরোধ-উপরোধেও পারো তার বাসন ফিরিয়ে দিল না, বলল— একদিন তোমার ঘরে নিমন্ত্রণ খেতে যাব, সেদিন কাজ কোরো।

খাওয়াদাওয়ার পরে ভূষণ, মনোরমাকে আবার কমনরুমে নিয়ে এল। ওখানে একটা ঘর, এখানে বসালে অন্য কারুর কাজে বিঘ্ন হবার আশঙ্কা নেই।

ভূষণ হেসে বলল— পি. বি.-র কাছে আমাকে রিপোর্ট পেশ করতে হবে। ঘণ্টা দুয়েক লাগবে।

মনোরমা সহাস্যে বলল— তবে আমি চলি।

—কোনো জরুরি কাজ আছে নাকি ?

মনোরমার কণ্ঠস্বর কেমন যেন উদাস শোনাল— বিশেষ কোনো কাজ নেই।

ভূষণ অনুরোধ করল – যদি অপেক্ষা করতে পার তবে আমি তোমাকে ছেড়ে আসতে পারি। আজ আমার তিন-চার ঘণ্টার অবসর আছে। শোনো, বিয়ে হল, মিষ্টি খাওয়াবে না ?

মনোরমার হৃদয়ের গভীর থেকে একটা কথা বেরিয়ে এল, মৃত্যু হলেও মানুষ মিষ্টি খাওয়ায়। কিন্তু কথাটা মুখ ফুটে বলতে পারল না। ভূষণ তখন পরম উৎসাহে বলে যাচ্ছে— তুমি আমাদের লাইব্রেরি এখনো দেখ নি। ওখানে যদি বইয়ের রাজ্যে ডুবে যাও, দু'ঘণ্টা কোথা দিয়ে চলে যাবে তা বুঝতেও পারবে না। তুমি বরঞ্চ ওখানেই বোসো, পরে তোমার সঙ্গে যাব।

ভূষণ, লাইব্রেরির অধ্যক্ষ মিসেস আপ্‌তের সঙ্গে মনোরমার পরিচয় করিয়ে দিল। মিসেস আপ্‌তে জানতে চাইলেন— আপনি কি বইয়ের তালিকা দেখতে চান না কোনো বিশেষ বই পড়বেন ভাবছেন। বলুন, আমি বার করে দিই।

মনোরমা বইয়ের বিরাট রেজিস্টারের পাতা ওলটাতে লাগল কিন্তু ভাবছিল নিজের জীবনের কথা। বিয়ে হয়েছে, তার মিষ্টি চাই বই-কি ! মরণের তো জলসা বসেছে কিনা। মরেও যে বেঁচে থাকে তার এর চেয়ে আর বেশি কী হবে ? এখানে বসে আছি অথচ আমি যে সুতলীওয়ালার স্ত্রী ; এ সম্পর্কের মধ্যে যেটুকু বিজ্ঞান বা সমাজবাদ আছে তার পিঞ্জরে আমি নিজেকে বেঁধে ফেলেছি। নিজেকে আমি সামান্য মনে করব

কী কারণে? স্ত্রী হয়েছি সোজা কথা নাকি? ওর মন ঘৃণায় ভরে উঠল।

মনোরমা গভীর চিন্তায় ডুবে গেল। ভূষণ যে-আত্মীয়তার সঙ্গে আজ ওর সঙ্গে কথা বলছে, আলাপ করছে, তাতে মনে পড়ে যায় কলেজ জীবনের কথা। কী করে ছিন্ন হয়ে গেল সে মধুর সম্পর্ক?... আমারই ভাগ্য,... নয়তো আমি আজ এখানে থাকতাম। আজ পারো ওর বন্ধু। পারো-র উপরে ওর যত বলভরসা, কিন্তু সে বলভরসা আমার উপর কোথায় ছিল? একগাদা বাজে কথা বলে গেল— আমাদের পাঞ্জাবের মেয়েরা কী সুন্দর দেখ পারো... হুঁ, তোমার কাছে তো পারো-ই সুন্দরী। ও তো তবুও কিছু করছে কিন্তু আমি কি কিছুই করতে পারতাম না? আমাকে খুশি করতে বেমালুম বলে গেল ভূষণ— আমি ত্রিশ ঘণ্টা কাজ করতে পারি। কিন্তু কাজ করার সুযোগ কি তুমি কখনো আমাকে দিয়েছ? দাও নি, কারণ আমি ধনী ঘরে জন্মেছি, তাই তুমি আমাকে চিরকাল শত্রু ভেবে এসেছ। যদি পনেরো হাজার টাকাই পেতাম, তাও তুমি তা দিয়ে পনেরো বছর কাটিয়ে দিতে পারতে কিন্তু এখন ওটুকু সঞ্চয় দিয়ে হুইস্কি, ক্লাব, রেস আর পেট্রোল বাজি লড়ে এক বছরও কাটবে না। ও টাকা একেবারে বরবাদ হয়ে গেল— যাক, সব যাক্। কুয়োর ভেতরে মুখ থুবড়ে পড়েছি, আর তা থেকে বেরোবার রাস্তা জানা নেই। হুঁ, বিয়ের মিষ্টি; এই বিয়ের অর্থ যদি জানতে, তবে—।

পুরো তিন ঘণ্টা কেটে গেছে। মনোরমা ভাবল, ভূষণের যদি এখন অবসর না থাকে, তবে না-হয় চলি। বড়ো ক্লান্ত লাগছে। কাঠের একটা বেঞ্চি, গদিফদি নেই, বসে বসে হাঁপিয়ে উঠল মনোরমা। পত্র-পত্রিকা দেখতেও মন লাগছে না। ভাবছিল, মিসেস আপ্‌তে-কে বলে চলে যায় কিন্তু মিসেস আপ্‌তে গোল-গোল কাঁচের চশমার ফাঁকের দৃষ্টি

সেই যে রেজেষ্ট্রি পাতায় নিবদ্ধ রেখেছেন, কোনো দিকে তাকাবার তার যেন ফুরসৎ নেই। আরো এক ঘণ্টা এভাবে কেটে গেল। লোকেরা হাসছে, কথা বলছে, সে হাসির, সে-কথার টুকরো টুকরো শব্দ ভেসে আসছে। মিসেস আপ্‌তে কিছু না বলে টুক করে চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে কে যেন বলল আপনি কি কমরেড মনোরমা?

মনোরমা ঘাড় ফিরিয়ে বলল— জী।

মোটাসোটা একজন লোক পাঞ্জাবিতে বলল— আপনার জন্য চা এনেছি। বলে অ্যালুমিনিয়মের একটি মগ মনোরমার সামনে রেখে দিল। একটু পরে সে অভয় দিল— ভূষণের আর অল্প একটু দেরি হবে— ব্যস, আর আধ ঘণ্টা। তারপর গল্প জুড়ে দিল লোকটা। —লাহোরে আপনাদের বাড়ি কোন্ জায়গায় ছিল? আমিও লাহোরে অনেকবার গেছি। ওখানে আমাদের কাগজে আপনি কাজ করতেন? বোম্বাই-তে কোনো পাঞ্জাবীর দেখা পেলে মনটা তার খুশিতে ভরে ওঠে। দেখুন এখানকার জল একেবারে বাজে। খাওয়াই-বা কি পাওয়া যায় শুনি! দুধের সের বারো আনা, আর দুধ মানে তো জল। ভূষণও প্রায়ই অসুস্থ থাকে। দেখছেন না, এখানকার লোকগুলো কী রকম খুদে খুদে, তবে হ্যাঁ, এদের মাথা খুব পরিষ্কার, খুব বুদ্ধি।

পাঞ্জাবী সঙ্গী খুশিতে উচ্ছল হয়ে এক নিঃশ্বাসে চোখে-মুখে কথা বলে যেতে লাগল। মাতৃভাষায় কথা বলতে যা সুখ। একটু থেমে বলল— আচ্ছা এখন চলি, পরে আবার নিশ্চয় দেখা হবে। আমি এখানকার উর্দু এডিশনে কাজ করি।

ভূষণ আর আধ ঘণ্টার মধ্যে এসে পড়ল। অনুনয়ের স্বরে বলল— কী আর বলব, দেরি হয়ে গেল। রিপোর্টে কিছু লেখা বাকি ছিল আসলে বি. টি.-কে তুমি তো জানো, মজদুর আন্দোলনের কুষ্ঠি একেবারে নখদর্পণে। আচ্ছা, এখন চলো। এখান থেকে বাসে মেরিন ড্রাইভ

চলো, সেখান থেকে বেড়াতে বেড়াতে মালাবার হিলে চলে যাব'খন। তুমি তো খুব হাঁটতে পারো। ধর্মশালায় খুব হাঁটতে। ভূষণের হাসি-ভরা মুখে অতীত-মুখর। মনোরমা তা বুঝতে পেরে নীরব রইল।

বাসে ভীষণ ভিড় ; ভূষণের পাশে বসল মনোরমা। রাস্তাটা চেনা। সুতলীওয়ালার সঙ্গে গাড়িতে বেশ কয়েকবার এই রাস্তা পেরিয়েছে। ভূষণ বারবার জিজ্ঞেস করতে লাগল— আচ্ছা বলো তো, তারপর কী ভাবে সব হ'ল। সব কথা খুলে বলো। ব্যারিস্টারের কী খবর ? হ্যাঁ, ভালো কথা, সোমা কেমন আছে ? ধনসিং কি ফিরে এসেছে ?

মনোরমা শুধু শেষ কথাটার উত্তর দিল – ধনসিং ফিরে আসে নি। আরো কয়েকটি কথা বলে ফেলল মনোরমা কিন্তু বাসের ঘড়ঘড়ানিতে তা শোনা গেল না।

ভূষণ ভাবল বাসে চড়তে মনোরমার নিশ্চয় কষ্ট হচ্ছে, তাই বলল – বাসে যাবার অভ্যাস নিশ্চয় তোমার নেই ; এখানে থাকলে অভ্যাস হয়ে যাবে।

পায়ে হেঁটে চলার সময় সোমাকে কেন্দ্র করে পরিবারে যে-ঝড় উঠেছিল, তা সংক্ষেপে মনোরমা বলল। সহানুভূতিতে শুধু একটু মুচকি হাসল ভূষণ, বলল— ঐ মহিলার জীবন সত্যিই একটা সমস্যার মতো দাঁড়িয়েছে। কী ভেবে যেন গম্ভীর হল— আমাদের সামাজিক সমস্যার এটা একটা মস্ত বড়ো উদাহরণ। হয়তো বরকত ওকে নিয়ে গেছে কিন্তু বরকত ওকে নিয়ে কী করবে ? বরকতের পক্ষে ও বিরাট বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। একবার উঁচু মহলের স্বাদ পেয়ে নিচু মহলের সঙ্গে খাপ খাওয়াবে কী ভাবে ? হয়তো অন্য পথে ওর স্খলন হবে কিন্তু আগের নিরলস সুন্দর জীবনে আর ফিরে আসতে পারবে না। হয়তো এই বোম্বাই শহরে এসে থাকবে। পলাতকের পক্ষে দুটিই তো নিরাপদ স্থান, এক বোম্বাই, না-হয় কলকাতা।

একটু ভেবে ভূষণ মন্তব্য করল— ঘরের ঐ অবস্থায় তোমার পক্ষে আর থাকা সম্ভব হল না, এই তো!

—হ্যাঁ।

—এই অবস্থায় তুমি বিয়ে করে নিলে, নয়?

মনোরমা চুপ করে রইল।

—মিঃ সুতলীওয়ালার সঙ্গে পরিচয় কোথায় হয়েছিল?…লাহোরে থাকত নাকি?…

মনোরমা মাথা নেড়ে সায় দিল।

—খুব ভালো লোক নিশ্চয় তুমি খুব সুখী, না?

মনোরমা মাথা নীচু করল মুখ দিয়ে কোনো কথা সরল না।

—তুমি অকারণে আমার কাছে সংকোচ করছ। এতে লজ্জার কী আছে?

মনোরমা মাথা হেঁট করে রয়েছে, কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না। ভূষণ লাহোরের অন্য লোকদের হালচাল জিজ্ঞেস করতে লাগল আর তখন মনোরমা সহজ হয়ে উত্তর দিয়ে গেল।

ভূষণ মনোরমার মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবল হয়তো ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তাই বলল— খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছ না, তবে আমি চলি।

মনোরমা মাথা নেড়ে আপত্তি জানাল— না।

দুজনে হেঁটে তিন-বাত্তী পৌঁছে গেল। মনোরমা 'উপর বাগে' যেতে চাইল। 'হ্যাঙ্গিং গার্ডেনে' গিয়ে দু'জনে একটি বেঞ্চে বসল। সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। নীল সমুদ্রের বুকে সূর্যাস্তের মোলায়েম আভা, দূরে পশ্চিমের আকাশে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে লাল রঙের বড়ো বড়ো রেখা। পিছন দিকে পাহাড়ের নীচে বোম্বাই শহরটাকে দেখাচ্ছে ঠিক যেন রঙ-বেরঙের খেলনার বড়ো একটা দোকান। 'হ্যাঙ্গিং গার্ডেন' তখন নির্জন হয়ে আসছে।

ভূষণ জানতে চাইল— তুমি তোমার বিয়ে আর স্বামীর কথা কিছুই আমাকে বললে না।··· কী করে তোমার দিন কাটছে?

মনোরমার ছু'চোখ বেয়ে জল ঝরে পড়ল, কোনোমতে আঁচলটা মুখে টেনে নিল।

ভূষণ স্তম্ভিত হয়ে গেল— আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে মন্নো। ইংরেজীতে বলল— থাক্ এ-সব কথা, আমি আর কোনো কথা জিজ্ঞেস করব না।

মনোরমা এবার আর নিজেকে সংযত রাখতে পারল না; চোখ ঝেঁপে যেন ঝড় নেমে এল। ভূষণ তিন বছর পরে আবার মন্নো বলে ডাকল; এতদিন ডাকছিল মিস সরোলা বা মনোরমাজী বলে। মনোরমার এ ডাক শুনে মনে হচ্ছিল ওকে কে যেন গালি দিচ্ছে।

মনোরমা চোখ মুছে নিয়েছে; রুমালটা প্রায় ভিজে গেছে। এক ফাঁকে রুমালটা লুকিয়ে ফেলল। ফেরার পথে অনেক দ্বিধা ও সংকোচের সঙ্গে জানতে চাইল - তোমার এ-সব শুনে খুব খারাপ লাগল, না?

—কেন?

মনোরমা একটু হেসে বলল— কান্না কিছুতেই আমি চাপতে পারছিলাম না।

—আমার ভুল হয়েছে। চলো, তোমাকে ঘরে পৌঁছে দিই। আমাকেও তো ফিরতে হবে।

ভূষণকে একটু ক্ষেপিয়ে তুলতেই বলল— বুঝেছি, পারো তোমার জন্য নিশ্চয় অপেক্ষা করছে।

—ঐ ধড়িবাজটা নিশ্চয় এখন ওর প্রিয়তম ভেঙ্কটের কাছে চিঠি লিখতে বসেছে। ছু'ছুবার ওদের বিয়ের তারিখ ঠিক হয়ে গেল অথচ ঐ ভেঙ্কটের নাকি ছুটি মেলে না। ও ট্রাভানকোরে আটকে পড়েছে।

মনোরমা বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকাল— সে কী? কম্যুনিস্টরাও বিয়ে

করে নাকি ?

—কেন ? যেন সাফাই গাইছে এমন ভঙ্গীতে বলল— কম্যুনিস্টরা কি মানুষ নয় নাকি ?

মনোরমা কথা ঘোরাল— আচ্ছা, এই নতুন পার্টি লাইনের অর্থ কী ?

ভূষণ না হেসে পারল না – বা রে, খুব তো মজা করছিলে। আসল কথা কি জান, কংগ্রেসী স্বাধীনতা আন্দোলনের মতো এ সংঘর্ষ তো নয় ; এক বা দুই বছরের কার্যক্রমও নয় যে স্বাধীনতা-লাভের পরেই বিয়ে করা চলে, আর তার জন্যেই প্রতীক্ষা ; বা কম্যুনিস্টদের কাছে বিপ্লব জিনিসটা এও নয় যে স্বরাজ না হওয়া পর্যন্ত নুন স্পর্শ করব না, বা জুতো পরা চলবে না। যতদূর সম্ভব সংঘর্ষ ও বিপ্লব সারা জীবনের তপস্যা ; জীবনকে স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যকর করে তোলা কি কম জরুরি।

—এ কথা কবে থেকে বুঝতে শিখলে ? মনোরমার গলার স্বর তীক্ষ্ণ শোনাল।

—সব-কিছু বুঝে-শুনে নিলেই কি সুবিধে ওঠানো যায় ? পূর্ণ জ্ঞান তো ঈশ্বর— আর কম্যুনিস্টদের সঙ্গে ঈশ্বরের ঠিক পরিচয় হয়ে ওঠে না। নির্বিকার ভঙ্গীতে ভূষণ পরিহাস করল।

ওরা তিনবাত্তী ছাড়িয়ে নেপিয়র রোডে গিয়ে পড়ল। নেপিয়র রোড ছাড়িয়ে চলল রমীনতুল্লা স্ট্রীট। মনোরমা ভাবতে চেষ্টা করল সুতলীওয়ালা এসে গেছে কিনা। হয়তো খাবার জন্য অপেক্ষা করে করে অধীর হয়ে এখন হুইস্কি খেতে শুরু করেছে। ভূষণের সঙ্গে কীভাবে পরিচয় করাবে সে কথাই ভাবছিল মনোরমা।

বেয়ারা বারান্দায় চেয়ার পেতে দিয়েছে। মনোরমা জিজ্ঞেস করল —সাহেব ফেরে নি ? বেয়ারা মাথা নাড়ল। শুনে মনোরমা একটু স্বস্তি পেয়েছে।

ভূষণ বারান্দায় চেয়ারে বসে বলল— খুব সুন্দর জায়গা। কী অপরূপ দৃশ্য ! খুব হাঁটলে আজ। নিশ্চয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছ।

—কই না তো। খাবার আনাচ্ছি, খেয়ে নাও।

—খেয়ে নেব ? কম্যুনে ভাইকে খবর দিই নি খুব বকাবকি করবে যে। ঠিক আছে, না-হয় বকাই একটু খাব। ও তো কথায় কথায় বকাঝকা করে। ভূষণ হেসে উঠল।

মনোরমা বেয়ারাকে ডেকে বলল— খানা লাগাও। সাহেবও খাবে

বেয়ারা আস্তে করে জিজ্ঞেস করল— ড্রিংক্স দেব ? মনোরমা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ভূষণের দিকে তাকাল।

—না, না। ও সব আমার চাই না। তুমি খাবে তো খাও।

মনোরমা হেসে বলল— পাগল, ও অবশ্য খায়। খাওয়াদাওয়া সেরে মনোরমা বলল— তোমাকে পৌঁছে দিই, কেমন ?

—সে কী, ভূষণ বিস্ময় প্রকাশ করল— এত দূর ?

—তা এখানেই বা কী করব। ব'লে বেয়ারাকে ডাকল— একটা ট্যাক্সি ডাকো।

মনোরমা ভূষণকে স্যাণ্ডহার্স্ট রোডে পৌঁছে দিয়ে সেই ট্যাক্সিতেই ফিরে এল। দশটা বাজে। সুতলীওয়ালা এখনো ফেরে নি। মনোরমা কাপড় পালটে শুয়ে পড়ল। এতটা পথ হেঁটেছে, মন খুলে এত কথা বলেছে, তাই ক্লান্ত; মনটাও হালকা লাগছে। ঘুমিয়ে পড়েছিল। কারুর চলার শব্দে জেগে গেল।

সুতলীওয়ালা শিস দিয়ে কী একটা গান ভাঁজছে। মনোরমা চোখ বুঁজে শুয়ে রইল। বুঝতে পারছে সুতলীওয়ালা কাপড় বদলাচ্ছে, এখন শুয়ে পড়ল। বাইরের ঘড়িতে ঢন ঢন করে দুটো বাজল।

পরের দিন সকালে মনোরমা স্নানটান সেরে নিয়েছে। সুতলীওয়ালা

তখনও গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। এক কাপ চা খেতে মনোরমার মন চাইছে। কিন্তু ভাবল, একসঙ্গেই যখন থাকতে হবে তখন একে অন্যকে দেখে হাহুতাশ করে কী লাভ বা বিপরীতমুখে ছোটারও কী অর্থ? শত শত লোকে এই করে; অধিকাংশ লোক হাহুতাশ ও ঝগড়াঝাঁটি করে জীবন কাটিয়ে দেয়। আমারও এভাবেই চলবে। চায়ের জন্য ও স্বামীর অপেক্ষায় রইল।

সুতলীওয়ালা স্নান সেরে বাইরে বেরুতেই মনোরমা জিজ্ঞেস করল —জলখাবার খেয়ে বাইরে যাবে তো?

—হ্যাঁ, বেশ।

সুতলীওয়ালা ও মনোরমা ইংরেজীতেই কথা বলে। জলখাবার খেতে খেতে সুতলীওয়ালা বলল— আমি খুবই দুঃখিত, আমার একেবারে খেয়াল ছিল না যে, তোমার খরচখরচার জন্য টাকাপয়সা দরকার পড়তে পারে। ঘরের জিনিসপত্র আনতে হয়, আসতে-যেতে ট্যাক্সি ভাড়া লাগে। চাও তো আমার গাড়িটা রেখে নিয়ো। আমি তো নিজেই গাড়ি চালাই। না-হয় একজন ড্রাইভার রেখে নাও।

—কী দরকার? আমার কোথায় বা যেতে হয়! ট্যাক্সি সব সময় পাওয়া যায়। মনোরমা জবাব দিল।

সুতলীওয়ালা মানি ব্যাগ থেকে দেড়শো টাকা বার করে বলল— এটা রাখো।

মনোরমা আপত্তি জানাল— এখন আমার কাছে টাকা আছে।

—তবুও হাতে কিছু থাকা ভালো। সুতলীওয়ালা অর্ধেক টাকা মনোরমার কাছে রেখে দিয়ে বলল— আমি একটা ভয়ানক সংঘর্ষের মধ্যে পড়ে গেছি, একে বলে পুঁজিবাদীদের সংঘর্ষ। সিনেমা জগতের এই যারা বড়ো বড়ো ঠিকাদার, এরা উঠতি লোকদের হাত দিয়ে পা দিয়ে একেবারে পিষে মারতে চাইছে। আমার আগের ফিল্ম 'রেইন

বসেরা'র বাজারটাকে খারাপ করার জন্য এরা কম চেষ্টা করে নি। এরা চায় আমি এদের তৈরি ফিল্মের এজেন্ট হয়ে থাকি। এদের জন্য মোটা টাকার লাভ উঠিয়ে দিই। কিন্তু কিসের জন্যে? আমার হাতে মোটা টাকা লাগাবার লোক আছে, গ্রাহক আছে, আর্টিস্টের অভাব নেই। আমি এক টাকায় এক আনা নেব কেন শুনি? আমি পরিশ্রম করে যখন খাই, কম করে হলেও আমি চার আনা নেব।

মনোরমা বলল — 'রেইন-বসেরা' ছবিটা আমি দেখি নি, কেমন হয়েছে?

সুতলীওয়ালা উৎসাহে যেন ফেটে পড়ল— খুব চলছে। বক্স হিট ফিল্ম, তুমি নিশ্চয় দেখো। বোম্বাই থেকে এখন তো চলে গেছে। এখানে তিনমাস চলেছিল। এতে মধুর একটা ঘরোয়া নাচ আছে। নবকলী, শেরজঙ্গ, নূরআহমদ ভাগ নিয়েছে। তিনটে নাচ আর নটি গান, খুব খারাপ নয়, কি বলো?

সায় দিয়ে মনোরমা বলল - আমাদের ফিল্মে আর্টের চেয়ে কুরুচির ভাগটাই বেশি।

মনোরমাকে বাধা দিয়ে সুতলীওয়ালা গম্ভীর চালে বলল - কিতাবী আর্টের দিকে খেয়াল রেখে ব্যবসা করা চলে না। এটা ব্যবসার একটা আর্ট।

মনোরমার আপত্তি ওর গলার স্বরে ফুটে উঠল -- আসল আর্টকে কি লোকেরা পছন্দ করে না?

—করতেও পারে আবার নাও পারে। আমি অন্যের পাঁচ লাখ টাকা নিয়ে কি বাজি লড়তে পারি? আমি তো চালু টাকা চালাব। অজানা মাল নিয়ে কে আর ঠিকাদারিতে নামতে চায়। দু-চারটে মারকাট গান, যা লোকেরা চায়, ভালোবাসে— তা নিয়েই নতুন সাজের মেলা। ব্যস।

মনোরমার বলার ইচ্ছে ছিল না, তবুও না বললে খারাপ দেখায়, তাই বলল— আমি কোনো রকমে সাহায্য করতে পারি ?

—নিশ্চয়, সময় এলে বলব। তোমার স্বভাব ও প্রকৃতি একটু আলাদা রকমের। তবুও তুমি নানা ভাবে আমাকে সাহায্য করতে পারবে। সময়মত বলব। তুমি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ আমি পূর্ণ সমতা, স্বাতন্ত্র্য ও পারস্পরিক বিশ্বাস ও সহায়তার পক্ষপাতী। কোনোরকম জবরদস্তিতে আমার আস্থা নেই। আজকে সন্ধ্যাবেলায় ক্লাবে যাবে ? যেতে রাজী থাকলে আমাকে ফোন করে দিয়ো।

সুতলীওয়ালা নিজের কাজে বেরিয়ে গেল। মনোরমা আবার উন্মনা হয়ে উঠল। কম্যুনের কথা মনে পড়ছে ; ওখানে কাজ করার সুযোগ থাকলে খুব পরিশ্রম করতে পারত। বারবার মনে হচ্ছে, ভূষণকে ফোন করলে কেমন হয়, জিজ্ঞেস করলে হয় কম্যুনে কোনো কাজ করার সুযোগ আছে কিনা। কিন্তু সংকোচে টেলিফোন করতে পারল না।

তিন দিন জোর করে চেপে রইল। চতুর্থ দিনে আর থাকতে পারল না, ভূষণকে ফোন করে বলল— আমি দেখা করতে চাই, আজ সন্ধ্যাবেলায় তোমার সময় হবে ?

—ছটার পরে অবসর পাব। ভূষণ উত্তর দিল — সাতটার সময় যেতে পারি।

মনোরমা বলল, ও ছটার সময় ফোন করবে। ভূষণ যদি তখন ফুরসৎ করতে পারে তবে ও একটা ট্যাক্সি নিয়ে ভূষণের পার্টি অফিসে গিয়ে ওকে তুলে নেবে।

মনোরমা যখন পার্টি দপ্তরে পৌঁছল তখন ভূষণ দরজায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। ট্যাক্সি ড্রাইভার বলল— কোন্ দিকে ?

ভূষণ মনোরমার মুখের দিকে অপেক্ষার দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

মনোরমা বলল— একটা জরুরি ব্যাপারে তোমার পরামর্শ নিতে চাই। এমন জায়গায় আমাকে নিয়ে চলো যেখানে নিরালায় হুটো কথা বলতে পারি।

—বালকেশ্বর। ভূষণ ড্রাইভারকে নির্দেশ দিল। বালকেশ্বর রাস্তায় এক ইরানী রেস্তোরাঁর সামনের মোড়ে ভূষণ ট্যাক্সি দাঁড় করাতে বলল। মালাবার হিলের দিকের রাস্তায় এগিয়ে যেতে যেতে বলল— এদিকে চলি, কেমন? কিছুটা এগিয়ে বড়ো বড়ো গাছের ঘন ছায়া; আরও একটু এগিয়ে দুজনে চামেলি ফুল গাছের নীচে একটি বেঞ্চিতে গিয়ে বসল।

মনোরমা যেন বলার জন্যই তৈরি ছিল— আমি কোনো একটা কাজ করতে চাই। কোনো কাগজে যদি কাজ পেয়ে যাই তবে তো খুব ভালো হয়; নয়তো অন্য কোনো কাজ।

ভূষণ একটু স্পষ্ট করে জানতে চাইল— তুমি পার্টির কাজ বলতে চাইছ তো?

—হ্যাঁ।

—একটু মুশকিল আছে জানো। পার্টির মেম্বর হতে হবে, আর তার অঞ্চল বা জেলা থেকে সুপারিশ করে যদি পাঠানো হয়, তবেই কম্যুনে স্থান পাওয়া সম্ভব, নইলে নয়।

—আমি থাকা-খাওয়ার কথা কিন্তু বলছি না।

—হ্যাঁ, আমিও বুঝতে পারছি; কাজ করার জন্যই এত কাঠখড় পোড়াতে হয়।

আঙুলে রুমাল জড়াতে জড়াতে অভিমানে ফেটে পড়ল মনোরমা— তোমাকে আমার জন্য কিচ্ছু করতে হবে না, যাও। আমার বিয়ের ব্যাপার তুমি জানতে চাইছিলে না? আমি গর্তে ডুবে যাচ্ছি ভেবে ভয় পেয়ে পালাতে চেয়েছিলাম আর পালাতে গিয়ে কুয়োতে পড়ে গিয়েছি।

—কেন, কী হয়েছে তোমার ?

—কী আর বলব ! এই মানুষটাকে আমি কতটুকুই-বা জানতাম। আমার দাদার বন্ধু। একবার আমাদের ওখানে উঠেছিল। পরে এক-বার মুসৌরিতে একই হোটেলে ছিলাম। আচার-ব্যবহারে খুবই চোস্ত, কথায় বার্তায় চৌকস। ভদ্রলোক দাদার কাছে চিঠি লিখে আমার সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব পাঠায়। ঠিক সেই সময়ে ঘরের ঐ পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে মনটা আমার এত বিক্ষিপ্ত ছিল যে, আমি চাইছিলাম যে করে হোক পালিয়ে যাই, পালাবার জন্য আমি উতলা হয়েছিলাম। আমার ফুটো কপাল, তাই আমি তার পাঠিয়ে জানিয়ে দিলাম, এ বিয়ের প্রস্তাবে আমি রাজি। নিজেই পনেরো দিনের মধ্যে সিভিল ম্যারেজের ব্যবস্থা করে নিয়েছিলাম। আর এখানে এসে দেখছি আমাদের দু'জনের মধ্যে কোনো মিল নেই। এ ঘরে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব। সারা দিনের জন্য কোনো একটা মোটামুটি কাজ যদি পেয়ে যেতাম তবে নিজেকে প্রবোধ দিতে পারতাম যে রাতে আমি হোটেলে আছি।

—যদি একটা কথা বলি, রাগ করবে না বলো।

—সে আশঙ্কা করার কারণ ঘটল নাকি ?

—অসহ্য একটা পরিস্থিতির থেকে পার পেতে, মনটাকে হালকা করতে, খুশি করতে তুমি পার্টির কাজ করতে চাইছ, না ?

—কেন ? লাহোরে আমি পার্টির কাজ করি নি ? তুমি আমার চিন্তাধারার পরিচয় কি পাও নি ?

—তখন তুমি পার্টি মেম্বর হতে চাও নি।

—তুমি হতে দাও নি ; আমার উপরে তোমার কোনো আস্থা ছিল না।

—কী বলছ তুমি ? ভূষণের স্বরে অধৈর্য ফুটে উঠল।

—ঠিকই বলছি। এখন তো পুরনো কথা বলবেই, নয়তো এসব কেন ঘটে গেল। মনোরমা ভূষণের চোখের দিকে তাকাতে চাইছিল না, বলল — তুমি তখন বলতে আমার মতো জীবনে সংঘর্ষ ছাড়া আর কিছু পাওনার নেই। অথচ সেদিন তুমিই বললে কম্যুনিস্ট কর্মীরা সুস্থ জীবন পেয়ে আজীবন সংগ্রাম করে যেতে পারে। এখন নিশ্চয় বুঝতে পারছ ?

—আমি আরও কিছু বলেছিলাম।

—কী বলেছিলে ?

—কোনো মানুষ জন্ম থেকেই বোঝে না, বা বোঝাতে পারে না।

মনোরমার দু'চোখ জলে ভরে গেল।

ভূষণ ওর হাত ধরে বলল - মন্নো, করছ কী ?

—ব্যস, আমার জন্যে পার্টি অফিসে কোনো একটা কাজের বন্দোবস্ত করে দাও।

—এত তাড়াতাড়ি করব কী করে ? আমি চাইলেও খুব তাড়াতাড়ি হবার নয়।

—কেন হবে না ? তুমি যোশীকে বলো, আমিও বলব। সবাই জানে আমি লাহোরে পার্টির কাজ করতাম, দরকার হলে ওখানে জিজ্ঞেস করে দেখুক।

—যোশী নিয়মের বিরুদ্ধে কী করতে পারে, বলো।

—তবে আমি মরে যাব ; কারুর কোনো প্রয়োজনে আসব না, নিজেকে তিল তিল করে শেষ করে দেব, এত নির্যাতন আমি সইব কেমন করে ?

– ঠিক আছে, হয়ে যাবে। তার আগে তুমি বোম্বাই সিটি পার্টিতে তিন-চার মাস কাজ করো। লোকেরা তোমাকে আগে জানুক।

—আমি তো ওদের চিনি না, জানি না।

—আচ্ছা, সে না-হয় আমি বলে দেব। কিন্তু সুতলীওয়ালার যদি কোনো আপত্তি থাকে।

—আপত্তি থাকলেই বা আমি কী করতে পারি? আমি ওর থেকে লুকিয়ে থাকব কেন? নিজেকে মেরে ফেলার চেয়ে এ বরং ভালো আমি এই পাহাড়ের উপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ি, সমুদ্রে ডুবে মরি। নিজেকে এত ঘৃণা করে আমি বেঁচে থাকতে পারব না। যাদের বিচার-বুদ্ধি আছে তাদের সাহচর্যে আমি থাকতে চাই।

—সে যাক, ওটা না-হয় হয়ে যাবে। এই একই ভাবনায় পারো নিজের আত্মীয়স্বজনের উত্তরাধিকারের ওপর লাথি মেরে চলে এসেছে আর পার্টির কাজ করছে। এই একই খেয়ালে সকীনার সঙ্গে ওর স্বামীর বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। এই ব্যবধানের চেয়ে ব্যক্তিজীবনের ন্যায় ও বুদ্ধি অনেক বড়ো জিনিস; তবুও আমি বলব আমার প্রতি তুমি অন্যায় করছ।

—আমি অন্যায় করছি?

—তুমি এক্ষুণি বললে, তোমার ওপরে আমার আস্থা নেই।

মনোরমা নিজের সাফাই গেয়ে বলল— সেই 1936-38 সালে তোমার ব্যবহার কি ভুলে গেছ? 38 আর 40-শেই বা তুমি কী করেছিলে? তুমি আমাকে শ্রেণী-শত্রু পর্যায়ে ফেলে দিলে। ভূষণের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ছিল মনোরমা; পায়ের কাছে একটা পাথর পা দিয়ে চেপে ধরে বলল— ব্যক্তি কি শ্রেণী থেকে কিছুতেই আলাদা হতে পারে না? সোমা কি ··?

—সোমা হয়েছিল ব্যারিস্টার সাহেবের হাতের খেলনা, কী, হয় নি? আমি ওরকম মূর্খামির পরিচয় দিতে চাই নি। ঐ অবস্থায় তোমার শ্রেণীর লোকেরা আমাকে হয় লাথি মারত আর নয়তো কিনে নেবার চেষ্টা করত। অথবা আমরা এই দুই পৃথক অবস্থার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত-

ভাবে লড়াই করতে করতে বিরাট একটা উপহাসের মধ্য দিয়ে শেষ হয়ে শহীদ হয়ে যেতাম।

—তুমি আবার সেই-সব কথা বলছ। তুমি জান আমি ঐ শ্রেণীর লোকদের ঘৃণা করি; এদের হাত থেকে বাঁচতে চাই। একটু ঝাঁঝ ফুটে উঠল ওর গলায়— আমি কী কম ভুগছি নাকি?

ভূষণ হেসে উঠে বলল— ওটা কি জানো, ছোটোবেলার আহ্লাদীপনা; সুন্দর খেলনা দেখলে তাকে পাবার জন্য অধীর হয়ে ওঠার মতো ব্যাপার।

—হোয়াট ডু ইউ মীন? মনোরমা অধীর হয়ে প্রশ্ন করল— তুমি আমাকে চিরকালই খেলনা বলে চালাতে চাও, না?

—আরে না। ঐ সময় আমি নিজেও স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করছিলাম। হঠাৎ একদিন অনুভূতি হল, আমি বুঝলাম আমার জীবনের পথ আলাদা। বুঝলাম আমরা দু'জনে দুই আলাদা শ্রেণীর মানুষ। বেশির ভাগ লোকই বড়োলোক ঘরের মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করার স্বপ্ন দেখে; তারা মনে করে নিজেদের উন্নতির এ একটা মস্ত বড়ো সুযোগ।

মনোরমার গলার স্বরে নৈরাশ্য— এখনও সেই দ্বেষ মনের মধ্যে পুষে রেখেছ নাকি? এখন তো আমি আর বড়োলোকের কন্যা নই।

ভূষণ ওকে একটু যেন আশ্বস্ত করতে চাইল— দ্বেষের কারণ তুমি যদি মেটাতে চাও তবে তাকে উপেক্ষা কোরো না, ঐ ধারণাটাকে উপড়ে ফেলে দাও।

সকালবেলায় জলখাবারের সময় মনোরমা সুতলীওয়ালাকে জিজ্ঞেস করল - কোনো জনসেবার কাজে লেগে গেলে কেমন হয়। লাহোরেও

কিছু-না-কিছু কাজ করতাম।

সুতলীওয়ালা সমর্থন জানাল— আমিও তোমাকে এ কথা বলব ভাবছিলাম। ভাবছিলাম বোম্বাই সমাজের সঙ্গে তোমার পরিচয় থাকা দরকার। সামাজিক স্বীকৃতির জন্যও এর প্রয়োজন। ব্যক্তি ও পরিবারের সামাজিক ও সার্বিক আস্থা ও স্থিতিটাও ব্যবসা বা কারবারের ব্যাপারে খুব প্রভাব ফেলে, কাজে লাগে। কোনো একজন জ্ঞানগম্যি লোকের কথার মূল্য কম নয়। পরিচয় বাড়াতে কখনও কখনও ক্লাবে যেয়ো। কোনো সভাটভা হলে তুমি যাতে নিমন্ত্রণ পাও সেদিকেও আমি খেয়াল রাখব।

মনোরমা সেই সপ্তাহে দু'দিন ক্লাবে গেল। গরীব বাচ্চাদের জন্য দুধ জোগাড় করার জন্য মাননীয়া স্ত্রীদের একটি কমিটি আছে; সুতলী-ওয়ালার চেষ্টায় মনোরমা সেই কমিটির মেম্বর হয়ে গেল। ঐ কমিটিতেও মনোরমা মাঝে মাঝে যায়; তবে নিয়ম করে যায় চূর্ণীরোডের কাছে গিরগাঁওয়ে এফ. এস. ইউ.-এর (সোভিয়েত মিত্র সংঘ) পত্রিকা ও সংগঠনের কাজে। এখানে ভূষণ মনোরমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে।

সংঘের পাক্ষিক সাময়িকী প্রকাশনের তারিখ এগিয়ে আসায় অফিসের বেশ কাজের চাপ পড়েছে। মনোরমা দুপুরে লাঞ্চ করতে ঘরে যেতে পারে নি। বিকেলের দিকে কার্যালয়ের অধ্যক্ষ কমরেড নীতার কাছ থেকে এক ঘণ্টার ছুটি নিয়ে বাড়িতে গিয়েছিল। ভূষণ যেতে বলেছিল, তা ছাড়া খিদেতেও পেট জ্বলছিল। মনোরমা ঘরে ফিরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ভূষণও এসে গেল। বেয়ারা খবর দিল— সাহেব বেশ কয়েকবার টেলিফোন করেছিলেন। বলেছেন, মেমসাহেব ফিরে এলে দপ্তরে যেন টেলিফোন করে।

মনোরমা ফোনে সুতলীওয়ালার সঙ্গে কথা বলল। সুতলীওয়ালা যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল— তুমি ফিরে এসেছ খুবই ভাগ্যি!

আমি একটা বিপদে পড়েছি। আজ পাঁচটায় অভিনেত্রী মধু ও শেঠ ওয়াদানিয়াকে 'তাজ'-এ চায়ের নিমন্ত্রণ করেছি। তোমাকে এঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই। এখনও হাতে পঁয়তাল্লিশ মিনিট আছে। তুমি একটা কাজ করো, একটা ট্যাক্সি ডেকে এখানে চলে এসো।

ভূষণ দেখল ফোনে কথা বলতে বলতে মনোরমার মুখে কতগুলি রেখা ফুটে উঠল। মাথা চুলকে মনোরমা বলল— আমি নিশ্চয় যেতাম। কিন্তু একটা জরুরি কাজে আটকা পড়েছি। কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেলেছি। যদি সেখানে না যাই তবে খুব খারাপ হবে। ওদের আমি কী জবাব দেব? আমি যেতে পারছি না, খুবই দুঃখিত।

সুতলীওয়ালা জোর করল— আমি তোমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট সম্বন্ধে আগে থেকে কিছুই জানতাম না। আমি ওদের বলেছি তুমি আসবে। তুমি না এলে ভেবে দেখ আমার কী অবস্থা হবে। অন্য ব্যাপারেও এর হয়তো গুরুতর প্রভাব পড়তে পারে। মনোরমা আর-কিছু বলতে পারল না, আস্তে করে ফোন রেখে দিল। ভূষণ চায়ের পেয়ালায় এক চুমুক দিয়ে কৌতূহলী দৃষ্টিতে মনোরমার মুখের দিকে তাকাল।

মনোরমার গলার স্বর কান্নার মতো ঝরে পড়ল— এখন বলো কী করি? কিছুতেই মানতে চাইছে না। এই পার্টিতে আমার থাকার কী দরকার শুনি? অ্যাকট্রেস মধু আর শেঠ ওয়াদানিয়াকে আমি চিনিও না— যাঃ এ একেবারে অসহ্য। কমরেড নীতা কী মনে করবেন বলো তো?

—নীতা নিশ্চয় খুশি হয়ে তোমাকে তারিফ করবে না। তবে তুমিই-বা কী করবে বলো! তিনি যে তাঁর স্বামীর অধিকার ফলাতে চাইছেন।

মনোরমার মনটা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। ও কাপড় পালটাতে অন্য ঘরে যাচ্ছিল আর ঠিক সেই মুহূর্তে ভূষণের কথা শুনে আবার চেয়ারে বসে পড়ল - খুব দেখাচ্ছ না, জেনেশুনে অপমান করছ কেন বলো তো? বলেই আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে নিল।

আঁচলটা তুলে ধরে ভূষণ জিজ্ঞেস করল কিসের অপমান? মনোরমা নীরবে উঠে পড়ল, চোখ মুছতে মুছতে ভেতরে চলে গেল। ভূষণ নিঃসাড় বসে রইল; চা একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, তাতেই ধীরে ধীরে চুমুক দিতে থাকল।

মনোরমা বাইরে এসে দাঁড়াল। সাদা রঙের একটা দামী শাড়ি আর গাঢ় লাল রঙের ব্লাউজ পরেছে মনোরমা। কাপড়টা পরার মধ্যে ওর নিরুৎসাহ, অনিচ্ছা ও বেপরোয়া ভাব প্রকাশ পাচ্ছে; উড়ো উড়ো চুল; চোখের জলের দাগ মুছতে ও মুখটা ধুয়ে একটু পাউডার প্রলেপ লাগিয়েছে, চোখে সুর্মা। মনোরমাকে এই সাজে দেখে ভূষণ মুচকি হাসল।

মনোরমা কৌতূহল চাপতে পারল না— হাসলে যে?

—আমাদের ওখানে একেবারে সন্ন্যাসিনী সেজে যাও।

—তো কি?

—এখন অপ্সরা সেজে বাইরে বেরুচ্ছ। পয়সার নিশ্চয় একটা ইজ্জত আছে, নয় কি?

—তোমাদের ওখানে যদি এভাবে সেজে যাই তবে তো ঠিকমতো চোখ মেলে তাকাতেই পারব না। আচ্ছা, দেখো তো খুব ভালগর দেখাচ্ছে না তো?

– কী যে বল, খুব চার্মিং দেখাচ্ছে।

—পাগলের মতো কথা বলছ, ট্যাক্সি পর্যন্ত আমার সঙ্গে চলো-না।

ট্যাক্সিতে বসে মনোরমা বলল— ফোর্ট পর্যন্ত এক সঙ্গে চলো,

সেখান থেকে এই ট্যাক্সি নিয়ে কম্যুনে চলে যেয়ো। এই নাও। মনোরমা একটা দশ টাকার নোট ভূষণের জামার পকেটে গুঁজে দিল। একটু সংকোচের সঙ্গে আবার জিজ্ঞেস করল মেজাজটা খুব খারাপ হয়ে ছিল, কী যে পরেছি নিজেই জানি না। ঠিক বলো তো, এ কাপড়টা পরে আমাকে কি খুব বেঢপ লাগছে ?

—আমি এর চেয়ে ভালো পোষাক কল্পনাও করতে পারি না। শেঠদের কাছ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চোলো, বুঝলে।

—ধ্যত ! কী মনে হতে আবার বলল— তুমি হয়তো জান না, পশু বলি দেবার আগে সাজিয়ে-গুজিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

পশুকে বলির জন্য নিয়ে যেতে দেখলে তাকে বাঁচানো উচিত।

—যে এত বড়ো সাহস দেখাবে তার মাথার ওপর সমাজের ধর্ম, আচার, সংস্কার আর গোটা ব্যবস্থাটাই হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে।

তাজ হোটেলে চা খেতে খেতে কথাবার্তা বলতে সাড়ে ছ'টা বেজে গেল। চা খাবার সময় সুতলীওয়ালা, মধু ও ওয়াদানিয়াকে ওর নিজের ফিল্ম কোম্পানির নতুন পরিকল্পনার যাবতীয় বিষয় বোঝাতে লাগল। সুতলীওয়ালার এই বক্তব্য ছিল, ওয়াদানিয়া এক লাখ টাকা বিনিয়োগ করুন, মধু দিক পঞ্চাশ হাজার, শেরজঙ্গ ও নুরুলের পঁচিশ-পঁচিশ হাজার ভাগ থাকুক। মনু নগদ টাকা না দিয়ে প্রথম ফিল্মের কাজ করার কনট্রাক্ট থেকে ওর দেয় টাকা কাটিয়ে দিক। শেরজঙ্গ ও নুরুল-ও তাই করুক। এভাবে কোম্পানির বিনিয়োগী মূলধন নিজের থেকেই চার লাখ হয়ে যাবে। সুতলীওয়ালা করবে ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের কাজ। সে এভাবে পঞ্চাশ হাজার টাকা লাগাবে। চা-পর্বের কিছু পরে শেঠ ওয়াদানিয়া ও সুতলীওয়ালা এক গুরুগম্ভীর আলোচনায় একটু ছেদ টানতে চাইলেন ; এ ক্লান্তি দূর করার জন্য দু'জনে হুইস্কির অর্ডার দিলেন। মনোরমা ও মধুর জন্য অর্ডার দেওয়া হল শ্যাম্পেন।

শেঠজী, সুতলীওয়ালা আর মধু মিলে জোরজবরদস্তি করাতে মনোরমা এক চুমুক শ্যাম্পেন খেলো বটে কিন্তু আর বেশি নয়, খেতে খারাপ লাগছে না, তবুও নয়।

শেঠজী প্রস্তাব করলেন— ডিনার একসঙ্গে খাওয়া যাক।

মধুর ভয়ার্ত প্রতিবাদ শোনা গেল— কী করে তা হবে? আমার তো আটটা থেকে সুটিং শুরু। মধু উঠে পড়ল।

সুতলীওয়ালা অভয় দিল— চলুন, আপনাকে আমি স্টুডিয়োতে পৌঁছে দিয়ে আসি।

শেঠজীর গলার স্বরে আতঙ্ক ফুটে উঠল— তবে আমি যে একা পড়ে যাব!

মনোরমার দিকে ইশারা করে সুতলীওয়ালা বলে উঠল— শেঠজী, আপনি একা থাকবেন, তা কি হয়? মনোরমা, তুমি শেঠজীর সঙ্গে থাকো? আমি মধুকে ছেড়ে আসি। মনোরমার উত্তর না শুনেই সুতলীওয়ালা পকেট থেকে গাড়ির চাবি বার করে চাবিটাকে আঙুলে ঘোরাতে ঘোরাতে উঠে দাঁড়াল।

শেঠজীর তখনও ভয় কাটে নি তবে ডিনার কোথায় হবে? আচ্ছা, আমার ওখানে মেরীন ড্রাইভ-এ করলে কেমন হয়? শেঠজী সুতলীওয়ালার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন আপনি তবে সোজা ওখানেই যাবেন।

সুতলীওয়ালা খুশি হয়ে সমর্থন জানাল খুবই ঠিক কথা বলেছেন শেঠজী. বেশ, আমি ওখানেই যাব।

মনোরমা শেঠজীর সঙ্গে তাঁর গাড়িতে মেরীন ড্রাইভ পৌঁছল। তেতলা যাবার জন্য লিফ্‌ট আছে। শেঠজীর ঘরে গিয়ে বোঝা গেল চাকর বাকরেরা মালিকের আবির্ভাব সম্পর্কে কিছুই জানত না। শেঠজী এসেই তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন। মনোরমা ড্রইংরুমের

সোফায় বসে জিজ্ঞেস করল— শেঠানীর সঙ্গে তো আলাপ করিয়ে দিলেন না ?

—তারা, আমার বাল-বাচ্চারা, সব তো কাল্বাদেবীতে থাকে। এ কথা বলেই শেঠজী সোফায় মনোরমার পাশে গিয়ে বসল।

মনোরমা শেঠজীকে জায়গা দেবার জন্য অন্য দিকে সরে গেল। এরকম নিঃসংকোচ ব্যবহার পছন্দ হল না। তাই মনোরমা বলতে চাইল— আপনি কি এখানে একা থাকেন নাকি ?

—একলা কী রকম, আপনি তো আছেন। আপনার সঙ্গে এসে এখানে ভিড় লাগালে তো আমারই লোকসান বেশি। শেঠজী কথাটা বলে অর্থপূর্ণভাবে হাসলেন।

মনোরমা নির্বাক্ হয়ে গেল, কোনো কথা বলার ওর আগ্রহ ছিল না। একটু পরে ঘর থেকে বেরিয়ে লিফ্টের কাছে গেল এবং বট্ন টিপে নীচে নেমে এল।

শেঠজী শুধু নিঃশব্দে তাকিয়ে দেখলেন।

* * *

মনোরমা বাড়িতে ফিরে গিয়ে দু'ঘণ্টা বারান্দায় বসে সুতলীওয়ালার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। সুতলীওয়ালা আসার পর কয়েক মুহূর্ত দু'জনের মুখে কোনো কথা সরল না ; দু'জনেই ভাবছে অন্য জন কথা বলবে। মনোরমা আর থাকতে পারল না, রাগে ফেটে পড়ল- টাকার জন্য কারুর এতটা পতন হতে পারে আমি না দেখলে বিশ্বাস করতাম না।

সুতলীওয়ালার গলার স্বরে ঝাঁজ— কী বলতে চাইছ তুমি ?

মনোরমা ওর মুখের দিকে ঘুরে বসে উত্তর দিল— মতলব বুঝি তুমি বোঝ না, না! ঐ লোকটার সঙ্গে আমাকে একা পাঠাবার কী অভিপ্রায় থাকতে পারে? ওখানে ওর স্ত্রীও থাকে না। চায়ের পার্টিতে আমাকে তুমি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলে কিন্তু ভদ্রলোক তার স্ত্রীকে সঙ্গে করে আনে নি কেন শুনি?

—একা গেছ তো হয়েছে কী? আমি পাঁচ-দশ মিনিটের মধ্যে ফিরব তা হয়তো তুমি জানতে না। রাস্তায় গাড়ির চাকার হাওয়া বেরিয়ে যাবে কী করে জানব? সুতলীওয়ালার গলার স্বর তীব্র হয়ে উঠল— এতদিন কি তুমি পর্দানশীন ছিলে? অন্য লোকের সঙ্গে তুমি কি একেবারেই চলেফিরে বেড়াও না? তোমার সঙ্গে দেখা করতে এখানে কি লোক আসে না? সারাদিন তুমি তোমার বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটাও। আজ আমি একজন বন্ধুকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি তো তুমি নানারকম বাধা সৃষ্টি করে চলেছ। ও কী করেছে তোমাকে বলো না? আমিও ওখান থেকেই আসছি। তুমি ঘুরে বেড়াও, তোমার পরিচিত লোকেদের সঙ্গে দেখা করো, এতে আমি কোনো বাধা দিই নি। তুমি আমার কোনো কথা সহ্য করতে পার না। এটাই যদি হয় তবে এক-সঙ্গে থাকার কী অর্থ? সুতলীওয়ালার গলার স্বর আরও চড়ল— নিজের বন্ধুর সঙ্গে বোম্বাইয়ে এসে দেখা করবে বলে এরকম একটা উপায় ঠাওরেছিলে; নয় কী?

অনেক কিছু বলার ছিল মনোরমার, কী বলবে সে কথাই চিন্তা করছিল। কিন্তু স্বামীর মুখে শেষ কথাটা শুনে ওর মুখে আর কথা জোগাল না। বারান্দার রেলিং-এর পরে মাথা ঠেকিয়ে নিঃসাড় বসে রইল; অবনত চোখের দৃষ্টি। সুতলীওয়ালার কাছে এ দৃশ্য অসহ্য, ক্রোধে জ্বলে উঠে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেল। গাড়ি স্টার্ট দেবার শব্দ এল, বাংলোর বাইরে বেরিয়ে গেল সুতলীওয়ালা।

স্নান সেরে মনোরমা আবার বারান্দায় এসে বসল ; পোড়া ভাগ্যটা বড়ো পীড়া দিচ্ছে ; নিজেকে বাঁচাবার উপায় কী ঘুরেফিরে সে-কথাই ভাবছে মনোরমা। সুতলীওয়ালা উঠল, মনোরমার যেন অস্তিত্ব নেই এমন ভাব ; জলখাবার খেলো না, আর নিচে নেমে গটাগট শব্দ করে বেরিয়ে গেল। বেয়ারা মনোরমার জন্য জলখাবার দিয়ে গেল। রাতে কিছু খায় নি ; শরীরটা বড়ো দুর্বল লাগছে। অল্প একটু খেল আর তার সঙ্গে সামান্য চা। ভাবল, এখানে আমি কোন্ মুখে খাওয়াদাওয়া করব ? ও তো খোলাখুলি বলতে শুরু করেছে, বন্ধুর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করার জন্য বিয়ের জাল পেতে বোম্বাইতে এসে হাজির হয়েছি।

চিন্তাগুলি সব ভিড় করে আসছে— বাবা ও ভাই-বোন শুনে কী বলবে আমাকে ? আমি তো নিজের মর্জিতে বিয়ে করে চলে এসেছি। টেলিগ্রাম পাঠিয়ে বিয়ে করেছি। সুতলীওয়ালা আমাকে ঘর থেকে টেনে বার করেছে আর নিজে পছন্দ করে বিয়ে করার সমস্ত অপরাধ আমার ঘাড়ে চাপাতে চাইছে। এই লোকই বুঝতে পেরেছে যে আমি আর ওর প্রয়োজনে লাগব না ; এখন ঘর থেকে বার করে আমাকে খারাপ মেয়েমানুষ প্রমাণ করার জন্য উঠে পড়ে লাগবে। বা রে সমাজের কুচক্র !··· আমি যে-ভুলই করে থাকি, এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া তো আমার মুক্তি।·· কিন্তু যাবই বা কোথায় ? কম্যুন-এও আমার স্থান নেই। নিজে বোকামি করে জীবনে যে ঠকে গেল তাকে ওরা রাখবে কোন্ দুঃখে ? ওখানে তো বিদ্বান বুদ্ধিমান লোকেরা ঠাঁই পায়।

মনোরমার মনে পড়ে গেল কাল সন্ধ্যায় এফ. এস. ইউ. দপ্তরে যাওয়া হয় নি ; ওখানকার কাজ নিশ্চয়ই পড়ে আছে ; কমরেড নীতা কী বলবে ! নীতার চেহারাটা ভেসে উঠছে, ঘাড়ে ঝোলানো থলি। লম্বা, শ্যামল মুখশ্রী। মনোরমার দিকে নিষ্ঠুর দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

যেন নীতা সার্কাসের সেই হাতীর খেল্‌-দেখানো হান্টার হাতে মাস্টার, এমন নির্দয় তার ব্যবহার ; কারুর কাজে একটু গাফিলতি দেখলে তড়িৎগতিতে হান্টার চলে যার, সেই নীতা কী বলবে ?

মনোরমা ভাবল, ঘরে বসে কান্নাকাটি করা ছাড়া কী আর করবে। কিছুদিন যাবৎ অপেরা পর্যন্ত মনোরমা হেঁটেই যাচ্ছিল ; ওর সঙ্গীরা হয় ট্রাম, বাস বা পায়ে হেঁটে যায় ; তাদের সামনে দিয়ে ট্যাক্সিতে চলতে খুবই সংকোচ হয়। অথচ আজকে শরীরটা ভয়ানক দুর্বল। ট্যাক্সিতে গেল কিন্তু দপ্তর থেকে পঞ্চাশ হাত দূরে নেমে গেল। দপ্তরের ভিতরে যেতেই নীতার নির্মম আওয়াজ শুনতে পেল এতক্ষণে ঈদের চাঁদ দর্শন দিলেন। যার জন্য হেড অফিসের বড়ো বড়ো দায়িত্বশীল লোক সুপারিশ করে আর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয় ; আপনার দাক্ষিণ্যে দপ্তরের কাগজ প্রকাশে 24 ঘণ্টা দেরি হয়ে গেল, বুঝলেন !

নীতা একবার বলতে শুরু করলে আর থামে না।— কাল মদনপুরায় মিটিং-এর পরে রাত আটটার সময় বাড়ি পৌঁছে ভাবলাম, বেচারী একলা বসে নিশ্চয় প্রুফ দেখছে। এসে দেখি, এখানে কেউ নেই। জয়রামের ওখানে গিয়ে জনাবের বাড়িতে ফোন করলাম। জানতে পারলাম জনাব পাঁচটার সময় ঘর থেকে বেরিয়ে গেছেন। ভয় পেলাম, রাস্তায় কোনো দুর্ঘটনা ঘটে নি তো ? কম্যুনে ভূষণের কাছে ফোন করলাম। জানলাম, বেগম সাহেবা নিজের শাহনশাহ খানদানী পার্টির শোভা বাড়াতে বেরিয়ে গেছেন। খানদানী পার্টির শোভা যেন বজায় থাকে, কী এসে গেল যদি হাজারো লোক কাগজের জন্য প্রতীক্ষা করে থাকে। কাগজ প্রকাশে দেরি হল কেন যদি আমাকে কেউ জবাবদিহি করে, আমি তখন ঈদের এই চাঁদকে দেখিয়ে বলব, আমাকে এর সাহায্য নিয়ে কাগজ বার করতে হয়েছে কিনা, তাই এত দেরি। নিজের খেয়ালখুশি-মতো যে কাজ করে, তাকে নিয়ে এখানকার কাজ চলবে না।

লেডি সাহেবা, এখানে ডিউটি দিতে হয়, নিজের থেকে যাঁরা মাথায় দায়িত্ব নেন, তাঁদের কর্তব্যজ্ঞান যে কী ভয়ানক তা বুঝবার ক্ষমতা আপনার নেই। নীতা বলেই চলল। ভাগ্য তার এটুকুই ভালো যে ওর সঙ্গে যারা কাজ করে, আজকে ছুটি ভেবে দপ্তরে আসে নি। নীতা নিজেই প্রুফ দেখছিল।

স্কুলে নির্দয় মাস্টারনীর কাছে নিদারুণ অপরাধ করেছে এমন ভঙ্গিতে মনোরমা চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। নীতা মন দিয়ে প্রুফ দেখতে লাগল। মনোরমা তখনও দাঁড়িয়ে। নীতা কাগজটাকে এমন নিবিষ্ট মনে দেখতে লাগল যে ওর সামনে যেন কেউ দাঁড়িয়ে নেই। কিছুক্ষণ পরে মনো-রমার দিকে তাকিয়ে নীতা বলল লেডি সাহেবা, এখানে দাঁড়িয়ে থাকতেই আপনি এসেছেন নাকি? আপনাকে বসার জন্য অনুরোধ করব আর ক্ষমা চাইব— হয়তো সে-কথা ভেবেই অপেক্ষা করছেন। মাপ করবেন, ওটা হবার নয়; আমি একটা শৃঙ্খলা মেনে চলতে অভ্যস্ত।

মনোরমা আঁচলে মুখ ঢেকে নিয়েছে। কান্নার বেগে ওর শরীর রীতিমতো কাঁপছিল। নীতা চেয়ার ছেড়ে উঠে ওর টেবিলের কাছে মনোরমার সামনে এসে দাঁড়াল। কোমরে দুই হাত, যেন কোনো লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত - তুমি কথা বলছ না কেন, বলো তো, কী ব্যাপার? কেউ কি তোমাকে হয়রানী করেছে। এখন নীতার গলার সুর পালটে গেছে— আমাকে কিছু বলছ না কেন?

নীতা মনোরমার হাত ধরে বাথরুমে নিয়ে গেল। ওর ভ্যানিটি ব্যাগ একদিকে রেখে নির্দেশ দিল— মুখ ধুয়ে নাও।

মনোরমা কিছুতেই যেন নিজেকে সামলে রাখতে পারছে না। দেয়ালের সঙ্গে লাগানো বেসিনের কলে নীতা মনোরমাকে নিয়ে গিয়ে নিজেই ওর মুখচোখ ধুয়ে দিতে চাইল। মনোরমা বাধা দিয়ে বলল—

দাঁড়ান। বলে নিজেই মুখচোখ ধুলো। মনোরমা বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখে নীতা টেবিলে বসে প্রুফ দেখে যাচ্ছে।

—এখানে এসো, নীতার স্বরে এখন স্নেহ ঝরে পড়ছে— আর কয়েকটার মাত্র প্রুফ পড়া বাকি। এগুলি তাড়াতাড়ি শেষ করে দিই। অনেক অনুনয়-উপরোধ করে রবিবার ছুটির দিনে প্রেস খুলিয়েছি। বাকি সব প্রুফ আমি আগেই পাঠিয়ে দিয়েছি।

নীতা চাপরাশীকে ডাকল— এই ছোকরা, চা নিয়ে আয়।

চা আসার আগে প্রুফ দেখা হয়ে গেল। নীতা চাপরাশীকে ডেকে বলল— নে, এই প্রুফগুলি প্রেসে দিয়ে আয় আর জিজ্ঞেস করবি কতটা হল?

মনোরমা চায়ের পেয়ালার দিকে তাকিয়ে ছিল, কিন্তু মনের আবেগে গতকালের পুরো ঘটনা বলে গেল—

নীতার মুখে একটা ইংরেজী গালি শোনা গেল— টাকার কুত্তা কোথাকার আবার তোমার নামে বড়ো কলঙ্ক লাগাতে এসেছে?

মনোরমা গভীর এক দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল— আমার মনে হয় ও আমাকে ছেড়ে চলে যেতে পারলে বাঁচে, কারণ দেখেছে আমার দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে ওর কোনো মিল নেই।

—ছেড়ে যাওয়ার মানে? ক্রোধে জ্বলে উঠল নীতা— কে কাকে ছেড়ে যায় দেখতে চাই আমি। ওকে তোমার মেইন্টেনেন্সের খাইখরচা দিতে হবে, তবে ছাড়ব। বিয়েতে তুমি দানসামগ্রী হিসেবে যা-কিছু পেয়েছ তাও তাকে ফেরত দিতে হবে। তোমার বাবার আর্থিক অবস্থা কী রকম?

মনোরমা বলল— দানসামগ্রী বিশেষ কিছু পাই নি। শুধু পনেরো হাজার টাকার চেক ছিল। আমি তা নিজের থেকেই সুতলীওয়ালাকে দিয়ে দিয়েছি।

নীতা রাগে গজগজ করতে লাগল— ছাড়তে চায় ছাড়ুক-না, আমি তাকে দেখে নেব। মেইনটেনেন্স খরচ দিতে বাধ্য করব, দেখো।

মনোরমার প্রতি নীতার আরও গভীর মমতা জাগল, কৌতূহল বাড়ল। ঘরের ঐ বিশ্রী পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে তাড়াহুড়ো করে সুতলীওয়ালাকে বিয়ে করে কত ভুল করেছে সে-সব কথাও নীতাকে বলে গেল।

সহানুভূতিতে হৃদয় ভরে উঠল নীতার, বিমর্ষ স্বরে বলল— তোমার মত এরকম মেয়ের ভাগ্যে এরকমই হওয়া উচিত। ঘরের লোকদের এ অন্যায় জুলুমের বিরুদ্ধে তোমার লড়ে যাওয়া উচিত ছিল। এরকম একজন মানুষের সঙ্গে ঘর করার কী অর্থ? তোমার ওকে তালাক দেওয়া উচিত, ইজ্জত ও সৎভাবে তোমার আবার নতুন করে জীবন শুরু করা উচিত। তুমি আমার সঙ্গে এই ঘরে থাকো। দেখব তোমার কে হয়রানী করে।

নীতি মনোরমার সামনেই সামনেই ওর জীবনের করুণ ইতিহাস স্বামী কমরেড বাসকের-কে সব বলল এবং নিজেই রায় দিল— এর স্বামী যদি একে তালাক দিতে চায় তবে মনোরমার তা মেনেই নেওয়া উচিত। কি, তুমিও আমার সঙ্গে একমত কিনা?

বাসেকর চিন্তায় ডুবে গেলেন, অন্যমনস্ক হয়ে আঙুল মটকে মটকে ধীরে ধীরে বললেন, তালাক দেবার মকদ্দমা খুবই ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার। তালাক দেবে যে, কারণ কী দেখাবে? রাজনৈতিক বা নীতিগত মতভেদের কারণে ডিভোর্স করা যায় না। তালাক দিতে যে-কোনো তিনটে কারণের মধ্যে একটি কারণ অন্তত দেখাতে হবে। স্বামীর যদি অন্য কোনো স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক থাকে, যদি সে নপুংসক হয় অথবা সে যদি স্ত্রীকে ধরে মারে।

নীতা মনোরমার মুখের দিকে তাকাল। মনোরমা নিচের দিকে

তাকিয়ে ইংরেজীতে বলল— আমার মতে তৃতীয় কারণটি ছাড়া সব গুণই তার আছে।

—কী বললে? লম্বা একটা নিশ্বাস নিয়ে নীতা বিস্ময় প্রকাশ করল; ওর চোখে মুখে একটা আতঙ্কের ছায়া পড়ল। বাসেকরের দিকে তাকিয়ে বলল – কী, একে জুলুম বলবে কিনা বলো? মেয়েটার উপর অসহ্য জুলুম চলেছে কিনা দেখ। মনোরমা, যে-কোনো উপায়ে এই অপমান ও লাঞ্ছনা থেকে তোমাকে পার পেতে হবে; তোমার হাতে তো সব তথ্য মজুত। নীতা দু'হাত মেলে ধরল, যেন সব তথ্য নীতার মুঠোর মধ্যে গুঁজে নিয়েছে।

আদালতের সামনে তথ্যের কোনো মূল্য নেই, তথ্য প্রমাণ করা চাই। প্রমাণ চাই, সাক্ষী চাই। বাসেকর জানতে চাইলেন— মনোরমা আদালতে গিয়ে সব কথা বলবে?

—কেন বলবে না? নীতা টেবিল চাপড়ে বলল। মনোরমা মাথা নেড়ে আপত্তি জানাল।

প্রচণ্ড রেগে উঠল নীতা, বলল— এরকম করলে বিপদ থেকে তোমাকে কে বাঁচাতে পারে, শুনি? তুমি নিজে বিপদ গলায় লটকে রাখতে চাও তো তোমাকে বাঁচায় কার সাধ্য।

নীতার এই প্রচণ্ড ক্রোধের ফল হল এই যে, মনোরমার অসুখী বিবাহিত জীবনের কথা পার্টিতে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। এই বদনামের ভাগী হয়ে মনোরমা সংকোচে ও লজ্জায় কুঁকড়ে যাচ্ছিল যেন। নীতার মতে এই সংকোচ পুঁজিবাদী সংস্কৃতির ভণ্ডামি ও ভ্রান্ত ধারণার ফল। নীতা জোর দিয়ে বলে যেতে লাগল— এই অপমান থেকে, এই নোংরা জীবন থেকে মুক্তি পাবার জন্য মনোরমার চেষ্টা করা উচিত।

ভূষণের মত, মনোরমার তাড়াহুড়ো করে কিছু করা উচিত নয়। এমন একটা পরিস্থিতি আসতে পারে যখন আদালতের এই বিশ্রী

ঝগড়ার মধ্যে না গিয়েই মুক্তি পাওয়া যাবে।

ভূষণ বলল – আমি চাই না কাগজে ফলাও করে খবর ছাপা হয় যে কম্যুনিস্ট যুবতী তার নপুংসক স্বামীকে তালাক দিয়েছে। নীতার হাতে কোন্ ডাক্তার আছে যে জরুরি সার্টিফিকেট দেবে?

সুতলীওয়ালা ও মনোরমার মধ্যে কথাবার্তা বন্ধ ছিল। দু'জনে আলাদা আলাদা সময়ে খাওয়া-দাওয়া করে। সুতলীওয়ালা পনেরো দিন অন্তর বেয়ারার হাতে একটা খাম দেয়, বলে মনোরমাকে দিতে। খামে থাকে একশো টাকার একটি নোট।

এভাবে মাস কেটে যায়, মাস ঘুরে বছর, এক থেকে দু'বছর। মনোরমা পার্টির মেম্বর হয়ে গেল কিন্তু নীতার সঙ্গে কাজ করতে থাকল। নীতার সঙ্গ ছেড়ে অন্য কোনো কাজে যোগ দেবার ইচ্ছেও ওর ছিল না।

শরণ নেবার মূল্য

লাহোর স্টেশনে সোমা বোরখা পরে গাড়িতে বসে পড়ল, অলক্ষ্যে চোখের জল মুছে নিল। মনে মনে স্থির করল কেঁদে যখন লাভ নেই আর কাঁদবে না। বরকত ওকে বুঝিয়েছে যে, গাড়িতে যদি কাঁদ, সঙ্গের মুসাফিররা সন্দেহ করবে; পুলিশ যদি একবার ধরে তবে দুজনেরই হাতকড়া পড়বে।

এখন সোমা কাঁদবেই-বা কার জন্যে? যা-কিছু ও ছেড়ে এসেছে, যেখান থেকে ওকে তাড়িয়ে দেওয়া হল, যেখান থেকে বেরিয়ে আসার সময় ওর মনে হয়েছিল মরে যাওয়া ছাড়া আর কোনো পথ নেই— দুঃখ যদি এখন হয়, তবে তো এদেরই জন্যে। কিন্তু সোমা সেখানে আর ফিরে যেতে পারবে না, চায়ও না। ঐ দুঃসহ ঘটনা, ঐ ভয়ানক অনুভূতির চেয়ে অজানা কোনো পৃথিবীর দিকে পা বাড়ানো সহজ, অজানা আশঙ্কার ভয়ও কম। ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আর কোনো কিছু আশা করে না সোমা, কল্পনাও করে না। মাথার উপরে যখন সংকট এসে পড়ে তখন তার থেকে পার পেতে সোমাকে কারু-না-কারুর শরণাপন্ন হতে হয়।

সোমার মনে পড়ে গেল বৈজনাথ-তহশীলের সেই আদালতের কথা;

ধনসিং-কে জেলে পাঠাবার জন্য পুলিশ যখন তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল তখন সোমা রাস্তার উপর বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল। মনে পড়ল লোকেরা ওর চারপাশে ভিড় করে তামাশা দেখছিল, ঠাট্টা-ইয়ার্কি শুরু করেছিল। এখন মরে গেলেও ওরকম একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করে তামাশার খোরাক জোগাতে পারবে না। গাঁয়ের সেই সোমা কবে মরে গেছে, এখন গাড়িতে বসে যে চলেছে সে অন্য এক সোমা, ভালো ঘরের গৃহস্থ, ধোঁকা খেয়েছে, পরিবার থেকে বিতাড়িত বিধবা।

বরকত সেয়ানা লোক ; তার নীতি হল সাবধানের মার নেই। তাই সে সোমাকে নিয়ে রাতে লাহোর স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠেছে। গাড়িতে বসবার সময় আর বসার পরে আরও একঘণ্টা সোমা বোরখা এঁটে বসে রইল। বরকত বলে দিয়েছিল, লাহোর ছাড়ার পরে আর চেনাশোনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার ভয় থাকবে না। তখন তুমি বোরখা খুলে কাপড়ে জড়িয়ে নিয়ো। ডাক গাড়িটা খুব যেন তাড়াহুড়ো করে চলেছে এমন তার ভাব ; গভীর এক অন্ধকার বুকে নিয়ে নানা রকম চালে অজস্র শব্দ করে রেল লাইনের উপর দিয়ে চলেছে, দুলছে, থামছে আবার অন্ধকারের বুক চিরে এগিয়ে চলেছে। ছোটো ছোটো স্টেশন চোখের নিমেষে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। গাড়ি থামছে আবার চলছে, তার দু'জনের ভাগ্যে যেন নির্ণয় হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু গাড়ি চলেই চলেছে। যখন গাড়ি থামছে স্টেশনের আলো এসে পড়ছে গাড়ির কামরায় ; লোকের চেহারা দেখা যাচ্ছে, ভাষা শোনা যাচ্ছে। যত এগিয়ে যাচ্ছে তত পাঞ্জাবের মানুষের সংখ্যা কমে যাচ্ছে ; কিন্তু সোমার নিথর চোখ দুটি কেউ দেখতে পাচ্ছে না। মাথাটা যেন শূন্য, চিন্তা করার শক্তি নেই সোমার।

বরকত সোমাকে বলেছিল, ওরা দু'জনে বোম্বাই চলেছে। সোমা শুনেছিল, বোম্বাই অনেক দূর, কত দূর তা অবশ্য জানত না। যত

দূরেই থাক্ কী এসে যায়! কে দূরে, কে কাছে তা নিয়ে ওর আর মাথাব্যথা নেই। যেখানে যাচ্ছে সেখান থেকে যেন আর ফিরে আসবে!

গাড়িতে ভীষণ ভীড়, হৈ-চৈ, ধাক্কাধাক্কি। মনে পড়ে দু'বছর আগে সোমা ধরমশালা থেকে লাহোরে এসেছিল ; তখন ছিল অন্য রকমের গাড়ি। মনোরমা তখন ওকে নিয়ে সেকেণ্ড ক্লাসে বসিয়েছিল। সেখানে শোওয়া-বসার জন্য সকলেরই বেশ জায়গা ছিল, গদি ছিল ; কেউ কাউকে ধাক্কা দেয় নি, সবাই কী রকম ভদ্র, ভালো। এই গাড়িতে শুধু ধাক্কাধাক্কি, চিৎকার আর ঝগড়া। বরকত ওকে এক কোণে কাঠের বেঞ্চিতে কাপড় বিছিয়ে বসিয়ে দিয়েছিল, নিজেও ওর কাছ ঘেঁষে বসেছিল। সোমা ওর স্পর্শ থেকে বাঁচতে কুঁকড়ে বসেছে। বরকত ঘন ঘন ঝিমিয়ে পড়ছে কিন্তু সোমার চোখ খোলা থাকুক বা বন্ধ থাকুক, ঘুম নেই, সজাগ নিস্পন্দ বসে আছে। বরকত বাঁ-দিকে আরও ধাক্কা দিয়ে দিয়ে আরও একটু জায়গা করে নিল। সোমাকে এবার শুয়ে পড়তে বলল। সোমা ঘোমটা টেনে শুয়ে পড়ল। বরকত নিজে বসে রইল। নতুন নতুন যাত্রী আসছে, ধাক্কা দিয়ে জায়গা করে বসতে চাইছে। বরকত আস্তিন গুটিয়ে তেড়ে উঠে বলছে— দেখতে পাচ্ছ না মেয়েছেলে বসে আছে। সোমা এখন বরকতের আশ্রয়ছায়ায়। বরকত ওকে নিয়ে চলেছে।

দিনটা টুক করে পার হয়ে গেল। একটা বিরাট স্টেশন। বরকত বলল— দিল্লী। সোমা কোনো নজরই দিল না, দিল্লীই হোক আর যাই হোক তাতে ওর কী। ভিড় বাড়ছে তো বাড়ছেই। সোমার জন্য যেটুকু সুরক্ষিত জায়গা রয়েছে তা কেউ দখল করে যাতে ওকে বিরক্ত না করে সে দিকে বরকত কড়া নজর রেখে চলেছে। বারো ঘণ্টা প্রায় পেরিয়ে গেছে অথচ সোমা নিজের জায়গা থেকে এক চুল নড়ে নি। বরকত জিজ্ঞেস করল, কিছু খাবে? দু'দিন দু'রাত কিছু খায় নি সোমা

তবুও মাথা নেড়ে জানাল কিছু খাবে না। বরকতের মমতা হল, কানের কাছে মুখটা এগিয়ে আস্তে আস্তে বোঝাল— পাগল নাকি তুমি! মানুষ কি না খেয়ে বাঁচতে পারে? হাত-মুখ ধোবে নাকি?

সোমা এবার আপত্তি করল না। বরকত সঙ্গে করে একটি বদনা এনেছিল। ও প্ল্যাটফর্ম থেকে জল নিয়ে এল। এই পাত্রটি দেখে সোমার মনটা কেঁপে উঠল। মনে পড়ল, কোনো এক মুসলমানের হাতে ওকে বিক্রি করা হবে জেনে ভয়ে ওর প্রাণ শুকিয়ে গিয়েছিল। এখন ও একজন মুসলমানের হাতেই ওর প্রাণ রক্ষার ভার দিয়েছে, তার অনুগ্রহের ভিক্ষা চাইছে। ওর ঘটি যখন নিতে হবে তখন কৃচ্ছ্রসাধন করে লাভ কী?

গাড়ির জানলার বাইরে মাথাটা বার করে সোমা হাত-মুখ ধুয়ে নিল কিন্তু কুলকুচি করতে পারল না। বরকত ওর জন্যে মাটির ভাঁড়ে চা নিয়ে এল। মুসলমানের ছোঁয়া-লাগা ভাঁড়। খুবই খারাপ লাগছিল তবুও খেয়ে নিল। মঝেরায় থাকতে ও মুসলমানকে ভীষণ ঘৃণা করত, ভয়ও পেত খুব। মুসলমানদের পায়ের জুতোর মতো মনে করত। শুনেছিল, মুসলমানদের ছোঁয়া লাগলে নিজের ধর্ম যায়, যত রাজ্যের নোংরা কাজ ওরা করে; অথচ সাহেবের কুঠিতে তাঁর অনেক মুসলমান বন্ধু আসত-যেত। তাদের ব্যাপারে কোনোরকম আচার-বিচার করা হত না। তারা ঘরে এসে একই বাসনকোসনে খাওয়া-দাওয়া করত। শুধু মা-জী ও বউদির এটা ভালো লাগত না। এই ভিড়ের মধ্যে পিষে যাচ্ছে, গাড়িটা হেলছে-দুলছে; সোমা তারই মধ্যে খাচ্ছে। আরও বেশ কয়েকটি স্টেশন পার হয়ে গেল। বরকত একজন হিন্দু পুরিওয়ালাকে ডাকল। সোমা পুরি খেল আর সেই বদনা থেকে জলও খেল। ওর গলা যেন শুকিয়ে যাচ্ছিল। মনে মনে বলল— আমার মতো মানুষের কীই বা বিগড়বে! পরাজিত লোক

যেমন সব-কিছুকেই উপেক্ষা করে সোমাও ঠিক সেই দৃষ্টিতে জল খেয়ে নিল।

গাড়ির কাঠের কামরাগুলি লোহার লাইনের উপর দিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে। খেত, গাঁ, জঙ্গল, পাহাড় যেন অন্য দিকে দৌড়ে পালাচ্ছে। বোম্বাই কখন পৌঁছবে বা বোম্বাই আর কত দূরে সোমা একবারও জিজ্ঞেস করল না। কাঠের বেঞ্চিতে গুটিসুটি মেরে বসে রইল। রাত এল। সোমা ঘোমটা টেনে গভীর নিদ্রায় ডুবে গেল। আবার দিন ফুটল। কাঠের কামরাগুলি চলতেই থাকল। সোমার মনটা একটু একটু করে যেন তাজা হয়ে উঠছে। ভাবছিল, কী করবে? উত্তর একটাই, যা-কিছু ওর করতে হবে, করবে। বকরত ওর কাছে বসে। এত গায়ে ঘেঁষে বসা ওর পছন্দ নয় কিন্তু এই দুনিয়ার অগণিত মানুষের মধ্যে বরকতই একমাত্র ওর জানাচেনা লোক। অজানা দুনিয়ার এত ভয় ও আশঙ্কার মধ্যে ওর সঙ্গে যেটুকু সম্পর্ক সেটাই এখন একমাত্র আশ্রয়।

বরকত লাহোরে যেমন ছেলেমানুষি করত, গাড়িতে সেরকম কিছু করছে না। দরকারি কথা ছাড়া বলছে না। কখনও জানালার বাইরে মুখ বার করে ট্রেনের তালে তালে গুনগুন করে গান গাইছিল কিংবা কখনও গম্ভীর হয়ে বসে ছিল। বোম্বাই পৌঁছে কী করবে হয়তো সে-কথাই ভাবছিল।

মঝেরা থেকে ধরমশালায় আসার সময় লোকজনের ভিড় দেখে সোমা অবাক হয়েছিল। লাহোরে এসে লোকজন দেখে সে আর অবাক হয় নি, বিস্ময়টা আতঙ্কের রূপ নিয়েছিল। বোম্বাই-তে 'ভিক্টোরিয়া' গাড়িতে চড়ে বসে যখন বাজারের পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল, তখন দু'পাশে অসংখ্য উঁচু উঁচু বাড়িঘর, রাস্তাঘাটে ভিড়-ভারাক্কা, অসংখ্য গলি-ঘুঁজি আর নানা রূপের নানা স্ত্রী-পুরুষ দেখে সোমা একেবারে থ' বনে গেল, ও যেন আর কিছু ভাবতে পারছে না,

কল্পনাশক্তি অসাড়। ওই জমজমাট কর্মচঞ্চল শহরে ও শুধু বরকতকে চেনে : ভিড়ের ধাক্কায় হারিয়ে যাবার আশঙ্কা ; এই অবস্থায় বরকতের ঐ ঘৃণিত হাতটা জোরে চেপে ধরে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আর উপায় কী ?

বরকত নলবাজারের কাছে একটি ছোটো হিন্দু হোটেলে সোমার থাকার ব্যবস্থা করেছিল। বরকত ওকে ভালো করে বুঝিয়ে বলেছে, কেউ যদি জিজ্ঞেস করে বলবে তুমি বরকতরামের বিবি। বলবে, অসুখে পড়েছিলাম বলে পাঞ্জাব থেকে এখানে চিকিৎসা করাতে এসেছি। চুরিচামারি হবার কিন্তু খুব ভয় ; সে বিষয়ে সোমাকে সাবধানে থাকতে বলে বরকত বেরিয়ে গেল ; থাকার জন্য একটা কিছু ব্যবস্থা তো করতে হবে। দুই রাত হোটেলের এরকম একটা অখাদ্য ঘরে সোমাকে থাকতে হল। বরকত দিনের বেলা এক ঘণ্টার জন্য দু'দুবার এসেছিল আর রাতে অনেক দেরি করে। রাতে অপেক্ষা করে করে হয়রান হয়ে সোমা ভাবছিল, এখন কী হবে! বরকত ওর জন্য সস্তা দামের তিনটে বেশ চটকদার শাড়ী নিয়ে এসেছে। রাতে চুপিচুপি ও সোমাকে বোঝাল যে ওর জন্য বরকত সিনেমায় একটা চাকরির চেষ্টা করছে। এরকম একটা চাকরি পেয়ে গেলে ও হাজারে হাজারে টাকা কামাবে। বাংলো বলো, মোটরগাড়ি বা চাকর-বাকর —কিছুরই তখন অভাব থাকবে না। সোমা রাজার হালে থাকতে পারবে। বরকত ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে— ঘাবড়িয়ো না, দু-চারদিনের মধ্যেই হয়ে যাবে। বরকত সোমাকে খুব খাতিরযত্ন করতে লাগল, যেন কত নম্র আর ভদ্র।

* * *

বরকত বোম্বাইতে আগেও বছর তিনেক ছিল। শহরটাকে ও ভালো করেই চেনে।

স্কুলে পড়ার সময়েই বরকত স্বপ্ন দেখত সিনেমায় নামবে, বড়ো অ্যাক্‌টর হবে। ওর বিশ্বাস ছিল সিনেমায় ঢুকতে হলে আর অভিনেতা হতে গেলে কতকগুলি আবশ্যক গুণ থাকা দরকার— এই যেমন, ভালো দেখতে হওয়া চাই, চমৎকার আকর্ষণীয় ফিগার থাকবে, হাসিখুশি, ভালো গলার স্বর আর অভিনয়ে দক্ষতা— বরকত ভাবত ওর মধ্যে এসব গুণই মজুত। সিনেমার গানগুলি ও যখন হুবহু গাইত তখন বন্ধুরা ওর অনুগত হয়ে পড়ত। ঘরে যখন গলা ছেড়ে গাইত পড়শীর মেয়ে-বউরা চিক বা জানলার আড়াল থেকে মুগ্ধ হয়ে শুনত। নিজেকে অ্যাক্‌টর করে তোলার জন্য ও মাথা-ভরা চুল রেখেছিল। গাল বেয়ে নেমেছে বিরাট বড়ো সযত্ন-লম্বিত জুলফি ; ও-বয়সে যতটুকু গোঁফ ওঠা সম্ভব, তা নিটোলভাবে ছেঁটে ঠোঁটের কিনারে তৈরি করেছে একটি সরু রেখা। মহরমের শোক অনুষ্ঠানে ভাগ নিতে বরকত কালো রঙের একটি জামা সেলাই করিয়ে নিয়েছিল ; পছন্দসই বলে এই জামাটাই বেশি পরত। তার জন্য সময়-অসময় মানত না। সাদা একটা পাতলুন আর তার সঙ্গে ম্যাচ করে কালো জামা। এমনিতে মজবুত দৃঢ়বদ্ধ শরীর, তা তুলে ধরতে জামাটাকে পেছনের কাঁধে একটু টেনে নিয়ে বুক উঁচু করে চলত। উৎসব-পার্বণে কলারে রুমাল এঁটে নিত, হাতে নিত হাতের মাপের একটা ডাণ্ডা। কথা বলার সময় ঘাড়টাকে একটু তেরছা করে ধরে, মাথার চুলে এক ঝটকা মেরে জুলফি ঠিক করে নেয় ; চুলগুলি আবার সারা মাথায় ছড়িয়ে পড়ে।

বরকতের বাপ বিজলী দপ্তরের দপ্তরী ছিল ; উন্নতি হতে হতে মাসে পঁয়তাল্লিশ টাকা মাইনে হল, তা দিয়ে সংসার কোনোমতে চলে যেত। তার আশা ছিল, ছেলেটা যদি কোনোমতে এনট্রেন্স পাস করে নিতে পারে তবে মেহেরবান্ অফিসরদের শরণাপন্ন হয়ে ওকে একটা ভালো চাকরি করিয়ে দেওয়া যাবে।

শরীর মজবুত ও রূপবান হবার জন্যই আট ক্লাসে পড়তে পড়তেই বরকতের বিয়ে হয়ে গেল। এই বিয়েতে ওর মোটেই মনে লাগে নি, মোট-কথা সন্তুষ্ট হয় নি। ও স্বপ্ন দেখত ছায়াছবি জগতের শাহেন-সাহর পুত্রের মতো কোনো বিরাট একটি কাণ্ড হবে অথবা কোনো লাখপতির মেয়ে ওর প্রেমে পড়ে হাবুডুবু খাবে, তবেই না! ওরকম একটি মেয়ে জুটলে তাকে মোটরসাইকেলে বসিয়ে ফট্‌ফট শব্দ করে কী চমৎকার পালিয়ে যাওয়া যেত। লোকেরা হা-হা করে পেছনে ছুটত, মারপিটও হয়তো হত কিন্তু অবশেষে লোকে অবাক হয়ে দেখত সেই লাখপতির মেয়ে ওকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করতে নারাজ। তখন লাখপতির পাষাণ হৃদয় গলে যেত আর তিনি দানসামগ্রী হিসেবে একটা কুঠী দান করে তাঁর মেয়ের সঙ্গে ওর বিয়ে দিতেন।

বরকত নিজের পছন্দমতো বিয়ে করে নি, ওর মা-বাবা পছন্দ করে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে। তখন ওর মাত্র উনিশ বছর বয়স। ওর ছিল একটি ছোটো বোন আর ছোটো দুটি ভাই। মায়ের শরীর সারাক্ষণই খারাপ থাকত। বরকতের বোন জোহরা ঘরের সব কাজকর্ম সামলাত। জোহরার যখন পনেরো বছর বয়স তখন ও শ্বশুরবাড়ি চলে গেল; ঘরের এত কাজ কে সামলায়? মা বড়ো দুশ্চিন্তায় পড়ে ভাবল এবার বরকতের বউ ঘরে আসুক। তাই দেখেশুনে বরকতের জন্য এমন বউ আনল যে ঘরের যাবতীয় কাজ সামলাতে পারে।

সকীনার বাবা আমজাদ আলী জীবিকার সন্ধানে চার বছর আগে সুদূর আফ্রিকায় পাড়ি দিয়েছিল। গাঁয়ে ফিরে মেয়েকে দেখে আমজাদ আলী তো একেবারে অবাক, লম্বায় তার মাকেও ছাড়িয়ে গেছে। মেয়ের জন্য সম্বন্ধ খুঁজতে লাগল আর এটা-ওটা-সেটা কত কথাই শুনল, যার অনেকটাই তার কাছে অজানা ও অস্পষ্ট। এত কথায় সে যেতে রাজি নয়, তাকে তাড়াতাড়ি মেয়ের বিয়ে দিতে হবে।

অমৃতসরে আমজাদের নিজের শালা থাকে ; শালার চাচাতো ভাই মিয়া লিয়াকতের ছেলে এই বরকত। দেখতে-শুনতে বেশ, আমজাদের পছন্দ হয়ে গেল। আর চটপট বিয়েও সারা। বিদেশে আমজাদের বেশ ভালো আয়পত্র হয় আর তা দিয়ে সে মেয়ের বিয়েতে বেশ ভালো দানসামগ্রীও দিয়েছিল।

প্রথম রাতে বরকত যখন সকীনাকে কাছে পেল, ওকে নিয়ে তখন ওর অনেক স্বপ্ন। কিন্তু সকীনাকে কেমন যেন আনমনা দেখাচ্ছে, কেমন যেন নিষ্প্রভ। সকীনা চায় নি ওকে কেউ তখন বিরক্ত করুক। অথচ বরকত উদ্‌ভিন্নযৌবনা একটি মেয়েকে নিজের হাতের কাছে এই প্রথম পেয়েছে ; এখন মনমরা হয়ে বসে থাকা ওর পক্ষে কী করে সম্ভব ? ওর কল্পনাকে ও নিজের হাতে গলা টিপে মারে কী করে ? তাই সিনেমার কায়দায় সে তার অধিকার ফলাতে চাইল। সকীনার গায়ে একটা রাম চিমটি কেটে বরকত হাসতে লাগল। রাগে জ্বলে উঠল সকীনা ; আঙুলের যে-দিকে আঙটি পরেছে সে দিক দিয়ে বরকতের গালে একটা কষে চড় মারল ; মৃদু স্বরে গালাগালি দিতেও শোনা গেল।

বরকত আর সকীনা, দু'জনেরই অল্প বয়স ; সকীনা গ্রামের মেয়ে, সতেরো বছরের তেজস্বী মেয়ে ; বরকত শহরের ছেলে, উনিশ বছরের নওজওয়ান। তবুও বরকত পুরুষ আর সকীনা নারী। বরকত ওকে দ্বিগুণ জোরে গালি দিল, কষে পেটাল। সকীনাও নিচু গলায় গালি দিল, লাথি মেরে জবাব দিল। বরকতের গালে আঙটির আঘাতের দাগ লেগে ছিল। ও কয়েকদিন পাগড়ি পরে অতি কষ্টে গালটা ঢেকে রাখল। বন্ধুদের ও একটা গুল মেরে বলল, অন্ধকারে এক অজানা বদমাশের সঙ্গে ওর মারপিট হয়েছিল।

সকীনার প্রতি বরকতের আর কোনো টান রইল না। ও বুঝল,

'হারামজাদা' বদ মেয়েমানুষ ; ঠিক করল ওকে মেরে ফেলাই বুদ্ধিমানের কাজ। আবার ভাবল, আর-একটা বিয়ে করে বিবি নিয়ে এসে ওর মাথার ওপর চাপিয়ে দিলে মজা বুঝবে, সারা জীবন যদি ওকে বাঁদি করে রাখে তবে বুঝবে কত ধানে কত চাল। মেয়ে জাত সম্বন্ধে ওর যে একটা রঙিন কল্পনা ছিল, মেয়েদের একটা যে বিচিত্র রহস্যের চোখে দেখত, সে কল্পলোক ভেঙে পড়ল আর মেয়েদের সম্বন্ধে ওর মনে একটা বিরূপ ভাব জাগল, তার অনেকটাই বিকৃত। মেয়েদের সম্বন্ধে ওর মনে একটা ঘৃণা ও শঙ্কার ভাব জাগল। ও ভাবতে শুরু করল মেয়ে জাতের সঙ্গে খেলা মানে সাপের সঙ্গে খেলা। মেয়েদের স্পর্শ করার চেয়ে দূর থেকে মেয়েদের দেখে শিস দেওয়া বা অঙ্গভঙ্গি করে প্রেম নিবেদনের মধ্যে ওর এখন অনেক বেশি তৃপ্তি।

1939 সালে বরকতের বাপ হঠাৎ মারা গেল। এনট্রেন্স পাস করতে আরো এক বছর বাকি ছিল। স্কুলের মাস্টাররা ওকে ছ'চক্ষে দেখতে পারত না ; কিন্তু বরকত বলত ওর প্রতি মাস্টারদের শত্রুতা আছে। এই অবস্থায় পাস করার আশা কম। পাস করে মুন্সীজী হয়ে উঠবে আর সারা দিন দপ্তরে খাটাখাটুনির পর বিকেল হতেই রুমালে তরি-তরকারী বেঁধে বাড়ি নিয়ে আসবে, মাথা নিচু করে চটের পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকবে— এরকম একটা জঘন্য জীবন ওর মনঃপূত নয়।

ও তো মুন্সী হতে জন্মায় নি, জন্মেছে ফিল্ম ছনিয়ার 'মজনু' ও 'দেবদাস' হতে। বিচারকের দৃষ্টিতে ও তার জীবনের দিকে তাকিয়ে দেখে — অভিনেতা একজন শাহনসাহের মতো জীবন যাপন করতে পারে আবার ঘাসকাটার মতো সামান্য জীবনও। একটি জীবনের মধ্যে যেন বিশটা জীবনের প্রবাহ। মরার সময় কেউ তো আর ছনিয়াটাকে সঙ্গে করে নিয়ে যায় না ; যদি ভালো খাইদাই-পরি, মজা লুটি— শুধু সেই-টুকুই নিজস্ব থাকে। আমার পিছনে একশোটা সম্পত্তি রেখে গেলেই বা

আমার তাতে কী লাভ? বিরাট বিরাট চমক্দার বাড়ি, অপরূপ নারী আর রঙিন চটকদার পোষাক অভিনেতারই শোভা পায়। কত খুবসুরৎ নবযৌবনা মেয়ে তার মুঠোর মধ্যে আসতে বাধ্য হয়। অ্যাক্টরের প্রণয়ের ছলনায় ও তার বীরত্বের রূপে কত পর্দানশীন আর কত বাংলোর কত মেমসাহেব প্রেমে পড়ে যায়। জীবন থেকে তারা কত-কিছু আদায় করে নেয়, জীবনটা যেন ওদের কাছে ভরপুর, আর কত তার দীপ্তি···! নাম-করা অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের নাম বরকতের নখদর্পণে; তাদের কত যশ, কত আয়! তা নিয়ে বাজারে যত রাজ্যের গুজব— তাও বরকতের মুখস্থ। ও মনে মনে ভাবত একবার কোনোমতে যদি বোম্বাইয়ে গিয়ে পড়া যায় তবে ওর সামনে ছায়াচিত্রের দুনিয়াটা এক নিমেষে খুলে যাবে।

রেলওয়ের মিস্ত্রি মিয়া নসীরুদ্দিনের ছেলে জমীল বরকতের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ দোস্ত। বরকত নিজের জীবনের সুখ-স্বপ্ন জমীলকে শুনিয়েছিল। ঐ স্বপ্নজগতের পর্দা খুলে ঢুকে পড়ার জন্য জমীলও অস্থির, চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। ওর-ও আর্থিক অবস্থা মোটেই ভালো ছিল না। বরকত প্রথমে তার মাকে খোশামোদ করে টাকা বাগাবার চেষ্টা করল ফল হ'ল না দেখে, মাকে ভরসা দিয়ে বলল, সে হাজার টাকা উপার্জন করে তাকে পাঠাবে; তাতেও ফল হ'ল না, তখন রেগেমেগে টং, ভয় দেখিয়ে বলল সে আর ঘরে ফিরবে না। এতসব কারসাজি করে তবে একশো পাঁচ টাকা জোগাড় করল। নিজের বউয়ের কিছু গয়নাপত্র হাতালো এবং জমীলের সঙ্গে বোম্বাইয়ে চলে গেল। দু'জনে মলাড, সান্তাক্রুজ ও দাদরের সিনেমা স্টুডিয়োগুলিতে চক্কর দিতে থাকল কিন্তু বিশেষ সুবিধে করতে পারল না, কারণ, স্টুডিয়োর পাঠান দারোয়ান তো বটেই, বিশেষ করে গোর্খা দারোয়ান বেহেস্তের দারোগা রিজওয়ানের চেয়েও বেশি সতর্ক আর অভদ্র। পকেটের টাকাপয়সা

একেবারে গড়ের মাঠ অথচ কিছুতেই স্টুডিয়োর ভিতর পা রাখতে পারল না। কিন্তু দু'জন তরুণ ওদের তপস্যায় অবিচল। শেষ পর্যন্ত ভিতরে ঢোকার সুযোগ এসে গেল। সিনেমার একটি রেস্তোরাঁয় দু'জনের চাকরি জুটল। মাসের পর মাস হুইস্কি-সোডার গ্লাস, চায়ের পেয়ালা আর প্লেট ধুতে ধুতে ওরা বুঝতে পারল ওদের বয়স এখনও নেহাৎ কম আর এও বুঝল সিনেমা জগতের দেবদূত হতে গেলে সঙ্গে একজন পরী থাকা দরকার। সিনেমা জগতে পরীর ওজন ও দাম দেবদূতের চেয়ে অনেক বেশি।

সিনেমা কোম্পানির মালিকের ড্রাইভার মুরীদ খাঁ পাঞ্জাবী রাজপুত মুসলমান। একদিন সে বরকত আর জমীলকে খুব ধমকালো, বলল তোরা পাঠানের বাচ্চা হয়েও ভেড়ুয়া আর বেশ্যাদের এঁটো বাসনপত্র ধুচ্ছিস। দু'জনকে সে এক মোটর কারখানায় লাগিয়ে দিল। জমীল মিস্ত্রির কাজ শিখতে লাগল কিন্তু বরকতের এ কাজ মোটেই পছন্দসই ছিল না। কিছুদিন সে একটা কারখানায় মজদুরি করে পরে এক ট্যাক্সিওয়ালার ক্লিনার হয়ে ড্রাইভারের কাজ শিখে নিল। বরকত একটি বাস কোম্পানিতে চাকরি পেয়ে গেল কিন্তু তাতেও বেশিদিন টিঁকে থাকতে পারল না।

ট্যাক্সি চালাতে বরকতের খুব ভালো লাগত, এতে নিজের ইচ্ছেমত কাজ করা যায় আর বন্ধুবান্ধবদের কাছে গর্ব করে বলতে পারে— আরে ইয়ার, আজকে আমার গাড়িতে একজন যে মালদার লেডী বসেছিল না, একেবারে দিলচোর। আমাকে তার এত পছন্দ হয়ে গেল যে ট্যাক্সি থেকেই আর নামতে চায় না। গাড়ির ভাড়া দেবার সময় আমি এইসা চোখ মারলাম আর মুচকি হাসলাম যে লেডী খুশি হয়ে দশ টাকার দুটো নোট দিয়ে দিল। নিজের বাংলোতে যেতে বলছিল— এ রকম গালগল্প করে ওর মনে খুব তৃপ্তি হয়। যারা সিনেমা জগতের লোক

তাদের চারপাশে চক্কর লাগায়। কখনো-বা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বিনা পয়সায় গাড়ি চড়ায়।

বরকত হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় পাঞ্জাবে ফিরে যেতে বাধ্য হল। ঘরের অবস্থা মোটেই সুবিধের যাচ্ছে না। এক ভাই কোন্ একটা মিলে গেট-চৌকিদারের কাজ করছে। ছোটো ভাই ওদের এক আত্মীয়ের তাঁতের কারখানায় কাজ করে পনেরো টাকা পায় আর কাজ শেখে। মা আগের চেয়েও অসুস্থ। বউয়ের সঙ্গে অনবরত ঝগড়া লেগে যায়। সকীনার মা-বাপ বলে— জামাই দুশ্চরিত্র আর ভবঘুরে হয়ে গেছে। মেয়ের শ্বশুরবাড়ি ওকে জ্বালিয়ে মারে।

সকীনা চাচার ভাইয়ের বিয়েতে সেই যে নিজের গাঁয়ে গিয়েছিল, আর সেখান থেকে ফেরে নি। গুজব শোনা গেল যে চাচার ভাই সকীনাকে উপপত্নী বানিয়ে ঘরে বসিয়ে রেখেছে। সে নাকি জোর গলায় বলেছে, 'যার বুকে সাহস আছে সে যেন একে নিয়ে যেতে আসে।' বরকত অমৃতসরে থাকতে চাইল না। সোজা চলে গেল লাহোর এবং কাজ খুঁজতে খুঁজতে ব্যারিস্টার সরোলার কাছে গিয়ে হাজির হল; তাঁকে অনেকগুলি সার্টিফিকেট দেখাতে তিনি খুশি হয়ে ওকে নিজের ড্রাইভার নিযুক্ত করলেন। কিন্তু বরকত তখনও বোম্বাই যাবার স্বপ্ন দেখে, সেখানে আছে সিনেমার জগৎ, ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকে।

হোটেলে দু'দিন থেকে বরকত সোমাকে মহীম-এ নিয়ে এল। জমীল তার পাড়ায় একটা খালি কুঠরি পাইয়ে দিল, রেশন কার্ডও বানিয়ে দিল। যুদ্ধের দিনকাল। রেশন কার্ড ছাড়া বোম্বাইয়ে আটা-ডালও পাওয়া যায় না। মহল্লায় বেশ কয়েকটি তিনতলা ইমারত, তার ঠিক উল্টো দিকেও বড়ো বড়ো বাড়ি। নীচের তলায় বেশির ভাগই নাগরা জুতো তৈরিতে সুদক্ষ মুচিরা থাকে, এরা জয়সলমিরের লোক। এক-একটা খুপরিতে বেশ কয়েকটি পরিবার থাকে। যতক্ষণ সূর্যের

আলো থাকে, মুচি ও মুচিনী বারান্দায় বসে জুতো সেলাই করে যায়; সন্ধ্যা নামতেই মুচি জুতো বেচতে বেরিয়ে পড়ে আর মুচিনীরা রান্নাবান্না করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এক-একটা খুপরিতে দুটো থেকে তিনটে উনুন জ্বলে। মাথার উপরের চালায় ধোঁয়াতে কালি পড়ে গেছে। নাইতে-ধুতে, বাসনকোসন মাজতে, এরা ঘরের সামনে জল তুলে আনে আর জায়গাটা জলে-কাদায় ভরে থাকে। প্রত্যেক তলায় বাথরুম ও পায়খানা রয়েছে, তবে সেগুলি অন্ধকার ও স্যাঁতসেঁতে। ঘরের সামনে মুচিদের কাপড় শুকোতে দেওয়া হয়, যেন পশুর আস্তানা; মুচিনীদের বড়ো বড়ো লাল-কালো রঙের ঘাঘরা শুকোতে ছাতার মতো মেলে দেওয়া হয়। এই কাপড়ের আর কাঁচা চামড়ার দুর্গন্ধে ইমারতের ঘরগুলি ভরপুর।

ইমারতের উপরের তলায় থাকে মুচিদের থেকে যাদের আর্থিক অবস্থা ভালো তারা; ঐ যারা কারখানায় কাজ করে এমন মজদুর, গরীব ক্লার্ক আর ড্রাইভার ইত্যাদি। এইসব খুপরিতে একই সঙ্গে কয়েকজন লোক ও পরিবার থাকে। এখানে নতুন শিশু জন্ম নেয়, যারা অসুস্থ আর বুড়ো থুরথুরে তারা নতুন শিশুর জন্য জায়গা ছেড়ে দিয়ে নিজেরা পরপারে চলে যায়।

জমীল বরকতের জন্য তিনটে পরিবারের সঙ্গে একসঙ্গে থাকার মতো একটা ঘরের ব্যবস্থা করতে পারত, তাতে অনেক সস্তা হত কিন্তু বরকত সোমার সুবিধার কথা ভেবে অনেক বেশি ভাড়ায় একটা আলাদা খুপরি ভাড়া নিল।

সোমা মহীমের এই খুপরি দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিল। প্রথম দিন বরকত কলের জল আর সামনের দোকান থেকে রসদ এনে দিয়েছিল কিন্তু রোজ তো ওর পক্ষে এটা করা সম্ভব নয়। বরকত সোমাকে বুঝিয়ে বলল— আটা, ডাল, চাল ও চিনি আনতে মুদির দোকানের

সামনে রেশনকার্ড হাতে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। আমি চাকরি-বাকরি খুঁজব না মুদি দোকানের সামনে লাইন দেব? পাশেই তো দোকান। মেয়েরা তাড়াতাড়ি জিনিসপত্রও পেয়ে যায়। এবার থেকে তুমিই এসব জিনিসপত্র আনবে।

লাহোরে সোমা ঘরের জিনিসপত্র আনতে মোটরগাড়িতে যাতায়াত করত। বোম্বাই-এর মহীম এলাকায় রেশনের দোকানের সামনে বিরাট বড়ো লাইন। এক-এক পা করে এগিয়ে যেতে যেতে সোমার ঘণ্টা পার হয়ে যায়। মনে মনে ভাবে, এই রেশনের জিনিস আনার চেয়ে খোলা বাজারে বেশি দাম দিয়ে জিনিসপত্র কেনা অনেক ভালো, কিংবা না খেয়ে থাকাও অনেক সুখের। রান্নাবান্না করে সে বরকতের জন্য প্রতীক্ষায় বসে থাকে। বরকত ঘরে ফিরে রোজকার মতোই ভরসা দেয়— ঘাবড়িয়ো না। আমি খুব তাড়াতাড়ি তোমার জন্যে সিনেমার একটা চাকরি জোটাব। আমি লোকজনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করছি।

পড়শীর অন্য ঘরের মেয়ে-বউরা সোমার সঙ্গে আলাপ জমাতে চায়। এরা দু-তিনটি পরিবার এক-একটা খুপরির মধ্যে কোনোমতে ঠাঁই করে নিয়েছে। এরা নিজেদের ঘরে সোমাকে ডাকে, বসাতে চায়, কথাবার্তা বলতে চায় কিন্তু সোমা এক মুহূর্তেই উঠে পড়ে। বাঁ-দিকের ঘরের লোকেরা দক্ষিণীদেশের; সোমা এদের ভাষাও বোঝে না। ডান দিকের লোকেরা হিন্দুস্থানী বলে; সোমা এদের কথা একটু-আধটু বুঝতে পারে। এরা জিজ্ঞাসা করায় সোমা বলে দিয়েছে ও পাঞ্জাবী। ওর স্বামী ড্রাইভার। কাজকর্মের সন্ধানে আছে। পাড়াপড়শীরা বুঝে নিল, আলাদা একটা ঘর নিয়ে ডাঁট দেখাতে চায়, কাজেই সোমার সঙ্গে আর বেশি কথাবার্তা বলতে চাইল না।

সোমা বসে বসে ভাবে সিনেমার কাজ ও করবে কী করে? ব্যারিস্টার জগদীশের প্রতি ওর মনে আজকে শুধু ঘৃণা কিন্তু নিজের

সৌন্দর্যে আস্থা ছিল বলেই তাঁকে সে কাছে পেয়েছিল একদিন। নিজের গলা যে মিষ্টি তাও সোমা জানে, তাতেও ওর ভরসা আছে। কিন্তু সিনেমাতে লোকেরা যা করে তা ও লোকের সামনে করতে পারবে কিনা সে বিষয়ে ওর খুবই সন্দেহ। বেশ কয়েকবার সিনেমা দেখেছে, দেখতেও ভালো লেগেছে কিন্তু নিজে গিয়ে ওসব করা, লোকের সামনে দাঁড়ানো, গান গেয়ে গেয়ে ওরকম অঙ্গভঙ্গি করা— ভাবতে সোমার লজ্জা হয়, অপমান লাগে। সোমা চাইছিল, বরকত চাকরি করবে আর ও তার ঘর সামলাবে কিন্তু বরকতকে মুখ ফুটে এ কথা যে বলবে সে অধিকার তার কোথায়?

মহীম এলাকার ঘরে এসে ঠাঁই নেবার পর বরকত অনেক বেশি সহজ হয়েছে, ওর সংকোচ কেটে গেছে আর আজকাল বেশ অধিকার ফলিয়ে কথা বলে। মনের খুশি প্রকাশ করতে কখনও-বা বরকত ওকে ছোঁয়, বিরক্ত করে। সোমা চুপ করে থাকে। সোমার সেই ভঙ্গিটা বরকতের মনে ভেসে ওঠে, ঐ যে লাহোরে বরকত একদিন সাহস করে ঠাট্টার ছলে বলেছিল— হুজুর, গরীবদের প্রতি কখনও একটু নজর রাখবেন। তখন সোমার কপালের রেখায় বিরক্তি ফুটে উঠেছিল, ক্রুদ্ধ হয়ে হুংকার দিয়ে বলেছিল— 'কী বাজে কথা বলছ? আর দেখো, তোমার যদি কিছু বলার থাকে, সাহেবকে বোলো।' এখনও যখন সোমা গম্ভীর হয়ে বসে থাকে বরকতের কেমন যেন ভয় করতে থাকে. ভাবে আবার বকে দেবে না তো?

সোমা কিন্তু রাগ প্রকাশ করে না, কখনো মুচকি হাসেও না। বরকতের ওসব হাবভাব শুরু হলে চা বা খাবার তৈরি করতে হবে, এরকম একটা অছিলা দেখিয়ে কেটে পড়তে চায়। কোনো ব্যাপারে বরকতকে যদি ডেকে কথা বলার দরকার হয়, তবে 'ভাই' সম্বোধন করে ডাকে, কথা বলে। রাগ দেখাবে বা আপত্তি করবে সে অবস্থাই-বা ওর আছে

কোথায় ? নিজেই তো এ অবস্থা মেনে নিয়ে ও বরকতের সঙ্গে চলে এসেছে, ওর শরণ নিয়েছে। সব ব্যাপারেই তো সোমা এখন ওর দয়ার ওপরে নির্ভরশীল। বরকতই ওর জন্যে সব-কিছু করছে। বরকতকে এখন ও কোন্ মুখে বাধা দেয়, আপত্তি জানায় ? পুরুষমানুষ নিজের তৃপ্তির জন্যই তো মেয়েছেলে পালে, তাদের আবদার সহ্য করে। একটা মাত্র অস্ত্র ওর হাতে ছিল, বরকতকে 'ভাই' বলে ডাকা ; বরকতকে আপত্তি জানিয়ে ওকে আরও প্রতিশোধপরায়ণ না করে তুলে, সোমা ভেবেছিল, ওর মনে যদি সহৃদয়তার ভাব জাগিয়ে তোলা যায়। সোমা চাকরি-বাকরির কথা পাড়ে, বলে— ভাই, সিনেমার কাজ আমি করব কী করে ? এত বুদ্ধিসুদ্ধি কি আমার আছে ? ভাই, তুমি সারাদিন পরিশ্রম করে ক্লান্ত হয়ে পড়ছ। ওখানে যদি সুবিধে না হয় থাক্ না। তুমি বরং আমাকে কোনো ঘরের কাজে-কর্মে লাগিয়ে দাও। ভাই, এটা তো বিরাট একটা শহর, এখানে তোমারও খুব ভালো কাজ হতে পারে।

বরকত যখন রাতে মদ গিলে আসে, মদের দুর্গন্ধে সোমার গা গুলিয়ে ওঠে। ব্যারিস্টার কখনও কখনও মদ খেতেন কিন্তু সে মদের এত দুর্গন্ধ নেই। এমনও অনেকদিন হয়েছে ব্যারিস্টার তাঁর গ্লাস থেকে এক চুমুক মদ খেতে ওকে বাধ্য করেছেন। মদ খেয়ে তিনি কীরকম স্ফূর্তিতে কথাবার্তা বলে যেতেন, ওকে নিয়ে মশগুল হতেন। তখন সোমা কীরকম একটা খুশির দোলায় দুলত। সেসব স্মৃতি মনে ভেসে উঠলে এখন মনটা কেমন যেন বিরক্তিতে ভরে ওঠে, অপমানজনক মনে হয়। আবার ভাবে, সেরকম দিন কি আর ফিরে আসবে ? না, আসবে না। এখন তো পাখিটা উড়ে গিয়ে একেবারে নালায় গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছে, এর চেয়ে আর কত তলিয়ে যাবে ? পাখিটা কত উঁচুতে উঠে গিয়েছিল···

সোমা বরকতকে খেতে দিয়ে, খাইয়ে নিজে খেত এবং বাসন-কোসন মাজতে বসে যেত। এর মধ্যেই বরকত শুয়ে পড়ত। সোমা আলো নিবিয়ে অন্ধকারে চোখ খুলে শুয়ে থাকত, ভাবত এরকম করে কতদিন আর চলবে, আমার কী হবে? স্টুডিয়োতে সোমার জন্য কাজ খুঁজতে খুঁজতে বরকতের তিন সপ্তাহ পেরিয়ে গিয়েছিল। জমীলের কাছ থেকে বরকত চল্লিশ টাকা ধার নিয়েছিল, তাও শেষ। যেখানেই বরকত যায়, কড়া উত্তর শোনে—'এক্সট্রা এজেন্সির' সঙ্গে কথা বল।

বনোয়ারী ওর পুরনো বন্ধু; তখন বনোয়ারীর খুব দুঃসময় চলেছে। ও 'এক্সট্রা এজেন্সির' মারফৎ কাজকর্ম যখন করছে তখন থেকে ওর সঙ্গে বনোয়ারীর আলাপ। বরকত ওকে দেখে হাসত, বিদ্রূপ করে বলেছিল— শালা, আমি যদি কোনোদিন পার্ট করি তবে নিজের মুবদে করব।

বনোয়ারী আজকাল 'দারেফেজ' কোম্পানির জন্যে ডায়লগ লেখার কাজ করে। বনোয়ারী এত পড়াশুনা করেছে বরকত জানত না। সোমার সৌন্দর্য ও তার ক্ষমতার প্রশংসা করে বরকত বনোয়ারীকে বলেছিল— দোস্ত, পাঞ্জাবের পাহাড়ের কোল থেকে একেবারে একটি রত্ন নিয়ে এসেছি। ওকে স্টুডিয়োর কোথাও একটা জায়গা করে দাও।

বরকত 'এক্সট্রা এজেন্সি'কে বড়ো ভয় করে, বলে— একবার যে ওদের খপ্পরে পড়ে তাকে সারা জীবন এক্সট্রা হয়ে থাকতে হয়। শালারা রক্তচোষা। মহিলার জন্য কোম্পানির কাছ থেকে দশ টাকা যদি-বা পাওয়া যায় তবে গরীবদের, বুঝলে, পাঁচ টাকা গুঁজে দেবে। কোনো মহিলার উপর একবার যদি এই এজেন্সির ছাপ পড়ে যায় তবে কোনো কোম্পানি আর তাকে সরাসরি ডাকবে না। স্টুডিয়োতেও নেবে না। শালা, এই এজেন্সিওয়ালারা খুব ভালো নাচনেওয়ালিকেই দশ-পনেরো

টাকা ধরিয়ে দেয়। আর সোমা তো এখনও কিছুই জানে না, শেখে নি। মুশকিল এই যে, এই শালারা স্টুডিয়োর দরজা আগলে রাখে। কমিশন না খেয়ে কাউকে ভিতরে ঢুকতে দেয় না। কোনো ডাইরেক্টর বা অন্য কোনো প্রভাবশালী লোকই কাউকে কাজে লাগাবার ক্ষমতা রাখেন।

বরকত নিরাশ হয়ে দারেফেজ স্টুডিয়োর রেস্তোরাঁর মালিক জীবা ভাইয়ের কাছে গিয়ে হাজির হল। পাঁচ বছর আগে বরকত এখানে বাসনকোসন ধোয়ার কাজ করত। তখন এই রেস্তোরাঁও যেমন-তেমন ছিল। এখন জীবা ভাইয়ের নিজের দুটি বাড়ি, একটা ট্যাক্সি। এ ছাড়া স্টুডিয়োতে রেস্তোরাঁর খাবার-দাবার তো যায়ই। উপরন্তু জীবা ভাই এক্সট্রার এজেন্সিও করে। বরকত জীবা ভাইয়ের কাছে নিজের আগের সে পরিচয় দিতে চায় নি কিন্তু ওর শ্যেনদৃষ্টি এড়ানো মুশকিল, অধিকারপূর্ণ দাবির কাছে বরকত নিজেকে গোপন করতে পারল না।

জীবা ভাই প্রশ্ন করল— কোথা থেকে নিয়ে এসেছ ?

বরকত উৎসাহ দেখিয়ে বলল— শেঠ, পাঞ্জাবের পাহাড়ের সেরা সুন্দরী, দেখলে টের পাবে।

—কত বয়স ?

বরকত কম চৌকস নয়, বলল — হবে এই উনিশ-বিশ বছর।

—কিছু কি জানে ?

—আপনি একবার দেখুন না ওকে, সব জেনে যাবে।

—আচ্ছা দেখব। জীবা ভাই ঠিকানা চেয়ে নিল কিন্তু অতটা গুরুত্ব দিল না।

বরকত জীবা ভাইয়ের এখানে দুপুরবেলা পর্যন্ত ঠায় বসে থেকে ওকে অনেক কষ্টে বিকেলের দিকে নিজের ঘরে নিয়ে আসতে পারল।

সোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল বরকত— এ আমাদের পরিচিত শেঠজী।

সোমা এক কোণে গুটিসুটি মেরে বসে ছিল। জীবা ভাই তেরছা-চোখে সোমার চেহারা আঁচ করার চেষ্টা করল। ফিরবার সময় বরকত জীবা ভাইকে আশ্বাস দিল — এ কুঠির ও সাহেব লোকদের সঙ্গে থেকে এসেছে। এখন একটু ভীত, ত্রস্ত। সময় এলে যখন খুলবে তখন দেখাবেন। মঞ্চের আলো মধু ও চন্দ্রাকে যদি এ ম্লান না করে দেয়, তবে পেচ্ছাব দিয়ে গোঁফ কামিয়ে ফেলব।

জীবা ভাই বরকতকে সাদরে গাড়িতে ওর পাশে বসালো, একটা সিগারেট এগিয়ে ধরে বোঝাল— দেখো মিয়া, যে ঘোড়া বোঝা বয় তার দ্বারা ঘোড়দৌড় হয় না। এই মহিলা শুধু স্টুডিয়োর ভিড় বাড়াবে। তার বেশি কিছু করার ক্ষমতা এর নেই। কিছুই তো জানে না। একে শিখিয়ে-পড়িয়ে নিতে কমসে-কম তু'বছর লাগবে। ততদিন তুমি একে কাজে লাগিয়ে কামাও আর পরে অন্য কাউকে না-হয় নিয়ে এসো। এর জন্যে স্টুডিয়োর লোকেরা পাঁচ টাকার রেট বাড়িয়ে দশ টাকা দিয়ে দেবে। আমি তোমাকে এর জন্য কুড়ি-পঁচিশ দিতে রাজি আছি।

বরকত এ প্রস্তাব না মেনে পারল না। ওর আর অন্য কোনো উপায় নেই। জীবা ভাই ওকে 'খাড়া-পারসী'-র সামনে একটা বাড়ি দেখিয়ে বলল — রাত দশটার সময় মহিলাকে এখানে নিয়ে এসো। দশ টাকার একটা নোট জীবা ভাই বরকতের হাতে গুঁজে দিল এবং সন্ধ্যাবেলা গাড়ি পাঠাবে বলে গেল।

বরকত আজকাল প্রায়ই সেই সকালে বেরিয়ে যায় এবং মাঝরাতের আগে ফেরে না। সেদিন বিকেলেই বাড়িতে ফিরে এল। বাদামী রঙের একটা থলি ওর হাতে ছিল, থলিটা সোমার হাতে দিয়ে বলল —

রান্নাবান্না খাওয়া-দাওয়া তাড়াতাড়ি সেরে ফেলো। রাত নটায় একটা জায়গায় যেতে হবে। শেঠের মোটরগাড়ি আসবে। সিনেমার কাজের জন্য তোমাকে দু-চারজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে হবে। এরা সব বড়ো বড়ো লোক। খুব কষ্ট করে এই বন্দোবস্ত করেছি। খুব খোশামোদ করেছি, তবেই না রাজি হয়েছে। এদের সঙ্গে একটু খাতির করে চোলো আর বুঝেশুনে কথা বোলো। সিনেমায় ভালো চাকরি এত সহজে পাওয়া যায় না।

বরকত কাগজের থলিতে মুখের পাউডার ও ঠোঁটের রঙ এনে দিয়েছে। ধরমশালায় থাকতে ধনসিং ওর জন্যে পাউডার ও ক্রিম কিনে দিয়েছিল। লাহোরেও সোমা মুখে পাউডার লাগাত, চোখে কাজল। মনোরমা ও অন্য মহিলাদের চুল-বাঁধা দেখে সোমাও অন্য ভাবে চুল বাঁধতে শিখেছিল; কিন্তু এমনভাবে সাজত যাতে অন্য কেউ বুঝতে না পারে যে সোমা সযত্নে প্রসাধন করে। রাতে সাহেবের কাছে যাবার সময় সোমা কপালে টিপ পরত। কপালের টিপ দেখে সাহেবের মুখে যে খুশির ভাব ঝলসে উঠত তা ও নিজের চোখে দেখেছে। সাজ-গোজের এত ব্যক্তিগত প্রসাধন দ্রব্য, ওর রূপের সঙ্গে, শরীরের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ যার সম্পর্ক— সেসব জিনিস বরকত আজ কিভাবে লুকিয়ে চুরিয়ে নিয়ে এসেছে।

সোমা চিবুক পর্যন্ত ঘোমটা টেনে আধ-শোয়া অবস্থায় পড়ে রইল। প্রায় নটার সময় বরকত তাগাদা দেওয়ায় সোমা উঠে গিয়ে শাড়ী পালটাল। বরকত যে চটকদার শাড়ীটা এনে দিয়েছিল, সেটা সোমা ঘরেই ব্যবহার করে; লাহোর থেকে যে-সাদা শাড়ীটা পরে এসেছিল, সেটাকে সোমা ধুইয়ে রেখেছিল, ভেবেছিল দরকারে-অদরকারে এটা পরবে। বড়ো বড়ো লোকের সামনে যেতে ভালো শাড়ী চাই, তাই সোমা এই সাদা শাড়ীটা পরে নিল। বুকটা কেমন যেন কাঁপছে কিন্তু

অন্য কোনো পথ নেই। জীবা ভাইয়ের গাড়ি এসে গেছে। বরকত ওর সঙ্গে গাড়িতে এসে বসল এবং এদের সঙ্গে কিভাবে বুঝেশুনে চলতে হবে সে-বিষয়ে সোমাকে বোঝাতে থাকল।

ধনী আর বড়োলোকের মতোই বিরাট বাড়ি। চাকরবাকরেরা উর্দি পরে ছুটোছুটি করছে। শেঠকেও দেখা গেল। শেঠ বরকতকে জিজ্ঞেস করল - এসে গেছে ? শেঠ সিঁড়ির পাশে একটা ছোট্ট ঘরে সোমাকে নিয়ে যাবার ইশারা করে বলল— আসুন। শেঠ ও আরও একজন লোক ঘরে এল। লোকটা দরজায় যেন কী একটা করল, সোমা তা দেখেও বুঝল না। ছোটো ঘরটার বাগানের দিকের দরজা তড়িৎ গতিতে বন্ধ হয়ে গেল এবং এদের পায়ের নিচের ফরাশ উপরে উঠতে লাগল। চার তলার দিকে উঠছে। সোমার পাশে দাঁড়িয়ে শেঠ মেজাজে চুরুট টানছে। সোমা ঘাবড়ে প্রায় চিৎকার করতে যাচ্ছিল আর ঠিক সেই সময়ে খাঁচার মতো ঘরটা হঠাৎ থেমে গেল। দরজার সামনে বারান্দা। লোকটা দরজার দেয়ালে কী যেন একটা টিপল আর দরজা আওয়াজ করে খুলে গেল। শেঠ বাইরে বেরুবার ইঙ্গিত করে বলল -- আসুন।

সোমাকে যে-ঘরে নিয়ে আসা হল, ঘরটা ছিমছাম, আসবাবে সুসজ্জিত। শেঠ সোমাকে বসিয়ে বাইরে চলে গেছে। সোমা একা ঘরে বসে আরও যেন ঘাবড়ে গেল ভাবল, এ আবার কোন্ জাল ? এখান থেকে তো বেরুবারও পথ নেই। নিচে থেকে কত উপরে উঠে এসেছে কে জানে ? জোরে চিৎকার করলেও বরকত শুনতে পাবে না··· এটা তো বৈজনাথের সেই থানার চেয়েও ভয়ংকর জায়গা। ঘরের বাইরে কে যেন হাসছে, কথা বলছে, তার স্বর ভেসে আসছে। কে যেন দরজা একটু ফাঁক করে দেখল এবং পিছনে সরে গেল। দু'মিনিট পরে শেঠের মতোই কাপড়-জামা পরা অন্য একজন লোক ভিতরে

এসে সোমার পাশে সোফায় সিঁটিয়ে বসল। সোমা একটু সরে বসল। মুখেচোখে ভয়ার্ত ছাপ। একটু বিস্মিত হয়ে লোকটা বলল— আরে, ও, বুঝেছি, লজ্জা পাচ্ছ, না? বলে বিশ্রীরকম হাসতে লাগল।

লোকটার মুখ দিয়ে মদের বোটকা গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে, পানের রসে ঠোঁট লাল। সোমা লোকটার মুখের দিকে তাকাতে পারছে না; বুঝতে পারছে সে বিলিতি মদ খেয়েছে। শেঠ হাতটা সোমার পিঠে রাখল, বাঁ হাতটা দিয়ে কোমর ধরবে এই মতলব। সোমা আবার এক হাত পিছনে সরে গেল। শেঠ হেসে বলল— আরে, কথাও বলবে না নাকি, আমি তো খুব তারিফ শুনেছিলাম। আবার অর্থপূর্ণ হাসি হাসল।

মদের নেশায় শেঠের মুখখানা ভারী ভারী আর রক্তিমাভ লাগছে। মুখের দিকে তাকাতে পারছে না সোমা, যদিও বুঝতে পারছে শেঠ বিলাতি মদ গিলে এসেছে। শেঠ সোমার কোমরে হাত রাখতে ওর পিঠের দিকে হাত বাড়াল। এক হাত সরে বসল সোমা। শেঠ মুচকি হেসে বলল— আরে, কথাও বলবে না নাকি? আমি যে তোমার অনেক তারিফ শুনেছিলাম।

সোমা মাথা নিচু করে রইল। সারা মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম। শেঠ ভাবল টাকা বার না করলে কাজ হবে না, তাই পকেট থেকে একশো টাকার একটা নোট বার করে সোমার কোলে ছুঁড়ে দিয়ে বলল— নাও, এখন তো ঠিক আছে নিশ্চয়।

সোমা ভয়ে কাঁপছিল, শাড়ীর খুঁট থেকে সুতো আঙুলে জড়িয়ে নিয়ে খুব ক্ষীণ কণ্ঠে বলল— আমি চাকরির কথা বলতে এসেছিলাম।

হয়তো সোমার কথা শেঠ শুনতে পায় নি। উৎসাহিত হয়ে সোমার শরীর ঘেঁষে বসল এবং জোর করে সোমার মাথা নিজের বুকে চেপে ধরল।

সোমা ছটফটিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়াল, বুক কাঁপছে, চোখেমুখে ঘৃণা ঠিকরে পড়ছে।

ঘরের বন্ধ দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা দিয়ে কে যেন চিৎকার করছে —আমিও পয়সা দিয়েছি, আমার পয়সা কি মুফতে আসে নাকি, অ্যাঁ ?

শেঠ উঠে দাঁড়াল। সোমা আগেই দাঁড়িয়ে পড়েছে ; কোল থেকে নোট ফরাশে পড়ে গেছে। শেঠ চট্ করে নোটটা হাতে তুলে নিয়ে দরজার কাছে গিয়ে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করল— কে ?

—কোন্ শালা 'কে' বলে রে ? বাইরে থেকে গলার চিৎকার যেন মারমুখী শোনাল— এই নম্বরের পয়সা আমি দিয়েছিলাম। একেবারে নতুন মাল আর বড়ো ঘরের ভদ্র মেয়েমানুষ বলে এরা আমার কাছ থেকে পয়সা আদায় করেছে। আমাদের ঐ শেঠকে ডাক। শালা, ঠগবাজ …! আমার পয়সা কি শালা মুফতে এসেছে নাকি, অ্যাঁ ?

শেঠ দরজার ছিটকিনি খুলে উত্তেজিত কণ্ঠে বলল— নাও, তুমি এবার তোমার পয়সা উসুল কর গে। বাইরে বেরিয়ে এল শেঠ। বাইরে থেকে ঝগড়া ও চিৎকার স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে - আমি আগে পয়সা দিয়েছি, আর এখন ? আমার সঙ্গে ঠকবাজি, অ্যাঁ, শেঠকে ডাক।

সোমা ঘরের ভিতরে দাঁড়িয়ে কাঁপতে থাকল। ভিতরের দরজা থেকে একজন চাকর এসে সোমাকে ডেকে নিয়ে গেল— বাই, এখান দিয়ে চলো।

চাকরটা সোমাকে কলঘরের পাশে একটা ঘরের মধ্য দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নিয়ে গেল। সোমার পা তখনও কাঁপছিল। এত সিঁড়ি আর যেন ভাঙতে পারছে না সোমা। চাকরটা তাকে একটা ছোট্ট নির্জন ঘরে নিয়ে গিয়ে একটা চেয়ার টেনে বসতে দিল। উপরে তখন প্রচণ্ড ঝগড়া চলেছে— পয়সা··· আমিই প্রথমে··· মুফতে নাকি অ্যাঁ, ঠগবাজ··· ইত্যাদি বিচ্ছিন্ন টুকরো শব্দ বারবার চিৎকার করে বলতে

শোনা যাচ্ছে।

সোমা দু'হাত দিয়ে মাথা জাপটে বসে আছে; অসাড় নিস্পন্দ। বরকতের গলাও পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু কী বলছে বরকত, সোমা তা বুঝতে পারছে না। অন্য লোকটার ক্রুদ্ধ স্বর শোনা যাচ্ছে— শালা, তুমি আমাকে ঠকাতে এসেছ!... তোমার লাশ সমুদ্রে ফেলার ব্যবস্থা করছি দেখো! এসব শুনে সোমা থরথর করে কাঁপছে।

চাকরটা এসে ওকে ডাকল— চলো বাই।

সোমা বাইরে এসে বরকতকে দেখতে পেল। বরকতের চেহারায় ক্রোধ ঝলসে উঠতে দেখল সোমা; একটু যেন ঘাবড়েও গেছে। কুর্তা-ধুতি পরা রোগা-পাতলা একটা লোক বরকতের সঙ্গে দাঁড়িয়ে; সোমা একে চিনতে পারল না। লোকটা সোমাকে খুব খুঁটিয়ে দেখছে।

দাঁতে দাঁত পিষে বরকত ক্রোধ সংবরণ করে সোমাকে বলল – চলো।

লোকটাও ওদের সঙ্গে এগিয়ে এল। একটু দূর গিয়ে বরকত থামল, আশঙ্কা-ভরা গলায় বলল— এখন বাস পাওয়া যাবে কিনা কে জানে?

লোকটা উত্তর দিল— এসময়ে বাস কি চলে নাকি যে পাবে; সেই কবে এগারোটা বেজে গেছে। মহিলা সঙ্গে রয়েছে। এই নাও, টাকা রাখো। একটা ট্যাক্সি করে নাও। আচ্ছা, আবার দেখা হবে।

1944 সাল, যুদ্ধের ভয়ংকর দিন। শত্রুপক্ষের উড়োজাহাজ আলো দেখলে জায়গা চিনে ফেলে বোমা ছুঁড়বে, এ আশঙ্কায় বোম্বাই-য়ে 'ব্ল্যাক-আউট' চলেছে। রাস্তায় বিজলী পোস্ট থেকে বাতি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। দোকানের আলো আধ-বোঁজা, অন্ধকার ঘিরে আছে। রাতে বাতি নেই বলে লোকজনও ঘর থেকে খুব কম বেরোয়; মোটর-গুলোর সামনের আলোর মুখে কাগজ সাঁটা, অন্ধকার তাদের আলোও যেন গ্রাস করেছে। নির্জন, অন্ধকার রাস্তায় ট্যাক্সির সন্ধানে বরকত

সোমাকে নিয়ে এগিয়ে চলেছে, পাচ্ছে না। আরো এগিয়ে যাচ্ছে আর দাঁতে দাঁত পিষে নিচু গলায় ধমক দিয়ে যাচ্ছে— একবার ঘরে চল্, তোর মজা দেখাচ্ছি।

বিজলীতে ঝলমলে, আসবাবে সুসজ্জিত ঘরে শেঠ বসে বসে ভালোবাসা কিনতে চাইছে, এ ভয়ানক দৃশ্যের চেয়ে বরং বরকতের এই ক্রোধ ভালো, চাপা স্বরে তার ঘন ঘন ধমকানি অনেক বেশি সহনীয় লাগছে সোমার।

আরও একটু দূরে গিয়ে বরকত একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেল। গাড়িতে সোমা চোখ বুঁজে চুপচাপ বসে ছিল। বরকত ট্যাক্সিতে দু'হাত দিয়ে মাথাটা চেপে ধরে গম্ভীর মেজাজে বসে আছে। দু'জনের না-খেতে-পেয়ে মরার মতো অবস্থা। বরকত ভেবেছিল সোমা বুঝদার মেয়েছেলে, অবস্থা বুঝে যা করণীয় তা করবে। সব-কিছু সামলাবার ক্ষমতা ওর আছে। এই মেয়েমানুষটা সাহেবকে এক আঙুলে নাচাত কিন্তু এখানে ও উল্টো ঢঙ শুরু করল। চুপ করে ভাবতে থাকল বরকত। মনে মনে বলল— মাদর··· আমাকে তুই উল্লুক বানাচ্ছিস নাকি ? আমি কি তোর মজদুর নাকি ? এটা ডাহা বেইমানি আর ঠগবাজি ছাড়া আর কি মদর···। বরকত নিজের ঘরে ফিরে যাবার প্রতীক্ষায় ছিল।

এতক্ষণ কোনোমতে নিজেকে চেপে রেখেছিল সোমা কিন্তু নিজের খুপরিতে পৌঁছে তার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল। সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল ; মুখে আঁচল টেনে দিল আর দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসে রইল।

ক্রোধে দিশেহারা হয়ে বরকত হাতের আস্তিন গুটিয়ে নিয়েছে। কোমরে হাত রেখে সোমার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁত কড়মড়িয়ে বলল— আমি তোকে এই লোকদের খাতির করতে বলেছিলাম আর তুই মুখ এঁটে বসেছিলি ?

মুখ থেকে আঁচল সরিয়ে সোমা ভেজা-চোখে তাকাল— তুমি জানো

ওরা কী করছিল ? বলে আঁচল দিয়ে আবার মুখ ঢেকে কান্না জুড়ে দিল।

ধড়াস করে একটা লাথি এসে পড়ল সোমার বগলের দিকে, মাথায়-ঘাড়ে দমাদম ঘুষি।

সোমার হৃৎপিণ্ডটা ধড়্ফড়্ করতে থাকল। কান্না বন্ধ হয়ে গেছে। বরকত তখনও রাগে ফোঁস ফোঁস করছে— হারামজাদী, ওখানে ঐ সাহেবের বাচ্চার সামনে ঠ্যাং ফাঁক করতে লজ্জাশরম ছিল না। আর এখানে ·· যেন দই জমিয়ে বসে আছে। মাদর···বড়ো সুন্দরী সাজতে চাইছে, ওসব ভদ্রতা বাপের সামনে দেখাস। শ' শ' টাকা তিনি ঠেলে ফেলে দিচ্ছেন। শালী··· তোকে আমি মেরে ফেলব। আমার কাছে বড়ো ভালোমানুষ সাজতে আসে··· যেন হারামজাদীকে আমি চিনি না!

মার খেয়ে যেন অসাড় হয়ে গেছে সোমা ; হাঁটুতে মুখ গুঁজে নির্বাক, নিশ্চল বসে রইল।

— কীরে, এখন যে বড়ো চুপ করে আছিস ? আবার একটা লাথি মারল বরকত।

—কী বলব ভাই ? ম্রিয়মাণ স্বরে সোমা জবাব দিল। সোমা যেন কাঁদতে ভুলে গেছে তবুও তার রুদ্ধ স্বর কান্নার মতো শোনালো— তোমার হাত ধরেই তো আমি বেরিয়ে এসেছি।

খ্যাপার মতো ঝাঁকি মেরে উঠল বরকত— বড়ো 'ভাই' পাতাতে এসেছে রে। ওখানে তো গলায় লটকে বলেছিলি, আমাকে নিয়ো চলো। আর এখানে কি তোকে আমার হাড়গোড় খাইয়ে পালব নাকি ? দাঁড়া, আজকে তোর দেমাক বার করব। তুই বড়ো সোজা লোক নোস।

বরকত খুপরির শেকল এঁটে বাইরে বেরিয়ে গেল। শেকলে বাইরে থেকে তালা দেবার আওয়াজ শুনতে পেল সোমা। শরীর

অসাড়, মস্তিষ্ক নিঃসাড় ; সোমা শূন্য মনে যেমন বসে ছিল তেমনি বসে রইল। আধ ঘণ্টা ধরে এরকম নিঃসাড় বসে থাকার পর ওর চেতনা ও বিচারশক্তি ফিরে এল। একটা কথাই বার বার মনটাকে তোলপাড় করছে, বেঁচে থাকার ব্যর্থ চেষ্টা করছে সে। মঝেরায় ওর মরণ হলে ল্যাঠা চুকে যেত, ধরমশালায় মরলে কার কী ক্ষতি হত, কিংবা লাহোরেই-বা মরল না কেন! ওর সঙ্গে তো সবাই শত্রুতা করেছে, ওকে আঘাত দিয়েছে, কষ্ট দিয়েছে, এখন মরে গেলেই বা কার কী ক্ষতি? দু'হাঁটুর মাঝে থুতনি ঠেকিয়ে নিষ্প্রাণ বসে আছে সোমা, মনে পড়ছে পুরোনো কত কথা, কখনও-বা স্মৃতি ও বিস্মৃতির মাঝখানে স্বপ্নে ভাসছে, আবোল-তাবোল চিন্তা ভিড় করছে মনে। সহ্য করে যাওয়া ছাড়া আর তো কোনো পথ নেই। সহ্য না করলে বাঁচার আর পথ কোথায়? চোখ বেয়ে অবিরাম জল গড়িয়ে পড়ছে।

দরজার ছিটকিনি খোলার শব্দ হল। সোমা চোখের জল মুছে নিল। ভাবল, পাশের বাড়ির খুপরির ভেতরের শেকল কেউ-বা খুলল। পাশের বাড়ির পুরুষটা রাতের সিফটে কাজ করে মিল থেকে ফিরল বোধহয়। সোমা ভাবল বরকতও নিশ্চয় এসেছে। হয়তো মদের বোতল খুঁজছে।

দেয়ালের ওধার থেকে একটা পুরুষের গলা শুনতে পাওয়া যাচ্ছে ; লোকটা ধমাধম মারছে আর গালি দিয়ে যাচ্ছে ; একজন স্ত্রীলোক কেঁদে ককিয়ে উঠছে। দু'জন স্ত্রীলোক পরস্পর পরস্পরকে গালি দিতে শুরু করল। বুড়ির গলার স্বর তীক্ষ্ণ, ছেনালি করার অভিযোগটা তীক্ষ্ণ স্বরে দিলেই তো মানায় বেশি। কারণ তাই শুনেই তো পুরুষটা হুংকার ছাড়ছে আর বলছে ও গলা কেটে নেবে।

প্রতিবেশীদের খুপরিতে এবার নিস্তব্ধতা নেমে এল। তবুও বরকত ফেরে নি। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সোমা ভাবল, ওখানে ছেনালি

করার জন্য মার পড়ছে আর এখানে ছেনালি কেন করছি না তার জন্যে মার খাচ্ছি। মার খাচ্ছে তবুও না-জানি কত তা গর্বের। ধনসিং ওকে একবার ছেনালির সন্দেহে ভয়ানক মেরেছিল।··· ওরকম একটা সন্দেহে জ্বলে উঠে সে দু'দুটো লোককে খতম করে দিয়েছিল ; নিজের জীবনটাই বরবাদ করে দিল। পুরুষরা যাকে নিজের স্ত্রী বলে ভালোবাসে, তার উপর অন্যের নজর যেন কিছুতেই সইতে পারে না। বরকত আমাকে বেশ্যা বানাতে যায়। ওর নিজের স্ত্রীর দিকে কেউ যদি বিশ্রীভাবে তাকায় তবে হয়তো মরতে চাইবে, মারতে উঠবে।

সোমা নিজেকে নিজেই প্রতারণা করেছে, এখন কেঁদে-কেটে কী লাভ ?··· কে শুনবে আমার কান্না ? হঠাৎ সোমার মনে পড়ল, বরকত শাসিয়েছিল— তোর এই দেমাক আমি ভাঙব। মদ খেতেই নিশ্চয় গেছে। সাহেবও মদ খেয়ে নেশার ঘোরে রঙবাহার দেখত, কীসব কথাবার্তা বলত ! সোমার সেসব কথা মনে পড়লে ঘৃণা হয়। মদ খেয়ে বরকত হয়তো তার ইচ্ছা পূরণ করতে চাইবে ; সে কথা ভেবেও ওর মনে কেবল যেন একটা ঘৃণা জাগল। আবার ভাবল, বরকত যদি ওকে ওর স্ত্রী বলে ভাবতে পারে তবে আর যাই করুক তাকে বেশ্যা বানিয়ে অন্যের হাতে অন্তত বিক্রি করবে না। এতশত লোকের হাতে পড়ার চেয়ে তো খুব খারাপ থেকে খারাপ একটা লোকের সঙ্গে সাঁপটে থাকও ভালো। একজন পুরুষের আশ্রয়ে থাকা খুবই জরুরি। পুরুষের আশ্রয়ে ছাড়া কোনো স্ত্রীলোক কী করে থাকবে ? পাশের ঘরে যে বউটা নিজের স্বামীর হাতে মার খাচ্ছিল, তাকে এখন সোমা ঈর্ষা করতে থাকল।

সোমা এবার খুপরির দরজা খোলার আওয়াজ পেল। বরকত ভিতরে আসার সঙ্গে সঙ্গে দেশী মদের কড়া গন্ধ পাওয়া গেল, গা গুলিয়ে ওঠে যেন। ওর পা দু'টো টলছে। সোমার দেমাক ভাঙবে

বরকতের সে কথা আবার মনে পড়ে গেল। মনটা গ্লানি ও ঘৃণায় ভরে গেল, তবুও ভাবল, এসব সহ্য করেও সে যদি বেশ্যা হবার হাত থেকে বাঁচতে পারে, যদি কোনো একজনের ঘরের গৃহিণী হয়ে থাকতে পারে?

বরকতের চোখেমুখে নেশার ঘোর, ঠোঁট পাপড়ির মতো খোলা। সোমার কাছে এসে টাল সামলাতে পারল না, বসে পড়ল, বলল— এখন বল। খুব কষ্ট করে যেন কথা বলছে বরকত। বলেই সোমার হাতটা থপ্ করে ধরল।

একটু যেন কুঁকড়ে গেল সোমা। একটু আগে মনের মধ্যে ঘৃণার যে বিষণ্ণ ছায়া দেখেছিল, তা জোর করে চেপে রেখে একটু মুচকি হেসে বলল— তোমার সঙ্গেই তো আমি এসেছি। মনের দ্বিধা কাটিয়ে উঠে সোমা আবার হাসল, এখন যেন মার খেতেও রাজি।

গাছের শেকড় উপড়ে ফেলার মতো বরকত ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ল। যেন গন্ধ-নালায় ডুবে যাচ্ছে এরকম একটা গ্লানিতে সোমার মন বিষিয়ে উঠল। মাটিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল, গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল, আবার দেয়াল-ঘেঁষে বসল। এও ওকে সইতে হল··· যে করেই হোক একটা দৃশ্যের সমাপ্তি তো হল। সোমা ওরকমই বসে রইল।

ভোরের নির্জনতা ভেঙে অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে কল-ঘর থেকে জল পড়ার শব্দ আসছে। সোমা স্নান সেরে আসতে উঠে গেল। নেয়ে এসে ও আবার দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসে রইল। নাকে উঠে আসছে মদের বিশ্রী একটা গন্ধ; বরকত বেহুঁশের মতো পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে, অল্প অল্প নাক ডাকছে। বরকতকে এরকমভাবে পড়ে থাকতে দেখে সোমার মনটা বিতৃষ্ণায় ভরে গেল কিন্তু আবার ভাবল, এখন ওর এই অবস্থায় বরকত তার একমাত্র অবলম্বন, ওর সর্বস্ব। তবুও কেন জানি মরতে ইচ্ছে করে। আবার ভাবে মরার ইচ্ছা থাকলে আগেই মরত, ধনসিং যেদিন চলে গিয়েছিল সেদিনই ওর মরা উচিত ছিল।

বেশ বেলা গড়িয়ে যাবার পর সোমা চা তৈরি করে বরকতকে ডাকল। বরকত একটু নড়েচড়ে উঠে আবার গভীর নিদ্রায় ডুবে গেল। সোমা দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে রইল। দুপুরবেলা বরকত ঘুম থেকে উঠল। মাথাটা ভার হয়ে আছে, মাথা তুলতে পারছে না বরকত। মাথায় দরদ হচ্ছে জেনে সোমা ঠাণ্ডা চা গরম করে নিয়ে এসে চায়ের পেয়ালাটা ওর হাতের কাছে রেখে বলল— ভীষণ মাথা ধরেছে বলছ, চারটে পয়সা না-হয় দাও। পাশের খুপরির ছেলেটাকে দিয়ে মাথা ধরার ওষুধ আনিয়ে দিই।

ময়লা একটা চাদরে শরীরটাকে জড়িয়ে বরকত উঠে দাঁড়াল। বিশ্রী একটা গালি দিল— কার মা··· একই গালির পুনরাবৃত্তি করে বলল— কার মার···কাছে আফিমের জন্যও চারটে পয়সা আছে শুনি? তুই আমাকে এভাবেই খাবি. ওরকমভাবেই তুই আমাকে শেষ করে দিবি। কাল ঐ হারামির সঙ্গে কথা হয়ে গিয়েছিল। মাদর··· তুই যদি ওরকম লাথি না মারতি তবে এই সময়ে পকেটে কুড়ি-পঁচিশ টাকা থাকত! আবার গালি দিল বরকত বহিন কী ·· তুই এতটা ঠগবাজ যদি জানতাম; এরকম মেজাজ দেখাতে চাস তো তুই তোর পথ দেখ! আমার কিসের পরোয়া; আমি আজই গিয়ে সৈন্যদলে নাম লেখাতে পারি। ভাত-কাপড় সরকারই দেবে। রাস্তায় যখন ফ্যা ফ্যা করে বেড়াবি, পয়সার জন্য হাত বাড়াবি তখন রূপসী হয়ে থাকার মজাটি টের পাবি।

ভয়ে কাঁপতে থাকল সোমা, চোখ বন্ধ করে কী যেন ভাবতে লাগল। সোমা ভাবছিল, এতটা পতন হবার পরেও কী করে মাটিতে দাঁড়িয়ে আছি? আসলে এটা ওর মনের ভুল। সেটা ভেবেই বরকতের দিকে তাকিয়ে দৃঢ়স্বরে বলল— যাক্ যা হয়ে গেছে তা নিয়ে না ভেবে, বলো এখন কী করতে হবে।

বরকতের সুর একটু যেন নরম হল— যদি সামলে নিতে পারিস, তবে মালকিন হয়ে যাবি, লোকে তোর পা চাটবে। বড়ো বড়ো লোক তোর পায়ে লুটিয়ে পড়বে। আরে তোর যা রূপ তা কি এরকম খুচরো দরে বিক্রি হবে নাকি? তুই তো আস্ত বেকুব। ঐ শালা শেঠটাকে যদি কাবু করে ফেলতে পারতিস তবে শালার থেকে খুব সহজেই চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকা হাতাতে পারতাম। তখন আলাদা একটা বাড়ি নিয়ে থাকতে পারতিস! এখানেও যদি ওরকম বোকামি করিস তো কী করে হবে? অমাবস্যার কাছে ফুলের মূল্য কোথায়; তুলে এনে টেবিলে রাখো— ফুলের তোড়ার রূপ খুলবে; মাটিতে পড়ে গেলে আঁস্তাকুড়। তুই তো আবার পড়াশুনাকরেছিস। এখানে হাজারো গাধা কত পয়সা রোজগার করছে। এখন তো মেয়েদেরই রাজত্ব হয়ে উঠছে। তোকে দিয়ে আমারও রুটিরুজি জুটে যাবে, এটাই তুই ভাবতে শেখ। শুধু তো সুযোগ পাবার ব্যাপার। ঐ তো শালা বনোয়ারী, ছিল জীবা ভাইয়ের ড্রাইভার। শেঠ ডাইরেক্টরকে একটু বলে দিয়েছে তো শালা এখনডায়লগ লেখে আর ভাঁড়ের পার্ট করে মাসে হাজার টাকা লোটে। শালার কাছে যখন যাবে দেখবে নতুন নতুন মেয়েমানুষ আর বিলিতি মদের বোতল। সেই বনোয়ারী এখন শালা ডাইরেক্টরের নাকের রোঁয়া হয়ে উঠেছে। লম্বা-চওড়া কথা বলে অনেক সময় বুঝতেও পারি না। যখন ইচ্ছে ও শালাকে ডেকে আনতে পারি; এক বোতলের ইয়ার ছিল।

*　　*　　*

যাদের সঙ্গে পরিচয় ছিল বরকত সবার কাছ থেকেই টাকা ধার করেছে। ধার শোধ দেবার এখন তো প্রশ্নই ওঠে না। ও এমন

একটা অবস্থায় পৌঁছে গেছে যখন নির্লজ্জতাই লাভ। গত রাতে বনোয়ারী ওকে 'ফুলমুন' হোটেলে বড়ো পরিশ্রান্ত দেখেছিল। একজন মহিলার ভদ্রতা ও ভালোমানুষির জন্য হয়রান হয়ে 'ব্যাক-আউটে'র অন্ধকারে বেরিয়ে এসে ছয় মাইল হেঁটে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। মহিলাকে দেখে বনোয়ারীর কেন জানি খুব কষ্ট হয়েছিল। বরকত একবার টাকা ধার নিয়েছে কিন্তু এখনও ফিরিয়ে দেয় নি ; তা সত্ত্বেও বনোয়ারী ওকে দশ টাকা দিয়েছিল।

বনোয়ারীর ভদ্র ব্যবহারে উৎসাহিত হয়ে বরকত বিষণ্ন মনে বিকেলের দিকে আবার দারেফেজ স্টুডিয়োতে গিয়ে হাজির। বনোয়ারী ওকে দেখেই জিজ্ঞেস করল— ঐ মহিলাকে ফিল্মে ঢোকাতে চাইছিলে, না ? দোস্ত, কোনো ডাইরেক্টরের হাতে ও যদি নিজেকে বিকিয়ে দেয় তো — ? একটু থেমে ঠাট্টার ছলে বলল— বা রে মিয়া, ঘোড়ার লাগাম না লাগিয়েই সওয়ারী জোগাড় করতে বেরিয়েছ, এত তোমার তাড়া পড়েছে ? একেবারে আনাড়ী দেখছি। আরে মিয়া, মেয়েটা কারো ঘুম কেড়ে নেয় নি তো ?

বরকত গোঁফে তা দিয়ে বলল— ওস্তাদ, বোঝা বইবার জন্য তো এটা টাট্টু ঘোড়া নয়। আর তা ছাড়া কি জানো ওস্তাদ, সেরকম খানদানী ঘোড়া হলে সওয়ারীর ঊরু পর্যন্ত চিনে দেয়।

—আমিও দেখব নাকি ? বনোয়ারী চোখ মেরে বলল।

—ভাই, তোমাকে তো আমি প্রথমেই বলেছি, সবচেয়ে আগে তোমার কাছে এসেছি। তুমি সমঝদার লোক, লেখাপড়া-জানা মানুষ, আবার তোমার সাহেবী কলম।

—আচ্ছা, তাহলে একদিন আসব। বনোয়ারী ভরসা দিল। সুযোগ বুঝে বরকত আরও পাঁচটা টাকা চাইল। বনোয়ারী পাঁচ টাকা বার করে দিল। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় দারফেজে শুটিং ছিল না। বনোয়ারী

আবার ভুলে না যায়, এই আশঙ্কায় বরকত স্টুডিয়োর বাইরে অপেক্ষা করছিল। বনোয়ারী বাইরে এলে বরকত তাকে স্মরণ করাল—এখন আসবে তো ?

অন্ধকার হয়ে এসেছে, ঘরে ঘরে আলো জ্বলে উঠেছে। সোমা ডাল-ভাত রেঁধে এক কোণে রেখে দিয়ে ঘরের মেঝেয় একটি শতরঞ্জি বিছিয়ে শুয়ে ছিল। দেখল বরকত সঙ্গে করে কাকে যেন নিয়ে এসেছে। সোমা দু'জনের জন্য শতরঞ্জি ছেড়ে নিজে দেওয়ালের দিকে পিঠ ঠেকিয়ে এক কোণে বসল।

বরকত পরিচয় করিয়ে দিল—এই যে আমার পাঞ্জাবী বন্ধু। বলছিলাম না, সিনেমার ডায়লগ লেখে, খুব বিদ্বান লোক। একে ফিল্ম জগতের ডাইরেক্টর ও মালিকরা খুব খাতির করে।

বনোয়ারী সোমার উদাস মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। ও বুঝতে পারল, বরকতের অভিপ্রায় আঁচ করে সোমা অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে স্বাগত জানাচ্ছে আর হাসবার চেষ্টা করছে।

এদিকে বরকত তখনও বনোয়ারীর যোগ্যতা ও প্রভাব নিয়ে বিস্তর প্রশংসা করে যাচ্ছিল। ওকে থামাতে বনোয়ারী ওর হাতটা মুখে চেপে ধরে পাঞ্জাবীতে বলল—থাক্, থাক্, অনেক বকবক করেছ, এখন থামো তো !

—হ্যাঁ, এর জন্যে চা বানাও—বরকত বলল—জানো তো এ আমাদের আপনজন—ব'লে বরকত আবার তার প্রশংসা শুরু করল।

বনোয়ারীর এখন চা খাওয়ার ইচ্ছে নেই, মাথা নেড়ে বারণ করল এবং অন্য নানা কথা বলতে থাকল। তাকে আদরযত্ন করতে সোমাকে বলে বরকত বেরুবার জন্য পা বাড়াল—আচ্ছা, আমি বনোয়ারীর জন্য ফলটল পাই কিনা দেখে আসি, তুমি খুব ভালো করে চা তৈরি করো, বুঝলে, খুব ভালো করে।

বনোয়ারী বরকতের হাত টেনে ধরে ওকে বাধা দেবার চেষ্টা করল কিন্তু বরকত হাত ছাড়িয়ে নিল — এটা কী করে হয়? ব'লে তড়িৎ গতিতে বেরিয়ে গেল।

সোমার মুখে উদাস ছায়া পড়েছে, বনোয়ারীর তা নজর এড়াল না। সহানুভূতির স্বরে পাঞ্জাবীতে সম্বোধন করে বনোয়ারী বলল— মনে হচ্ছে আপনি বম্বেতে বেশি দিন আসেন নি?

—এই তো কয়েকদিন মাত্র হল। সোমা হাসবার চেষ্টা করল।

বনোয়ারী সায় দিল— আমাদের ওদিককার লোকদের বম্বের আবহাওয়াটা ঠিক যেন খাপ খায় না। খাওয়াদাওয়াও তেমনি, কিছুই পাওয়া যায় না। খুব রোগা হয়ে গেছেন, না?

বনোয়ারীর সহৃদয় ব্যবহারে সোমা বুঝে নিল এর কাছে জোর করে হাসবার প্রয়োজন নেই, তাই মুখ নিচু করে নীরব রইল।

বনোয়ারী জানতে চাইল— আপনি কি সিনেমায় কাজ করতে চান?

সোমা মুচকি হেসে বলল— হ্যাঁ জী।

বনোয়ারী অনুভব করল এই মহিলা নিজের অন্তরের দুঃখ লুকোবার চেষ্টা করছে। দেয়ালে ঠেস দিয়ে একটু আরাম করে বনোয়ারী সিগারেট ধরালো. সিগারেটে কষে একটা টান মেরে বলল— সিনেমার জগৎটা খুব একটা ভালো জায়গা নয়, তবু অন্য কোনো খারাপ জায়গা থেকে অবশ্যই অনেক ভালো। এ দুনিয়ায় সৎভাবে থাকা মহা মুশকিল, ভালো হয়ে থাকতে গিয়ে মানুষ শেষ হয়ে যায়। সিগারেটটায় শেষ টান দিয়ে সেটাকে ফেলে দিয়ে বনোয়ারী বলল— আচ্ছা আমি চলি। বরকত কখন আসবে কে জানে?

সোমা উদাস ভাবটা জোর করে কাটিয়ে উঠে ভাবল, অতিথিকে খাতির-যত্ন তো কিছুই করা হল না। কেন জানি এ কথাও ভাবল, বরকতের চেয়ে এই মানুষটির আশ্রয়ে থাকা অনেক বেশি নিরাপদ,

এর ঘরে থাকতে পারলে অনেক বেশি শান্তি পাবে। এ কথা ভেবেই জোরকরল সোমা— একটু বসুন-না, আমি এক্ষুনি চা তৈরি করে আনছি।

—না, না। বনোয়ারী হাত নেড়ে আপত্তি জানাল, বলল— আমার এখন চা খেতে ইচ্ছে করছে না। ভাববেন না, চা এখন থাক্। হ্যাঁ, ভালো কথা, সিনেমায় যদি যান নিজের পরিচয় কিভাবে দেবেন? তুনিয়ায় একটি লোকের আশ্রয়ে থাকলে ভালো হয়, এটাও ভেবে দেখবেন। বনোয়ারী উঠে দাঁড়াল।

সোমা কাতর স্বরে অনুরোধ করল— আরও একটু বসুন-না। চা আপনাকে খেতেই হবে, আমি তু'মিনিটে তৈরি করে আনছি। এতদিন পরে সোমা এমন একজনের দেখা পেয়েছে যাকে ও ভাবতে পারছে সজ্জন, ভদ্র।

সোমার কাতর আবেদনে বনোয়ারী বসল; সোমা চা বানাতে লাগল। চায়ের পেয়ালাটা বনোয়ারীর সামনে রেখে সোমা এক কোণে সরে বসল। একটু পরে সাহস সঞ্চয় করে জিজ্ঞেস করল— আমার দ্বারা সিনেমার কাজ হবে তো?

বনোয়ারী সাহস জোগাল— করলে সব হবে। যে মানুষ বুকের তুঃখ চেপে রেখে হাসতে পারে সে সিনেমার কাজ খুব ভালো করতে পারবে।

চা খেয়ে উঠবার আগে বনোয়ারী বলল— শুনুন, আপনি খুব মুশকিলে আছেন বুঝতে পারছি। বরকতকে আমি খুব ভালো চিনি, লোক খুব সুবিধের নয়। এই তুটো নোট নিজের কাছে রেখে দিন।

দশ টাকার তুটো নোট পকেট থেকে বার করে বনোয়ারী সোমার সামনে রেখে বলল— বরকত আপনাকে না-খাইয়ে মারতে পারে, বরকত সব-কিছু করতে পারে। টাকার কত দরকার পড়তে পারে। তুনিয়ায় টাকার অবলম্বন মস্ত বড়ো কথা। এমনভাবে রাখবেন যাতে

বরকত দেখতে না পায়। এখন আমি চলি। বনোয়ারী ঘরের বাইরে পা বাড়াল।

সোমা নোট নিতে আপত্তি করে নি, আবার ছোঁয়ওনি।

বনোয়ারী চলে গেলে সোমা আঁচলে মুখ ঢেকে অঝোরে কাঁদতে লাগল। একটু পরে উঠে নোট দুটো তুলে লুকিয়ে রাখল। কেবলই ভাবতে থাকল, এই ভালো মানুষটি যদি আমাকে আশ্রয় দেয় তবে আমি এখনও বাঁচতে পারি। বনোয়ারী খুপরি থেকে কয়েক পা যেতেই বরকতের সঙ্গে দেখা। বরকতের ঔৎসুক্য আন্দাজ করে বনোয়ারী ওর হাত ধরে বলল— বড়ো চমৎকার মাল এনেছ, দোস্ত। ওর পিছনে পিছনে ওয়ারেন্ট আসছে না তো?

বরকত জোরে জোরে মাথা নাড়ল— ওস্তাদ, আমার ওপর আস্থা রাখো। একটু থেমে আসল কথা জানতে চাইল— কোনো কাজটাজ দিচ্ছ তো।

বনোয়ারী একটা সিগারেট বরকতের সামনে ধরল ও নিজেও একটা ধরাল। একটু ভেবে নিয়ে বলল— সকাল এগারোটার সময় স্টুডিয়োতে এসে যেয়ো, একটা-কিছু ভাবা যাবে।

সিনেমা জগতে বনোয়ারীর আজকাল খুবই সুনাম। ওর সূক্ষ্মবুদ্ধি আর ওর যাযাবরী স্বভাবটাও প্রসিদ্ধ। বেশ বয়স হয়েছে কিন্তু দেখলে আরও বেশি বয়স্ক মনে হয়। শুধু সিনেমা জগতের নয়, জীবনে অনেক ঘাটের জলই ও খেয়েছে।

1919 সালে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময় হাজারো ছাত্র যখন কলেজ ছেড়ে কর্মযজ্ঞে নেমে পড়েছিল, বনোয়ারীও ছিল তাদের

একজন। তখন সে অনেকের মতোই দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে স্বেচ্ছাসেবক হয়েছিল। কিছুদিন পরে কংগ্রেসের নেতারা অসহযোগ আন্দোলনের পথ ছেড়ে সহযোগিতা করতে লাগলেন। যুদ্ধের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ সোচ্চার হয়ে উঠেছিল, কংগ্রেস এখন তার পরিবর্তে সংবিধানগত আন্দোলনের সমর্থক হয়ে উঠল। এখন অবৈতনিক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর আর কোনো আবশ্যকতা রইল না। যাঁরা সময় দিতে পারবেন আর যাঁরা টাকাপয়সা ঢালতে পারবেন— এখন সেই সব লোকদেরই মহত্ত্ব বজায় রইল।

বনোয়ারীর পরিবারের আর্থিক অবস্থা মোটেই সুবিধের ছিল না। ও পয়সাকড়ি কামানোর জন্য এক পত্রিকার দপ্তরে একটা কাজ নিয়েছিল, কিন্তু এই সংবাদপত্রে নিজের ইচ্ছেমত লিখতে পারত না। আবশ্যকমত টাকাকড়িও পেত না। ওর এই পোড়া ভাগ্যের প্রতি মোটেই ও প্রসন্ন ছিল না। আর্থিক স্থিতির দিক থেকে বনোয়ারী ছিল নিম্ন-মধ্যবিত্ত, কিন্তু চিন্তায়-ভাবনায়, বিচারে ও একটু উন্নত-ধরনের মানুষ ছিল। লেখক হিসেবে সম্পন্ন পরিবারে ওর আসা-যাওয়া ছিল।

বনোয়ারী নিজের বুদ্ধি ও চাতুর্যের প্রতি আস্থা রেখেই বোধহয় আঘাত পেয়েছিল, ঠকেছিল। ও এক অবস্থাপন্ন পরিবারের এক সুশিক্ষিতা বিধবার প্রেমে পড়ে গেল। বিদুষী ও অবস্থাপন্ন বিধবা ওর প্রেমকে গ্রহণ করেছিল ঠিকই কিন্তু ওকে বিয়ে করে ঘর-সংসার করতে চায় নি। ওদের সোনালী প্রেম শেষে কেমন যেন জট পাকিয়ে গেল আর তা নিয়ে ঝগড়া আর মনোমালিন্য। ভালোবাসার রঙিন স্বপ্ন-রাজ্যে থেকে বনোয়ারী তার প্রকৃত অবস্থা ভুলে ছিল কিন্তু মন-কষাকষি শুরু হওয়ায় বুঝল দু'জনের পার্থক্য কত গভীর। বনোয়ারী শুধু চিন্তা ও বিচারের জগতে বিচরণ করছিল; কল্পনাশক্তি আর ওর

মানসিকতা ওকে তৃপ্তি দিত কিন্তু ওর জীবনের ভবিষ্যৎ, ওর সাফল্যের মাপকাঠিতে যখন ওর মূল্য বিচারের প্রয়োজন দেখা দিল, তখন দেখল বাজারে ওর ওজন ও মূল্য মোটেই ভরসা দেবার মতো নয়। এ নিষ্ঠুর সত্যকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল বনোয়ারী। জীবনের একটা নতুন অধ্যায় শুরু করার জন্য ও লাহোর ছেড়ে বোম্বাইয়ে চলে গিয়েছিল।

জীবনের সম্পদ ও সামর্থ্যের মানদণ্ডে খুবই মূল্যহীন প্রমাণ হলেও বনোয়ারী জানত ওর মধ্যে শিল্পপ্রতিভা আছে ; শিল্পজগতের সবচেয়ে বড়ো মাধ্যম সিনেমায় একটা স্থান করে নেবার জন্য ও চেষ্টার ত্রুটি করে নি। নিজের প্রতিভার স্বাক্ষর অনেকগুলি গল্প-কাহিনী বগলদাবা করে ও তখন ছায়াচিত্র জগতের ব্যবসাদারদের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরছিল। এই শিল্পকলা জগতের ব্যবসাদার ও ইঞ্জিনিয়াররা ওর ভালোমানুষির পরিচয় পেয়ে শুধু একটু বাঁকা হাসলেন। এক অজানা অজ্ঞ লেখকের প্রতিভাকে মূলধন করে পাঁচ-দশ লাখ টাকা ঢালবার মতো মূর্খ কে আছে ?

ততদিনে বনোয়ারী না-খেতে-পেয়ে মরার অবস্থায় পৌঁছে গেছে; কিন্তু নিজের আত্মসম্মান ও বুদ্ধির অহংকার তখনও ওর কাটে নি। ও স্থির করল, নিজের শিল্পকর্ম বেচার চেয়ে ও বরং নিজের কায়িক শ্রম বেচবে। নিজেকে অশিক্ষিত বলে জাহির করে ও একটা চাপরাশীর চাকরি পেয়ে গেল। কিন্তু ওতে যা মাইনে পেত তা দিয়ে জীবিকা নির্বাহ হয় না। শরীরে সারাক্ষণ ঘুসঘুসে জ্বর আর খক্‌খক্ কাশি। আয়নায় নিজের চেহারা দেখে নিজের উপরেই যেন মায়া হয়, নিজেকে নিজে করুণা করে। ও মানতে বাধ্য হয় যে, নিজের বুদ্ধি, কল্পনাশক্তি আর মানসিকতা যার আছে সে শরীরের অবস্থাকে একেবারে উপেক্ষা করতে পারে না। বুঝতে পারে আবশ্যকীয় খাবারদাবার, কাপড়চোপড় আর কিছু পড়াশুনা-লেখা ছাড়া বাঁচা মুশকিল।

বনোয়ারী ঠিক করল এক্সট্রা অ্যাক্টর হলে হয়তো ওর মূল্য একটু বাড়বে। এর জন্যেও ওর যোগ্যতার পরিচয় দিতে হবে। ওর যা অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে ও অনুভব করল এবং স্বীকার করে নিল যে সিনেমার লাইনে খোশামোদের যোগ্যতার চেয়ে বড়ো যোগ্যতা আর নেই। যে এজেন্সি এই এক্সট্রা শিল্পীদের জোগায় তাদের মারফৎ এক সেনা-শিবির দেখাবার ভিড়ে সামিল হয়ে বনোয়ারী একটা স্টুডিয়োতে ঢুকবার সুযোগ পেল।

বনোয়ারী আত্মসম্মানের সেই পুরনো অহংকার ছেড়ে ডাইরেক্টর সাহেবের হাতের পুতুল হয়ে ওঠার মধ্যেই নিজের ভবিষ্যৎ দেখতে পেল ; নিজের ক্ষুদ্র বুদ্ধির তুলনায় ডাইরেক্টর সাহেবের মহত্ত্ব যে কত বিশাল এটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার জন্যও প্রতিভা থাকা দরকার। আর বনোয়ারী সে প্রতিভা দেখাতে সমর্থ হয়েছিল। সুতরাং ডাইরেক্টরের তাকে খুব পছন্দ হয়ে গেল। বনোয়ারী স্টুডিয়োতে নিজের অল্প বুদ্ধি ও মূর্খতার অভিনয় চালিয়ে যেতে লাগল। অন্যের মূর্খতা দেখে দর্শকরা যেমন নিজেদের বুদ্ধিমান মনে করে আর সে অহংকারে একটা তৃপ্তি অনুভব করে, অনেকটা সেইরকম। এ-ব্যাপারে বনোয়ারীর মূল্য দিন দিন বেড়ে যেতে লাগল।

অভিনয়ের ক্ষমতায় নিজের পথ করে নেওয়ার মধ্যে একটা চমক আছে ; ওর ক্ষমতায় ও যেন চমকে উঠল। এখন ছায়াছবির জগতে ওর একটাই মন্ত্র : যা তুমি বলবে আমি তা করে দেখাতে পারি। হাস্যকৌতুক অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে বনোয়ারী ডায়লগের মধ্যেও হাসির খোরাক দিতে শুরু করেছে। ডাইরেক্টরের সামনে ও এমন ভাব করত যে, যা ও লিখছে, বলছে সবই ডাইরেক্টরের কথা ও চিন্তা ; ও তো শুধু ডাইরেক্টরের কথার রূপ দিচ্ছে। ডাইরেক্টর যদি কখনো ভুল করত, উল্টোপাল্টা কথা বলত, বনোয়ারী সেটা বুঝেও উৎসাহ দেখাত,

তাঁর কথা সমর্থন করত। এভাবে ডাইরেক্টর মহন্ত ওকে নিজের ডান হাত ভাবতে শুরু করেছিলেন। শিল্প-সাহিত্যের প্রতি ওর যে একটা গভীর শ্রদ্ধা ছিল, ও যে ভাবত শিল্পসাধনা আনুগত্যের সাধনা, সংবুদ্ধির সাধনা— সে অহংকার কবেই বিসর্জন দিয়েছে। এখন ও ভাবে, যে শিল্পসাধনা রুটিরুজি জোগায়, জীবিকা নির্বাহে সহায়তা করে সেটাই শিল্প, সেটাই সাধনা। আগে নিজেকে শিল্পী ভাবত, ভাবতে পারত ; এখন নিজেকে বলে 'কলাবাজ'।

দারফেজ কোম্পানিতে 'জ্বলন্তা ঘোঁসলা' (অগ্নিদগ্ধ নীড়) ফিল্মের কাজ চলছিল। দুটি খুব সফল ইংরেজী ফিল্মের প্লট মিলিয়েজুলিয়ে তার একটা ভারতীয় সংস্করণ করে যে কাহিনীর সৃষ্টি— তা নিয়েই এই ফিল্ম — এটা অবশ্য ডাইরেক্টর সাহেবের সমঝ ও মস্তিষ্কের ফসল। এতে আবার বিস্তর নাচ-গান। 'সোসিয়াল হিট' কী করে হতে পারে ডাইরেক্টর সাহেব সেই আশায় স্বপ্নে বিভোর ছিলেন। এ ফিল্মে ঘরোয়া জীবনের রহস্যপূর্ণ দৃশ্য দেবার প্রয়াস চলছিল। অর্ধেক ফিল্মের স্যুটিং হয়ে গেছে ; কাহিনীর শেষাঙ্ক এখন ডাইরেক্টর সাহেব ও বনোয়ারীর মস্তিষ্কে খেলা করছিল।

ফিল্মে দৃশ্যের পর দৃশ্য তৈরি হয়ে যাচ্ছে : নায়ক নিজের শ্যালিকার বিয়েতে যাবে, অর্থাৎ তার নিজের শ্বশুরবাড়ি ; সেখানে নায়িকার এক বান্ধবীকে দেখে নায়ক মুগ্ধ হয়ে যাবে। নায়িকার নাম মণি, এ শক্ত পার্টের জন্য ডাইরেক্টর সুঅভিনেত্রী চন্দ্রাকে বেছে নিয়েছেন। নায়িকার বোনের বেশি পার্ট নেই। এই পার্টের জন্য তিনি দু'হাজার টাকায় গোমতীকে ঠিকা নিয়েছিলেন। গোমতী তিন দিন রিহার্সাল করে গেছে কিন্তু ড্রেস রিহার্সালের দিন সে আসে নি। নায়িকার বোনের এই পার্টটি তখন করেছিল রহীমা, এর সঙ্গেও ঠিকাদারী ব্যবস্থা। গোমতী ও রহীমা— বেশ কয়েকটি জায়গায় কিছু কিছু কাজ করে।

গোমতী না আসাতে কোম্পানির লোকসান তো হচ্ছিলই, উপরন্তু ওদের এই দৃশ্যের জন্য অন্য যেসব অভিনেতা আসছিল, তাদের জন্যও সময় ও টাকা বরবাদ হচ্ছিল; এ ছাড়া স্টুডিয়োর ভাড়া তো আছেই। এতে আবার রহীমারও লোকসান, কারণ 'আর্কেট' কোম্পানির লোকেরা ওকে দুটি গানের জন্য তলব করছিল। দারফেজ কোম্পানিতে নিজের ঠিকাদারীর কথা ভেবে রহীমা অন্য কোম্পানিকে বারণ করে দিয়েছিল। রহীমা ডাইরেক্টরকে চুকলি করল যে, গোমতী আপনার কাজে আসে নি আর ওদিকে তার আর্কেট-এ যাবার সময় হয়েছে ঠিক।

ডাইরেক্টর মহন্ত অভিনেত্রীর এই বেইমানিতে ক্রুদ্ধ হলেন। আর্কেট কোম্পানির লোকেরা দারফেজের লোকসান ঘটাতে আরও অনেক রকম অন্যায় করে যাচ্ছিল। বনোয়ারী সুযোগ বুঝে ডাইরেক্টর মহন্তকে বলল — শুনেছি গোমতীর কাসব বিশ্রী অসুখ হয়েছে। গর্মির হকীমের দরজায় ঘোরাঘুরি করছে। ক'দিনের মধ্যে ওর সমস্ত মুখে যখন ফুনকুড়ি বেরোবে তখন ঐ অভাগীর মেক-আপ্ করলেও ও পাপ ঢাকা পড়বে না। হুজুর, নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন ওর গলার স্বরেও কত পার্থক্য এসে গেছে। তা ছাড়া হুজুর, ওকে দিয়ে যা করাতে চাইছেন, সে যোগ্যতাই ওর নেই।

মহন্ত নিজের সিগারেট কেস বনোয়ারীর সামনে এগিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন— মানে?

বনোয়ারী একটা সিগারেট নিয়ে বলল— হুজুর, গোমতীর তাঁদড়ামি একটু যেন বেড়ে গেছে। এমনি তো আপনি জানেন ও অনেক সহজ ব্যাপার বুঝতে পারে না। এই তো দেখুন মণি, মানে চন্দ্রার তুলনায় তার বোনের রূপ বা ভঙ্গি এমন হওয়া চাই যে শুধু যে হিরো কাত হয়ে যাবে তাই নয়, তামাম পাবলিক তাকে দেখে থ' হয়ে যাবে। আপনি এর মেক-আপ্ পালটে ফেলার ব্যাপারে একটু

ভেবে দেখবেন। 'সাইলেন্ট লার্ক'-এ 'উইনসন্' থেকে 'ডোরা' অনেক বেশি সুন্দরী। অভিনয় যদি ভালো না-ও হয়, অন্ততঃ চেহারার মধ্যে তো একটা জলুস থাকা চাই।

—হুঁ। সিগারেটের ধোঁয়ায় মহন্তের জ্বলজ্বলে চোখ দুটিতে চিন্তার ছায়া পড়ল। তিনি গভীর ভাবনায় ডুবে রইলেন।

বনোয়ারী বলে গেল — হুজুর, কাল আমি একজন মহিলা দেখেছি। তাকে যদি একবার স্টেজে নিয়ে আসা যায় আর আপনার ডাইরেকশন যদি সে পায় তবে 'জ্বলতা ঘোঁসলা' সব ছবিকে মাত করে দেবে। মহিলাকে খুব বুদ্ধিমতী মনে হল আর দেখতে ঠিক যেন 'সাইলেন্ট লার্ক'। আপনার ডাইরেকশন ঠিক ঠিক ধরতে পারবে। আপনার হুকুম হলে তাকে ডেকে একবার দেখা যেতে পারে। গোমতীর রিহার্সালও তো এখনো পুরোপুরি হয় নি। হুজুর, এক-আধজন নতুন চেহারাও তো আসা দরকার।

মহন্ত চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে বললেন— এখন আসতে পারবে তো? হ্যাঁ, ডাকো, ব্যবস্থা করো।

* * *

সোমা সিনেমা কোম্পানির গাড়িতে বসে মহীম থেকে অন্ধকারের মুখ দেখতে দেখতে আসছিল। বরকত তার পাশে খুব বিনম্র সুরে উপদেশ ঝাড়ছে— অনেক চেষ্টায় এরকম একটা সুযোগ এলো। এখন যদি সামলে নিতে পারো সারা জীবন আর জীবিকার জন্য ভাবতে হবে না।

সোমার এ-সব কথা শুনে প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল; জোর করে মুখ বুঁজে ছিল। তেরছা নজরে বরকতের মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবছিল—

তোর হাত থেকে বাঁচতে আমি কুয়োতে ঝাঁপিয়ে পড়তেও রাজি। ভয় পাবার মতো আমার আর কীই-বা অবশিষ্ট আছে? কালকে যে এসেছিল সে বড়ো ভালো লোক; সে যদি একটু সাহায্য করে। হে ঈশ্বর, সেই ভালো মানুষটি যেন ওখানে থাকে।

স্টুডিয়োতে সবার আগে বনোয়ারীর সঙ্গেই দেখা হল। ও এগিয়ে এসে ভরসা দিল— কোনো কথায় ঘাবড়াবে না, বুঝলে।

কুয়োতে ঝাঁপিয়ে পড়ার সাহস বুকে বেঁধে সোমা এখানে এসেছে। ও বুঝতে পারল, এই মানুষটি হাত বাড়িয়ে ওকে কুয়োর থেকে তুলবে এবং কুয়ো পেরিয়ে অনেক দূর এগোতে সাহায্য করবে। ডাইরেক্টর নিঃসংকোচে সোমাকে দেখতে লাগলেন; ঘুরে ঘুরে খুঁটিয়ে দেখার পরীক্ষা চলতে লাগল। সোমা কোনোরকম লজ্জা পেল না; এই সুতীক্ষ্ণ নজর সত্ত্বেও ওর কোনো সংকোচ হ'ল না, অপরিচিত কোনো ডাক্তারের কাছে গায়ের কাপড় সরাতে যেমন লজ্জা হয় না, ঠিক তেমনি।

ডাইরেক্টর সোমার মাথা, নাক, চোখ জোড়া, ঠোঁট, গাল. চিবুক —এক এক করে শরীরের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ডাক্তারের নিখুঁত দৃষ্টিতে পরীক্ষা করে বনোয়ারীর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বেশ গম্ভীর স্বরে বললেন —নট ব্যাড; যেন তিনি যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করছেন এমন ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলেন— ক্যান শী স্পীক?

সোমাকে তিনি নিজেই জিজ্ঞেস করলেন— এতটা পথ আসতে আপনার কোনো কষ্ট হয় নি তো?

সোমা শুধু ইশারায় মাথা ঝাঁকিয়ে, চোখের পলক ফেলে নিঃশব্দে ধন্যবাদ জানালো, আবার চোখের ইশারায় বুঝিয়ে দিল তার কোনো কষ্ট হয় নি।

ডাইরেক্টর মুগ্ধ স্বরে বনোয়ারীর দিকে তাকিয়ে ইংরেজীতে

বললেন— এ দেখি চোখ দিয়েই কথা বলতে পারে। চমৎকার চোখ ছুটি।

বনোয়ারীও ইংরেজীতে সমর্থন জানালো— এর এই রূপের ঝলকানি আর সঙ্গে যদি 'চম্পা অ্যাণ্ড পার্টির' ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিক জুড়ে দেওয়া যায়, তা হলে হুজুর 'জ্বলতা ঘোঁসলা' বম্বেতে ইজিলি এক বছর চলবে।

রিহার্সালের জন্য সোমাকে স্টুডিয়োতে ডাকা হ'ল। ওখানে আরও আটজন মহিলাকে দেখে সোমার একটু যেন স্বস্তি এল, ভরসা বাড়ল। কিন্তু একটু পরেই ও বুঝে নিল এদের চোখের দৃষ্টিতে সহানুভূতির চেয়ে ঈর্ষা ঝিলিক দিচ্ছে।

মেক-আপ রুমে নিয়ে গিয়ে সোমার কাপড় পালটানো হ'ল; মেক-আপ আর রঙ মেখে ওকে যখন আবার নিয়ে আসা হল স্টুডিয়োতে তখন ওকে একেবারে অন্যরকম লাগছে। ফোটোগ্রাফার কাছে গিয়ে লেন্সে ওর চেহারাটা দেখল; ক্যামেরায় ওর ছবি কেমন আসে সেটাই সে দেখে নিল।

স্টেজে মেয়েরা বউ-কে ঘিরে গান গাইবে বলে বসে আছে। সোমাকেও তাদের সঙ্গে বসানো হল। ডাইরেক্টর হাতের সমান লম্বা একটি ছড়ি নিয়ে ইশারা করে সবাইকে হুকুম দিচ্ছেন। বউ-এর কাছে সোমাকে এবার বসানো হ'ল। নায়ক একটা জানলা থেকে উঁকি দিয়ে এ দৃশ্য দেখছিল।

ডাইরেক্টর সোমার দিকে তাকিয়ে বললেন— দেখুন, একটু থেমে আবার ছড়িটা বউ-এর দিকে ইশারা করে সংকেত করলেন— এর চিবুকটা একটু ছুঁয়ে বলবেন— কী গো, এত উদাসী হয়ে পড়ছ কেন?

সোমা হুবহু বলে গেল।

ডাইরেক্টর বাধা দিলেন— হয় নি, আরো জোরে বলুন।

সোমা আরো জোরে কথাটার পুনরাবৃত্তি করল।

ডাইরেক্টর ছড়িটা নিজের উরুতে মেরে হুকুম দিলেন— মুচকি হাসুন।

সোমা হাসল বটে কিন্তু ডাইরেক্টরের পছন্দসই হল না। সোমার অসফল প্রচেষ্টায় সঙ্গী মেয়ে-বৌরা একটু মুচকি হাসল।

বনোয়ারী কর্কশ গলায় বলে উঠল— বিবি জী, এখানে একটু হাসিরই দাম দেওয়া হয়, লজ্জার দাম নেই।

সোমা একবার চোখের পলক নেড়ে মুচকি হাসবার চেষ্টা করল এবং এবার নিখুঁত মুচকি হাসি ছড়াল।

ডাইরেক্টর শিল্পীদের গুণ সমাদর করতে জানেন বলেই বোধ হয় তারিফ করে উঠলেন— গুড। হাত উঠিয়ে তিনি সাবাশী দিলেন। ক্যামেরাম্যানকে ডেকে বললেন— ঘুরঘুরে, মনে আছে তো, ঠিক এ জায়গাটায় ক্লোজ-আপ্ হবে।

ডাইরেক্টর এবার অন্য ডায়গলটা বলতে বললেন। নতুন বউ কান্না-ঝরা স্বরে বলল— বহিন, তোমাদের সঙ্গে আমি ছোটোবেলার সুখের দিনগুলি কাটিয়েছি. আর এখন তোমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

সোমা এবার মুচকি হেসে বলবে -- এখন তো এ কথা বলছ, কিন্তু এমন দিন আসবে যখন তোমার গলার স্বর শোনার জন্য আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করব। কিন্তু তোমার তখন চিঠি লেখবার মতো সময়টুকু হাতে থাকবে না।

সোমাকে যা বলতে বলা হল, তাই বলল।

বনোয়ারী রূঢ় ভাষায় সংশোধন করল— 'বকত' নয় বক্ত্ বলো। অন্য মেয়েরা হেসে উঠল। অনেক শব্দের উচ্চারণ ঠিকমতো হচ্ছিল না। ইন্তজার নয় ইন্তজ্যার বলো, 'সবর' নয় সব্র, 'বশক' নয় বলো 'বেশক'। প্রত্যেকটি শব্দ ঠিক উচ্চারণ করতে বলা হচ্ছে আর মেয়েরা প্রত্যেক বার হি হি করে হেসে উঠছে। কিন্তু সোমা যেন

নির্বিকার, এ হাসিঠাট্টা উপেক্ষা করেই ও শব্দগুলি নিখুঁত উচ্চারণ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছিল।

প্রথম দিনই সবার কানে কানে কথাটা ফিরতে লাগল এ মহিলা পাঞ্জাবের পাহাড় দেশের মেয়ে। ওর নামই হয়ে গেল পাহাড়ন।

দ্বিতীয় দিন সোমা বরকতের সঙ্গে স্টুডিয়োতে ঠিক সময়ে এসে দেখে ঝগড়া বেধে গেছে। জীবা ভাই ক্রুদ্ধ স্বরে বলছে— অ্যাকটর-অ্যাকট্রেস ঠিকায় জোগাড় করার দায়িত্ব আপনারা আমাদের উপরে দিয়েছেন। তা এখন নিজেরা ইচ্ছেমতো অ্যাকট্রেস আনবেন সে কী করে হয়? গোমতী যখন নিয়মিত আসছিল না তখন তো আমাদের একটা খবর দিতে পারতেন। আপনাদের প্রয়োজন-মতো আমরা অন্য অ্যাকট্রেস জোগাড় করে দিতাম। যে মহিলাকে আপনারা রেখেছেন তার জন্য ওর স্বামীকে আমরা অগ্রিম টাকা দিয়েছি।

জীবা ভাই উত্তেজনায় ফেটে পড়ল; বরকতের নাকের সামনে আঙুল উঁচিয়ে জেরা করল— তুমিই বলো, এর জন্য দশ টাকা অ্যাড-ভান্স নিয়েছ কি না?

বরকত স্রেফ অস্বীকার করে বসল। জীবা ভাই তখন রাগে গজগজ করতে করতে এই বেইমানির জন্য গালাগালি দিতে থাকল। জীবা ভাই বনোয়ারীকে সাক্ষী মানল— আপনিই বলুন তো, এই মহিলাটিকে আমার হোটেলে দেখেছিলেন কিনা? ও আমাদের আসামী। আমাদের লোককে আপনারা সরাসরি কী করে কাজে লাগাতে পারেন? আমাদের কমিশন কোথায়? এটা বিজনেস, না ডাকাতি?

বনোয়ারী বুঝতে পারল জীবা ভাই নিজের কমিশন খোয়া যাবার রোষে সোমার বদনাম করে ছাড়বে। বনোয়ারী জীবা ভাইয়ের হাত ধরে এক কোণে নিয়ে গেল। জীবা ভাই রাগে গরগর করে উঠল—

যখন পঞ্চাশটি মেয়ে-বউ চাই তখন আমরা ভুগব আর কোনো মহিলাকে আপনাদের পছন্দ হয়ে যাবে তখন আমাদের লোককে আপনারা উড়িয়ে নিয়ে যাবেন। এটা কি বিজনেস, অ্যাঁ? এ আমাদের খাতক, আমরা একে নিয়ে যা ইচ্ছে করব, দরকার হলে স্টেজে পাঠাব, নয়তো অন্য কোনো কাজে। আমাদের বিজনেস যদি আপনারা বিগড়ান তবে আমরাই বা আপনাদের সাহায্য করব কী করে? সিনেমার লোকেরা যদি এজেন্সি ছাড়া ফিল্ম তৈরি করতে চায়, তো করুক। আমরা না-হয় এজেন্সি খতম করে দিচ্ছি। কাল যদি আপনারা বলেন, অ্যাক্টর আমাদের পয়সা মেরে কেটে পড়েছে তবে তার জন্য কিন্তু আমরা দায়ী নই, বুঝে নিন।

বনোয়ারী বুঝিয়ে বলল— শেঠ, তুমি ব্যবসাদার লোক। এত রাগ করারই বা কী আছে? একটা পাখি জাল থেকে উড়ে গেলেই বা কী? জালটাই ছিঁড়ে ফেলবে নাকি? আরো শত শত ফাঁসবে। এ মহিলার সঙ্গে তোমরা ঠিক পেরে উঠবে না।

—আমি শত শত এরকম মা··· বেচে দিয়েছি। একটা গালি দিয়ে শেঠ গোঁফে হাত বুলোল।

বনোয়ারী নিচু গলায় বলল— হয়তো হবে। এ মহিলাকে ডাইরেক্টর মহন্তের খুব পছন্দ হয়েছে। উনি নিজেই একে ডেকেছেন। ওঁকে অযথা রাগাচ্ছ কেন? অন্য জায়গায় টাইট দিলে ঠেলাটি বুঝবে। আমার কথা শোনো।

সোমা ক্যানভাসের দেয়ালের পেছনে দাঁড়িয়ে এসব কথা শুনে ভয়ে ও আশঙ্কায় কাঁপছিল।

পাহাড়ন ডাইরেক্টর সাহেবের আশা সফল ও সার্থক করতে পেরেছে। ও প্রাণমন দিয়ে সব-কিছু ঠিকমতো করতে চেষ্টা করছে; বলার কায়দা বা ভঙ্গি হুবহু আনবার জন্য ওর যত্নের শেষ নেই।

সন্ধ্যাবেলায় একটু সময় পেলে বনোয়ারী বরকতকে পরামর্শ দিয়ে প্রায়ই সিনেমায় নিয়ে যেতে লাগল। অভিনেত্রীদের ভিন্ন ভিন্ন বলার ধরন ও ভঙ্গি সংকেতে দেখিয়ে বনোয়ারী জিজ্ঞেস করত—কী, বুঝলে তো। সিনেমাটা কেমন লাগল ? তুমি এরকম পার্ট করতে পারবে না ?

সোমা লাহোরে মনোরমা ও বউদির সঙ্গে বেশ কয়েকবার সিনেমা দেখতে গেছে। সিনেমা দেখতে ওর বেশ ভালোই লাগে। কিন্তু এই-সব অভিনেত্রীর ব্যবহার ও ঢঙঢাঙ দেখে ভাবত— হায় রে, এরা সব কীরকম লোক! সবাইকে দেখিয়ে এরকমটা করে। এদের কি লজ্জাশরম বলে কিছু নেই ? এখন সোমা ভাবে, এ তো আমিও করতে পারি··· বনোয়ারী ও বরকতও বারবার আত্মবিশ্বাস জোগায়, বলে তোমার পক্ষে কোনো কাজই শক্ত নয়। দুটো ফিল্মে যদি খুব কাজ করতে পার, তবে সিনেমা জগতের লোকেরা তোমাকে খোশামোদ করে চলবে। ওরা সোমাকে মধু, চন্দ্রা, হেমা আর বালীর কথা শোনায়, বলে, ওরা মাসে হাজার হাজার টাকা রোজগার করে।

বনোয়ারী পাহাড়নকে একটা ফিল্মে গ্রামের লোকনৃত্য দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল— কী, তুমি এরকম নাচতে পারবে না ?

পাহাড়ন সায় দিয়ে বলল, শেখালে নিশ্চয়ই পারব। গান গাইতেও ও রাজি, আসলে সব-কিছু করতেই প্রস্তুত, ব্যাকুল।

শুধু তিনটি দৃশ্যের জন্য পাহাড়নকে তলব করা হয়েছিল। কাহিনীর শুরুটা এ রকম :— নায়ক রেণুকে (যে পার্টটা এখন পাহাড়ন করছে) দেখে মুগ্ধ হয়ে প্রেমে পড়ে যাবে আর নিজের স্ত্রীকে উপেক্ষা করবে। নায়িকা হিংসায় জ্বলে উঠে নিজের বোন রেণুকে বিষ খাইয়ে মারবে। তারপর গুপ্তগতি প্লট এগিয়ে চলবে ; কিন্তু পাহাড়নের সফল অভিনয়ে উৎসাহিত হয়ে ডাইরেক্টর ভাবলেন ওকে আরও কিছুক্ষণ স্ক্রিনে রাখলে খুব জমবে। এর রূপে দর্শকদের মুগ্ধ করে লাভ ওঠাবার জন্য আরো

দুটি দৃশ্য যুক্ত করা হল। বনোয়ারী উত্তরপ্রদেশে প্রচলিত খোড়িয়া'-র একটা গান কোথা থেকে লিখে নিয়ে এল। ডাইরেক্টরকে বোঝাল—হুজুর, এই গানের সঙ্গে পাহাড়নের একটা নাচ হলে মন্দ হয় না। ডাইরেক্টর এই প্রস্তাবটা যেন লুফে নিলেন।

ওস্তাদ ভূরের উপর হুকুম হল, সন্ধ্যাবেলা এই সময়ের মধ্যে পাহাড়নকে এমনভাবে তালিম দেওয়া হোক যাতে সে তাল সামলাতে পারে। প্রথমে ওকে গান গেয়ে শোনানো হ'ল। তারপর গানের একটা-দুটো কলি দশ-কুড়িবার গাওয়ানো হল। রেকর্ডিং রুমে বসে আছেন ডাইরেক্টর ও সাউণ্ড ইঞ্জিনিয়ার; তাঁরা কখনও গলার স্বর উঁচু করতে বলছেন, কখনো নিচু। সাউণ্ড ইঞ্জিনিয়ার গানটাকে কিছুতেই পাস করছেন না। ক্লান্তিতে পাহাড়নের মুখ লাল হয়ে উঠেছে; কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে।

বনোয়ারী ডাইরেক্টরের কানে কানে মন্তব্য করল – হুজুর, এ সময় যদি টেকনিকলার ক্যামেরা থাকত, ইস্।

সাউণ্ড ইঞ্জিনিয়ার চোখে, পাহাড়নের মন-মাতানো চোখজোড়া দেখে মুগ্ধ হয়ে বেশ কয়েকবার মুচকি হাসি ছেড়েছে। কথা বলতেও চেষ্টা করেছিল কিন্তু পাহাড়ন চোখ নামিয়ে নিয়েছে, আমল দেয় নি। বনোয়ারী ব্যাপারটা ঠিক আন্দাজ করেই নিভৃতে পাহাড়নকে ডেকে বুঝিয়ে বলেছে— পাহাড়ন, এটা সিনেমার আখড়া! এটা যেন মনে থাকে এখানে লোকেরা যদি চায় তোমার গলার থেকে বাঁশির মতো সুর বের করবে, আর যদি এরা বিগড়ায় তবে তোমার স্বর ফাটা বাঁশির মতো করে ছাড়বে। ক্যামেরার দুরূহ পরীক্ষায় তুমি জিতে গেছ। মহন্ত খুব ভালো মানুষ, ক্যামেরার কলাকৌশল ওঁর মাথায় খুব খেলে, বোঝেনও ভালো। ক্যামেরাম্যান ওঁকে সহজে বিগড়াতে পারবে না; কিন্তু চোখে একটু অন্য ধরনের লোক, ওকে সামলাও।

এ কথা শুনে পাহাড়ন একটু যেন মন-মরা হয়ে গেল ; বনোয়ারী সেটা লক্ষ্য করে বকুনি দিয়ে বলল— তবে এখানে পা বাড়িয়ে আসতে চেয়েছিলে কেন ? আমি তো আগেই তোমাকে বলেছি। এখন এদের যদি সামলে নিতে পার পরে আমরাই তোমার জুতো সামলে রাখব।

পরের দিন চোখে রিহার্সেলের আগে পাহাড়নের চোখের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাতে ও লজ্জা পেয়ে একটু মুচকি হেসে বলল— আপনি তো কেবল আমার ওপর রাগ করেই আছেন।

চোখে বিস্ময় প্রকাশ করে বলল -- কই, না তো। আজ সন্ধ্যাবেলা আমার সঙ্গে খানা খাবেন চলুন।

পাহাড়ন হেসে বলল - আপনি আমাকে ভীষণ ঘাবড়ে দেন। আমার গান আপনার পছন্দ হয় না। ভয়ে আমার খিদে মরে গেছে, খাব কী করে ?

সেদিন সন্ধ্যাবেলা পাহাড়নের গানের খুব তারিফ শোনা গেল। সন্ধ্যার পরে পাহাড়ন চোখের সঙ্গে 'গ্রেট মোঘল'-এ খানা খেতে গেল। রাত একটার সময় চোখে ওকে ট্যাক্সি করে মহীমে পৌঁছে দিল। রাত দুপুরে বাড়ি ফেরার সময় সোমার মনে ভয় ছিল, এত রাতে ফিরতে দেখে বরকত ঝগড়া করবে, বকবে আর হয়তো হাতই চালিয়ে বসবে। ক্রোধে জ্বলে উঠল পাহাড়ন. মনে মনে ভাবল, একবার দুর্ব্যবহার করে দেখুক না ! পাশের খুপরিতে কদিন আগে পুরুষটা তার বৌকে খুব পিটিয়েছিল ; সে কথা মনে পড়ল···। আমার ব্যাপারে এই অভাগাটার কী অধিকার শুনি ?

সোমা অনেকক্ষণ ধরে শেকল খটখট করার পর বরকতের ঘুম ভাঙল ; সে উঠে এসে দরজা খুলে দিল কিন্তু আশ্চর্য, কিছুই বলল না। চুপটি করে আবার চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল। অনেকক্ষণ সোমার ঘুম এল না··· ভাবছিল, এ সব কী হচ্ছে ? যা খুশি হোক,

ও পা রাখার তো একটা জায়গা পেয়েছে। দেড় মাস যাবৎ স্টুডিয়োতে যাচ্ছে। আটশো টাকা পেয়ে গেছে…। হয়তো আর কয়েকদিন পরে নিজের ইচ্ছেমতো চলতে পারবে, হয়তো এ খুপরি ছেড়ে অন্য জায়গায় যেতে পারবে।

পাহাড়নের গানের রেকর্ডিং চমৎকার হয়েছে। গানের রেকর্ড চলে আর তার সঙ্গে সঙ্গে নাচের রিহার্সাল হয়। ফরাশে রেখা টেনে ওকে বলে দেওয়া হয়েছে কোন্ সুরের তালে কোথায় পা রাখতে হবে। ফুল ড্রেস রিহার্সালের দিন পাহাড়নকে ঘাগরা ও চোলি পরানো হল। ওর নরম মসৃণ পেট উন্মুক্ত; ওর ফর্সা ও খাসা শরীরের যে-যে স্থান উন্মুক্ত ছিল তাতে আরো গাঢ় সাদা রঙ মাখানো হল যাতে ক্যামেরায় শরীরের রোমকূপ বা অন্য কোনো ছিদ্র বা দাগ দেখা না যায়। চোলি গায়ের সঙ্গে যেন লেপটে আছে। চোলি এমনিতেই বুকের সঙ্গে সেঁটে ছিল কিন্তু আরও সুতীক্ষ্ণ করার জন্য তাতে কিছু তুলো ভরে দেওয়া হল।

রেকর্ড বার বার বাজছে— 'দোপহরিয়া কা মামলা, মেরা গোরা বদন কুমলায়ে।'

ডাইরেক্টর সোমাকে বুঝিয়ে বললেন— 'দোপহরিয়া কা মামলা', বলার সময় একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ার ভাব ফুটিয়ে তুলতে হবে, একটু ভালোমানুষি টাইপ, বুঝলেন, আর তখন দু'হাত দু'দিকে পাখার মতো মেলে ধরবেন। যখন 'মেরা গোরা বদন' বলবেন, তখন নিজের কাঁধ ছুঁয়ে কোমরে একটু প্রাণ ফুটিয়ে তুলতে হবে। 'কুমলায়ে' বলার সময় আঁচল দিয়ে হাওয়া খেতে থাকবেন। গানের এই পঙ্‌ক্তি পুরো রিহার্সাল দিতে বেমালুম আড়াই ঘণ্টা লেগে গেল। কখনো ফরাশের ওপর দাগ-ছেড়ে পাহাড়নের পা ওদিকে চলে যায়, কখনো ফটোগ্রাফার লাইটের ফোকাস পালটে ফেলে। পাহাড়নের হাঁপ ধরে গেছে। কুড়ি বার একই পদের ভাবটি ফুটিয়ে তোলার অভিনয় চলতে থাকল এবং

অভিনয় নিখুঁত হবার পর 'টেক' নেওয়া হল। ওকে চা খেতে দেওয়া হল এবং বলা হল এখন একটু বিশ্রাম নিতে পারে।

গানের অন্য পদের উপর নাচের এবার রিহার্সাল শুরু হল।--'শাশুড়ী, তেরা বেটা রী, তেরা বেটা রী মেরে জীবন কো হাত লগায়ে'। এই পদের রিহার্সালে আগের চেয়ে অনেক বেশি সময় লাগল। মুচকি হেসে ঘোমটা টেনে এগোতে গিয়ে ফরাশে-আঁকা রেখার নিশানা থেকে পা সরে যায়, কখনো আগে পা পড়ে আবার কখনো একটু পেছনে। পাহাড়ন দম ছুটিয়ে পরিশ্রম ক'রে ডাইরেক্টরের হুকুম তামিল করল; ডাইরেক্টরও এখন পুরোপুরি খুশি, একটা তৃপ্তির ছাপ পড়েছে তাঁর মুখে। সোমার 'ক্লোজআপ্‌ নেওয়া হল; ওর নাচের মুদ্রার 'স্টিল' নেবার নির্দেশ দেওয়া হল। নতুন অভিনেত্রীর তারিফ শুনে দারফেজ কোম্পানির প্রডিউসার এম. পালিত ওকে দেখতে স্টুডিয়োতে এসেছেন। ডাইরেক্টর মহন্ত ও আর-সব লোক তাঁর আগে-পেছনে ঘুরছেন। সুটিং শেষ হবার পর পালিত পাহাড়নকে তারিফ করলেন এবং তাকে চায়ে আমন্ত্রণ জানালেন।

পাহাড়ন এতদিনে নিজের ক্ষমতা আঁচ করতে পেরেছে। ওর চেহারা পালটে গেছে, বোলচালেও এখন একেবারে আলাদা মানুষ। এতক্ষণ পরিশ্রম করে শরীরটা ক্লান্তিতে যেন ভেঙে পড়ছিল; তাই প্রডিউসারের কাছে ক্ষমা চেয়ে তাঁর আমন্ত্রণ প্রত্যাখান করল। এমন-কি, প্রডিউসারকে দেখে চেয়ার ছেড়ে পর্যন্ত দাঁড়াল না।

পালিত সাহেব বিনম্র হেসে বললেন— আচ্ছা কালকেই না-হয় হবে। বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

বনোয়ারী ছুটে আসে, তার গলার স্বরে খুশি যেন ঝরে পড়ছে—পাহাড়ন, তুমি যে তাণ্ডব ব্যাপার করলে। এই তো সবচেয়ে বড়ো সাহেব। ইনিও তো মালিক। ইনি চাইলে ডাইরেক্টর ও অন্য সবাইকে,

গোবরে মাখা কোনো মহিলাকেও হাতির-দাঁতের মূর্তি বলে মানতে হবে। এই ফিল্মটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত একে তোমার ফাঁসিয়ে অন্ততঃপক্ষে রাখতে হবে।

পরের দিন পাহাড়ন পালিত সাহেবের সঙ্গে তাজ-এ ডিনার খেতে গেল এবং সেখান থেকে ট্যাক্সিতে মহীমে ফিরল। প্রডিউসার পাহাড়নকে তৃতীয় দিনের দিন আবার তাজে-এ ডেকে পাঠালেন।

পালিত, ডাইরেক্টের সাহেবকে ডেকে বললেন— এ ভদ্রমহিলা অন্য কোনো ফিল্ম কোম্পানিতে যেন যেতে না পারে। এখন পর্যন্ত পাহাড়ন দিনে পঁচিশ টাকার হিসেবে কাজ করছিল। পালিতের রায় শোনার পর মহন্ত ওকে ছয় মাসের এক শর্তনামায় স্বাক্ষর করতে বলল। পাহাড়ন বনোয়ারীর মতামত জানতে চাইল।

বনোয়ারী বুঝিয়ে বলল— মাসে পনেরোশো টাকা চেয়ো আর বোলো প্রত্যেক মাসের টাকা অগ্রিম চাই।

বনোয়ারীর এ প্রস্তাবটা শুনে পাহাড়নের পাগলামি মনে হয়েছিল কিন্তু ডাইরেক্টরকে বলবার সময় বনোয়ারীর কথামতোই দাবি পেশ করেছিল। দেখে আশ্চর্য হ'ল ওর দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে।

পাহাড়নের হাতে অনেক টাকা এসে গেছে। ও মহীমের খুপরি ছেড়ে দিল। বনোয়ারীর সহায়তায় মাসে দুশো টাকায় দাদরে একটা ফ্ল্যাট জোগাড় করে নিল। বরকতের সঙ্গে একটা ঘরে থাকা ওর পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠছিল। এতদিন স্টুডিয়ো থেকে যা রোজগারপত্র হত বরকত তার অধিকাংশ হাতড়ে নিত। বনোয়ারী নগদ টাকা নিতে বারণ করে বলেছিল— টাকা চেকে নিয়ে ব্যাঙ্কে জমা করে দেবে।

সোমার এই বদখেয়ালে বরকত বিগড়ে উঠল, বিদ্রূপ করে বলল— এখন থেকেই আমার ওপর চোখ রাঙাতে শুরু করেছ? সোমাকে গালমন্দ করল এবং ওকে মারবে বলে শাসাতে লাগল।

পাহাড়ন বরকতের দিকে দৃঢ় ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে ভ্রূকুটি করল, তীব্র স্বরে ধমক দিল— খবরদার, বাজে বকবি তো, এক্ষুনি পুলিশে ধরিয়ে দেব। যদি থাকতে চাও ভালোভাবে থাকো, আর না থাকতে চাও বাইরের ঘরে থাকবে।

লাহোরের সেই সোমা যেন আবার ফিরে এসেছে, সোমা এখন পাহাড়ন, দশ গুণ তার উগ্র মূর্তি যেন ; বরকত এ ভয়ানক মূর্তির ধমকি হজম ক'রে নিল। নিজের প্রয়োজনমত কখনও পাহাড়নকে সে খোশামোদ ক'রে টাকা আদায় করে, কখনও-বা রাগটাগ দেখিয়ে কাজ হাসিল করে। ওর খরচা তো নেহাৎ কম নয়। রোজ তার আট-দশ টাকা হাত খরচ চাই।

*   *   *

শরীরটা একটু বেশি অসুস্থ হওয়ায় গোমতী দারফেজ-এ যেতে পারে নি। তৃতীয় দিনের দিন গিয়ে দেখে ওর জায়গায় অন্য একজন মহিলাকে রাখা হয়েছে।

গোমতী খোশামোদের সুরে ডাইরেক্টরকে বলল— লোকেদের সুখদুঃখ বলে তো একটা কথা আছে। অন্য কোনো জায়গায় আমি কাজ করতে যাই নি··· যে বলেছে সে প্রমাণ করে দেখাক দেখি···! কিন্তু দারফেজে ওর প্রয়োজন ফুরিয়েছে। ওকে বলে দেওয়া হল— অগ্রিম হিসেবে তুমি যা টাকা খেয়েছ ওটা তোমার। ও নিয়েই আমাদের রেহাই দাও।

দারফেজ থেকে ওকে হটাবার কথা ছড়িয়ে পড়ল ; লোকমুখে ওর বদনামি অসুখটার কথাও। অন্য জায়গায় ওর কাজ পাওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। চিকিৎসা হচ্ছিল বলে এতদিন সেই বিশ্রী অসুখটা চাপা

ছিল : এখন টাকা নেই চিকিৎসাও হতে পারছে না, তাই অসুখটাও মাথা চাড়া দিয়ে উঠল।

ওর ক্রোধটা গিয়ে পড়ল পাহাড়নের ওপর, কারণ ও ভাবল, পাহাড়নকে পেয়েছে বলেই ওর চাকরি গেছে। ও লোককে বলে বেড়াতে লাগল— পাহাড়ন কী জানে, কী অ্যাক্টিং করবে ও? জংলী একটা ছাগলের মতো চোখে-মুখে বিরক্তি ফুটিয়ে ম্যা-ম্যা করে ডাকে। কোম্পানির লোকেরা সাদা-পাকা পেয়ারা দেখে লাফিয়ে পড়েছে। চারদিনেই হারামজাদীকে পা দিয়ে পিষে ছুঁড়ে ফেলে দেবে।

ডাইরেক্টর, প্রডিউসার আর কোম্পানির কোনো রকম ক্ষতি করা গোমতীর অসাধ্য কাজ। কিন্তু হৃদয়টা জ্বলেপুড়ে যেন ছারখার হয়ে যায় ; সারা শরীরে হিংসার অসহ্য জ্বালা। ও সোজা পাহাড়নের ফ্ল্যাটে গিয়ে হাজির। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে অকথ্য ভাষায় গালা-গালি দিতে থাকল- তুই আমার পেশা খেয়েছিস, আমার পেটে লাথি মেরেছিস, তোর সর্বনাশ হবে। যে রূপ নিয়ে তোর এত অহংকার ভগবানের কৃপায় সে রূপ খসে পড়ুক, ও রূপ বরবাদ হয়ে যাক। যার কামাই তুই গিল্‌ছিস··· তোর মা··· কি··· একটা গালি দিয়ে আবার মুখ খিঁচাই করল— তাতে পোকা পড়ুক। এক বছরের মধ্যে তোর এই অসুখ যদি না লাগে তো আমাকে ধরে রাস্তায় জুতো মারিস।

পাহাড়ন ভয় পেয়ে ভিতরের ঘরে গিয়ে লুকিয়ে রইল, দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে ভয়ে কাঁপতে লাগল। ওর মহাজন বরকত এবার গোমতীর মোকাবিলা করতে এল। গোমতী চুপ করতে দেখে হাতে একটা জুতো নিয়ে ওর সামনে এসে দাঁড়াল. গোমতীর ঘাড় ধরে ফ্ল্যাটের নিচে হড়কে নিয়ে এল। গোমতী চিৎকার করে গালাগালি করতে থাকল।

পাহাড়নের হৃৎপিণ্ড আতঙ্কে অনেকক্ষণ ধড়ফড় করতে থাকল।

ও দরজা বন্ধ করে, চোখ বুজে খাটের ওপর শুয়ে পড়েছে ; নিজের ভবিষ্যৎ কল্পনায় দেখতে পাচ্ছে, অনেক অন্ধকার বুকে নিয়ে যে ভবিষ্যৎ কাঁদে।

গোমতীর এই শত্রুতার কথা ছড়িয়ে পড়তেই অন্য কোম্পানিতেও পাহাড়নকে নিয়ে আলোচনা-চর্চার ঝড় বয়ে যায়। 'জ্বলতা ঘোঁসলা' ফিল্ম শেষ হয়ে যাবার পর মণিমালাও পাহাড়নের বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করে দিয়েছে। খামকাই এরা পাহাড়নকে নায়িকা বানিয়েছে, এবং কল্পিত নায়িকার গায়ে লাথি মেরে যাচ্ছে। ফিল্মের প্রচারপত্রে ফলাও করে মণিমালার নাম বেরিয়েছে কিন্তু এ-ফিল্মে সত্যিকারের নাম ছড়িয়ে পড়েছে পাহাড়নের। সবাই জেনেছে আর বলাবলি করছে যে ভবিষ্যতের ফিল্মের প্রচারপত্রে পাহাড়নের নাম সবার উপরে থাকবে। ডাইরেক্টর-প্রডিউসারের ইচ্ছে হলে আজকে যাকে তুলবে অপছন্দ হলে কালকে তাকে হড়কে নামাবে।

এক বছর ঘুরে আসতে আসতে পাহাড়নের তিনটে ফিল্ম বোম্বাইতে চলছিল। 'মাসুম চোর' আর 'মন কা সৌদা'— এই দুটি ফিল্মে পাহাড়ন নায়িকার পার্ট করেছে। বোম্বাই-এর আকাশে-বাতাসে পাহাড়নের নাম গুঞ্জরিত হয়ে উঠল। ওর চেহারার দশ গুণ বড়ো চিত্র দেয়ালে শোভা পাচ্ছে, নানা জায়গায় সে ছবি ঝুলতে দেখা যাচ্ছে। ঘরে-বাইরে, পান-বিড়ি-চায়ের দোকানে, রেস্টুরেণ্টে পাহাড়নের নানা ভঙ্গির ছবি দেখা যায় ; তা নিয়ে আলোচনা হয়, চর্চা চলে ; গ্রামোফোনে ও রেডিয়োতে ওর গানের রেকর্ড শোনা যায়। পাহাড়ন সব সময় সব জায়গায় নিজেরই মুখ দেখে। ভঙ্গি চোখে পড়ে। ও কানে শোনে নিজেরই কণ্ঠের গান— দরদ দিয়ে যেসব গান গেয়েছিল, ঘুরেফিরে সেসব গান কানে ভেসে আসে – 'মেরে জীবন কো হাথ লগায়ে', এ গানের কলি লোকের মুখে মুখে ফেরে, তারপর আরও আছে,

'মন পনছী ভুল ন জানা',... আরও, 'বসায়ে প্রীত কা সংসার।'

পাহাড়ন চারটে ফিল্মে একসঙ্গে কাজ করছিল। সিনেমা কোম্পানি-গুলি এখন ওর সুবিধা-মতো রিহার্সাল ও সুটিং-এর সময় ঠিক করে। ব্যাঙ্কে ওর ত্রিশ হাজার টাকা জমা পড়েছে। যেমন-তেমন করে পাহাড়ন টাকাপয়সা ওড়ায় না। বনোয়ারী ওকে বারবার বুঝিয়েছে— আসল কথা কী জানো, অভিনেত্রীর জীবনের মেয়াদ পাঁচ থেকে বড়ো জোর সাত বছর।

পাহাড়নের মেজাজটাও বেশ তীক্ষ্ণ হয়ে পড়েছে। কিছু যেন ভালো লাগে না, তাই বেশি লোকজনের সঙ্গে মেশেও না। ওর কাছে প্রেম নিবেদন করার লোকের অবশ্য কোনো অভাব নেই। এসব প্রেমিকদের মুখের দিকে ও তাকিয়েও দেখে না। বনোয়ারী উপদেশ দিয়েছিল— এই জঞ্জালে ফেঁসেছ কি মরেছ। প্রেম তোমার হাতের অস্ত্র। এই ছোরাটা নিজের পেটেই গলিয়ে দিয়ো না।

সফলতার একটা দারুণ নেশা আছে; পাহাড়ন সেই নেশার ঘোরে পড়েছে। আজকাল অতীত জীবনটা ওর মনের ভেতরে উঁকি মারে। যে জীবন ও কাটিয়ে এসেছে তার তুলনায় এখন ওর অনেক ক্ষমতা; ওর এই সফল জীবন ওকে তৃপ্তি দেয়, সন্তোষ আনে। কখনও ভাবে, এরা সব যদি ধাক্কা না দিত, আঘাত না দিত তবে এত সব কিছুতেই হ'ত না। যা হয়েছে ঠিকই হয়েছে। অথচ কী আশ্চর্য, ওর রূপে, অভিনয়ের ক্ষমতায় দুনিয়ার মন ভোলায়, আনন্দ ছড়ায় কিন্তু নিজের মনের ভিতর অন্ধকার এসে বাসা বাঁধে, কেন জানি দিন দিন ও গম্ভীর হয়ে যেতে থাকে।

পাহাড়ন বরকতকে নিয়ে খুবই অশান্তি পাচ্ছে। বেশ কয়েকবার 'এক্সট্রার' কাজ পেয়েছে বরকত কিন্তু ওকে দু'তিন টাকার বেশি কেউ দেয় না। ও চাইত পাহাড়নের সঙ্গে হিরোর পার্ট করবে এবং পাহাড়ন

যদি জেদ ধরে এমন সুযোগটা হাতে না এসে যায় না। কিন্তু পাহাড়ন এটা করে কী করে? এতে পাহাড়নের অসুবিধা কোথায় বরকতের মাথায় আসে না; পাহাড়নকে কেমন যেন মনে হয় অকৃতজ্ঞ। আর এ নিয়ে ঝগড়া বেধে যায়। পাহাড়ন শুধু একটাই জবাব দেয়—আমাকে মাপ করো। আমার থেকে যা-কিছু নেবার একবারে নিয়ে এখান থেকে চলে যাও।

জুয়া খেলা ছাড়া বরকতের দিন কাটত না। পাহাড়ন ওকে দু'দুবার দেড় দেড় হাজার টাকা দিয়েছে; ওর সঙ্গে দু'বারই শর্ত ছিল এ টাকা নিয়ে ও কেটে পড়বে। টাকা নিয়েছে ঠিকই কিন্তু যায় নি। ও হিরো হবে, অ্যাক্টর হবে বহুদিনের সেই আকাঙ্ক্ষা আজ আর নেই; কিন্তু ওর ঠাটবাট বা মেজাজ যায় নি; আজকাল সে চালচলন পালটে ফেলেছে, এখন তার কায়দাকানুন, বোলচালই আলাদা রকম। জামা-প্যাণ্ট ছেড়ে এখন পরে চুড়িদার ধুতি ও কোর্তা। ইয়া গোঁফ রেখেছে; গোঁফের আগায় তা দিয়ে দিয়ে ঊর্ধ্বমুখী করেছে। ছোটোমতো একটা ডাণ্ডা হাতে নিয়ে সব সময় ঘোরে। লাঠিটাকে মাটিতে ঠুকে হুঙ্কার ছাড়ে— বল তো দু'হাত লাগাই, অঁ্যা? চার-পাঁচজন সঙ্গে নিয়ে ঘোরে। ওদের নেশা-পানির খরচাও ও জোগায়। একবার বরকত কোকেন লেনদেনের মামলায় ফেঁসে গেল। পাহাড়ন নিজের বদনামের ভয়ে বনোয়ারীকে পাঠিয়ে পুলিশের হাতে দুশো টাকা ঘুষ দিয়ে ওকে কোনোমতে ছাড়ালো। এই ঘটনার পর থানার লোকদের সঙ্গে ওর বেশ ভাব হয়ে গিয়েছিল।

পাহাড়নের খ্যাতি দিন দিন বেড়ে যেতে থাকল আর সঙ্গে সঙ্গে আয়ও। দাদরের ফ্ল্যাট ছেড়ে ও একটা বাংলোতে বাস করতে লাগল। একটা বিরাট মোটর কিনল। কিন্তু আগের চেয়ে ও আরও যেন নীরব থাকে। সারা বছরে ও বোধ হয় ন-দিন ন-রাতের মতো

ফুরসৎ পেয়েছে। একসঙ্গে ছয়টি কোম্পানির কাজ করে। অন্য অনেক কোম্পানি ওকে কাজ দেবার জন্য উৎসুক। কিন্তু হাতে একেবারে সময় নেই, তাই বারণ করে দিতে হয়। বনোয়ারীর উপদেশ আর যেন ভালো লাগে না ; মনে তার উল্টো প্রতিক্রিয়া হয় আজকাল। পাহাড়ন ভাবে, আর কতদিন আমি লাট্টুর মতো শুধু ঘুরপাক খাব, অন্যের কথায় আর কতদিন নাচব ? সত্যিই তো আমার কী প্রয়োজন ? হাতে এখন অনেক পয়সা। আমি কি শুধু চণ্ডাল বরকতের জন্য টাকার পিছনে ছুটব ? অন্য অভিনেতা-অভিনেত্রীরা কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা উপার্জন করে আর রেস ও মদে সব পয়সা উড়িয়ে দেয়। পাহাড়ন তা করে না। তাই ব্যাঙ্কের জমা টাকার অঙ্ক বাড়তেই থাকে।

বরকত কোথা থেকে যেন গুজব শুনে এল, প্রডিউসার শেঠ পালিত ভাই, প্রেডিউসার সুতলীওয়ালা আর ডাইরেক্টর জমান— প্রত্যেকেই পাহাড়নের পিছনে লেগে আছে, এঁরা প্রত্যেকেই পাহাড়নকে বিয়ে করতে উৎসুক। বরকত এও শুনল, পাহাড়ন প্রডিউসার সুতলীওয়ালা ও অ্যাসিস্টেন্ট ডাইরেক্টর বনোয়ারীর সঙ্গে প্রেম করে বেড়াচ্ছে।··· খুব তাড়াতাড়িই কাউকে নিয়ে ঘর-সংসার ফেঁদে বসবে। বরকতের মনটা বিরূপ হয়ে গেল ; আজকাল সিনেমা জগতের প্রতি ওর বিতৃষ্ণার শেষ নেই।

কানাঘুষো শুনে বরকত রীতিমত আশঙ্কায় পড়ল। বনোয়ারীর ইমানদারির উপর বরকতের গভীর আস্থা ছিল। ও যা পাহাড়নের জন্য করেছে, তা আর কেউ করত কিনা সন্দেহ। তবুও বরকত ভাবল, এদের প্রতি সতর্ক নজর রাখা দরকার। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। এরা পাহাড়নের কাছে এলে, বরকত নানা রকম উৎপাত শুরু করে দেয়, পাহাড়নের সঙ্গে তা নিয়ে ঝগড়া করে। পাহাড়ন বাইরে কোথাও গেলে বরকত ওকে গার্ড দেবার জন্য ড্রাইভারের পাশে বসে

পড়ে ; সঙ্গে সঙ্গে সে ঘুরবেই, এই যেন ওর পণ।

বরকত প্রচার করতে শুরু করল— পাহাড়ন আমার নিকা-পড়ানো-বউ···। কোনো শালা যদি ওর দিকে চোখ উঁচিয়ে তাকায় তবে চোখ ফাটিয়ে দেব।

বরকতের এই ব্যবহার পাহাড়নের আর কোনোক্রমে সহ্য হচ্ছিল না। কেবলই ভাবে, লোকটা আমাকে আর কতদিন খাবলে খাবলে খাবে? আমি কি ওর গোরু যে আমাকে অনবরত ওভাবে দুইবে? আমার যদি আজকে কিছু হয়ে যায়, আমি যদি উপার্জন করা বন্ধ করে দিই, তবে আগুন-লাগা ঘর থেকে যেমন ইদুর পালায় তেমনি লোকটা আমার কাছ থেকে পালাবে। এ আমার কে হয় যে আমার উপর ওভাবে চৌকিদারী করে বেড়াবে? আমি যদি সংসার পাততে চাই তবে এ লোকটা আমাকে বাধা দেবার কে? আমি কি সারা জীবনই এইসব নিরাশ্রয়ী ও ঠকবাজ লোকের পাল্লায় পড়ে ভয়ে কাঁপতে থাকব?

সন্ধ্যার সময় পাহাড়ন ক্লান্ত হয়ে স্টুডিয়ো থেকে ফিরে বিষণ্ণ মনে বারান্দায় বসে রইল। 'নবোদয়' কোম্পানির নতুন ফিল্ম 'রঙ্গীলা কনকৈইয়া'-তে পাহাড়ন পঞ্চাশ হাজার টাকার বরাতে কাজ করছিল। সেদিন স্টুডিয়োতে নদীতে স্নান করার একটা দৃশ্যের সুটিং হয়ে গেছে। ডাইরেক্টর খুব খুশি। নাইবার সময় যতদূর সম্ভব ওর নগ্ন তাজা শরীর দেখানো হয়েছে। এখন ভয় সেন্সর না এসব সীন কেটে দেয়।

স্টুডিয়োর অনুশাসনে পাহাড়ন ডাইরেক্টর জমানের নির্দেশমতোই ও কাজ করে যাচ্ছিল কিন্তু গাড়িতে বাড়ি ফেরার সময় পাঁচ বছর আগের কতকগুলি ঘটনা ওর মনে পড়ে গেল।··· পুকুরের ধারে নগ্ন দেহে চাদর লেপটে ও কাপড় ধুচ্ছিল ; ঠিক সে সময় ধনসিং গিয়ে হাজির। লজ্জা ও ভয়ে ও কেমন কুঁকড়ে গিয়েছিল। লাহোরের

কথাও কেন জানি মনে পড়ে যখন মন্নো বিবি আর ব্যারিস্টার দামী কাপড় পরে বাজারে যেতে বলত, তখন লজ্জায় ও কেমন আড়ষ্ট হয়ে যেত। রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পর ও চুপিচুপি সাহেবের ঘরে যেত; বাতি জ্বলবার আগে খুব ভালো করে দেখে নিত ঘরের সব জানলায় পর্দা আঁটা আছে কিনা। সে সময় ওর একমাত্র সান্ত্বনা ছিল যে ওকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না। আর এখন? এখন ওকে এদিক-সেদিক ঘুরিয়ে ওর নগ্ন দেহ সবাইকে দেখানো হচ্ছে।

পাহাড়নের বাংলোর ঠিক ডান দিকে, চৌহদ্দি পেরিয়ে উঁচু দেয়ালে ওর একটা বিরাট ছবি টানানো হয়েছে; সেই ছবিতেও দুই হাত দু'দিকে ছড়িয়ে আছে আর ওর মাথায় বিরাট চুলের পাহাড় দেখানো হয়েছে। রেডিয়োর তীক্ষ্ণ আওয়াজ ভেসে আসছে, তাতে নিজেরই গানের সুর বাজছে— 'কস গলে ডালো বহিয়াঁ, মোরে সাইয়াঁ ইস্ বিধ করো প্রীত।' সোমার কানে যখন এসব গানের সুর বাজে তখন ওর যেন মনে হতে থাকে, ওর প্রেম সারা দুনিয়ার বাজারের জিনিস। মনটা দুঃসহ এক যন্ত্রণায় গুমরে ওঠে। ব্যারিস্টারের সঙ্গে ওর নিভৃত ও গোপন প্রেমের কথা যখন মনে পড়ে তখন বুকের ভিতর থেকে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে··· এ গভীর ব্যথা না-জানি কতদিন আর বইতে হবে? আবার ভাবে, এরকমভাবে কতদিন চলবে? ও কী পাচ্ছে— শুধু তো পয়সা! পয়সা তো মানুষের তৃপ্তির জন্যে, কিন্তু ওর এতে কতটুকু তৃপ্তি? জীবন কতটুকু সাশ্রয় ও শান্তিতে ভরিয়ে তুলেছে? এসব ছেড়ে কারুর সঙ্গে চলে গেলে কেমন হয়? এই সময় তো সবাই ওর খোশামোদ করছে. কিন্তু চার বছর পরে কে ওর দিকে ফিরে তাকাবে? কিন্তু কে এমন আছে যে ওর ভার নিতে পারে? কাকে ও বিশ্বাস করবে, কার উপর ও ভরসা রাখবে? প্রেমের গভীর অনুরাগে নিজেকে সমর্পণের কথা ও আর ভাবে না, ভাবে শুধু

আশ্রয়ের কথা, একটু শান্তির কথা। প্রডিউসার পালিত, ডাইরেক্টর জমান ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, কিন্তু যাদের স্পর্শ পেলে মনে হয় ঠিক যেন একটা টিকটিকি ছুঁলাম আর গা-টা ঘিনঘিন করতে থাকে —তাদের হাতে নিজেকে ও সমর্পণ করে কী করে? নিজেকে ও আর বেচতে চায় না, অনেক হয়েছে।

অন্য লোকেরা পাহাড়নের বিশ্বাস ও আস্থাভাজন হবার জন্য কত-রকমভাবে চেষ্টা করত কিন্তু বনোয়ারী বলত, কাউকে বিশ্বাস করবে না, নিজেকেও নয়। তাই ওর বনোয়ারীকেই ভালো লাগে, বিশ্বাস শুধু ওকেই করে। বনোয়ারীও ওকে দিয়ে কখনো নিজের স্বার্থ পূরণ করে নি, বরং ওকে সব সময় সহায়তা করার চেষ্টা করেছে। কখনো টাকা ধার নিয়েছে তো জোর করে ফেরৎ দিয়েছে। সোমা কল্পনার রাজ্যে ডুব দিয়ে ভাবে বনোয়ারীকে যদি ও বিয়ে করে? এখন সমাজের চোখে বনোয়ারীর চেয়ে ওর অবস্থা অনেক উঁচুতে। কেউ হয়তো হাসে, কিন্তু সোমা কারো বিদ্রূপ বা হাসির পরোয়া করে না। ভাবে, আমরা দু'জনে কোনো দূরের এক পাহাড়ে গিয়ে না-হয় থাকব।

বনোয়ারী সোমার ঘরে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলে যায়, হাসিঠাট্টা করে, গল্প করে, মদের বোতল আনিয়ে মদ খায়। কিন্তু পুরুষ যে-চোখে মেয়েকে দেখে, তার সঙ্গ চায়, বনোয়ারী সে-দৃষ্টিতে সোমাকে দেখতে পারে নি। পাহাড়ন এই নির্বিকার ভঙ্গির কাছে হেরে গেছে; ওর সামনে পাহাড়ন পুরোপুরি আত্মসমর্পণের ইঙ্গিত পর্যন্ত দিয়েছে। এ কথা যখন ভাবে, কী একটা লজ্জায় ও অভিমানে মন ভরে ওঠে। বনোয়ারীর এই উপেক্ষা ওকে যেন আরো বেশি টানে, আকর্ষণ করে।

বনোয়ারীর কথা ও এত ভাবে, ওর প্রতি আকর্ষণ এত গভীর হয়ে উঠল যে সারাক্ষণ ওকেই যেন দেখতে পায়। একদিন সামনের রাস্তা

দিয়ে ওকে হেঁটে আসতে দেখল। আস্তে আস্তে বনোয়ারী ভেতরে ঢুকল; ওকে দেখে এক দীর্ঘশ্বাস পড়ল। কেন জানি মনে হল, আজ ওর সঙ্গে শেষ কথা বলা সময় এসেছে।

বনোয়ারী ওর দুর্বল শরীরটা বড়ো একটা চেয়ারে টেনে নিয়ে বসাল; এত রোগা যে চেয়ারটার অর্ধেকের চেয়ে কম জায়গা নিয়ে এক ধারে সেঁটে বসেছে। পাহাড়নের দিকে তাকিয়ে বনোয়ারীর কেমন যেন মনে হল, ওর মন কী কারণে যেন ভয়ানক খারাপ। আর তাই ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করল— কী ব্যাপার, বড়ো যে উদাস দেখাচ্ছে তোমাকে! কিছু হয়েছে নাকি? আমার তো আজকে পানীয় খেতে খুব ইচ্ছে করছে।

—আমি সত্যি একেবারে তিক্ত-বিরক্ত হয়ে উঠছি।

—কার উপর?

—জীবনের উপর, এই যারা প্রেম নিবেদন করতে অভ্যস্ত, তাদের উপর। কাল বিকেলে পালিত ভাই মাথা খেয়েছেন আর আজ জমান সাহেব।

—অভিনন্দন না জানিয়ে পারছি না। তাই ঘটনার স্মরণেই নিয়ে এসো বোতল. হয়ে যাক। তোমার মূল্য দিন দিন বাড়ছে, এসো তাকে স্মরণীয় করে রাখি।

—বাজারের দর বাড়ে, আমি তা ছাড়া আর কী? হঠাৎ পাহাড়নের চোখে যেন একটা ব্যথা আগুনের ফুলকির মতো ছুটে এল, ও ঘুরে দাঁড়িয়ে বনোয়ারীর চোখে চোখ রেখে তীক্ষ্ণ স্বরে বলল— লজ্জা করে না? তুমিও আমাকে তাই ভাবো।

বনোয়ারী একটু যেন লজ্জা পেল, বলল— তুমি আজ খুব রেগে আছ, না?

আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে নিল পাহাড়ন। আস্তে আস্তে বলল—

আমি খুবই দুঃখী, অভাগা।

বনোয়ারীর গলার স্বরে সহানুভূতি ঝরে পড়ল — আজ তোমার কী হল পাহাড়ন ?

— তুমিই বলো আমি কী করব ? তোমাকে তো কতবার বলতে শুনেছি, এইসব রঙ-বাহার খুব বেশি হলে চার-পাঁচ বছর চলতে পারে।

— তুমি কি সত্যিই বিয়ের কথা ভাবছ ? কাকে সবচেয়ে তুমি বিশ্বাস করতে পারো, আমাকে খুলে বলো।

— তোমাকে, শুধু তোমাকে। বলেই পাহাড়ন আবার আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকল।

বনোয়ারী না হেসে পারল না— তুমি একটা ছলনা নিয়ে বেঁচে আছ। অভিনেত্রীর গভীর দায়িত্ব যদি তোমার দ্বারা পালন করা সম্ভব না হয়, তবে তুমি কোনো-একজন মালদার আসামীকে পাকড়াও, দেখো বয়স যেন তার একটু বেশি হয়। আর শোনো, প্রথমে আদালতে বিয়ে করে নেবে আর তার পরে যদি চাও প্রেম কোরো। আচ্ছা, আমি আজ চলি। বনোয়ারী উঠে দাঁড়াল।

পাহাড়ন চোখের জল মুছে বলল - বোসো. আমি পানীয় আনছি।

— না, থাক্। এখন আর খাব না । আমি মনটা ভালো করতে এসেছিলাম আর তুমি তোমার দুঃখ-জ্বালা-ব্যথার কথা শোনাতে লাগলে। আমি চলি। বনোয়ারী চলে গেল।

লজ্জায়, ঘৃণায় বুকে কেমন যেন একটা ব্যথা করে ; রাগ হয়, ভীষণ রাগ হয়। কিন্তু পাহাড়নের মনে হল, এই একজন মানুষ, যাকে আমি ভরসাস্থল ভাবতে পারি। এ অন্ততঃ ভাবের ঘরে চুরি করছে না ; খোলাখুলি বলছে, আমার সঙ্গে স্ফূর্তি করতে এসেছিল। এই ইমানদারিও ওর অসহ্য। পাহাড়ন ভাবে, আগুন লাগুক, এই ইমানদারিও জ্বলেপুড়ে শেষ হয়ে যাক।

চৌহদ্দি পেরিয়ে দূরে বাজছে পাহাড়নের গানের রেকর্ড— 'কস গলে ডালো বহিয়াঁ, মোরে সইয়াঁ ইস বিধ করো প্রীত।'

পাহাড়ন ভাবতে থাকে, এ দুনিয়া হাত বাড়িয়ে আমার সঙ্গে খেলতে চায় কিন্তু সেই হাত বাড়িয়ে কেউ আমাকে আশ্রয় দিতে রাজি নয়।

শুধু মালিক বদল

সরকারের হাত থেকে প্রাণ বাঁচাতে ধনসিং এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পালিয়ে বেড়াছিল; এখন সরকারী উর্দি পরে সরকারী লোক হয়ে বসল। সৈনিক দলে ভর্তি হবার যাবতীয় নিয়মকানুন পালন করা হয়েছে। ওর শরীরটাকে ঠুকে-বাজিয়ে দেখা হয়েছে; সরকারের গুরুত্বপূর্ণ কাজের যোগ্য স্বাস্থ্য আছে কিনা তা তো বাজিয়ে দেখতে হবে। ওর গাঁ কোথায় জিজ্ঞাসা করায় ও একটা কাল্পনিক গ্রামের নাম বলে দিয়েছিল; ফৌজি দপ্তর থেকে থানায় ওর কাগজপত্র পাঠিয়ে ও বিশ্বাসযোগ্য কিনা তা অনুসন্ধান করতে বলা হল। আইন ও নিয়মের বিরাট এই আড়ম্বরের মধ্যেও কতই-না ফাঁক-ফাঁকি আছে। সেই সময় সরকারের খুব লোকজন দরকার। স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার জন্য যে-ডাক্তার ছিলেন, তিনি তো তাকে কাপড় খুলতে বললেন; কিন্তু এই নিম্ন-শ্রেণীর একজন লোকের নোংরা শরীর ছুঁয়ে দেখার কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে বলে তাঁর মনে হল না; এই নোংরা শরীরের বোঁটকা গন্ধ থেকে নাক বাঁচাতে তিনি নাকটাকে রীতিমত চেপে ধরে রায় দিলেন— সরকারের যত দুশমন আছে, তাদের গুলির মোকাবিলা করার শক্তি এই লোকটার যথার্থই আছে।

জেলা হুঁশিয়ারপুরের চিন্তাপূর্ণী থানা থেকে ধনসিং-এর বিশ্বাসযোগ্যতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হয়েছিল। অনুসন্ধান আবার কি? অনুসন্ধান করার নমুনাটা এরকম দাঁড়াল: থানার মুন্সী একজন সেপাইকে ডেকে হুকুম দিল, গ্রামে গিয়ে লোকটার সম্পর্কে অনুসন্ধান করে এসো। একেবারে কোনো-কিছু পাবার আশা নেই অথচ চৌদ্দ মাইল এলাকা চষে বেড়াতে হবে। এ আর কে করে? পরের দিন সেপাই বেমালুম বলে দিল আপত্তি করার কোনো যুক্তিসংগত কারণ নেই।

ধনসিং-এর ট্রায়াল নেওয়া হল। প্রায় এক বছর পার হতে চলল, ধনসিং গাড়ি স্পর্শ করে নি; ওর পরিচিত স্টিয়ারিং, ক্লাচ, ব্রেক আর ইঞ্জিনের গমগম আওয়াজ কতদিন যেন শুনতে পায় নি। গাড়ির গুঞ্জন শুনে আবারও অনুভব করল ওর জীবন স্বাভাবিক হয়ে আসছে। ভরপেট খাওয়াদাওয়া, ব্যারাকে শুয়ে নিশ্চিন্ত ঘুম, মোটর চালাবার কাজকর্ম— এসব ওর কাছে স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। যেন অন্য কোনো দেশ, অন্য কোনো সমাজে ও পৌঁছে গেছে। এখানে সবাই উর্দি পরে; এখানে শুধু হুকুম চলে, শুধু সজাগ-স্ফূর্তিতে থাকা, সেপাহী চালচলন, কথাবার্তা। এখানে সবাই জওয়ান, এসো জওয়ান, খাও জওয়ান। মর-মার জওয়ান। এখানে ইজ্জতের রূপটাও আলাদা, অসম্মানের রূপটাও তাই।

দেশের অগণিত নগ্ন মানুষ, ভুখা মানুষ, ঐ যারা কুঁকড়ে থাকে, পিষে গুঁড়ো হয়ে যায়— সেইসব লোক থেকে এই খাকী উর্দি-পরা মানুষগুলো কত ভালো আছে, কত এরা শক্তসমর্থ আর সম্মানিত জন। এই সমাজে কেউ গালি ও বুটের মার ছাড়া কথা বলে না; সৈনিককে গালি দেয় আর বুট ঠোকে নায়েক, নায়েকদের জমাদার, জমাদারদের সুবেদার। গালি দিলে, বুটের ঠোকর মারলেও কারুর মুখে কোনো প্রতিবাদ শুনতে পাবে না। কারণ এ হুকুমের রাজত্ব। এ সমাজের

মাথার ওপর ছাউনি ; নানা শ্রেণী-বিভাগ। প্রত্যেক শ্রেণীর লোককে আবার উর্দি দেখেই চিনে ফেলা যায়। যার উর্দির উপর একটি মাত্র ফিতের রেখা থাকে কিংবা পেতলের চিহ্ন বাড়ে, তার শক্তি ও হুকুমের ক্ষমতাও বাড়ে। সাধারণ সৈনিকদের পরিবার নিয়ে থাকার অধিকার নেই ; কিন্তু বড়ো অফিসার বাংলোতে থাকেন ; তাঁর স্ত্রী দামী দামী শাড়ি পরেন, খোলতাই শরীর আর ফর্সা মুখ নিয়ে স্বামীর সঙ্গে ঘুরে বেড়ান। ধনসিং ধরমশালাতেও দেখেছে লালাজী, ব্যারিস্টার সাহেব, মন্নো বিবি, তাদের ভাই-বোন-আত্মীয়স্বজনকে— ওঁদের হাতে কত টাকাপয়সা, কত ঠাটবাটে এঁরা থাকেন। ঠিক সেরকমই এই অফিসাররা থাকেন, বসেন, খান। এঁরা হুকুম দেন আর সৈনিকরা সেই হুকুম তামিল করে।

এই তাঁবু আর পরিখার জীবনে শুধু যে একটা অস্বাভাবিকতা আছে তাই নয়, উত্তেজনাও আছে। এখানে চিন্তা করা, বিচার করার সুযোগ নেই, শুধু হুকুম তামিল করাই এদের জীবন। এখানে স্ত্রীদের সঙ্গ নেই, টান নেই, বন্ধন নেই ; বাচ্চাদের পিছটান নেই। ঐ যাঁরা স্বরাজ্যের জন্য ইংরেজদের সঙ্গে সংগ্রামের কথা বলেন-- হিন্দুস্থানের সেসব মানুষ এখানে নেই। ইনক্লাব-জিন্দাবাদের বুক-ফাটা চিৎকার এখানে শোনা যায় না ; এখানে গান্ধীজীর জয়, সুভাষবাবুর জয়ধ্বনি পৌঁছয় না ; এখানে জেলে যাবার হুজুক নেই, হিড়িক নেই। ছাউনি বা ক্যান্টনমেণ্টের এইসব ব্যারাকের দুনিয়া অন্য একটা ভারত থেকে কত আলাদা ! এখানে কংগ্রেস নেই, সোসিয়ালিস্ট বা কম্যুনিস্ট পার্টি বা তাদের রাজনীতির খেলা নেই। কখনও যদি পড়া-লেখার দুনিয়ায় যাবার সুযোগ ঘটে, তখন সংবাদপত্র চোখে পড়ে ; অন্য দুনিয়ার খবর কানে আসে, আর সেই দুনিয়ার খবর জেনে এসে অন্যদের বলার সুযোগ আসে। সাধারণতঃ কংগ্রেসী সংবাদপত্র পড়া বারণ। এখানে

শুধু খোশগল্প, প্যারেড, রেশন বা ফ্রন্টের কথা হয়। কখনও যদি মেয়ে-বউ দেখা যায় তবে তাদের নিয়ে আলোচনা হয় বটে কিন্তু আলোচনা একটু অন্য ধরনের। এই যেমন খেতে খুব ভালো মুলো বা আখ হয়ে আছে ; ওগুলো উঠিয়ে নিয়ে এলে বেশ রসিয়ে খাওয়া যায়। মেয়ে-বউদের নিয়ে আলোচনাও সেই রকমের।

ধনসিং-এর বাইরের রূপ একেবারে পালটে গিয়েছিল কিন্তু ওর ভিতরের মনটা এখনও সেরকমই আছে। ইংরেজ উঠে গেলে আর সে-জায়গায় দেশে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠা হলেই ধনসিং-এর প্রকৃত জীবন শুরু হতে পারে। শুধু তখনই ধনসিং পাহাড়ে ফিরে গিয়ে সোমাকে ফিরে পেতে পারে। সোমার দু'চোখ বেয়ে জল ঝরে পড়তে দেখে ধনসিং ; ভাবে বেচারী ওরই পথ চেয়ে বসে আছে ; ওরই প্রতীক্ষায় ও লালাজীর ঘরে চাকরাণীর চাকরি করে চলেছে। ও নিজের উর্দির দিকে তাকায় আর ভাবে এই উর্দি-পরা সেইসব লোক জনতার শত্রু — যারা ইংরেজ সরকারের প্রতিপত্তি জমিয়ে রাখছে, যারা সমস্ত দেশের রেল স্টেশনে খাড়া হয়ে ইংরেজ সরকারের রক্ষার জন্য অতন্দ্র প্রহরায় নিযুক্ত। ধনসিং যখন শোনে তিন-চার লাখ এরকম প্রহরী আছে তখন ও নিরাশ হয়ে পড়ে ; ইংরেজ রাজকে হটাবার আর কোনো উপায় নেই। সবাই তো নিজের পেট পূর্তির কথা ভাবে ; স্বাধীনতা কেউ চায় না। লোকেরা নিজেরাই খেয়ালখুশিতে ইংরেজের গোলাম হয়ে গেছে।

ধনসিং খুব ভালো ড্রাইভার। স্টাফ কার চালাবার বিভাগে ওর ডিউটি পড়ল। সাধারণ সৈনিকরা ছাউনির বাইরে যেতে পারে না ; অফিসারদের বেলায় এরকম কোনো বাধা ছিল না। বর্ষাকাল। মুষল-ধারে বৃষ্টি পড়ছে ; তবুও মেজর সাহেব মধ্যরাত্রি পর্যন্ত ক্লাবে নাচতে থাকেন। ক্লাবের গাড়ি-বারান্দায় বৃষ্টির ছাঁট আসছে দেখে ধনসিং গাড়ির মধ্যে চেপেচুপে বসে ছিল ; নাচের খেল্ কখন থামবে তারই

ও প্রতীক্ষা করছে। রোজই করে। কখনও ধনসিং মেমসাহেবকে নিয়ে বাজারে বা হোটেলে যায় ; কখনও মেমসাহেবের সঙ্গে অন্য সঙ্গী থাকে। মেজর সাহেবের স্ত্রীকে মেমসাহেব ডাকার রেওয়াজ ; ভারতীয় হলেও। ধনসিং এদের তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে আর ভাবে, এদের স্বাধীনতা কিসের জন্যে চাই, দরকারই-বা কী ? বরঞ্চ এরাই চাইবে না স্বাধীনতা আসুক। এরা তো ইংরেজ সরকারের পরম আত্মীয়। বড়োলোক, ধনীলোকের স্বাধীনতার কী প্রয়োজন ? এদের কিসের অসুবিধা হচ্ছে ? ইংরেজ সরকার নিজেদের রাজত্ব চালাতে কত শত লোককে নিজেদের পঙ্‌ক্তিভুক্ত করে রেখেছে।

মেজর সাহেবের আর্দালি সেপাই ইয়ারমহম্মদের সঙ্গে ধনসিং-এর বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। ইয়ারমহম্মদ খুব রগুড়ে মানুষ। সাহেবের সামনে চুপটি করে থাকে যেন ভয়ানক ভালোমানুষ ও আজ্ঞাবহ দাস। কিন্তু তাঁর পিছনে সাহেবের নকল করে হাসিঠাট্টা শুরু করে দেয়। আর্দালির কাজে তাকে খুব যোগ্য লোক বলে মনে করা হত। কোনো অফিসার যখন বদলী হয়ে আসত তখন তাঁর বাঁধাধরা আর্দালি এই ইয়ারমহম্মদ।

ইয়ারমহম্মদ ধনসিংকে আজ বোঝাচ্ছিল— আরে যারা বেকুব, অহংকারী ও মূর্খ লোক তারাই আর্দালির ডিউটির নামে নাক সিঁটকায়। অথচ জানে না এই ডিউটিতে খুব আরাম, খুব মজা। রোজকার প্যারেড থেকে ছুটি, কষে স্যালুট করার বালাই নেই ; সাহেবের জুতো পালিশ বা বাক্স ঝাড়পোঁছ— তাতে হয়েছে কী ? চার ঘন্টার লাগাতার প্যারেড করে শক্তিক্ষয় করার চেয়ে তো ভালো।

ইয়ারমহম্মদ খিলাফত আর কংগ্রেস আন্দোলনে নাম লিখিয়েছিল। ও বলত— আমার সেখানেও তোফা ভাগ্য ছিল। ভলেন্টিয়ারদের খুব হালুয়া-পুরি খাওয়ানো হত। সেখানেও আমার ডিউটি ছিল লিডারদের

সঙ্গে। খিলাফত-কংগ্রেসের কাজ দাবিয়ে রাখা হল তো আমি সড়াৎ করে এখানে চলে এলাম। একেই বলে বুদ্ধিমানের মতো কাজ, বুঝলে? খোদা আমাকে যখন শেয়াল বানিয়ে পাঠিয়েছেন তখন আর বাঘ হতে পারি না। তবে বাঘের পেছন পেছন ঘুরতে পারি। আরে বাঘের যা ফেলাছড়া যায় সেটুকুই আমার পক্ষে যথেষ্ট! ধনসিং ওর কথা শুনে খুব হাসে, কিন্তু নিজে যখন একান্তে বসে ভাবে, ইয়ারমহম্মদের কথা-গুলো ওকে বড়ো নিরাশ করে দেয়।

ধনসিং-এর কোম্পানিকে রাণীখেত ছাউনিতে বদলী করা হয়েছে; সেখানে এরা পাহাড়ী পথে গাড়ি চালাবার অভ্যাস করবে। পাহাড়ের পথঘাট দেখে ধনসিং-এর পুরনো কথা আরো যেন বেশি করে মনে পড়ে; নিজের দেশের কথা, সোমার কথা বার বার মনে ভেসে ওঠে। কুমায়ুন পাহাড়ী এলাকা অনেকটা কাংড়া পাহাড়ের মতোই; যদিও পার্থক্য আছে। এই পাহাড়ের পুরুষ ও নারীব চেহারা অন্যরকম। সবচেয়ে বড়ো পার্থক্য, কুমায়ুনের পাহাড়ী লোকেরা কাংড়ার ভাষা বলে না। চালাবার অভ্যাস করতে ধনসিং খালি ট্রাক পাহাড়ী রাস্তায় নিয়ে যায়; যাত্রীভরা গাড়ি দেখে, কেন জানি এসব গাড়ির ড্রাইভারদের ও ঈর্ষার চোখে দেখে। ছাউনিতে প্রায়ই ইংরেজ ও আমেরিকান আহত সৈন্যদের নিয়ে আসা হয়; কখনও থাকে ভারতীয় সৈন্য।

রাস্তার কিনারে আর পাহাড়ের সব জায়গায় শুধু সৈন্য-সমাগম লেগে থাকে। পাহাড়ী অঞ্চলে কী করে যুদ্ধ করতে হয় সৈন্যরা সেটা এখানে শেখে। ধনসিং না দেখলে বিশ্বাস করত না, দেশটা এত বড়ো আর ইংরেজ সরকারের শক্তি কী ভয়ানক বিস্তৃত। হাজার দশ হাজার সৈন্য মরে যাওয়া ইংরেজ সরকারের পক্ষে কিছুই নয়। এ-সব দেখে ধনসিং ভাবে ওর অস্তিত্ব কত ক্ষুদ্র, কত নিরর্থক। লড়াইয়ের ক্ষেত্র এখান থেকে হাজার মাইল দূরে; আর সেখান থেকে ইংরেজ,

আমেরিকান আর ভারতীয় আহত সৈন্যরা কত সহজে গাড়িতে চলে আসছে। ওদেরও শীগ্‌গির রণাঙ্গনে যেতে হবে। ছাউনিতে সৈন্যদের হাতে ফৌজি পত্রিকা দেওয়া হয়। এই-সব পত্রিকায় শুধু যুদ্ধে ইংরেজদের জয়ের কথা লেখা থাকে। ধনসিং রাণীখেতের বাজারে অন্য লোকদের অন্য পত্রিকা পড়তে দেখেছে। এই-সব পত্রিকা পড়ার অধিকার সৈন্যদের নেই; তবুও তারা শুনতে পায় ইংরেজরা হারছে।

ধনসিংদের কোম্পানিকে রণাঙ্গনে পাঠিয়ে দেওয়া হল। তিন দিন তিন রাত্রি সমানে ওরা ট্রেনে চড়ল; তারপর জাহাজে নদী পার হয়ে গৌহাটি পৌঁছল। গৌহাটি থেকে গেল দিমাপুরে। দিমাপুরে স্টেশনের সংলগ্ন খুব চওড়া একটা রাস্তা আর দুদিকে বাঁশের চাটাইয়ের বেড়া; খড়কুটো, তালপাতা আর গোলপাতা দিয়ে তৈরি সব ঘর, আর সেগুলি নিয়ে একটা ছোটোখাটো শহর। কুঁড়ে ঘর এক লাইনে সব সারি সারি; ঝকঝকে তকতকে। বস্তি শুধু খাকী-উর্দি সেপাইদের জন্য। দশ মাইল পর্যন্ত শুধু সৈন্য আর সৈন্যদল। হাজার হাজার সৈন্য আর কামান রোজ আসছে তো আসছেই। ধনসিং এত সাজসরঞ্জাম দেখে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যায়; এত যার শক্তি তাকে শক্তিহীন করা কি অত সোজা কাজ?

ধনসিং কনভয়ে লরি চালায়। চারটে মোটর পাশাপাশি যেতে পারে এত বড়ো একটা সড়ক দিয়ে কনভয় করে মণিপুরে যায় ও আসে। লরির ওপর জাল বিছিয়ে দেওয়া হয়; সেই জালে বড়ো বড়ো গাছের ডাল আর ঝোপঝাড় লাগিয়ে লরিগুলির চেহারা পালটে ফেলে; আকাশে উড়ছে জাপানী উড়োজাহাজ, তারা যাতে এ-সব লরি দেখতে না পায় তার জন্যই এই ব্যবস্থা। এই-সব লরি সৈন্যসামন্ত বা সাজসরঞ্জামে ভরা থাকে; এগুলি একটির পর আরেকটা খুব আস্তে আস্তে চলে, খুব সামলে, কেউ আগে, কেউ পেছনে; ইশারা শুনে শুনে এগিয়ে যায়। রাস্তার উপর দিয়ে একসঙ্গে পঞ্চাশটা লরি চলে; মাথার উপর

উড়োজাহাজ প্রচণ্ড আওয়াজ করে উড়ে যায়। সমস্ত পাহাড়ী ঘাঁটিটা থরথর কাঁপে। মনে হয় যেন প্রলয়কালে আকাশ ও পৃথিবী কেঁপে কেঁপে উঠেছে।

কোহিমার উঁচু চড়াই পেরিয়ে মণিপুরের সামনে গেলে কামান আর বন্দুকের প্রচণ্ড আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন গোলাগুলির বর্ষা শুরু হয়েছে আর কামানের ঘরঘর শব্দ যেন বাদলা দিনে মেঘের গর্জন। ঘন-জঙ্গলে অন্ধকারে ঢাকা মাঝরাত, মুষলধার বর্ষা— যত দুর্যোগ আসুক, সেনা-সরবরাহ আর আহত সৈন্যদের চলাচল বন্ধ হবার নয়। শুধু আকাশের বুক চিরে যখন বোমা বর্ষণ হয়, তখন কনভয়ের আগে ও পেছনে চলতি গাড়ির কাছ থেকে নির্দেশ পেলে লরিগুলি থেমে যায়। কিন্তু যদি গাড়ি থামাবার হুকুম না আসে তবে ড্রাইভার বুঝতে পারে আকাশ দিয়ে যেসব উড়োজাহাজ উড়ে যাচ্ছে সেগুলি মিত্রপক্ষের বা আমাদের।

ধনসিং এই প্রাণের ভয়ের মধ্যে থাকতে থাকতে, হুকুম হলে মৃত্যুকে বরণ করতে রাজি এমন সব সৈনিকদের সঙ্গে থেকে এখন ধরে নিয়েছে ভয়টা জীবনের একটা সাধারণ অবস্থা, বিচলিত হবার মতো কিছু নয়। সড়কের উপর বোমা এসে পড়ে আর চলমান লরিগুলি গুঁড়িয়ে যায়, রাস্তাঘাট উড়ে যায় ; ধনসিং অনেকবার এ রকম হতে দেখেছে। বোমা বর্ষণ বন্ধ হবার পরে রাস্তা মেরামত করা হয় আর লরিগুলি আবার যথারীতি চলতে থাকে। প্রাণের যেখানে এত সঙ্কট সেই পরিবেশে থেকে এরা একসঙ্গে চলেফিরে বেড়ায় আর পরস্পরকে নিজেদের মা-বাপ-ভাই-বোনের থেকেও আপনজন বলে জানে। প্রাণের আশঙ্কা থাকলেও এরা আরেকজনকে সঙ্কটের মুখে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যাবার কথা ভাবতে পারে না। নিজেদের মধ্যে কোনো ভেদবুদ্ধি বা রাখঢাক নেই ; মানসিক বা শারীরিক কোনোরকম পর্দার এরা ধার ধারে না।

জীবনের সব রকম ব্যবহার, সব রকম কাজ এরা একজন আরেকজনের বা সমগ্রভাবে করতে পারে। বিনা সঙ্কোচে সব-কিছু বলবে, কান খাড়া করে শুনবে। মর্দান, জওহার পহলবান সিং, খেমসিং, ধনসিং— এরা সব যেন আপন ভাই, এমন ছিল এদের ব্যবহার। শরীর ও মস্তিষ্কের উত্তেজনা থেকে সদাসর্বদা বাঁচতে ও তাকে উপেক্ষা করে চলতে পরস্পর পরস্পরকে গালিগালাজ দিয়ে কথা বলে ; ভালোবাসা-ক্রোধ-সুখ-দুঃখ প্রকাশ করার মাধ্যমও গালিগালাজ।

দিমাপুর থেকে ট্রাকে রণাঙ্গনে সৈন্যদের নিয়ে যেতে, গোলা-বারুদ ভরে বা যুদ্ধে-রত সৈনিকদের জন্য খাবার-দাবার ও জিনিসপত্র নিয়ে মণিপুরের দিকে যেতে আর সৈন্যদের নিয়ে ফিরতে চল্লিশ থেকে আট-চল্লিশ আবার কখনও কখনও ষাট ঘণ্টা সময় লেগে যায়। এতটা সময় ধনসিং বা ওর দলের লোকেরা তরোয়ালের মুখে পা দিয়ে চলাফেরা করে কিন্তু ওদের এই বীরত্ব নিয়ে গর্ব করার মতো অবসরটুকু পর্যন্ত থাকে না। কারণ একটি মানুষ তো এই বীরত্ব বা সাহস দেখাচ্ছে না, সব লোক সঙ্ঘবদ্ধভাবে দেখাচ্ছে। শোবার বা খাবার সময় এরা পায় না, আধ-সেদ্ধ খাবার মুখে পুরে কাজ করে যায়। আকাশ থেকে গোলাগুলি বর্ষণের সময় গাড়িগুলিকে থামাবার যদি হুকুম হয়, তখন অত বিপদ আর মৃত্যুর আশঙ্কা সত্ত্বেও ড্রাইভাররা নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোয়। তখন কারুরই খেয়াল থাকে না যে মাসে মাত্র ষাট-সত্তর টাকার জন্য এরা সর্বস্ব পণ করে কাজ করতে প্রস্তুত। আসলে এরা আর কিছু করে না, নিজেদের ডিউটি করে যায়।

রণক্ষেত্র থেকে ফিরে এলে কোম্পানি কমাণ্ডারের হুকুমে ড্রাইভার-দের এক ছটাকের মতো রাম জোটে। ক্যাম্পে প্রায়ই চব্বিশ থেকে বত্রিশ ঘণ্টা বিশ্রাম করার অবকাশ পায়। ধারে কাছে পাহাড়ী নদীর কাছে গাড়ি নিয়ে সাফ করতে হয়। অবসর সময়ে ক্যান্টিনে নিজের পয়সা খরচ

করে সস্তায় মদ খেতে পারে। ওতে যদি মন না ভরে তবে বস্তিতে গিয়ে দেশী মদ 'জুঙ্গ' খেয়ে আসতে পারে। ক্যাম্পের কাছে মেয়ে-বউরা আনারস, কমলালেবু বা সেদ্ধ ডিম বেচে; সৈনিকরা যা-হয় একটা কিনে খায় আর বউদের সঙ্গে ইয়ার্কি-ফাজলামি করে। তারপর লুকিয়ে আশেপাশের বস্তিতে টহল দিতে থাকে।

জায়গায় জায়গায় বড়ো বড়ো ছবি টাঙানো হয়েছে; তাতে দেখানো হয়েছে বাহাদুর ভারতীয় সৈন্যরা জাপানী রাক্ষসদের কিভাবে শেষ করে দিচ্ছে অথবা তাদের জয় করছে। নানা জায়গায় বিজ্ঞাপন: তাতে লেখা, ম্যালেরিয়া থেকে বাঁচার কী উপায়, গনোরিয়া ও সিফিলিসের মতো দুরারোগ্য ব্যাধির থেকে সাবধান থাকার নির্দেশ। সৈনিকদের দেহ-মনের ক্লান্তি দূর করার জন্যে অফিসাররা কখনও গ্রামোফোনের রেকর্ড বাজান। সিনেমাও দেখানো হয়। সৈনিকদের মনোরঞ্জনের জন্য কখনও কখনও গাইয়ে ও নাচনেওয়ালীদের ডাকা হয়; কিন্তু সৈনিকরা যখন খুশিমতো পাশের বস্তিতে ঘুরতে পারে তখনই তাদের দিলখুস হয় বেশি। ক্যাম্প থেকে বাইরে যাওয়া বারণ। ফৌজি পুলিশ পাহারা দেয়। হুকুম না মানলে এদের গুলি করার নির্দেশ কিন্তু এরা এতটা নিষ্ঠুর হয় না, কারণ সবাই জানে সৈনিকরা কত বাধাবিপত্তি ও বিপদ মাথায় করে কাজ করে আর তাই এদের বেলায় আইন-কানুন প্রয়োগ করতে কত আর নিষ্ঠুর হওয়া যায়। তা ছাড়া সৈন্যদের খুব বেশি অসন্তুষ্ট করা বা ভয় দেখানোও সমীচীন নয়।

নিরন্তর ভয় ও শঙ্কার মধ্যে থাকতে থাকতে সৈনিকরা ভয়ডর কাকে বলে জানে না। মনের আনন্দে এদিক-ওদিকে ঘুরে বেড়িয়ে সন্ধ্যার সময় হাজিরা দিয়েই কেউ কেউ লুকিয়ে ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে বস্তিতে চলে যায়। এরকম অপরাধের জন্য দু-একজনকে শাস্তি দেওয়া হয় বটে তবে বেশির ভাগ সময়েই এসব অপরাধ ক্ষমার চোখে দেখা হয়। শুধু একটা

কাজের ক্ষমা নেই। যুদ্ধের গতিবিধি নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করা অপরাধ বলে গণ্য হয়, কিংবা শত্রুসেনা এগিয়ে আসছে দেখে ভয় পাওয়ার কথা অথবা জাপানীদের বা 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' সম্বন্ধে কোনো কথা বলা চলে না ; বললে সে অপরাধের উপযুক্ত সাজা দেওয়া হয়। জাপানীরা যে দ্রুতবেগে এগিয়ে আসছে সে কথা এদের কখনও বলা হয় না। এ-সব কথা শুধু খুব বড়ো অফিসাররাই জানেন।

ক্যাম্পে সতর্কতা জোরদার করা হয়েছে। আরও অনেক বেশি সংখ্যায় আহত সৈনিক আসছে। ছোটো ছোটো কনভয় যাচ্ছে। সৈনিকদের আশঙ্কা হ'ল যে, শত্রুসৈন্য দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছে। একদিন ধনসিং তার লরির পেছনে একজন আহত সৈনিককে বলতে শুনল— লাইনের পঞ্চাশ পা এগিয়ে বড়ো একটা গর্ত ছিল। গর্তের ওপারে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সৈন্যরা একটা কুৎসিত গালি দিয়ে চ্যালেঞ্জ করল— মাদার··· ইংরেজের কুকুর, নিজের ভাইদের গুলি করে মারতে গিয়ে প্রাণ দেবে ? আমরা জবাবে আরও প্রচণ্ড বেগে গুলি চালালাম ···। ধনসিং এই সৈনিকের কথা শুনে মনের সুপ্ত কৌতূহলে মাথা ঘুরিয়ে দেখল কিন্তু এ-সব কথা নিয়ে ও কারুর সঙ্গে আলোচনা করল না।

এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ধনসিং চল্লিশটি ট্রাকের একটা কনভয় নিয়ে কোহিমা থেকে আহত সৈনিকদের নিয়ে আসছিল। শত্রু-পক্ষের উড়োজাহাজ চিলের মতো ছোঁ মেরে ঝপাঝপ বোমা বর্ষণ করছিল। সংকেত পেয়ে কনভয় ঘন বৃক্ষের আড়ালে দাঁড়িয়ে গেল। রাস্তায় কনভয়ের সামনে-পেছনে বোমা ফাটার প্রচণ্ড শব্দ হল। কনভয় ছয় ঘণ্টা দম বন্ধ করে নিশ্চল হয়ে রইল। অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসার পর কনভয় আবার চলতে শুরু করল এবং সারা রাত এই ঘুটঘুটে অন্ধকারে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল। সকালবেলা আবার

শত্রুপক্ষের উড়োজাহাজ ঘিরে ধরল। কনভয় আবার দাঁড়িয়ে গেল। আবার বোমা পড়ল। শেষের দিকে দুটো ট্রাক উড়ে বেরিয়ে গেল। বিকেলবেলা নাগাদ কনভয় দিমাপুর পৌঁছল। দিমাপুর পৌঁছেই ড্রাইভাররা বোমা বর্ষণের সেই ভয়ংকর ঘটনা নিয়ে দিব্যি হাসি-গল্প শুরু করে দিয়েছে। মর্দানসিং আর হাতুসিং শেষের দুটি ট্রাকের সঙ্গে খতম হয়ে গেছে।

কনভয় আহত সৈনিকদের হাসপাতালে নামিয়ে দিয়ে লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে গেল। ক্যাপ্টেনসাহেব সব ড্রাইভারদের পিঠে হাত রেখে শাবাশী দিলেন। বড়ো ইংরেজ অফিসারও ড্রাইভারদের মুখের দিকে তারিফের চোখে তাকিয়ে মাথা নেড়ে মুচকি একটু হাসলেন। প্রত্যেক ড্রাইভার এক-এক ছটাক রাম, বিস্কুট ও মিষ্টির রেশন পেল। ট্রাক ধোবার কাজটাও পরের দিনের জন্য স্থগিত রাখার নির্দেশ দেওয়া হ'ল।

ধনসিং আর তোতাসিং সিগারেট ধরিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তোতাসিং পরামর্শ দিল— চল্, ক্যান্টিনে গিয়ে আরও একটু মদ খাই।

ধনসিং রাজি না হওয়ায় তোতাসিং একটা গালি ঝেড়ে বলল— ওপারে সঙ্গে করে পয়সা নিয়ে যাবি নাকি ? কাল যদি মর্দান ও হোতু-র মতো রাস্তায় শেষ হয়ে যাস, তবে পয়সা কি মার··· ওখানে রাখবি নাকি ?

ধনসিং-ও পাল্টা একটা বিশ্রী গালি দিয়ে বলল - চল্ ··। দুজনে ক্যান্টিন থেকে আরও এক ছটাক মদ খেল। ওরা আরো খেতে চাইছিল কিন্তু একবারে এর চেয়ে বেশি মদ দেবার হুকুম নেই বলে ক্যান্টিন দিতে রাজি হয় নি। ওরা বেড়াতে বেড়াতে সেই জায়গাটায় এল যেখানে বস্তির থেকে মেয়ে-বউরা আনারস, কমলালেবু ও আরো নানা জিনিস এনে বেচতে বসে যায়। তোতাসিং ধনসিং-এর কনুইয়ের মধ্যে হাত গলিয়ে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে বউ-মেয়েদের মধ্যে

অল্পবয়সী মেয়েদের দিকে তাক করে নানারকম অশ্লীল মন্তব্য করছিল। ওরা থোঙ্গমাকে খুঁজছিল। তোতাসিং একটু হেসে ধনসিংকে বললে —মাদর··· একেবারে পট্‌কা, ফাটাবার জন্যে তৈরি।

থোঙ্গমা কাটা আনারসে নুন ও মরিচ মেখে কলাপাতায় সাজিয়ে বিক্রি করছিল। এক এক ঠোঙার দাম দু'আনা। থোঙ্গমার পুরু ঠোঁট পানের রসে লাল হয়ে আছে। গোলগাল চওড়া মুখে বড়ো বড়ো চোখ। এরকম একটা খোলতাই চেহারা দেখে বয়স বোঝা ধনসিং-এর পক্ষে একটু শক্ত। দৃঢ়বদ্ধ শরীর ও হাসিখুশি মুখ দেখে মনে হয় বাইশ-পঁচিশের বেশি বয়স নয়। থোঙ্গমা একটা রঙিন চুরিদার চাদর গায়ে জড়িয়ে জড়োসড়ো হয়ে বসে ছিল। তোতাসিং ধনসিং-এর কনুইয়ের মধ্যে হাত গলিয়ে হাতের পাঞ্জায় চাপ দিয়ে থোঙ্গমার সামনে উবু হয়ে বসে দুটো পাতার ঠোঙা নিল, একটা নিজের জন্যে, অন্যটা ধনসিং এর।

তোতাসিং এক টাকার একটা নোট দিল। থোঙ্গমা বারো আনা ফেরত দিতে হাত বাড়িয়ে দিল। তোতাসিং পয়সা নেবার সময় থোঙ্গমার হাতটা টেনে নিয়ে একটু চাপ দিল।

থোঙ্গমা মুচকি হেসে পয়সা-সমেত হাতটা টেনে নিল।

তোতাসিং জিজ্ঞেস করল— 'জুঙ্গ' (দেশীমদ) আছে ?

—ঐ গাঁয়ে। থোঙ্গমা হেসে বলল।

তোতাসিং আরো একটা টাকা ওর হাতে গুঁজে দিল। থোঙ্গমার কাছে আর পাঁচ-সাতটি ঠোঙা ছিল, সেগুলি ঝুড়িতে রেখে উঠে পড়ল। ওর কুড়ি হাত দূরে তোতাসিং ও ধনসিং এগিয়ে আসছে। থোঙ্গমার গাঁ ক্যাম্প থেকে আড়াই মাইল দূরে। তোতাসিং দুই ভাঁড় জুঙ্গ খেল, ধনসিংকেও দিল, ধনসিং-এর থেকেও এক টাকা পাইয়ে দিল। তোতাসিং থোঙ্গমার সঙ্গে ততক্ষণে অশ্লীল ঠাট্টাবটুখেরা শুরু করে দিয়েছে।

থোঙ্গমা হেসে উঠছে, বলছে— আমি চিনি নেব, কাপড় নেব।

তোতাসিং দু'হাত বাড়িয়ে কথা দিল— এত চিনি দেব, কম্বল দেব।

সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ছিল। তোতাসিং সেদিকে তাকিয়ে ধনসিংকে মনে করাল— মা···কে···হাজিরার সময় হয়ে এসেছে রে···। দু'জনে ফেরার পথ ধরল। রাস্তায় দেরি হয়ে যাবার আশঙ্কায় ওরা মাঝে মাঝে দৌড়চ্ছিল।

পরের দিন পাহাড়ী নদীর কাছে ট্রাক ধুয়েমুছে সাফ করার সময় তোতাসিং বলল— শালীকে এক সের চিনি ও একটা কম্বল দেবখন আর দু'জনে একটু মজা লুটে আসব।

কথাটা ধনসিং-এর ঠিক পছন্দ হল না। চিনি-কম্বল দেবার অবশ্য কোনো অসুবিধা নেই। কোহিমায় রাস্তার ধারের মুদির দোকান থেকে চার প্যাকেট সিগারেট নিয়ে তার বদলে একটা ফৌজি কম্বল বার করে তার হাতে দিয়েছিল। সরকারী মাল, অত ভাবনার কী আছে? কিন্তু ধনসিং ভাবছিল অন্য কথা। তোতা বড়ো বদমাশ, মাগীবাজি করে। বেশ্যাবাজির ঝগড়ায় আমি দুটো লোককে সাবাড় করে এসেছি। এখানে তো দুনিয়াটাই এই।

দুই দিনের ছুটি ফুরিয়ে গেল তবুও তৃতীয় দিনে ওদের কারো কনভয় নিয়ে যাবার ডিউটি পড়ল না। ড্রাইভাররা নিজেদের মধ্যে গোপনে আলোচনা করতে লাগল— হয়তো জাপানীরা সড়কটা কব্জা করে নিয়েছে। এতে ওদের কোনো দুশ্চিন্তা নেই, ভয়ডরও নেই। ধনসিং দিনে পড়ে পড়ে ঘুমোয় আর ঘুরে ফিরে বেড়ায়; তাই রাতে সহজে ঘুম আসে না। শুয়ে শুয়ে ভাবে, জাপানীরা জিতে গেলে তো ভালোই হয়। কী জানি কতদিন লাগবে··· থোঙ্গমার কথা ভাবে. থোঙ্গমা···

পুরো তিন সপ্তাহ পার হয়ে গেল। কনভয় কোহিমা-মণিপুরের পথ দিয়ে যাচ্ছে না বটে কিন্তু দিমাপুর থেকে গৌহাটিতে আহত

সৈনিকদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আর ট্রাকে ট্রাকে ভরা সৈন্যদের। বহু সৈন্য যাচ্ছে রেলে আর মোটরে। গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে, বাংলা থেকে উড়োজাহাজ করেও রণক্ষেত্রে সৈন্যদের পাঠানো হচ্ছে। প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে। সারাটা বর্ষাকাল ধনসিং কনভয় নিয়ে গৌহাটির দিকে যাতায়াত করছে ; বর্ষার তোড়ে রাস্তাঘাট ভেঙে গেলে কনভয় একদিন-হু'দিন রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখা হয়।

সেপ্টেম্বর মাসে জাপানী ও আজাদ হিন্দ্ ফৌজ পেছনে হঠছিল। ধনসিং-এর কনভয় আবার মণিপুরের দিকে যাচ্ছিল। এরা দিমাপুর ফিরছিল। ধনসিং-এর গাড়ি সবচেয়ে আগে আগে চলেছে। ওর সঙ্গে ওয়্যারলেসের লোক বসে। গাড়িগুলি একটা ঢালু জায়গায় এসে ব্রেক কষে আস্তে আস্তে এগোচ্ছিল। হঠাৎ ধনসিং-এর গাড়ির বনেটে একটা গুলি এসে পড়ল ; অন্য একটা গুলি এসে লাগল ওর হাতে। সঙ্গের ওয়্যারলেসের লোকটির কানের কাছে গুলি লাগতেই নিঃশব্দে গড়িয়ে পড়ল। গাড়ির একটা চাকায় গুলি লেগে টায়ার বসে গেল। গাড়িটা রাস্তার কিনারের গর্তে পড়ে যাচ্ছিল ; ধনসিং এক হাতে কোনোমতে গাড়িটাকে বাঁচাল।

সড়কের ধার দিয়ে বেশ কয়েকটি বন্দুক ওর দিকে উঠে এল। কয়েকজন সৈনিকের মুখ দেখা গেল ; থকথকে কাদায় ভরা পা। তারা চ্যালেঞ্জ করল— নিজের দেশ ও জাতভাইয়ের স্বার্থে আমাদের দিকে চলে আসবে তো গাড়ি থামাও।

ধনসিং বুঝে নিল— এরা আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর সেপাই। আত্ম-সমর্পণের জন্য ও হাত উঠিয়ে দিল। ওর পেছনে যে-সব ট্রাক আসছিল, তারাও থেমে গেল এবং সব ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে হাত তুলে ধরল। ট্রাকগুলি ছিল আহত ইংরেজ সৈন্যে ভরা। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের অফিসারের হুকুমে ড্রাইভাররা ফুট বোর্ডে

দাঁড়িয়ে গাড়িগুলি চালিয়ে গর্তের দিকে চালান করে দিল। ট্রাকগুলি হেলতেদুলতে নীচের দিকে গড়িয়ে গেল। ওতে পড়ে গিয়ে আহত ইংরেজ ও আমেরিকান সৈন্যরা সব শেষ হয়ে গেল। ড্রাইভাররা রাইফেল নিয়ে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সঙ্গে 'জয়হিন্দ্' ধ্বনি দিতে দিতে গর্তের নিচে নেমে জঙ্গলের পুব দিকে চলে গেল।

* * *

কনভয়ের বিশজন ড্রাইভার আর বিশজন সান্ত্রী আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বারো জন লোকের প্রহরায় ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল। ক্যাম্পে খড়কুটোয় ছাওয়া ঘর। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের অফিসার, ব্রিটিশ-ভারতীয় সেনাবাহিনীর ড্রাইভার ও সান্ত্রীদের রাইফেল থেকে গুলি বার করে নিলেন এবং এদের সতর্ক করে দিয়ে বললেন— আপনারা দেশের শত্রুর পক্ষ ছেড়ে নিজেদের জাতভাইদের সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে এসেছেন। আমরা আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আপনাদের উপরে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, আপনারা পালাবার চেষ্টা করবেন না। আপনারা যদি পালাবার চেষ্টা করেন তা হলে আমরা গুলি করে আপনাদের মারতে বাধ্য হব।

ধনসিং-এর জখমী হাতে ভয়ানক যন্ত্রণা হচ্ছিল; গলায় একটা পট্টি বেঁধে তাতে হাতটাকে ঠেকিয়ে রাখল। অন্য হাতে রাইফেলটা কাঁধের ওপর চেপে ধরল। পরের দিন ধনসিং ও তার সঙ্গীদের বড়ো ক্যাম্পে যেতে হল। চ্যাপ্টা ধরনের দেখতে একজন হিন্দুস্থানী অফিসার এগিয়ে এল; মাথা-ন্যাড়া একজন জাপানী অফিসারের সামনে সে এক-একজন সৈন্যকে আলাদা আলাদা ডেকে ব্রিটিশ-ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবস্থা সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে লাগল। ড্রাইভাররা যতটুকু জানত

তা বলে দিতে তাদের আপত্তি ছিল না। ওরা বিশ্বাসঘাতকতা করছে এ কথা তাদের ঘুণাক্ষরে মনে হল না। শত্রুসেনার পক্ষ ছেড়ে নিজেদের জাতভাইদের সেনাবাহিনীতে সামিল হতে পেরে ওরা খুব সন্তুষ্ট হল। ওরা এখন আজাদ হিন্দ্ ফৌজে যোগ দিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়তে প্রস্তুত।

আজাদ হিন্দ্ ফৌজের ডাক্তার ধনসিং-এর হাতে ওষুধ লাগিয়ে একটা পট্টি বেঁধে দিলেন। তখন ওরা তৃতীয় ক্যাম্পের দিকে গেল। কয়েকজন জাপানী ও হিন্দুস্থানী জখমী সৈন্যকে খচ্চরের পিঠে বা বর্মী কুলিদের সাহায্যে স্ট্রেচারে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। আহতদের মধ্যে যারা হেঁটে যেতে পারছে তারা হেঁটে চলেছে। আহত সৈনিকদের জন্য ইংরেজ ক্যাম্পে যতটা আরাম, যতটা সাজসরঞ্জাম ও জিনিসপত্রের বন্দোবস্ত, এখানে তার কিছুই নেই; কিন্তু সেজন্য ধনসিং-এর অভিযোগও ছিল না। ওরা ইংরেজের চাকুরে আর এরা দেশের কাজ করছে। ঘন বৃক্ষ ও খড়কুটোর আড়ালে ছোট্টমতো একটা হাসপাতাল; খড়কুটোর বিছানায় আহতদের শুইয়ে রাখা হয়েছে। জাপানী ও হিন্দুস্থানী সৈন্যরা আলাদা আলাদা পড়ে রয়েছে। ধনসিং হাতটাকে একটু-আধটু ঘোরাতে-ফেরাতে পারছে। ওর বুঝতে অসুবিধা হল না যে এদের এখানে জিনিসপত্রের অভাব। জাপানী সৈন্যদের খাতির বেশি আর হিন্দুস্থানী সৈন্যদের খুবই দুরবস্থা।

হিন্দুস্থানী ডাক্তারের মুখেচোখে বিরক্তির ছাপ; সৈন্যদের শরীর থেকে গুলি বার করতে অনুভূতি-নাশক ইনজেকশন চাই অথচ সেই ইনজেকশন খুবই কম। এই ইনজেকশন শুধু জাপানী সৈন্যদেরই দেওয়া হয়। ডাক্তার ধনসিংকে ভরসা দিলেন— বাহাদুর জওয়ান, উৎসাহটাকে একটু জিইয়ে রাখো। কম্পাউণ্ডার ও হিন্দুস্থানী আরদালি ধনসিং-এর হাতটা চেপে ধরে রাখল। ধনসিং দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করে

রইল; গুলি বার করে দেওয়া হল। ধনসিং-এর হাতটা ভালো হতে পুরো এক মাস লাগল।

হাসপাতালে একজন কম্পাউণ্ডার ছিল কাংড়া জেলার লোক। সিঙ্গাপুরে যে-সময়ে ইংরেজ সৈন্যরা অস্ত্র সমর্পণ করে, তখন এই কম্পাউণ্ডার সিঙ্গাপুর ছাউনিতে ছিল। সে ধনসিংকে বলল— জাপানীরা সিঙ্গাপুর ঘিরে ফেরল। গোটা ক্যাম্পটা উড়িয়ে দেবে ভয় দেখাল। এই অবস্থায় পড়ে ইংরেজ কমাণ্ডার হুকুম দিল— 'আমি তোমাদের জাপানী ফৌজের কমাণ্ডারের হাতে সমর্পণ করছি। এখন থেকে তোমাদের জাপানী কমাণ্ডারের হুকুম মেনে চলতে হবে; যেন ছাগলের মালিক একসঙ্গে তার সব ছাগলগুলি বেচে দিচ্ছে। তারপরই নেতাজীর আবির্ভাব ঘটে।

কম্পাউণ্ডার নেতরাম যখন নেতাজীর কথা বলে যায় তখন ধনসিং-এর উৎসাহের সীমা থাকে না, ওর চোখ জ্বলজ্বল করে ওঠে—। নেতরাম বলে চলে জাপানীদের সাহায্য পাচ্ছি ঠিকই কিন্তু আমরা দেখো আমাদের দেশ থেকে ইংরেজদের ভাগিয়ে দিয়ে দেশের স্বাধীনতা কায়েম করবই। পাহাড়ী ভাষায় নেতরাম জাপানীদের গালি দিয়ে ওঠে, বলে— এইসব হারাম··· কী লোক কি মানুষ নাকি? এরা বড়ো দাগাবাজ, ভয়ানক রাক্ষস। ইংরেজরা তবুও মানুষ, রাজ্য চালাতে জানে। তার চাকরদের পেট ভরে খেতে দেয়, ফুসলায় ঠিকই কিন্তু খুশি ক'রে কাজ আদায় করে। জাপানীরা তো গায়ে সঙ্গীন ঢুকিয়ে দিয়ে কাজ করায়। নেতাজীর হুকুম, জাপানীদের সাহায্য পাওয়া যাক না যাক আমাদের নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে দেশকে ফিরে পেতে হবে।

ধনসিং ভাবে, ভারতে যদি বর্মার মতো ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে, তবে আমরা এক মাসের মধ্যে কাংড়ার দুর্গের কাছে

পৌঁছে যাব। রণাঙ্গনে গিয়ে লড়ব। পাঞ্জাবের দিকে যে সৈন্যদল সবচেয়ে আগে যাবে তাদের সঙ্গে চলে যাব।

ধনসিং হাতটা নাড়াচাড়া করতে পারছে দেখে ওকে ডিউটিতে পাঠিয়ে দেওয়া হল। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সৈন্যরা কনভয় নিয়ে চলে না। সৈন্যদের রেশন বা জিনিসপত্র পৌঁছতে বা আহত সৈন্যদের পেছনের দিকে হটিয়ে নিয়ে যেতে বেশির ভাগ খচ্চর বা কুলিদের সাহায্য নেওয়া হয়। একটা গোলন্দাজ বাহিনীর রেশন আনা ও নিয়ে যাওয়ার জন্য ধনসিংকে দুটো খচ্চর দেওয়া হল।

এখানে রেশনের ভয়ানক ঘাটতি। ইংরেজদের ছাউনির মতো চিনি ও বিস্কুটের বস্তা এদিক-ওদিক গড়াগড়ি যায় না। ধনসিংএর মনে পড়ে গেল, দিমাপুর ও কোহিমার ক্যাম্পের সৈন্যরা রেশনের জিনিসের উপর দিয়েই চলে যেত; রেশনের জিনিস পায়ের নিচে গুঁড়িয়ে যেত। রাস্তার ধারে ছেলেমেয়েরা ও বউরা নিজেদের পেট ও শরীর দেখিয়ে এক মুঠো চিনি, নুন আর কম্বলের জন্য নিজেদের বিকিয়ে দিতে রাজি হয়ে যেত। আর এখানে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সেপাইরা আধ-পেটা খেয়েও লড়তে গর্ব অনুভব করে। যারা জনতাকে দমন করে রেখেছে, এরা তাদের গোলাম নয়; এরা জনতারই সৈনিক। ও জানেও না মাইনে পাবে কিনা, পেলে কবে পাবে কিংবা হয়তো পাবেই না; ধনসিং উত্তেজনায় অধীর হয়ে ভাবে, একবার আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সেপাইরা দিমাপুরের হিন্দুস্থানী সৈন্যদের সঙ্গে লড়াইয়ে মোকাবিলা করুক-না, তখন দেখবে কী কাণ্ড হয়ে যায়। লোকেরা সব ইংরেজদের বিরুদ্ধে খেপে আছে; তখন তো ইংরেজদের অন্তিম দিনের কথাই আমরা ভাবব।

সাত নম্বর ক্যাম্পের রেশন শেষ হয়ে গিয়েছিল। সন্ধ্যাবেলা পর্যন্ত কোনো রেশন এসে পৌঁছল না দেখে ক্যাম্পের কমাণ্ডার, ধনসিং ও

কালেখাঁ আরদালিকে বেস ক্যাম্প থেকে রেশন নিয়ে আসতে হুকুম দিল। ধনসিং আট মাইল পিছনে গিয়ে গোদার জাপানী অফিসারকে একটা চিঠি দিল। জাপানী অফিসার চিঠিটা পড়ে অন্য দু'জন জাপানী অফিসারের সঙ্গে চিড়বিড় করে কী যেন সব বলল। আগে যে আরদালিটা এসেছিল সে এদের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। সে ধনসিং ও কালেখাঁ আরদালিকে ফিসফিস করে বলল— পাঁচ ঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে আছি। বহনকা··· জাপানীদের জন্য রেশন ঠিকই দেওয়া হচ্ছে। অথচ আমার চিঠি ছিঁড়ে ফেলে দিল।

জাপানী অফিসারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য এই আরদালিটাই আবার একটা সেলাম ঠুকল। অফিসারদের কপালে বিরক্তির রেখা ফুটে উঠতে দেখা গেল। ও ধনসিং ও কালেখাঁকে সংকেতে ওর পাশে এসে দাঁড়াতে বলল। একজন অফিসারকে একটা গর্তে সুরসুর করে নামতে দেখল। গর্তটার মধ্যে বিশ-পঁচিশটা বস্তা উপরে নীচে রাখা আছে। এ-সব বস্তা ভারতীয় সৈন্যদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল। এতে ভারতীয় ফৌজি চিহ্ন। অফিসারদের ইশারায় ধনসিং আর কালেখাঁ এক-একটা বস্তা উঠিয়ে তার সামনে রাখছিল। অফিসার প্রত্যেকটি বস্তায় হাত ঢুকিয়ে দেখছে এতে কী আছে। চাল আটার বস্তাগুলি অফিসার অন্য এক দিকে রাখতে বলল। একটা বস্তায় গোল-মরিচ রাখা ছিল।

অফিসার বস্তার থেকে গোলমরিচ হাতে রেখে জিজ্ঞেস করল— এগুলি কী ?

কালেখাঁ জবাব দিল— গোলমরিচ। অফিসার ইশারায় জানতে চাইল কী কাজে আসে।

কালেখাঁ মুখে হাত দিয়ে বলল, খায়।

অফিসার বুট দিয়ে বস্তায় একটা ঠোক্কর মেরে বলল— বস্তা ওঠাও।

কালেখাঁ ও ধনসিং অনেক করে বোঝাল এ জিনিস খেয়ে পেট ভরানো যায় না। জাপানী অফিসার রেগে উঠে ভ্রূকুটি করল। গোল-মারর একটা বস্তা নিয়ে গিয়ে কী লাভ হবে। তবুও ওরা গোল-কালেটা খচ্চরের পিঠে চড়িয়ে উদাস মনে ফিরে চলল।

কেন? আমরা ংকে একটা ধমক দিয়ে উঠল, বলল, আরে ঘাবড়াচ্ছ লাঙ্গলে চড়িয়েছে, কারণ নায়ার সেপাই। আগে আমাদের ইংরেজরা ছিল। ওরা আমাদের যুদ্ধে পাঠা র কাছে চড়াবার রসদ ছিল, মাধ্যম করেছে, শুধু ঘাস খাওয়াবে কেন, দা শস্যও খাইয়েছে। এখন তো আবার জাপানীদের রাজত্ব। কখনও নেতাজ দয়াতে যদি রাশিয়ার মতো দেশটা হয়ে যায় তখন নাহয় আমরা সুখের মুখ দেখব। নেতাজী হুকুম দিয়েছেন দেশের স্বাধীনতার জন্য আমাদের সব-কিছু মুখ বুঁজে সইতে হবে। নেতাজী যখন আসেন তখন এরাই আবার আমাদের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলে; নয়তো যে হাল বর্মার হয়েছে, আমাদেরও তাই। এই লোকগুলো তো আমাদের কাঁচা মাংস খেয়ে যাবে।

দুঘণ্টা আগে দুটি ইংরেজ উড়োজাহাজ বোমা ফেলে গেছে। পাকদণ্ডী ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে। রাস্তাঘাট চেনার উপায় নেই। চত্তরসিং, ধনসিং আর কালেখাঁ আন্দাজে দক্ষিণ-পশ্চিমের দিকে যেতে লাগল। কালেখাঁ বার বার বলছে, রাস্তা গুলিয়ে ফেলেছি আমরা, অন্ধকারে আরও হারিয়ে যাব। দিন ফোটা পর্যন্ত কোথাও নাহয় থামা যাক। গোলমরিচের বস্তাটাকে এত তাড়াতাড়ি নিয়ে গিয়েই বা হবে কী? চত্তরসিং আর ধনসিং বলল, বন্দুকের আওয়াজ যেখান থেকে আসছে ওদিকেই যাওয়া যাক। ওরা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকেই চলতে লাগল। পুব দিকে ভোরের প্রথম আলো ফোটার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। এখনও এরা ঠিক রাস্তা খুঁজে পেল না। খচ্চরগুলি ক্লান্ত

হয়ে পড়েছে, আর যেন চলতে পারছে না; বারবার হোঁচট খাচ্ছে। তিনজনে ঘন বৃক্ষের নীচে বেড়ার আড়ালে একটু জিরিয়ে নিতে বসল; বসে ভাবল কোমরটাকে একটু সোজা করে নিই তাই শুয়ে পড়ল আর সঙ্গে সঙ্গে ঘুম।

ধনসিং-এর হঠাৎ মনে হল যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে; নড়েচড়ে উঠতে গেল, পারল না। শরীরটাকে নাড়াতেই পারছে না। চোখ খোলার চেষ্টা করল কিন্তু চোখ দুটো কাপড় দিয়ে বাঁধা। ধনসিং এর হাত দুটো পেছনে বেঁধে চোখ খুলে দেওয়া হল; ও দেখল ওর দু'জন সঙ্গীরও ঠিক একই অবস্থা।

পিস্তল উঁচিয়ে ওদের সতর্ক করে দিয়ে লোকটা বলল— যদি চেল্লাচিল্লি কর তবে সবকটাকে গুলি করে মারব। মুখ থেকে কাপড় সরিয়ে জিজ্ঞেস করা হল— তোমাদের শেষ সেনাদলটা কোথায় লুকিয়ে আছে বলো?

ধনসিং ও তার সঙ্গীরা ইংরেজ সৈন্যের স্কাউটের হাতে ধরা পড়েছে। ওদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কারণ কোনোরকম খবর দিতে এরা রাজি নয়। ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে ওদের আলাদা আলাদাভাবে আটক করে রাখা হল। ভেবে দেখার জন্য ওদের ছয় ঘণ্টা সময় দেওয়া হল; বলা হল, শত্রুপক্ষের সব গোপন খবর যদি এ সময়ের মধ্যে এরা না বলে তবে এদের গুলি করে মারা হবে। ছ'ঘণ্টা পরে ধনসিংকে একজন হিন্দুস্থানী ও একজন ইংরেজ অফিসারের সামনে এনে হাজির করা হল। ধনসিং ভয়ে কাঁপছিল কিন্তু মুখে ওর একটাই উত্তর— আমি কিছু জানি না।

ধনসিংকে প্রাণে মারা হল না তবে অন্য সৈন্যদের সঙ্গে জেলে পুরে রাখা হল। দ্বিতীয় দিনে এল কালেখাঁ। তিন দিনের দিন চত্তরসিং। ওর শরীরে প্রচণ্ড প্রহারের দাগ। চত্তরসিংকে বেদম মারা হয়েছে।

ও বলল, ওর চালাকির জন্য এত মার খেয়েছে। ভয় পেয়ে ও মিথ্যে কথা বলেছিল যে, আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজের লোকেরা ওকে জবরদস্তি সেপাই বানিয়েছে। ও ইংরেজ সৈন্যদের কাছে ফিরে যেতেই পালিয়ে আসছিল। অফিসার ওর আনুগত্যের জন্য খুব তারিফ করল। ওকে আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজের পরিখা আর ক্যাম্পের পথ বাৎলে দেবার জন্য নিয়ে যাওয়া হল। ও চব্বিশ ঘন্টা ধরে স্কাউট পার্টিদের প্রতারণা করে গেল। বারবার ওকে গুলি করে মারার হুমকি দেওয়া হল। ও ঘন ঘন পায়ে পড়ে, বলে— হুজুর, রাস্তা খুঁজে পাচ্ছি না। ওকে ধোলাই দিয়ে অফিসারদের সামনে নিয়ে আসা হল। অফিসার বলে উঠল — নাও, নিয়ে যাও একে। ভীতু লোক। হয়তো সত্যিই ভুলে গেছে। এইসব সেপাইদের মাথায় স্রেফ গোবর থাকে, বুঝলে।

তার দিয়ে ঘেরা খড়কুটোর ক্যাম্পে ধনসিং-এর সঙ্গে আরও প্রায় শ'খানেক সেপাইকে পনেরো দিন রাখা হল। পরে কয়েদী সৈনিকদের গোর্খা সেপাইদের প্রহরায় দিমাপুরের পথে শিলিগুড়ি ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেওয়া হল। আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজের সেপাইরা হিন্দুস্থানী, আবার হিন্দুস্থানী সৈন্যরাই সঙ্গীন উঁচিয়ে এদের পাহারা দেয়। এদের দু'পক্ষেরই কথা বলা মানা। পাহারাদার সেনারা নিজেদের গর্ব করে ভাবত রাজভক্ত; তাদের মনে ছিল অদ্ভুত একটা অহংকার। আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজের সেপাইদের দেখে এরা ভাবত বিশ্বাসঘাতক ও নিমক-হারাম। আবার আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজের সেপাইরা ওদের ভাবত মাংসের-টুকরো-খাওয়া কুকুর; ভাবত এক টুকরো মাংসের জন্য এরা দেশটাকে বেচে দিতে পারে। আজাদ্‌ হিন্দ ফৌজের সেপাইরা ভাবত, শীগ্‌গিরই ওদের বিজয় হবে এবং নিজের ভাইদের সঙ্গে হাত মেলাতে পারবে।

ধীরে ধীরে পাহারাদার ও কয়েদী সেপাইরা বুঝল ওদের ভাষা এক, ওরা আলাদা নয়। প্রহরা কড়াকড়ি থাকা সত্ত্বেও ক্যাম্পে খবর পৌঁছতে

লাগল। লুকিয়েচুরিয়ে খবরের কাগজ আসতে লাগল। ইংরেজদের নীতি বুঝতে পেরে সিপাইরাও বিগড়ে যেতে লাগল। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সেপাইরা মনে মনে তাদের অন্ধকার ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হয়ে রইল। ওদের একটাই মাত্র সান্ত্বনা ছিল, ওরা দেশের জন্য লড়ছে, পরিণাম তার যাই হোক…

যুদ্ধে ইংরেজদের জয় হয়েছে। জেলবন্দী আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর সৈন্যরা নিরাশ হয়ে পড়েছে। তবুও ওদের কানে খবর এসে পৌঁছল, দেশের জনসাধারণ ওদের মুক্তির জন্য আন্দোলন করছে। ক্যাম্পের সেপাইদের বাছাই করা হচ্ছে; ওদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে তদন্ত-অনুসন্ধান ও বিচার চলেছে। সেপাইদের পুরনো চিঠি আর হিসাব তলিয়ে দেখা হচ্ছে; কোন্ অবস্থায় পড়ে এরা আজাদ হিন্দ্ ফৌজে যোগ দিয়েছিল, অপারগ হয়ে কিংবা স্বেচ্ছায়। যে-সব সৈন্য ভয় ও নিরাশায় আজাদ হিন্দ্ ফৌজে যোগ দিয়েছে তাদের ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। যারা নিজেদের বিচারবুদ্ধির তাগিদে, কর্তব্য মনে করে আজাদ হিন্দ্ বাহিনীতে নাম লিখিয়েছে, তারা বিশ্বাসভঙ্গের দোষে দোষী এবং তারা অপরাধী। ধনসিং ছাড়া পেল না, কারণ ও নির্ভীক বলেই বিশ্বাসের অযোগ্য বলে ধরা হল।

দিল্লীতে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের নেতাদের মকদ্দমা চলতে লাগল। সারা দেশ ও আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বন্দীরা উৎসুক হয়ে মকদ্দমার ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করে রইল। জনসাধারণের সুতীব্র দাবির কাছে ইংরেজ সরকার মাথা নত করতে বাধ্য হল। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের নেতারা ছাড়া পাবার তিন মাস বাদে ধনসিংকেও বাঁকীপুর সৈনিক জেল ক্যাম্প থেকে মুক্তি দেওয়া হল।

যার যার পথে

প্রডিউসার সুতলীওয়ালা 'গরীব কী আহ' ফি[illegible] নায়িকার ভূমিকা নেবার জন্য পাহাড়নকে অনুরোধ করছিল। সে সময় মুগ্ধ পাহাড়ন তিন-তিনটে ফিল্মে কাজ করছে। তাই বলল – আমার সব হাতে সময় কোথায় ? সুতলীওয়ালা আশ্বাস দিল যে তার সময় ও সুবিধা [illegible]মতো সব-কিছু ব্যবস্থা করা হবে। পাহাড়ান পঁচাত্তর হাজার টাকা চাইল। আ[illegible]

সুতলীওয়ালা স্মিত হেসে বলল— বাঃ, গরীবের দুঃখের যদি এত দাম বেড়ে যায়, আমার তো মনে হয়, এবার গরীবের সব দুঃখ ঘুচে যাবে।

পাহাড়ন এ উপহাসের উত্তরে মুচকি হেসে চুপ করে গেল।

সুতলীওয়ালা এবার যেন গরীবদের দুঃখে গভীরভাবে চিন্তামগ্ন হল, মুখে গাম্ভীর্যের কতগুলি রেখা ফুটে উঠল, বলল – আসল কথা কী জানেন, 'গরীবের দুঃখের' কথা কেউ শুনতে চায় না। নয়তো গরীবের বুকফাটা কান্নার এত শক্তি যে এতদিনে এই বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থাটাই ভেঙে পড়ত। এ সমাজের প্রতি সুতলীওয়ালার যেন ভয়ংকর ক্রোধ আর তা প্রকাশ করতেই সিগারেটের একগাদা ধোঁয়া মুখ থেকে মেঘের মতো বার করল, হাতের গেলাসটায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে গেলাসটাকে

একটু নাড়ল। হুইস্কির সঙ্গে সোডা মিশ খেয়ে শত শত বুদবুদ উঠছে, ফেটে পড়ছে যেন বিরাট একটা বিক্ষোভের বিস্ফোরণ।

সুতলীওয়ালা পাহাড়নের চোখে চোখ রেখে বলে গেল — জানেন, এই যুদ্ধে প্রত্যেক দিন একশো কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। যুদ্ধটা এইজন্য হচ্ছে যে, একটি রাষ্ট্র অন্য একটি রাষ্ট্রের কাছ থেকে শোষণের ক্ষমতা কেড়ে নিতে চায়। কিন্তু এই সংসারের গরীবের দুঃখের কান্না যদি ঠিকভাবে তুলে ধরা যেত, যদি গরীবদের সংগঠিত করা যেত তবে দুনিয়ার এই যে সমাজের শোষণ তা একদিনে, হ্যাঁ এক দিনের মধ্যে বন্ধ করা যেত।

সুতলীওয়ালার এত বুদ্ধি ও জ্ঞান দেখে পাহাড়ন প্রভাবিত হল, কী বলবে ভেবে পেল না। তার কথার যথার্থতা অনুভব করেই পাহাড়ন চোখের নিঃশব্দ ভাষায় স্বীকৃতি জানাল।

নিজের কথায় বেশ কাজ হয়েছে দেখে সুতলীওয়ালা উৎসাহিত হল, হাতে যে হুইস্কির একটা গ্লাস আছে তার অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে বলে উঠল — কে গরীব? গরীব কি জানে যে তাকে বঞ্চিত করা হচ্ছে?

প্রশ্নটা করে একটু দম নিল সুতলীওয়ালা, পাহাড়নের চোখে চোখ রেখে গভীরভাবে তাকে দেখে নিয়ে ভাবের বশে বলে গেল— আপনি এই ফিল্মের জন্য পঁচাত্তর হাজার টাকা চান। আপনি যদি বলেন আমি নিশ্চয় দেব। আপনি ভাববেন আপনি বেশ লাভ করলেন কিন্তু আমি কোথা থেকে আপনাকে পয়সা দেব? যারা টাকা খাটায়, বিনিয়োগ করে, টাকা তাদের। কিছুটা আপনাকে দেব, কিছুটা দেব অন্য অ্যাক্টরদের। দিনরাত পরিশ্রম করে, মাথা ঠুকে আমি এই ফিল্ম বানাব। এটাকে বিক্রি করার ঝুঁকি মাথায় নেব, আমিও কিছু নেব। পুঁজিপতিদের যে টাকা ব্যাঙ্কে পড়ে আছে তার থেকে প্রায় চার লাখ টাকা এর জন্য বিনিয়োগ করতে হবে। আপনি জানেন,

এই ফিল্ম থেকে কত টাকা কামানো দরকার ?

সুতলীওয়ালা হাত উঠিয়ে মুখে বিস্ময়ের একটা ভাব ফুটিয়ে বলল— বারো লাখ টাকা ! এই টাকা যাবে পুঁজিপতিদের ঘরে। আপনি আপনার শিল্পের প্রতিভা দিয়ে আর আমি আমার পরিশ্রম দিয়ে পুঁজিপতিদের আয় বাড়িয়ে চলি। আমাদের পরিশ্রমের জন্য তাঁদের টাকার অঙ্ক বাড়তেই থাকে। অথচ আমাদের উপর তাঁদের অধিকার দিন দিন আরও দৃঢ় হতে থাকে, তাঁদের দখলদারী হাত আরও মজবুত হয়ে ওঠে।

এবারে সুতলীওয়ালার গলার স্বর কেমন যেন রহস্যজনক শোনাল—আমি সোসালিস্ট, তাই আমি এইসব ভেদ-বুদ্ধি ও বিভিন্নতার কথা আপনাকে বলে যাচ্ছি। আমি চাই আমাদের মতো বুদ্ধি-জীবীদের শোষণ বন্ধ হোক। আপনি কোম্পানি থেকে পঁচাত্তর হাজার কেন, এক লাখ টাকা চান। দেওয়া ? সে তো আমার কাজ। সুতলীওয়ালা নিজের কপালে হাতটা রাখল, তারপর স্বর নামিয়ে আস্তে আস্তে বলল— আপনার যা খরচ, তা চালাবার জন্য আপনার নিশ্চয় ভাবতে হয় না, এটা অনুমান করছি, কারণ অন্য কোম্পানিতে আপনার কাজ চালু রয়েছে। আপনার দরকার হলে তার বন্দোবস্ত নিশ্চয়ই হয়ে যাবে। আপনি কোম্পানিকে বলুন, আমি এই ফিল্মে পার্ট করব কিন্তু তার জন্য কোম্পানিতে আমার নামে এক লাখ টাকার 'শেয়ার' থাকবে। লাভ নিয়ে আপনার দাঁড়াবে তিন লাখ টাকা।

পাহাড়নের চোখে বিস্ময় ফুটে উঠল। সুতলীওয়ালা ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল— কোম্পানি গড়ে তুলতে আপনার হাত থাকলে কত ভালো হয়। আপনি পঁচাত্তর হাজার টাকার চাকর হতে চেয়ে নিজেকে শোষণ করার সুযোগ করে দিচ্ছেন। আপনি পরিশ্রম করেন, তার জন্য আপনার মালিক হয়ে থাকা দরকার। যে পরিশ্রম করে

তাকেই আমি মালিক হতে বলি। সুতলীওয়ালার হাতের সিগারেট নিভে গেছে। হাতটা টেবিলের ওপর রেখে দেখল হুইস্কির গ্লাস উপেক্ষিত হয়ে পড়ে আছে ; তাতে ছোটো ছোটো বুদবুদ যেন একটা ঘূর্ণীর মধ্যে আটকা পড়েছে।

সুতলীওয়ালা যেন পাহাড়নকে আজ সব-কিছু বুঝিয়ে ছাড়বে—এভাবে আমরা সমাজে সাংবিধানিক ও শান্তিপ্রিয় পথে বিপ্লব আনতে পারি। কম্যুনিস্টরা মজুরিটাকে বড়ো করে দেখে হৈ-হট্টগোল শুরু করে দেয়। মজুরি বাড়াতে পারলে চুপ হয়ে যায়। মজদুরদের পক্ষে বিপ্লব আনা সম্ভব নয়। আপনি ইকনমিক্স ও পলিটিক্সের একটু গভীরে যদি তলিয়ে দেখেন, তবে বুঝবেন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরাই শুধু বিপ্লব আনতে পারবে, আর কারো ক্ষমতা নেই। বাস্তবিকপক্ষে এরাই তো সমাজটাকে চালাচ্ছে। আজকে তারা সমাজের পুঁজিপতিদের জন্য খেটে মরছে। এরা যদি সচেতন হতে পারে তবে তারা নিজেদের স্বার্থে সমাজকে চালাতে পারে।

বিস্ময়বিহ্বল বড়ো বড়ো চোখে তাকিয়ে রইল পাহাড়ন। এই বিমূঢ় চাহনি দেখে সুতলীওয়ালা মুচকে হেসে বলল— আপনি একটু ভেবে দেখুন, আপনার যা সুবিধা তাই হবে। একটু-আধটু এদিক-ওদিক হলে তা নিয়ে ভাববেন না, ঠিক হয়ে যাবে। ও-সব ঠিক করার দায়িত্ব আমার। আসল যে কথাটা তা আমি আপনাকে বললাম।

সুতলীওয়ালার প্রস্তাব-মতো 'গরীব কী আহ্'-তে কাজ করার কথাটা নিয়ে পাহাড়ন বেশ কয়েকদিন ভাবল। একবার ভাবল, বনোয়ারীকে ডেকে ওর পরামর্শ নেয়, কিন্তু ওর ব্যবহারে পাহাড়ন ক্ষুব্ধ হয়ে আছে…। নিজেকে কী ভাবে বনোয়ারী ? ও ছাড়া কি আমার কাজ চলতে পারে না ?

সুতলীওয়ালা পাহাড়নের সঙ্গে প্রায়ই দেখা করে। প্রত্যেকবার দেখা

করে সুতলীওয়ালা নতুন নতুন কথা বলে, প্রস্তাব দেয়। সুতলীওয়ালা পাহাড়নের ভবিষ্যৎ জীবনের সমস্যা নিয়েও কথা বলে যায়। পাহাড়ন তার প্রস্তাব মেনে নিল। বনোয়ারীকে এই ফিল্মে অ্যাসিস্টেণ্ট ডাই-রেক্টর করে নেবার জন্য পাহাড়ন অনুরোধ জানাল।

'গরীব কী আঁত' ফিল্মের খুব জোরদার প্রচার চলতে লাগল। প্রডিউসার সুতলীওয়ালা সবচেয়ে প্রসিদ্ধ অ্যাক্টর মুনব্বরকে পঞ্চাশ হাজার টাকায় নায়কের ভূমিকার জন্য নির্দিষ্ট করে নিল। ঠিক হয়েছে সেও পঁচিশ হাজার টাকার কোম্পানির শেয়ার কিনবে আর বাকি পঁচিশ হাজার টাকা নগদ নেবে। নামী অভিনেতা ও অভিনেত্রী এই ফিল্মে কাজ করছিল বলে বাকি অ্যাক্টর ও অ্যাক্ট্রেসদের খুব কম খরচে সুতলীওয়ালা কাজে লাগাতে পেরেছে, এবং এদের কাউকে নগদ টাকা দিতে হচ্ছে না। যারা দ্বিতীয় শ্রেণীর অভিনেতা ও অভিনেত্রী তারা নামী অভিনেতাদের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়ে খুশি, কারণ তা হলে এদেরও নাম ছড়াবে।

ফিল্মের সুটিং দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। বোম্বাই-এর 'মধুবন' সিনেমার মালিকপক্ষ, লাহোর, দিল্লী আর কলকাতার মতো শহরের সিনেমা হলের জন্য ফিল্মটা বুক করে পাঁচ লাখ টাকা অগ্রিম দিয়ে দিয়েছে। পাহাড়ন ভুল করে নি এটা ভেবেও ওর সন্তোষ। সুতলী-ওয়ালা ওর এখানে আসে-যায়। কখনও সন্ধ্যার সময় নিজের গাড়িতে পাহাড়নকে বসিয়ে বেড়িয়ে আসে। আজকাল শুধু কোম্পানি গড়ে তোলার বিষয়ে আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকে না। সুতলীওয়ালার সৌজন্য-বোধ ও বুদ্ধিমত্তায় প্রভাবিত হয়ে পাহাড়ন ওর ব্যাঙ্কে, জমা টাকার বিষয়ে তার মতামত নেয়। সুতলীওয়ালা ওকে লোহা ও অন্য কোম্পানির 'শেয়ার' কেনার ব্যবস্থা করে দেয়।

একদিন সুতলীওয়ালা পাহাড়নের সামনে দশ হাজার টাকা

রেখে দিল।

পাহাড়ন বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল— এ কিসের টাকা ?

সুতলীওয়ালা বলল— আপনি যদি অন্য কোনো লোকের মারফৎ এ-সব শেয়ার কিনতেন, তবে সে কমিশন বাবদ এ টাকাটা পেত। আমাকে এইসব কোম্পানি কমিশন দিয়েছে কিন্তু আমি ঠিক করেছি আপনার কাজে আমি কোনো কমিশন খাব না। আমি এটা নিজের কাজ ভেবে করেছি।

পাহাড়নের চোখেমুখে কৃতজ্ঞতার দীপ্তি ফুটে উঠল। অনুনয় করে বলল— না, এ টাকা আপনার, আপনি এটা রাখুন। আমার জন্য আপনি অনেক করছেন, আমি খুবই কৃতজ্ঞ।

উদাস হয়ে উঠল সুতলীওয়ালা, বলল— আমি টাকা নিয়ে কী করব ? আমার কোনো উচ্চাভিলাষ নেই, জীবনটাকে আমি খুব সংক্ষিপ্ত করে ফেলেছি। আমি শুধু ভাবি অন্যের প্রতি যেন কোনো অন্যায় না করা হয়। নিজের জীবনধারণের জন্য আমি যথেষ্ট রোজগার করি। অযথা টাকা জমিয়ে কী করব ?

একটু থেমে নিজের জীবনের দুঃখ ও ব্যর্থতার কথা বলে যেতে লাগল— দেড় বছর হয়ে গেল বিয়ে করেছি কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে একদিনের জন্যও মিল হয় নি। স্ত্রীর স্বভাব ও প্রকৃতি আমার থেকে একেবারে আলাদা।... একই বাড়িতে থাকি কিন্তু কখনও গোটা সপ্তাহ আমরা কেউ কারুর মুখ দেখি না। আমার একটা নৈতিক দায়িত্ব আছে তা ভেবেই আমি চুপ করে আছি। যদি আমার বাড়িতে যাও তোমার মনেই হবে না কোনো বউ ও-বাড়িতে থাকে। ওর ছায়াও দেখতে পাবে না। কখনও দুপুরে একলা বাড়ি আসে, একটু বসে আবার চলে যায় ; কখনও সারা রাতও আসে না। ওর নিজের সোসাইটি আছে, নিজের বন্ধু আছে। ও ভাবে আমি ওর যোগ্য নই ; ওর এই তিরিক্ষি

স্বভাব আর ওর এই অহংকার আমি কিছুতেই যেন সইতে পারি না।

পাহাড়ন আশ্চর্য হয়ে ভাবে, এত সজ্জন ও অমায়িক মানুষের সঙ্গে যে মানিয়ে নিতে পারে না সে কীরকম বউ? পাহাড়নের কৌতূহল বেড়ে যায়; সমবেদনার সুরে কয়েকটি প্রশ্ন না করে থাকতে পারে না পাহাড়ন।

সুতলীওয়ালা নিঃসংকোচে উত্তর দেয়-- দু'বছর আগে মুসৌরীতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সে সময় আমার এক পাঞ্জাবী বন্ধু নিজের বোনের সঙ্গে একই হোটেলে ছিল। ওখানেই মিসেস সুতলীওয়ালাকে আমি প্রথম দেখি ও আলাপ হয়। তখন কিন্তু মেয়েটিকে খুব ভদ্র ও শিক্ষিত মনে হয়েছিল। কিন্তু এক সপ্তাহে কাউকে কি সম্পূর্ণ বোঝা যায়? না সত্যিকারের কেউ কাউকে চিনতে পারে? তবুও আমাদের দুজনের পরস্পরকে খুব পছন্দ হয়ে যায়। আমার বন্ধু লাহোরে ফিরে গেল ও তার বোনের সঙ্গে আমার চিঠি-বিনিময় চলতে লাগল। একদিন হঠাৎ ওর বোনের এক চিঠি এসে হাজির, লিখেছে, আমাকে সে বিয়ে করতে চায়। পরে টেলিগ্রাম আসায় বিয়ের তারিখ ঠিক করে ফেলতে হল। ওকে আমি কথা দিয়েছিলাম। বিয়ের তিন দিনের দিন থেকেই ঝগড়া শুরু হয়ে গেল।

সহানুভূতিতে গভীর এক দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে পাহাড়ন বলল— এরকম বউকে দেখতে আমার খুব কৌতূহল হচ্ছে। কিন্তু যদি তোমার ওখানে যাই আমার সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে দেবে না তো?

সুতলীওয়ালা হেসে উঠে বলল— না, ঝগড়া করবে বলে মনে হয় না। বরং ও খুশিই হবে যে, আমাকে তালাক দেবার একটা সুযোগ তুমি করে দিয়েছ।

পাহাড়ন একটু যেন লজ্জা পেল। বিরক্ত হয়ে বলল— তুমিই তালাক দিয়ে দিচ্ছ না কেন?

—শুধু শুধু একজন মহিলার জীবন বরবাদ হয়ে যাবে, সে কথা ভাবি। সুতলীওয়ালার স্বরে করুণা ফুটে ওঠে।

এ করুণাকে উপহাস না করে পারল না পাহাড়ন— বাঃ চমৎকার।

পাহাড়ন নিজের বিক্ষিপ্ত মানসিক অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে বনোয়ারীর দিকে ঝুঁকেছিল। বনোয়ারী সৎবুদ্ধির তাগিদে বা ভীরু বলেই হয়তো পাহাড়নের কাছ থেকে আস্তে আস্তে সরে পড়েছে। পাহাড়ন অপমানিত বোধ করে কোনো একটা আশ্রয়ের আশায় উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করেছিল আর সেই সময়ে সুতলীওয়ালা হৃদয়ের উদারতা ও দূরদর্শিতার আলো নিয়ে পাহাড়নের সামনে এসে দাঁড়াল। সুতলীওয়ালা সব সময় একটা নিঃস্বার্থ ভাব দেখাত; পাহাড়নের কল্যাণ কামনা ছাড়া যেন তার অন্য কোনো স্বার্থ নেই। পাহাড়নের মনে হচ্ছে, এরকম একজন উপকারী লোকের জন্য সে কিছুই করতে পারছে না।

পাহাড়নের ভবিষ্যৎ জীবনের নানা কথা তুলে সুতলীওয়ালা বলে— আমরা শুধু এরকম করতে পারি, কিংবা বড়ো জোর অন্য রকম করলে সুফল পাব। এ-সব কথা শুনে পাহাড়ন ভাবে, ভাগ্যিস বনোয়ারীর কাছ থেকে ও মুক্তি পেয়েছে!

এখন বনোয়ারী কখনও বা যদি আসে আগের মতো আন্তরিকতার সঙ্গে পাহাড়ন তার সঙ্গে কথা বলে না। আগের মতো যদি বনোয়ারী ব'লে বসে, পাহাড়ন বার করো, একটু খাই, তা হলে পাহাড়নের ব্যবহারে অভদ্রতা ফুটে ওঠে। হয়তো কোনো উত্তরই দেয় না, যেন শুনতে পায় নি। এখন ঘুমোবার আগে ওর মদ খাওয়ার প্রয়োজন হয় না; ঘুম আসার আগে সুতলীওয়ালার কথা ভাবে; মধুর একটা অনুভূতি ওর

মনে নেশা ধরিয়ে দেয়; এ নেশার আবেশের তুলনায় মদের নেশার জড়তা ওর ভালো লাগে না। বনোয়ারী এরকম ব্যবহার পেয়ে আজকাল প্রায় আসেই না। পাহাড়ন রুষ্ট হয়ে ভাবে, অ্যাঁ, অ্যাসিস্টেন্ট ডাইরেক্টর হয়ে গেছে বলে খুব ডাঁট বেড়ে গেছে।

সুতলীওয়ালা যে ওর কত উপকার করে সে কথা ভাবতে ভাবতে পাহাড়ন বনোয়ারীর উপর আরো যেন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। নিজের মনে ভাবতে লাগল ও আমাকে অনাদরের চোখে দেখছে। আমার মধ্যে যেন কোনো গুণ নেই, ক্ষমতা নেই, এমনভাবে আমাকে ডাকে, ব্যবহার করে। আমাকে বেশ্যার চেয়ে আর কিছু ভাবতে পারে না। সেদিন থেকে ও বনোয়ারীর মুখ দর্শন পর্যন্ত করতে চায় না, ওর কথা ভাবতে ঘৃণা হয়। সুতলীওয়ালার কথা আজকাল ওর বেশি করে মনে পড়ে, কারণ একজন ভদ্র মহিলার প্রতি যেরকম ব্যবহার করা উচিত, সে সৌজন্যমূলক ব্যবহার তার যেন স্বভাবগত। বনোয়ারী ওকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওর জীবনের সব কথা জেনে নিয়েছে অথচ সুতলীওয়ালা এ বিষয়ে কোনো কৌতূহল প্রকাশ করে নি, ওর দুর্ভাগ্যের দিনের একটা কথাও সে জানতে চায় নি। উপরন্তু ওকে সে সম্মান দিয়েছে, মর্যাদার চোখে দেখেছে।

পাহাড়ন শনিবার দিন রাত দুটো পর্যন্ত স্টুডিয়োতে কাজ করেছে। রবিবার ঘুম ভাঙতে ভাঙতে এগারোটা বেজে গেল। তাড়াতাড়ি স্নান সেরে সাজগোজ করে নিল। সুতলীওয়ালা বলেছিল সাড়ে এগারোটায় আসবে; বলেছিল, ছুটির দিনটায় কোথাও যাওয়া যাবে, দুপুরের খাওয়া বাইরে কোথাও খেয়ে নেবখন। কিন্তু বারোটা বেজে গেল, এখনো সুতলী-ওয়ালা এলো না। পাহাড়ন ওকে কখনো ফোন করে নি, কখনো তার বাসায় যায় নি। ঝগড়াটে মিসেস সুতলীওয়ালাকে ওর ভীষণ ভয়, কী জানি কোনো ব্যাপারে আবার যদি হয়রানি হয়

ভাবনা হতে লাগল পাহাড়নের ; চিন্তায় অধীর হয়ে এ-ঘর থেকে ও-ঘর করতে লাগল। পথের দিকে বারবার তাকাচ্ছে। কেবলি মনে হচ্ছে এই বুঝি সুতলীওয়ালার গাড়ীর হর্ন বেজে উঠল। সুতলীওয়ালা পৌনে একটার সময় এল। ওকে কেন জানি আজ বড়ো উদাস লাগছে, হাসি ছড়িয়ে নিজের মনের ব্যথা ঢাকতে চেষ্টা করছে। পাহাড়ন ওর গাড়িতে বসে জিজ্ঞেস করল— কী হয়েছে ?

রাস্তায় খুব ভিড় ; এই ভিড় কাটাতে সুতলীওয়ালা খুব সাবধানে গাড়ি চালাচ্ছিল। শহর ছাড়িয়ে নিরালা একটা জায়গায় যাবার জন্য পাহাড়নও অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল।

পাহাড়ন বেশ কয়েকবার একই প্রশ্ন করেছে কিন্তু সুতলীওয়ালা তার উত্তরে শুধু বলেছে – সত্যিই আমার .জীবন ও দুর্বিষহ করে তুলেছে।

পাহাড়নের মুখেচোখে আশঙ্কার ছায়া পড়ল – কেন, কী বলছে ?

—তালাক চায়।

—চুলোয় যাক না ডাইনীটা। ক্রোধ চাপতে না পেরে গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে পাহাড়ন বলে উঠল।

—ভেবে দেখো। সুতলীওয়ালাকে কেমন যেন রহস্যজনক লাগছে।

—কেন ? বড়ো বড়ো চোখে বিস্ময়।

—লোকে বলবে আমি পাহাড়নকে বিয়ে করার জন্যে তালাক দেবার কথা বলছি।

পাহাড়ন চোখ নামিয়ে নিল। এক মুহূর্ত ভেবে নিল, সুতলীওয়ালাকে আড়চোখে দেখল এবং ব্যথিত স্বরে বলল— তুমি কি এতে তোমার অপমান মনে করছ ?

—আমি ? আমি শুধু তোমার সম্মানের কথাই ভাবি। পাহাড়নের বুকের ভেতরটা ব্যথা করে উঠল। মুখে আঁচল টেনে কেঁদে উঠল।

সুতলীওয়ালা এই প্রথম যেন বুকে একটু সাহস পেয়েছে ; দু'হাতে পাহাড়নকে নিজের বুকের কাছে টেনে নিয়ে গভীর আবেগে বলল— কাঁদছ কেন ? আমার কথায় আঘাত পেয়েছ, না ?

পাহাড়ন মাথা নেড়ে বলল— আমাকে কাঁদতে দাও। কত দিন পরে আমি আজ প্রাণ খুলে কাঁদতে পারছি।

কয়েক মিনিট ধরে পাহাড়ন শুধু কাঁদল, শুধু কাঁদল। সুতলীওয়ালা ওর মাথাটা ধরে নিজের বুকে চেপে রইল। চোখের জল না মুছেই পাহাড়ন মুখটা এগিয়ে নিয়ে দু'হাতে সুতলীওয়ালার গলা জড়িয়ে ধরে বলল— আজ আমি জীবনে··· কথাটা শেষ করতে পারল না, গভীর আবেগে আবার বলল— সত্যি বলো তো, আমাকে তুমি কখনো ছেড়ে যাবে না ?

সুতলীওয়ালা ওকে আরো কাছে টেনে নিল, নিজের ঠোঁট দিয়ে ওর ঠোঁটের শব্দগুলিকে স্তব্ধ করে দিল।

প্রতি দু'সপ্তাহ অন্তর বেয়ারা মনোরমার হাতে একটি খাম দেয়, তাতে থাকে একখানা একশো টাকার নোট। এ টাকা হাতে তুলে নিতে ওর ভয়ানক খারাপ লাগে, কেমন যেন একটা গ্লানি হয়। এ কথা ও ভূষণকে ছাড়া আর কারো কাছে মুখ ফুটে বলতে পারে নি। ভূষণ ওকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে— এতে লজ্জা বা গ্লানি হবার কী আছে ? তুমি সুতলীওয়ালাকে পনেরো হাজার টাকা নগদ দিয়েছিলে, তার কী ? তা ছাড়া তুমি কি ওখানে খাচ্ছ না ?

সুতলীওয়ালার কাছ থেকে টাকা পায় বলে মনোরমা কত সহজে ট্রামে-বাসে যেতে পারে, দরকার হলে একটা ট্যাক্সি নিয়ে নেয়। খাবার

খেতে মালাবার হিলে যাবার প্রয়োজন পড়ে না। ভূষণের সেই আদি-অকৃত্রিম চারমিনার ব্র্যাণ্ড; মনোরমা এ টাকা দিয়ে ওকে মাঝে মাঝে ভালো সিগারেট কিনে দেয়। কখনো ওরা দুজনে অন্য কমরেডদের সঙ্গে নিয়ে সিনেমা দেখে আসতে পারে। ভূষণ আবার দেশি ফিল্ম দেখতেই চায় না; মনোরমাও ও-ধার দিয়ে যায় না। দেশি ফিল্মের ব্যাপারে ওর প্রচণ্ড রাগ। এতটা অপছন্দ করে বলেই বোধ হয় সুতলীওয়ালার প্রযোজিত ফিল্ম 'দিন অউর রাত্রি' পর্যন্ত দেখতে চায় নি।

সেদিন সোমবার। বেয়ারা ওর হাতে সেই খামটা দিয়ে গেল। মনোরমা খাম খুলে দেখে, দশ টাকার দশটা নোট ছাড়াও একটা টাইপ-করা চিঠি। মনোরমা তিনবাত্তির ঢালু রাস্তায় নামতে নামতে চিঠিটা পড়ছিল। চিঠি পড়তে পড়তে বার বার থেমে যাচ্ছে। রাস্তার এক দিকে. দাঁড়িয়ে ও চিঠিটা আর-একবার পড়ল। পড়ে খুব বিস্মিত হল, একটু যেন বিরক্ত-ও। একটু দাঁড়িয়ে কী যেন ভাবল। আর হেঁটে যাওয়া সম্ভব হল না। খালি একটা ট্যাক্সি যেতে দেখে সংকেতে থামতে বলল।

মনোরমা ট্যাক্সি থেকে পার্টি দপ্তরের সামনে নামল। হাতে ঘড়ি দেখল, দুটো বেজে গেছে। লাঞ্চের মেয়াদি সময় পেরিয়ে গেছে। এখন আর ভূষণকে ডাকা ঠিক নয়। ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে মনোরমা হেঁটে সোভিয়েট মিত্র-সংঘের দপ্তরে ফিরে গেল।

সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রুফ ওর টেবিলে পড়ে আছে। কাজে একেবারে মন লাগছে না। সুতলীওয়ালার চিঠির প্রতিটি লাইন যেন চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। বারবার একটা কথাই মনে হচ্ছে—ওর মতলবটা কী? ভাগ্যিস কমরেড মিসেস নীতা দপ্তরে নেই। কমরেড আওরে পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যার ম্যাটার তৈরি করছিল। উৎসাহের চোটে বার বার ডেকে উঠছে— কমরেড. এটা দেখবে নাকি?

যা ওয়াণ্ডারফুল, ছাপার পক্ষে দারুণ জিনিস, বুঝলে ?

মনোরমা রেগে উঠেছে— প্লিজ ডোণ্ট ডিসটার্ব। উঠে ভূষণকে একটা ফোন করল— খুব জরুরি কাজ। ছটার সময় সোজা এখানে চলে এসো।

মনোরমার গলার স্বরে একটা আশঙ্কার আঁচ পেয়ে ভূষণ জিজ্ঞেস করল · বিশেষ কোনো কথা আছে নাকি ?

মনোরমা টেলিফোনে কোনো আভাস দিতে চাইল না, তাই বলল— না, তবে তুমি সোজা চলে এসো।

ভূষণ বলল -- যদি খাস্ কোনো কথা না থাকে তবে একটু দেরি হবে, ধরো সাড়ে সাতটায়। কাজ শেষ করে, খানাপিনা সেরেই বরং যাব।

মনোরমা অধীর হয়ে বলল— না, খানা খাবার আগেই এসো কিন্তু।

ছটার সময়েও মনোরমার প্রুফ পড়া শেষ হল না। ও আওরে-কে ডেকে একটু সাহায্য করতে অনুরোধ করল।

আওরে হেসে বলল— এর মজুরী লাগবে কিন্তু ; বেশি না, স্রেফ এক পেয়ালা চা আর এক প্যাকেট চারমিনার সিগারেট।

মনোরমা রেগেমেগে এক টাকা ছুঁড়ে দিল। টাকা নিয়ে আওরে বড়ো একটা সেলাম ঠুকে মনোরমার কাছ থেকে সব প্রুফ তুলে নিল।

মনোরমা হেসে উঠে বলল— থ্যাঙ্ক ইউ কমরেড। বলে সোজা পার্টি দপ্তরে গেল। ভূষণের ঘরের সামনে গিয়ে ওকে ডাকতে হল। ভূষণ নিচে নেমে রাস্তায় পা দিয়ে বলল— একেবারে ঘাবড়ে গেছ যে, কিছু হয়েছে নাকি ?

—বলব, সব বলব। বলেই একটা খালি ট্যাক্সি ডাকল। ট্যাক্সিতে বসে ভূষণ আবার একই প্রশ্ন করল। মনোরমা ভ্যানিটি ব্যাগটা চেপে ধরে চুপ করে রইল। ট্যাক্সিওয়ালাকে সংকেতে থামতে বলল—

বালকেশ্বরের সামনে মনোরমা ট্যাক্সি ছেড়ে দিল। চড়াই পেরিয়ে পার্কের সেই বেঞ্চিটাতে দুজনে বসল; প্রায় দুবছর আগে মনোরমা এই বেঞ্চিটাতে বসে ওর বিবাহজীবনের ব্যর্থতার কথা ভূষণকে বলেছিল। মনোরমা ওর ব্লাউজের ভিতর থেকে একটা চিঠি বার করে ভূষণের হাতে দিয়ে বলল— পড়ে দেখ।

ভূষণ বলল— আলোর সামনে যেতে হবে যে।

—এখানে বোসো, আমি বলছি··· আবার কী ভেবে বলল— না, যাও, আলোতে গিয়েই পড়ে নাও।

ভূষণ চিঠিটা পড়ে একটু যেন গম্ভীর হয়ে গেছে। বলল— এখন কী করা?

—তুমি বলো না। মনোরমার গলার স্বর একটু যেন কেঁপে উঠল।

—উপায় আবার কী? এটুকুই তো কথা যে তুমি যদি তালাক দেবার আর্জি পেশ না করো তবে সে করবে। তুমি তালাক দেবার কথা কি ভাবতে পারছ না?

—কী যে বলো। আরে চাইব না কেন, কিন্তু কারণ কী দেখাব শুনি?

—আইনতঃ তিনটেই তো কানুন আছে, অন্য কারুর সঙ্গে সেক্সের সম্পর্ক, মারপিট বা নপুংসকতা। তবে হ্যাঁ, আদালতে শুধু তো বললে হবে না, প্রমাণ চাই। আমি জানতে চাই এর মধ্যে কোন্ কথাটা সাক্ষী-সাবুদ দিয়ে প্রমাণ করা যায়?

মনোরমা একটু যেন চিন্তায় পড়ল— এরকম কথা আমি আদালতের সামনে গিয়ে কী করে বলি? প্রথম দুটো কারণের কোনোটাই নেই, থাকলেও অন্ততঃপক্ষে আমি জানি না। প্রমাণ দেব কী করে?

—হুঁ, একটু চুপ করে কী যেন ভাবল ভূষণ. তারপর বলল— ভদ্রলোক লিখেছে আদালতে দাঁড়িয়ে সে নিজের স্বপক্ষে কিছু বলবে

না। একতরফা ডিক্রী হয়ে যাবে কিন্তু তার শর্ত হিসেবে বলেছে যে, ওর উপর যদি দুরাচার বা অত্যাচারের অভিযোগ করা হয়, তবেই এ মামলায় নিজের সাফাই হিসেবে কোনো কথা বলবে না। তুমি যদি এতে রাজি থাক তবে তুমি দরখাস্ত করো আর যদি তোমার আপত্তি থাকে তবে সে নিজে দরখাস্ত করতে রাজি আছে। ওর সাক্ষী-সাবুদ জোগাড় করতেও কোনো দিকদারি পোহাতে হবে না। তুমি যে দুশ্চরিত্রা, তা প্রমাণ করতে সে দশটা ঝুট সাক্ষী হাজির করতে পারে ; কিন্তু না, তা সে করবে না কেন জানো? এতে সুতলীওয়ালারই বদনাম হবে। এটুকু বোঝা যাচ্ছে সে চায় না ওকে কেউ নপুংসক বলুক ; বরং দুশ্চরিত্র শব্দটার মধ্যে অনেক বেশি পৌরুষ আছে। অন্তুতঃ তা হলে নিজের পুরুষালির গর্বটা ঢাক পিটিয়ে করতে পারে। আচ্ছা বলো তো, আজকাল সে করছে কী?

—হয়তো ফিল্ম প্রডিউস করছে। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন বেরুছে যে অভিনেত্রী পাহাড়নের সহযোগিতায় বেশ কয়েকটি ফিল্ম করছে।

—কোনো অ্যাকট্রেসকে ফাঁসাতে চায় না তো?

—সব-কিছু সম্ভব।

—ও, তাই বলো, আর ঠিক এইজন্যেই ভদ্রলোক নিজের রাস্তা পরিষ্কার রাখতে চায়। শোনো, আমি ভাবছি, সে যদি তালাক দিতে চায়, তবে তার ব্যবস্থা ওকে নিজে করতে বলো। ভদ্রলোক লিখেছে দেখ, "এ জীবন তুমিও সইতে পারছ না, আমিও না। আমরা দু'জনে স্বামী-স্ত্রীর মতো জীবনযাপন করছি না। তাই তোমার উপর আমার টান হবে কোথা থেকে?"...

একটু থেমে ভূষণ আবার বলল— আমার মনে হয় কি জানো, ওর পক্ষে তালাক দেওয়াটার কোনো একটা প্রয়োজন আছে, দেখ গিয়ে হয়তো কোনো একটা মতলবও আছে। তুমি ওকে বলো, তোমার হয়ে

ও যেন একটা দরখাস্ত লিখে দেয় আর সাক্ষী-সাবুদের নামও যেন দিয়ে দেয়। তবে সাবধান! তুমি নিজের হাতে কিছু লিখে দিয়ো না। দেখছ না, সুতলীওয়ালাও এ চিঠিতে সই করে নি।

—হুঁ।

ভূষণের গলার স্বর হঠাৎ যেন পাল্‌টে গেল— তারপর কী? মনোরমার পিঠে আস্তে করে হাত রাখল ভূষণ।

মনোরমা গভীর এক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল; ওর চোখের পলক বুঁজে এল আর মাথাটা ভূষণের কাঁধে নেবে এল।

ভূষণ অধীর হয়ে উঠল— কী, কোনো কথা বলছ না যে?

—কেন, এখন তুমি কি আমাকে কম ব্যথা দিচ্ছ?

ভূষণ ওর মুখটাকে নিজের কাছে টেনে নেবার জন্য অধীর হয়ে উঠেছিল।

মনোরমা একটু মুচকি হাসল— এখনই যে বড়ো অধৈর্য হয়ে উঠলে!

ভূষণ লজ্জা পেল।

সুতলীওয়ালা ওর নিজের ও মনোরমার বিবাহজীবনের ভণ্ডামি ঘোচাতে দু'জনের বন্ধন ছিন্ন করতে চাইছে, ভূষণ সুতলীওয়ালাকে এতটা মহানুভব ভাবতে পারল না; ওর কেন জানি বিশ্বাস করতে মন চাইছে না। ওর মনে গভীর একটা সন্দেহ জাগছে যে সুতলীওয়ালা অন্য কোনো বিরাট একটা ভণ্ডামির পিছনে ছুটছে। সিনেমা জগতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে এমন কয়েকজনের সঙ্গে ভূষণ কথাবার্তা বলে জানতে পারল, সুতলীওয়ালা ইদানীং পাহাড়নের প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত হয়ে পড়েছে। সে পাহাড়নের অংশীদার হয়ে একটি ফিল্ম তৈরি করছে। নামী আরো দুজন অ্যাক্টরকে নিয়ে নিজেদের একটা কোম্পানি গড়ে তুলছে। এ কথা শুনে ভূষণ ধরতে পারল, মনোরমার সঙ্গে বিবাহ-সম্পর্ক ছিন্ন করতে সুতলীওয়ালা এত ব্যাকুল হয় উঠেছে কেন!

সুতলীওয়ালার চিঠি পাবার পর থেকে ওর বাসায় পা রাখা মনোরমার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠল। ত্বপুরে খাবার জন্য মনোরমা আর বাড়িতে যাচ্ছে না কিন্তু রাতটা কাটাবার জন্য ওকে বাসায় আসতেই হয়। রাতে অন্য কোথাও থাকবে কী করে? ভদ্রঘরের কোনো বউ নিজের বাড়ি ছাড়া আর কোথায় গিয়ে থাকতে পারে? এ-বাড়িকে ও নিজের বাড়ি বলে দাবি করতে পারে না। কিন্তু এ ছাড়া ওর থাকবার জায়গাই-বা কই? সমাজের দৃষ্টিতে এখনো এটাই ওর ঘর। যতবার তালাকের কথা ওর মনে হচ্ছে, একবার ভাবছে চিরদিনের জন্য মুক্তি পাবে, আবার কেন জানি নিজেকে বড়ো অপমানিত মনে হচ্ছে। নিজের সঙ্গে অনবরত বিচার করে, ভাবে, চিরকালের সংস্কারবোধ থেকেই মনে এই অপমানবোধ জাগছে। মুক্তি পেতে হলে মনের কুসংস্কার থেকেও মুক্তি চাই। কিন্তু তবু অপমানে লজ্জায় নিজেকে বড়ো আহত মনে হয়; কেন জানি মনে হয় অন্য কোনো মহিলার সঙ্গে যে ওকে তুলনা করা হচ্ছে, সেটাই বড়ো বুকে বাজে। মনোরমা নিজেকে আবার প্রবোধ দেয় - না, কেন? আমি তো নিজেই ওকে ত্যাগ করেছি!··· অথচ কিছুতেই আসল কথাটা ও ভুলতে পারে না।

আবার মনোরমা ভাবে, এই পাহাড়ন কে? সুতলীওয়ালার প্রকৃত অবস্থাটা নিশ্চয় জানে না··· শত হলেও অভিনেত্রীই তো। ত্বজনেই অন্যের কাছ থাকে কিছু সুবিধা আদায় করতে চায়। স্বামী-স্ত্রীর বিচারে ওর একে কোনো প্রয়োজন পড়বে না, এরও ওকে নয়। এদের ত্বজনের একসঙ্গে থাকার কোনো বাধাই থাকবে না। ত্বজনে হাত মিলিয়ে শুধু তুনিয়াকেই ঠকাবে।

পাহাড়নের বড়ো চিত্র সারা শহরে ঝুলছে। ওর কামনাদীপ্ত গানের রেকর্ডও যেখানে-সেখানে বাজতে শোনা যায়; কিন্তু মনোরমা পাহাড়নের কোনো ফিল্ম এ-পর্যন্ত দেখে নি। ভূষণ একদিন ঠাট্টা করে

বলেওছিল -- চলোই-না দেখে আসি। আমাদের পাঞ্জাবের কোন্ পাহাড়ন, কীরকম অ্যাক্টিং করে দেখে এলে হয়।

—চুলোয় যাক্, আমি কেন দেখব ? বলেই মনোরমা উপহাসছলে হেসেছিল— হবে তোমার পাহাড়-দেশের কোনো পাহাড়ন বোন, তুমি তো আবার পাহাড়ী না ? যাও না, দেখে এসো। মুচকি হেসে জুড়ে দেয় -- তোমার পাহাড়ী দেশের মেয়েরা দেখতেও সুন্দরী আবার চালাকও। সোমাই-বা কিছু কম ছিল নাকি ?

পথের দেয়ালে পাহাড়নের বিরাট আকারের কোনো চিত্র মনোরমার নজরে পড়লে আজকাল ও চেয়ে চেয়ে দেখে। নিভৃতে বলে— 'ওর' জন্যে তোমাকেই ঠিক মানাবে। তুমি ওর কান কেটো আর ও তোমার কাটবে। বেশ মজা হবে কিন্তু। সঙ্গে সঙ্গে ওর খেয়াল হয়, এ-বাসা ছেড়ে ও কোথায় যাবে ?

ভেবে ভেবে উদাস হয়ে যায় মনোরমা। ওকে কেউ তাড়িয়ে দিতে চায় সেই অপমান হৃদয়ে ভারী বোঝার মতো চেপে থাকে ; গভীর একটা ব্যথার অনুভূতি ওকে নাড়া দিয়ে বলে ওঠে— আমি কোথায় যাব ? অভিমানে গুমড়ে উঠতে চায় মন, ভাবে, পার্টি অফিসে চলে যাব, নয়তো ফুটপাথে শুয়ে থাকব ; নয়তো কি সুতলীওয়ালাকে বলব, আমাকে তোমার চরণ থেকে হটিয়ে দিয়ো না, আমাকে নিয়ে যা-হয় করো, আমি তাতেই রাজি ? নাকি বলব, আমি তোমার দাসী, পতিব্রতা স্ত্রী ? মুখটা কেমন যেন তেতো তেতো লাগছে, ইচ্ছে হয় রাস্তায় থুক করে থুতু ফেলে।

সুতলীওয়ালা মনোরমার তরফ থেকে ওর নিজের উকিলকে দিয়ে একটা দরখাস্ত লিখিয়ে দিল। সাক্ষী হিসেবে ঘরের বেয়ারার নাম দিয়েছে। দরখাস্তে সুতলীওয়ালার বিরুদ্ধে দুরাচার ও নিষ্ঠুরতার অভিযোগ করা হয়েছে। আদালতে এক মাস পরে তারিখ পড়ল।

সুতলীওয়ালা নিজের স্বপক্ষে কিছু বলতে আদালতে হাজির হয় নি দেখে আদালত আবার পনরো দিন পরের তারিখ দিল।

মনোরমার কেন জানি মনে হয়, আদালতে যাবার চেয়ে মৃত্যুও শ্রেয় কিন্তু না গিয়েই বা কী করে? দুজনের মধ্যে এ বিভেদের জন্য ও কাউকে দোষারোপ করতে চায় নি। তাই লজ্জায় ও যেন মরে যাচ্ছিল। আদালতের সামনে আবার ওকে দরখাস্তের অভিযোগ জোর দিয়ে বলতে হল। বেয়ারা সুলেমানকে সাক্ষী হিসেবে খাড়া করা হল। উকিলের জেরার প্যাঁচে বেয়ারা মনোরমার কথাই একটু উলটে-পালটে আর বিশ্বাসযোগ্য করে বলল। জজ সাহেব চায় নি যে একটা পাতানো সংসার ভেঙে পড়ুক। তিনি সুতলীওয়ালাকে আবার একটি শমন্ পাঠালেন। সুতলীওয়ালা মোহর-যুক্ত কাগজে লিখিত বয়ান পাঠিয়ে দিল যে ওর নিজের সাফাই হিসেবে কিছু বলার নেই। তালাক মঞ্জুর হয়ে গেল।

খোরাক বাবদ সুতলীওয়ালা মনোরমাকে মাসোহারা দিক, এরকম কোনো আরজি সে আদালতের কাছে করে নি। আদালত নিজের থেকেই রায় দিয়েছেন যে মনোরমার খোরাকের জন্য সুতলীওয়ালাকে মাসে মাসে তিনশো টাকা দিতে হবে।

কমরেড নীতা মনোরমার সঙ্গে আদালতে গিয়েছিল। আদালতের ফয়সলা শুনেই আনন্দে অধীর হল নীতা; অত্যাচার থেকে মুক্তি পাবার জন্য আদালতের সামনেই মনোরমাকে অভিনন্দন জানিয়ে বসল। সংকোচে ও লজ্জায় মনোরমা চুপ করে ছিল। কিন্তু নীতার উৎসাহ যেন মুহূর্তে মুহূর্তে বেড়ে যাচ্ছিল। খুশির বন্যায় মনোরমাকে হাত দিয়ে ধরে সোজা পার্টি দপ্তরে নিয়ে এসে ওর মুক্তির খবর ঘোষণা করে দিল। নীতা মনোরমাকে এমনভাবে সামলাচ্ছিল যেন নব-বধূর গৃহ-প্রবেশের উৎসব পড়ে গেছে। মনোরমাও নতুন বধূর মতো জড়োসড়ো হয়ে

দাঁড়িয়ে ছিল।

বহু কমরেড নিজেদের কাজকর্ম ফেলে এসে সসংকোচে মনোরমাকে ঘিরে দাঁড়াল। উমেশ মাথাটা উটের মতো তুলে ধরে খুব জোরে চিৎকার করে উঠল— তো এবার··· এবার কী ? যেন প্রেমাহত – এমন একটা ড্রামাটিক ভঙ্গিতে হৃদয়ে হাতটা চেপে ধরল।

পারো উমেশের কাঁধে জোরে একটা ধাক্কা দিয়ে ধমক দিয়ে উঠল— সরে যা তো ! পাগল কোথাকার !

মঙ্গল কোনো বাধা মানবে না, এমন তার উৎসাহ— আরে, কেউ তো আশায় বুক বেঁধে রাখতে পারে। কারুর না কারুর জীবনে তো সুযোগ আসতে পারে।

কমরেড ওক্ বলল— না, না, এসব তিকড়মবাজি চলবে না। পুরো-পুরি স্বয়ম্বরসভা হবে। আমরাও গাণ্ডীব তুলব। বয়স না থাকলেও একবার ট্রাই নেব। নিজের ঠাট্টায় নিজেই মুগ্ধ হয়ে বিজ্ঞের মতো মাথার ঘন কেশগুচ্ছে হাত বুলোতে থাকল।

মিসেস গোগরে এই কোলাহলে বেশ তেতে উঠছিলেন। নিজের জায়গায় বসে বসে চশমার ফাঁক দিয়ে চোখ ঘুরিয়ে ধমক দিয়ে উঠল— কাজের সময় এ-সব কী বেকুবি চলছে অ্যাঁ ?

ভূষণ ও নীতা মনোরমাকে সেক্রেটারির সামনে নিয়ে গেল। সেক্রে-টারি তাঁর পিটপিটে চোখ দুটি কাগজ থেকে তুলে ধরলেন ; দাড়ি-ভরা মুখে খুশির একটা প্রলেপ পড়ল। নীতার কথা শুনতে শুনতে তিনি হাতের তালুতে তামাক নিয়ে ঘষতে লাগলেন।

সব শুনে সেক্রেটারি অনুমতি দিয়ে দিলেন— জন-নাট্য-সঙ্ঘের সঙ্গে যারা কাজ করে সেই মেয়েদের সঙ্গে অন্ধেরীতে থাকতে পারে। অন্য মেয়েদের মতো রোজ ট্রেনে করে কাজে আসতে পারবে।

নীতা চিৎকার করে বলে উঠল— কমরেড, এই পাগলকে একবার

দেখ। আদালত একে তিনশো টাকার মাসোহারা পাইয়ে দিয়েছে। আর এ বলে কিনা, আমি ঐ টাকাটা নেব না। কেন নেবে না? তুমি তো মুখ ফুটে চাও নি; কোর্ট দিয়েছে যখন তখন কেন নেবে না শুনি? ঐ বদমাশটাকে কি তুমি এখনো এতটা ভালোবাসো নাকি?

সেক্রেটারি খইনি জিভের তলায় গলিয়ে দিয়ে বললেন এ বললেই হয়ে গেল নাকি? পার্টিকে মাসে 40 টাকা করে চাঁদা দিতে হবে। এতে করে যা লাভ হবে সেটা পার্টির ভাগে যাবে। আচ্ছা। সেক্রেটারি এ-কথা বলে আবার কাজে মন দিলেন।

মনোরমা এই হট্টগোল থেকে ছুটি পেয়ে একটা ট্যাক্সি করে নিজের জিনিসপত্র নিয়ে আসতে বাসায় পৌঁছল। ফিরে আসার পর হঠাৎ ওর মনে পড়ল ভূষণ পার্টির কিছু গোপন কাগজপত্র ওকে সামলে রাখতে বলেছিল; মনোরমা ঐ-সব কাগজপত্র বড়ো একটা আলমারির পিছনে লুকিয়ে রেখেছিল। তাড়াহুড়োতে সেগুলো আনতে একেবারে ভুলে গেছে। ও আবার তাড়াতাড়ি ছুটে গেল।

মিসেস সুতলীওয়ালাকে একবার দেখার খুব কৌতূহল হয়েছিল পাহাড়নেরও; মনের ভিতর একটু আশঙ্কাও ছিল, ভেবেছিল এরকম একজন সজ্জন লোকের সঙ্গে সর্বদা যে ঝগড়া করে তাকে দেখতে গেলে কী জানি কী গালিগালাজ করে উঠবে বা হয়তো কিছু করেই বসবে। এই ভয়ে সুতলীওয়ালার বাড়িতে যাবার ইচ্ছেটাকে ও এতদিন দমন করে রেখেছিল। এদিকে তালাক দেবার ব্যাপারে আদালতের রায় সুতলীওয়ালা জানতে পেরেছে। সুতলীওয়ালা বেয়ারাকে টেলিফোন করে জানতে পারল মেমসাহেব নিজের জিনিসপত্র নিয়ে চলে গেছে। পাহাড়নকে অনুরোধ করল যে ওর সঙ্গে আজ নিজের বাসায় গিয়ে একেবারে লাঞ্চ করে ফিরবে। বহুদিন ধরে এই দিনটার প্রতীক্ষায় ছিল পাহাড়ন। পাহাড়ন সেদিন রিহার্সাল অর্ধসমাপ্ত রেখে সুতলী-

ওয়ালার সঙ্গে এল।

সুতলীওয়ালা গাড়িবারান্দায় গাড়িটা থামিয়ে হাত বাড়িয়ে পাহাড়নকে গাড়ি থেকে নামতে সাহায্য করল। দুজনে যখন বারান্দার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তখন দেখল মনোরমা কিছু পুস্তিকা ও কাগজপত্র হাতে নিয়ে সামনের ঘর দিয়ে বেরিয়ে আসছে। সুতলীওয়ালা ভাবল, মনোরমা আবার কী করতে এসেছে? ও মনোরমাকে দেখেও না-দেখার ভান করল।

এই ঝগড়াটে বউকে এখনো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পাহাড়নের মনটা আশঙ্কায় কেঁপে উঠল। সুতলীওয়ালার হাত থেকে তাড়াতাড়ি হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে মহিলার মুখ থেকে চোখ ফিরিয়ে রইল। মনোরমাও আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু পাহাড়নের মুখের দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল, ডেকে উঠল— সোমা!

অকস্মাৎ তড়িতাহত হয়ে সোমা বিস্ময়ে বিমূঢ় দাঁড়িয়ে রইল। মনোরমার দিকে আবার তাকিয়ে দেখল। মনোরমা সুতলীওয়ালাকে উপেক্ষা করে সোমার আরো কাছে এগিয়ে এসেছিল।

পাহাড়ন সোমাকে চিনতে পেরে ভয়ে ও আশঙ্কায় থর্ থর্ কেঁপে উঠল। মনোরমা আরো একটু এগিয়ে এসে আদর করে পাহাড়নের গলায় হাত রেখে বলে উঠল— সোমা, বোন আমার!

পাহাড়নের পা দুটো যেন আর টাল সামলে রাখতে পারছে না। মনোরমা তাকে ধরে সামলাবার চেষ্টা করল। কিন্তু ততক্ষণে সে মেজের গালিচায় বসে পড়ে একবারে মূর্ছিত হয়ে পড়েছে। মনোরমা ঘাবড়ে গেল। হাতের পুস্তিকা ও কাগজপত্র এক কোণে রেখে পাহাড়নকে ধরে ওঠাবার চেষ্টা করল। সুতলীওয়ালা তড়িৎগতিতে এগিয়ে এল। সুতলীওয়ালা পাহাড়নের কাঁধের দিকে আর মনোরমা হাঁটুর দিকে ধরল। দুজনে ওকে তুলে নিয়ে এসে তক্তাপোষে শুইয়ে দিল।

মনোরমা চিৎকার করে বেয়ারাকে ডাকল— শীগ্‌গির জল নিয়ে এসো। পাহাড়নের চোখেমুখে জলের ঝাঁপটা দিয়ে একখানা খবরের কাগজ দিয়ে বাতাস করতে লাগল। আরও দুমিনিট এভাবে কেটে গেল কিন্তু পাহাড়নের জ্ঞান ফিরে এল না। দুশ্চিন্তায় অধীর হয়ে মনোরমা তক্তাপোষের দিকে ঝুঁকে রইল। কিন্তু একটু পরেই সুতলী-ওয়ালার গলার স্বর শোনা গেল — তুমি যাও, আমি ডাক্তার ডাকছি।

মনোরমা স্তব্ধ, নির্বাক্‌ ; সুতলীওয়ালার মুখের দিকে তাকাতে পারল না ; ধীরে খাট থেকে সরে গেল। ধীরে ধীরে পুস্তিকা ও কাগজপত্র হাতে তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। লজ্জায়-ঘৃণায় মাথাটা একটু যেন নুইয়ে পড়েছে ; মনের মধ্যে একটাই চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে— তা হলে সোমাই পাহাড়ন··· এত পরিবর্তন কি সম্ভব ? মানুষ কী অদ্ভুত জীব, তার কত বিচিত্র রূপ হতে পারে! একদিন সেদিন অনেকদিন আগে ধরমশালায় ভূষণ সোমাকে সঙ্গে নিয়ে ওদের বাড়িতে এসেছিল ; কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ শুনে ভয়ে কুঁকড়ে ছিল, ঠিক যেন একটা ভয়ার্ত ছাগলের চেহারা নিয়ে নির্বাক্‌। সেদিন ধনসিং-এর জন্য প্রাণপাত করতে প্রস্তুত। পুলিশের ভয়ে সেদিন তার গর্ভপাত হয়ে যায়, বাজারে যেতে ভয়ে কাঁপে। তারপর সে দৃশ্যেরও পরিবর্তন : ওকে নিয়ে দাদার বাড়াবাড়ি আর বড়ো বৌদির অন্যায় ও অপমানের কাহিনী। সব যেন ছবির মতো মনে পড়ে। আর আজ ? আজ সে দুনিয়ার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে··· যেন প্রতিশোধ নেবার জন্য বদ্ধ-পরিকর··· আজ কি সুতলীওয়ালার দিকে হাত বাড়িয়ে সুখী হতে পারবে ? এত চালাক হয়ে গেছে সোমা ?

অভ্যাসবশতঃ মনোরমা তিবাত্তির দিকে এগিয়ে চলেছে। তিবাত্তিতে এসে অন্য রাস্তা ধরে ক্যাণ্ডি বীচের দিকে চলল। সেখানে সমুদ্রের তীরে একটা বাঁধানো জায়গায় চুপচাপ বসে রইল। চিন্তাটা আবার

পাক খাচ্ছে মনে— সোমাই আজ পাহাড়ন? মানুষকে কে বুঝতে পারে, কে তাকে সত্যিকারের চিনতে পারে?… সূর্য রঙ ছড়িয়ে আস্তে আস্তে ঢলে পড়ল পশ্চিম আকাশে; ধীরে ধীরে অন্ধকার ছেয়ে এল কিন্তু মনোরমা তবুও বসে রইল।

দূরে কে যেন শিটি বাজিয়ে বিশ্রী ইঙ্গিত করছে; মনোরমা মুখটা ঘুরিয়ে দেখল লোকটা ওর দিকে তাকিয়ে শিটি বাজাচ্ছে। হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল সাড়ে আটটা বেজে গেছে। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। দ্রুত হেঁটে স্যাণ্ডহার্স রোডের দিকে চলে গেল।

* * *

পাহাড়ন মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ার আধ ঘণ্টা পরে ডাক্তার এলেন। পনেরো মিনিট ধরে এটা-সেটা ওষুধ আর ইনজেকশন দেবার পরে পাহাড়ন চোখ মেলে তাকাল। মুখের চেহারাটা ঠিক শুকনো পাতার মতো ফিকে হল্‌দে-পানা হয়ে গেছে। ও চকিত দৃষ্টিতে চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। ডাক্তারের দিকে ফ্যালফেলে দৃষ্টিতে তাকাল। সুতলীওয়ালাকে চিনতে পেরে তার দিকে তাকিয়ে রইল, সে দৃষ্টিতে অনেকগুলি নির্বাক প্রশ্ন।

একটু হেসে সুতলীওয়ালা ভরসা দিয়ে বলল— ঘাবড়িও না। এ আমার ডাক্তার বন্ধু। এখন তুমি ভালো হয়ে গেছো।

ডাক্তার নির্দেশ দিলেন, একটু গরম দুধ বা চা দিন। আর একেবারে কথা বলতে দেবেন না। বলে চলে গেলেন।

ডাক্তার চলে যাবার পর পাহাড়ন মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করল— সে কোথায় গেল?

—ও তো কখন চলে গেছে। পাহাড়নের মাথার চুলে বিনি কাটতে

কাটতে সুতলীওয়ালা বলল— এখন চুপ করে থাকো।

—ও কোথায় গেছে? আবার প্রশ্ন করল পাহাড়ন। ডাক্তার পাহাড়নকে ঘুমের ওষুধ দিয়ে গেছে। সুতলীওয়ালা বলল— গরম দুধের সঙ্গে এই ওষুধটা খেয়ে নাও আর একেবারে চিন্তা করবে না। চিন্তা করার মতো কিছু হয় নি। পাহাড়ন যাতে আর বেশি কথা না বলে সেজন্য সুতলীওয়ালা খাট থেকে একটু সরে গিয়েছিল। পাহাড়নের স্তিমিত কণ্ঠে দু'বার ডাক শুনল— শুনুন, শুনুন।

পাহাড়নের কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে ; কথা বলা উচিত নয়। কিন্তু যদি কথা বলে আর সুতলীওয়ালা না শুনতে পায় এই ভয়ে সে ভিতরের দিকের ঘরে গেল না। সুতলীওয়ালা পকেটে হাত ঢুকিয়ে ব্যালকনীতে পায়চারি করতে লাগল, মনে একটা চিন্তা সূতোর মতো জড়িয়ে যাচ্ছে, কী যেন এক অধীর কৌতূহল। এটুকু সময়ের মধ্যে কী যে হয়ে গেল তা অনুমান করার চেষ্টা করল সুতলীওয়ালা— দু'জনে দু'জনকে কী আগে থেকেই চিনত? হয়তো ছোটোবেলার বন্ধু কিংবা এও হতে পারে ওদের আত্মীয়।··· পাহাড়ন হয়তো লুকিয়ে ঘর থেকে পালিয়ে গিয়েছিল! সে যাই হোক··· একটা কিছু হবে নিশ্চয়। দু'জনের আবার যদি দেখা হয় তবে মনোরমা আমার ব্যাপারে ওকে কী লাগাবে, কী বলবে? মনোরমার কথা শুনে আমাকে বিশ্বাস করবে, না তাকে? পাহাড়নের কল্যাণের জন্য আমি কত কিছু করেছি, এই ফিল্মে ওর কত টাকা খাটানো হয়েছে। আর শুধু একটা মাস, ব্যস। হ্যাঁ, আমি সব সামলে নেবো। এখন আমার অবস্থাও অনেক ভালো। মনোরমার থেকে এর তফাত কত স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। মনোরমা একেবারে তরুণী, যুবতী আর ওর জন্য অনুরূপ একজন জোয়ান লোক দরকার···।

চিন্তায় তখনো মশগুল সুতলীওয়ালা ঘরের ভেতরে এসে দেখে ঘুমের ওষুধের প্রভাবে পাহাড়ন ঘুমিয়ে পড়েছে। নাড়ি টিপে দেখল গায়ে

বেশ জ্বর। প্রায় দু'ঘণ্টা পরে পাহাড়ন ঘুম থেকে জাগল। সুতলী-ওয়ালাকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করল— কটা বাজে ?

সুতলীওয়ালা বলল— প্রায় নটা বাজে। ঘাবড়িয়ো না, আমি আর্কট স্টুডিয়োতে ফোন করে বলে দিয়েছি, তোমার জ্বর, স্টুডিয়োতে যেতে পারবে না।

পাহাড়ন জেদ ধরল — আমি নিজের বাড়ি যাব।

—এটাও তোমারই ঘর। তোমার গা টা গরম। এই অবস্থায় হাওয়া লাগানো ঠিক হবে না। তোমার জন্য একজন নার্স ডাকব ?

—না আমি ভালো আছি।... আচ্ছা, এর সঙ্গে তোমার বিচ্ছেদ হল ? একে তালাক দিলে ? সুতলীওয়ালার চোখে চোখ রেখে গভীর এক বেদনায় পাহাড়ন জিজ্ঞেস করল।

—হ্যাঁ, তুমি একে কী করে চেন ?

সুতলীওয়ালার কথার কোনো জবাব না দিয়ে পাহাড়ন জিজ্ঞেস করল— কবে বিয়ে হয়েছিল ?

—বলেছি তো, দু'বছর আগে।

—দু'বছর আগে ? একটু চিন্তা করে নিয়ে আবার বলল— এ তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতো ?

—তুমি কোনোরকম চিন্তা কোরো না। সুতলীওয়ালা পাহাড়নের মাথায় হাত বুলিয়ে বলল।

—আর ও কি এখানে আসবে ?

—আর কখনো আসবে না। কেন ? তুমি ওর সঙ্গে দেখা করতে চাও নাকি ?

পাহাড়ন মাথা নেড়ে অসম্মতি জানাল।

পাহাড়ন চেয়েছিল রাতের অন্ধকারে নিজের বাড়ি ফিরে যায়। কিন্তু জ্বর আরও বেড়ে গেছে। ডাক্তার নির্দেশ দিয়েছেন বিছানা থেকে

নড়া চলবে না। সুতলীওয়ালা ওকে কিছুতেই যেতে দিল না। বারবার বোঝাল, দুশ্চিন্তা করার কোনো কারণ নেই। প্রবল জ্বরে পাহাড়ন মাঝে মাঝে ভুল বকে যাচ্ছে— না, না। আমি সোমা নই··· আমাকে থাকতে দাও, আমাকে বাঁচতে দাও···। না, বরকত আমার কেউ নয়···।

সুতলীওয়ালা বুঝে নিল, পাহাড়ন তার অতীত জীবনটাকে ভুলে থাকতে চায়। সেই বিস্মৃত অতীতের কথা জানার ইচ্ছাও সে প্রকাশ করল না। মনে মনে ভাবল, যদি প্রয়োজন হয়, পাহাড়নের চাকর বরকতের কাছ থেকে সব কিছু জানা যাবে।

*　　　*　　　*

পাহাড়ন স্টুডিয়ো থেকে সারা রাতের মধ্যে ফেরে নি দেখে ওর আয়া ও মহারাজীন খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল। ওরা বরকতকে ডেকে দুশ্চিন্তার কথাটা জানাল। বরকত অধীর আশংকায় পড়ল। যত রাতই হোক, তিনটেই বাজুক কিংবা চার, পাহাড়ন ঘরে ঠিক ফিরে আসে। বরকত পাহাড়নের খোঁজ করতে আর্কট স্টুডিয়োতে গেল। শুনল, রাতে পাহাড়ন আসেই নি। তবে একটা ফোন এসেছিল, পাহাড়ন অসুস্থ। কিন্তু স্টুডিয়োতে তো আসে নি। বরকত তখন কাঞ্চন স্টুডিয়োতে গিয়ে হাজির হল। ওখানে জানতে পারল, আগের দিন পাহাড়ন এসেছিল কিন্তু কাজ শেষ না হতেই সুতলীওয়ালার সঙ্গে চলে গিয়েছিল। বরকতের মাথায় বাজ পড়ল। লোকেরা অবশ্য বলছিল— দুজনে খুব মজেছে··· বিয়ে করে বসবে···। বরকত ভাবল, সুতলীওয়ালা যদি পাহাড়নকে বিয়ে করে কেটে পড়ে তবে ওর কী হবে? — আমি ঐ মাদারের··· জন্য নিজের জানপ্রাণ দিয়েছি, কত বড়ো ঝুঁকি নিয়েছিলাম মাথায়···।

বরকত সুতলীওয়ালার অফিসের ঠিকানা নিয়ে 'ফোর্টে' ধাওয়া করল। দপ্তরের দরজায় পাহারা দিচ্ছে আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজের গাড়োয়ালী সেপাই-চৌকিদার। বরকতের পোষাক দেখে সন্দেহ হওয়ায় চৌকিদার ওকে ভিতরে যেতে দিল না। গম্ভীর স্বরে বলল—সাহেব এখনো আসেন নি।

বরকত হাতটা হিপ্‌ পকেটে চালিয়ে দিয়ে ব্যস্ত ও ত্রস্ত হয়ে অফিসের সামনে চক্কর দিতে থাকল। প্রায় এক ঘণ্টা পরে সুতলী-ওয়ালার ফিকে নীল রঙের গাড়িটা আসতে দেখা গেল।

বরকত এগিয়ে এসে উদ্ধত স্বরে জিজ্ঞেস করল— পাহাড়ন কোথায় ?

বরকতের উগ্র মূর্তি দেখে সুতলীওয়ালা কিছুমাত্র বিচলিত হল না, বলল — মেমসাহেবের শরীর খারাপ।

দুহাত কোমরে ঠেকিয়ে অদ্ভুত একটা ভঙ্গী করে বরকত বলল—আমরা ওকে ঘরে নিয়ে আসতে চাই।

—এখন না। ডাক্তার মানা করেছে। আমি ওকে ঘরে পৌঁছে দেবো, চিন্তা কোরো না।

বরকত সুতলীওয়ালার পথ আটকে গোঁফে তা দিয়ে অভদ্র ভাষায় বলল— আমাকে ধোঁকা দেবার চেষ্টা কোরো না, আমি সব-কিছু বুঝতে পারি। অন্য কোনো খেয়ালে থেকো না বাছাধন, আমি পাহাড়নকে ধর্ম সাক্ষী করে বিয়ে করেছি। আমি তোমার সব সাহেবী-পনা ঝেড়ে ফেলতে পারি, বুঝেছ ? বরকতের মুখ থেকে মদের গন্ধ বেরুচ্ছে, চোখ দুটো লাল।

সুতলীওয়ালা চৌকিদারের দিকে চেয়ে ইসারা করল। চৌকিদার এগিয়ে এসে বরকতকে দুহাত দিয়ে থামিয়ে এক ধাক্কা দিয়ে বলল—এই, পিছনে হাট্‌।

সুতলীওয়ালা দপ্তরে গিয়ে কোনোমতে নিজের সম্মান বাঁচাল। বরকত তখনও গোঁফে তা দিচ্ছে আর গালি দিয়ে ভূত ভাগাচ্ছে··· দেখে নোবো।

সুতলীওয়ালা, পাহাড়নের আয়া ও মহারাজীনকে খবর পাঠিয়ে দিয়েছিল যে, স্টুডিয়োতে পাহাড়নের হঠাৎ প্রচণ্ড জ্বর এসেছে ; দু'চারদিনের মধ্যে ঘরে ফিরবে, চিন্তা করার মতো কিছু নয়। ওরা দুশ্চিন্তায় ও মমতায় পাহাড়নের পথ চেয়ে রইল। বরকতকে ডেকে ওরা পাহাড়নের অসুস্থতার কথা জানাল এবং বলল দু'একদিনেই ভালো হয়ে ঘরে ফিরবে। কিন্তু বরকত মানুষকে অত সহজে বিশ্বাস করে না। ওর মনে একটা আশংকা কাঁটার মতো বিঁধে রইল যে সুতলীওয়ালা পাহাড়নকে ভাগিয়ে নিয়ে গেছে, ওকে লুকিয়ে রেখেছে। ওর সন্দেহ হল— হয়তো এই মাদার··· পাহাড়নের সঙ্গে এমন দুর্ব্যবহার করেছে, ইয়ে করেছে যে ওর আর উঠবার শক্তি নেই। আয়া ও মহারাজীন ভেবে অস্থির পাহাড়ন কবে সুস্থ হয়ে, কবে ঘরে ফিরবে। কিন্তু বরকতের মনে আশংকার অন্ধকার ছেয়ে যেতে থাকল ; ও ভাবল, ওর জীবনের একমাত্র সম্বল হাতছাড়া হয়ে যেতে বসেছে।

মনোরমা ক্যাণ্ডি বীচ থেকে ফিরে দেখে পার্টি দপ্তর থেকে যারা অন্ধেরীতে ফিরবে— তারা সব সাতটার গাড়ীতে রওনা হয়ে গেছে। একা এখন কোথায় যায় ? 'রেড ফ্লাগ হলে' পারোর কাছে গিয়ে হাজির হল। কিছু খেয়েছে কিনা মনোরমার এতক্ষণ খেয়াল ছিল না। পারো জিজ্ঞেস করতেই খেয়াল হল। পারো ওকে এক ইরাণী হোটেলে নিয়ে গিয়ে কিছু খাইয়ে আনল। ঘুরে ফিরে মনোরমা শুধু সোমার কথাই ভাবছে, সোমার চিন্তায় বিভোর হয়ে আছে।

পারো ভাবল মনোরমা বিচ্ছেদের আঘাতে নিশ্চয় বিষণ্ণ। পারো ওকে নানা ভাবে সান্ত্বনা দিল। কিন্তু মনোরমার বিষণ্ণ ভাব তবু কাটছে না দেখে ও মনোরমাকে বোঝালো যে কুসংস্কারের জন্য এত আঘাত পাবার কোনো অর্থ হয় না।

সারা রাত ঘুমোতে পারল না মনোরমা। চুপচাপ পড়ে রইল। এখনো সোমার কথাই মনে পড়ছে। ঐ যেদিন ধরমশালায় ওদের বাড়িতে এলো, লাহোরে বড়ো বৌদি ও মা যেভাবে ওকে অপমান করে তাড়ালো, সব কথা মনে পড়ে। সোমার জীবনের সব কথা। মুহূর্তে মুহূর্তে সোমার পরিবর্তন আর সে স্মৃতি ওর মনে পাক খেতে থাকে। এর আগে মনোরমা সোমার পরিবর্তনের রূপ এতটা স্পষ্ট করে বুঝতে পারে নি। যেবার ভূষণ লাহোরে শেষবার এসেছিল, ওর সামনে সোমাকে ধরে এনে বসিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ভূষণ সোমাকে চিনতে পারে নি আর যাবার সময় বলে গিয়েছিল, ধনসিং যদি আবার ফিরে আসে, তবে সোমা কি সত্যিই ওর সঙ্গে আর থাকতে পারবে? মনোরমা তো নিজের চোখে ওর এই নানা পরিবর্তন দেখে এসেছে। হঠাৎ দেখে ওকে চিনতেই পারে নি। এখন একে দেয়ালে দেয়ালে হাসি ছড়াতে দেখা যায়, রেকর্ডে রেকর্ডে ওর কামনাদীপ্ত গান শোনা যায়— এখন পাহাড়ন অন্য মানুষ।

মনোরমা সকাল আটটার সময় পার্টি অফিসে পৌঁছল। গত রাতের সব ঘটনা ও ভূষণকে খুলে বলল।

ভূষণ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বলল— যাঃ সত্যি? পাহাড়নই সোমা?

সেদিন সন্ধ্যাবেলা মনোরমা আর ভূষণ 'মন কা চোর' ফিল্ম দেখতে গেল; সোমাকে পাহাড়নের রূপে দেখে, ওকে পার্ট করতে দেখে চকিত হয়ে গেল। ভূষণ বার বার বলতে থাকল— মানুষ কী অদ্ভুত জীব; মানুষের কত রূপ তা কেউ ভাবতেও পারে না!

মনোরমা ও ভূষণ সিনেমা থেকে ফিরে আসছিল। সুতলীওয়ালার ওখানে সোমার সঙ্গে দেখা হবার সেই সব বিস্ময়কর ঘটনার কথা আবার মনোরমা বলে গেল। ভূষণ হঠাৎ বলে উঠল— আচ্ছা মনোরমা, ভাবোতো এখন যদি ধনসিং ফিরে আসে আর ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ায় তবে কী হবে?

মনোরমা গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল— ঐ বেচারার কী দোষ?

ভূষণকে যেন ঠাট্টায় পেয়েছে, তাই বলল— আচ্ছা, না হয় ওর অপরাধ নেই কিন্তু যদি ফিরে আসে ওর কি হবে?

— ও যেন না আসে এটাই আমি চাই। মনোরমা আবার দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলল।

সোমা যেন ওর মেয়ে কিংবা ওর ছোট বোন— তা না হলে মনোরমার হৃদয় ব্যথায় এত গুমরে উঠছে কেন? যেন সোমার এ জীবনের জন্য ওর কোনো একটা দায়িত্ব আছে। সোমা কেন বেহুঁশ হয়ে পড়ল? ওর গলা জড়িয়ে ধরে মনোরমা ওকে সান্ত্বনা দিতে চেয়েছিল; ওর জীবনের সব কথা শুনতে মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। লাহোরে ঘর থেকে বার করে দেবার পর ওর কি অবস্থা হয়েছিল, এখনই-বা কেমন চলছে? বেচারী খুব আঘাত পেয়েছে, চোট খেয়েছে; সে সব দিনের অভিশাপ থেকে তো বেঁচেছে সোমা। আমি ওকে বলে দিতাম সুতলীওয়ালা কীরকম অদ্ভুত লোক।

মনোরমা ভাবল সুতলীওয়ালা গিয়ে সোমার খোঁজ করে কিন্তু সুতলীওয়ালার যে রূঢ় স্বর ওখানে শুনেছিল— 'তুমি এখন যেতে পার', তা শুনে আর ওখানে কী করে যায়? মনোরমা দু'বার টেলিফোন করার চেষ্টা করল কিন্তু সুতলীওয়ালা ফোনটার কী কারসাজি করেছে কে জানে, রিং-ই বাজে না। সোমার সঙ্গে দেখা করতে মনোরমা উৎসুক

হয়ে উঠল। তাই তখন বোম্বাইয়ে পাহাড়নের যতগুলো ছবি চলছিল মনোরমা সব কটি দেখে ফেলল। কিন্তু ওর সঙ্গে দেখা করে কী করে? নিরাশ হয়ে সুতলীওয়ালাকে ইংরেজীতে একটা চিঠি লিখল :

প্রিয় মিষ্টার সুতলীওয়ালা,

পাহাড়ন কেমন আছে তা জানতে আমি উৎসুক হয়ে আছি। ও বেশি কষ্ট পায় নি এটাই আশা রাখছি। ওকে বলবেন, আমি একবার অন্ততঃ ওর সঙ্গে দেখা করতে চাই। যদি সম্ভব হয় তবে ওর সঙ্গে যাতে আমার সাক্ষাৎ হয় সেটুকু করবেন।

তিন দিনের দিন উত্তর এল।

প্রিয় মহোদয়া,

আপনার পত্রের জন্য ধন্যবাদ। মিস পাহাড়ন খুব ভালো আছেন। আপনার কথার উত্তরে তিনি বলেছেন যে ওঁর জন্য আপনি অকারণে দুশ্চিন্তা করবেন না; এটুকু করলেই তিনি কৃতজ্ঞ থাকবেন।

ধন্যবাদ।

মনোরমা খুব আঘাত পেল। একবার ভাবলো এটা নিশ্চয় সুতলীওয়ালার কারসাজি। কিন্তু আবার ওর মনে হল, কী জানি সোমা হয়ত ওর সঙ্গে আর দেখা করতে চায় না। ওর অবস্থার কত পরিবর্তন হয়েছে, মনেরও। কিন্তু আমাকে দেখে ও তবে বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিল কেন? যেটাই হোক, ও সুখে থাকুক। সুতলীওয়ালার চিঠি পেয়ে মনোরমার এত খারাপ লাগল যে এ কথাটা ও ভূষণকে বলতেও সাহস পায় নি।

মনোরমা জানতো পাহাড়ন অন্ধেরীতেই থাকে। কিন্তু সুতলী-ওয়ালার ওরকম একটা চিঠি পেয়ে ও পাহাড়নের ওখানে আর যেতে চাইল না। ভাবল, এতো হতে পারে যে, সোমাই ওরকম একটা চিঠি লিখিয়েছে। অতীতের বেদনাহত জীবনের স্মৃতি থেকে সোমা হয়ত

দূরে থাকতে চায়। এতে তো ওর কোনো দোষ নেই। আমি কখনো ওর ক্ষতি করিনি কিন্তু সোমা সমস্ত সমাজকে ভয়ের চোখে দেখে। নিজের নতুন জীবনকে হয়ত প্রাণপণে বাঁচিয়ে রাখতে চাইছে। অতীতকে নিশ্চয় সোমা আশংকার দৃষ্টিতে দেখে।

সকালে অন্ধেরী থেকে চা খেয়ে দপ্তরে যায়; দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সারে কম্যুনে, সন্ধ্যার সময় সাতটার ট্রেনে সবার সঙ্গে আবার ফিরে যায়। দিনটা কীভাবে যে কেটে যায়! ভূষণের সঙ্গে আগের মত ঘুরতে পারে না। কিন্তু ওর মনের সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা, দু'জনে কত কাছাকাছি আছে। সন্ধ্যার সময় যদি একসঙ্গে সময় কাটাতে চায়, তবে মনোরমা তার দল থেকে সরে পড়ে। কেউ কিছু বলে না। কিন্তু সঙ্গীরা যদি এ নিয়ে কোনো কথা বলে তবে মনোরমার খুব সংকোচ হতে থাকে।

পার্টিতে স্ত্রী-পুরুষেরা পরস্পরের প্রেমে পড়ে না, এও নয়। সঙ্গীরা ভেঙ্কট ও পারোর বিয়েতে মিষ্টি খাবে বলে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। রমেশের সঙ্গে সুমতির প্রেম চলছে, তাও সবাই জানে। ভূষণ আর মনোরমার কথা বলেও ওরা আনন্দ পায়। কিন্তু তরুণ তরুণীদের মত তো এরা নয়। মনোরমা নিজের পত্রিকার সহকারী সম্পাদক আর ভূষণকেও এরা অভিজ্ঞ ও বয়স্ক কমরেড দাদা বলেই জানে। সুতরাং এরা বেশি রকম পরিহাসে মত্ত হতে পারত না। যদি এদের বিয়ে হয় তবে পার্টিকে কেন জানিয়ে দিচ্ছে না। কিন্তু এই তো সবে বিচ্ছেদ হল, এখনই বিয়ে করা ঠিক দেখায় না। ঐ ঘটনার তিক্ততা মনোরমার পক্ষে এত তাড়াতাড়ি ভুলে যাওয়াও সম্ভব নয়। কখনো মনোরমা ভাবে কত দুঃসহ যন্ত্রণা সহ্য করে ভূষণের কাছাকাছি থাকতে পারছি, ওর সঙ্গ পাচ্ছি তবে এখনই কেন ব্যাকুল হয়ে উঠি? সেই তীব্র সুখের কল্পনায় ওর সর্ব শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে··· ভাবে, এত তাড়াতাড়ি কী করে হবে?

*　　　*　　　*

তিন দিনের দিন সন্ধ্যার সময় পাহাড়নের গা থেকে জ্বর ছেড়ে গিয়েছিল কিন্তু সুতলীওয়ালা তাকে আরও দু'দিন নিজের কাছে রাখল, যেতে দিল না। তার আশংকা হচ্ছিল বরকতের এই উদ্ধত ব্যবহারে পাহাড়নের আবার একটা মানসিক বিপর্যয় না হয়। পাহাড়নকে সাবধান করে দেবার জন্য তার অফিসের সামনে যেসব ঘটনা ঘটেছিল তা সব খুলে বলল। পাহাড়ন তাতে সামান্যমাত্র বিস্মিত হল না।

একটু দুশ্চিন্তা প্রকাশ করল— ওটা বড়ো অপদার্থ। যা-খুশি তাই করে বসতে পারে। তুমি ওর থেকে সাবধানে থেকো।

সুতলীওয়ালা ওকে ভরসা দিয়ে বলল— তুমি কোনো চিন্তা করো না। ওসব লোক আমাদের কিছুই বিগড়াতে পারে না। ওর উপযুক্ত ব্যবস্থা আমি করবো।

পাহাড়ন অন্ধেরীতে ফিরে গিয়ে স্টুডিয়োয় যেতে শুরু করেছিল। স্টুডিয়োতে সুতলীওয়ালার সঙ্গে দেখা হোত বা কখনো তার বাসা হয়ে বাসায় ফিরত। নিজের বাসায় যেতে সুতলীওয়ালাকে মানা করে দিয়েছে। প্রয়োজন পড়লে সুতলীওয়ালা ফোনে কথা বলে নেয়।

পাহাড়ন ও সুতলীওয়ালার মধ্যে বরকত যেন একটা বড়ো বাধা হয়ে দাঁড়াল। এ সমস্যার হাল কী করে হবে দু'জনেই তা নিয়ে ভাবে। এই শয়তানটাকে পাহাড়ন আর যেন সইতে পারছে না। সুতলী-ওয়ালা আশ্বাস দিয়ে বললো— আরে, ঘাবড়িয়ো না। ও হয় সারা জীবনের জন্য জেলে পচে মরবে নয়ত অনন্ত সমুদ্রে হারিয়ে যাবে। এই বোম্বাই সমুদ্রে লাখ লাখ লাশ গুম হয়ে গেছে।

পাহাড়ন যেন কেঁপে উঠল— না, না। এমন কিছু করে বোসো না যাতে লাভের চেয়ে লোকসান বেশি। তোমার উপর কোনোরকম চোট যেন না পড়ে, ক্ষতি না হয়। আমি এমনিতেই ভালো আছি।

বরকতের উদ্ধত ভাবটা দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। আর একজন বন্ধুকে ডেকে নিয়েছে, সে এখন বরকতের সঙ্গেই থাকে। নতুন যারা আসে-যায় তাদের ধমকিয়ে বলে— কে যায় রে? কোথা থেকে আসছ? ওর কেবল সন্দেহ সুতলীওয়ালা অন্যের হাতে পাহাড়নকে খবর পাঠায়। এই অপমান আর নৈরাশ্যজনক জীবনে পাহাড়ন যেন হাঁপিয়ে উঠছে; এই বিবশ অবস্থা ওর আর কিছুতেই যেন সহ্য হচ্ছে না।

আবার দেখা

ধনসিং সমেত আজাদ হিন্দ্ ফৌজের পঁয়ষট্টি জন সেপাইকে বাঁকীপুর জেল ক্যাম্প থেকে মুক্তি দেওয়া হল। ধনসিং কোনোরকম ক্ষমা প্রার্থনা করে নি, গ্রেপ্তার হবার পরেও নয় যদিও পরাক্রমী আজাদ হিন্দ্ ফৌজে ভর্তি হবার ব্যাপারে ও আর্জি পেশ করেছিল। এই অন্যায়ের শাস্তিস্বরূপ ওর মাইনের সব টাকা বাযেজাপ্ত করে নেওয়া হয়। জেল থেকে মুক্তি পাবার পর ভাড়া ও খোরাক বাবদ মাত্র পঁচিশ টাকা পেয়েছে।

পাটনা পৌঁছতেই জনতা আজাদ হিন্দ্ ফৌজের কর্মীদের গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জানালো। সভা-সমিতিতে এঁদের বীরত্ব ও আত্মত্যাগের জন্য প্রশংসা ও অভিনন্দন বর্ষিত হতে থাকলো। কংগ্রেস পার্টির তরফ থেকে সেপাইদের নৈশভোজে আপ্যায়িত করা হয়। পরের দিন সকাল ও বিকেলে দু'জন ধনী লোক এঁদের সম্মানে ভোজনপর্বের ব্যবস্থা করেন। বিরাট এক জনসভায় আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে স্বাধীনতার অগ্রদূত বলে অভিনন্দিত করা হয়।

এইসব আদর-আপ্যায়ন ও ভুরি ভুরি প্রশংসা পাবার সময়েও ধনসিং ভাবছিল কবে সে পাঞ্জাবের ধরমশালায় ফিরে গিয়ে সোমার খোঁজ করতে পারবে। এখনও ইংরেজদের রাজত্ব কায়েম আর ইংরেজ

রাজ মানেই তো সেই পুলিশের রাজত্ব। পাঞ্জাব-ধরমশালায় যেতে হলে এখনো ওকে নাম বদল করতে হবে, ওর বেশভূষা ও চেহারা পালটে ফেলতে হবে। ধনসিং মনে মনে ঠিক করল প্রথমে পাটনায় একটা স্থিতি করে নিয়ে পরে অন্য কথা ভাববে। তখন এক সময় লুকিয়ে কাংড়ায় চলে গিয়ে সোমাকে নিয়ে আসবে। লোকেরা তো বলাবলি করেছ, কংগ্রেসী রাজ চালু হয়ে গেছে। কিন্তু রাজ্যশাসনের কিছু পরিবর্তন হয়েছে বলে ওর তো অন্ততঃ চোখে পড়ছে না। উদাসী হয়ে ধনসিং ভাবে, দেশ যেরকম স্বাধীনতা পেয়ে গেছে, সেরকমই স্বাধীনতা আমরাও পেয়েছি। যেরকম সব লোক জীবন নির্বাহ করবে, আমরাও তেমনি।

ভালবাসা ও উচ্ছ্বাসের বন্যা খুব দ্রুত থেমে গেল। যাঁরা ধনসিং-কে আদর করে কাছে ডেকেছেন, ওদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন, ধনসিং সাহায্যের ঝুলি নিয়ে তাঁদের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরল। ও ভিক্ষা চাইতে যায় নি ; বলেছে চাকরি দাও, একটা কিছু করে দাও। যাঁরা আদর করেন, শ্রদ্ধা জানায়, 'চাকরি বা রুজির ব্যবস্থা করে দাও'— এ দাবি তাঁদের নিশ্চয় পছন্দ হবার কথা নয়। তা ছাড়া এসব করার ঝামেলা তো অনেক। তাঁরা রায় দিলেন— নিজের জাতের লোক খুঁজে নাও, নিজের দেশ, যেখানে চেনাজানা লোক, তাদের কাছে চাকরি খোঁজো, ঠিক পেয়ে যাবে। চাকরি-বাকরির ব্যাপারে জান-পহচান ও চেনাশোনা থাকলে একেবারে কার্যসিদ্ধি, ওটা বিনিয়োগের মত, বুঝলে? এখানে তোমার ঘর-বাড়ি-দেশের কথা কেই-বা জানে?

আদর, ভালবাসা ও কল্যাণবুদ্ধির এই অসারত্ব দেখে ধনসিং নিরাশ হয়ে পড়ে, ভাবে, আমি এখন কী করি? চেনাজানা লোক তো সেই কাংড়ায় বা ধরমশালায় রয়েছে। কিন্তু সেখানে যাবার সাহস যে ও কুলিয়ে উঠতে পারছে না। এরকম একটা সংকট মুহূর্তে ওর হঠাৎ মনে

পড়ল অর্জুনলালের কথা।

ধনসিং কানপুরে গিয়ে হাজির হল। কানপুরে আজাদ হিন্দ ফৌজের সেপাইদের জন্য আদর-আপ্যায়নের প্লাবন বইছে; ওদের কল্যাণ সবার মুখে মুখে; থাকা খাওয়ার জন্য এলাহী ক্যাম্পের ব্যবস্থা। ধনসিং ওখানে যেতে চাইল না; ও প্যারেডের কাছে কম্যুনিস্ট পার্টির দপ্তরে গিয়ে গণেশের সঙ্গে দেখা করল। গণেশ অর্জুনলালের ঠিকানা বাৎলে দিল। কংগ্রেসের নব-নির্বাচনের ব্যাপারে অর্জুনলাল তখন গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ধনসিং গণেশের কাছে ফিরে এসে চাকরি-বাকরির সম্ভাবনার বিষয়ে আলোচনা করল। সন্ধ্যাবেলা গণেশ ওকে একটা সিনেমা দেখাতে নিয়ে গেল।

কানপুরে তখন 'জনতা ঘোঁসলা' ফিল্ম চলছিল। দিমাপুর ক্যাম্পে দু'চার বার সেপাইদের ফিল্ম দেখানো হয়েছিল; ধনসিং সেখানেই যা সিনেমা দেখেছে। আজাদ হিন্দ ফৌজে এবং পরে প্রায় এক বছর ক্যাম্পে থাকার সময় কোনো সিনেমা দেখার সুযোগ পায় নি। তাই অনেকদিন পরে আজ সিনেমাটা খুব মন দিয়ে দেখছিল। রুপালি পর্দায় পাহাড়নকে দেখেই ধনসিং যেন তড়িতাহত হোল। ভালো করে চোখ মেলে দেখলো, কারণ ও ভাবছিল নিশ্চয় ভুল দেখছে। আবার খুব মন দিয়ে দেখলো। বাঁ দিকের গালের নিচে চোয়ালের কাছে একটা যে তিল ছিল তাও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কণ্ঠের স্বর হুবহু সেই।

ফিল্মে পাহড়ন গান গেয়ে গেয়ে নাচছে— 'সাম্বুরী তেরা বেটা রী, মেরে জীবন কো হাথ লাগায়ে'। গলার আওয়াজও ঠিক সোমারই মতো। নিশ্চিন্ত হয়ে এই সিনেমা দেখে যাওয়া ধনসিং-এর পক্ষে আর সম্ভব হল না। রুপালি পর্দায় নায়ক নিরালয় নির্জনে গিয়ে পাহাড়নের দিকে নিজের হাত বাড়াতে এগিয়ে যাচ্ছে আর পাহাড়ন সংকোচে আড়ষ্ট হয়ে মুচকি হাসছে।

ধনসিং-এর মাথাটা কেমন যেন ঘুরে গেল, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমল।

ধনসিং-এর এই অশান্ত ভাব লক্ষ্য করে গণেশ জানতে চাইলো— কী ব্যাপার, দোস্ত? শরীর ভালো লাগছে না?

ধনসিং এক ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলল— ভীষণ মাথা ধরেছে।

ছবিটার অর্দ্ধেক দেখেই গণেশ ধনসিংকে বাড়িতে নিয়ে এল। ধনসিং রাতে কিছুই খেল না। পার্টি দপ্তর থেকে ফিরে এসেই মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়ল।

ধনসিং গণেশের কাছ থেকে জানতে চাইল— এ সব সিনেমা কোথায় তৈরি হয়?

—এই ফিল্মটা বোম্বাইয়ে তৈরি হয়েছে।... কেন? গণেশ কৌতূহলী হল। ধনসিং কোনো উত্তর দিল না।

একটু থেমে আবার গণেশ একই প্রশ্ন করল। তার সোজাসুজি উত্তর না দিয়ে ধনসিং বলল— আচ্ছা বোম্বাইয়ের গাড়ি কোন্ সময়ে যায়?

—সকাল এগারোটা সাড়ে এগারোটা নাগাদ। বোম্বেতে যেতে চাও নাকি? কেন যেতে চাইছ?

—ভাবছি বোম্বাইয়ের ভাড়া কত? ধনসিং জিজ্ঞাসা করল। ভাড়ার অংকটা বলে দিয়ে গণেশ বলল— কেন, বোম্বাইতে তোমার কোনো আপনজন আছে নাকি?

ধনসিং আবার চুপ। গণেশের আগ্রহ বেড়ে গেছে— কী দোস্ত, উত্তর দিচ্ছ না যে?

—ভয়ানক মাথা ধরেছে। বলে চুপচাপ ভাবতে লাগল ধনসিং। দুজন মহিলার কি একরকম রূপ হতে পারে; একরকম দেখতে? এসব দেখার জন্যই কি আমি দুটো লোকের জান নিয়েছি? এসব দেখব বলেই কি আমার সমস্ত জীবনটা বরবাদ করেছি?

বোম্বাইয়ের নর-সমুদ্রে ধনসিং প্রবাহিত হয়ে এল ; যেন জলের একটি বিন্দু অনন্ত প্রবাহে এসে মিলেছে আর সেই বিন্দু নিজের পথ খোঁজার চেষ্টা করছে। বোম্বাইয়ে ধনসিং-এর কোথাও পা রাখার জায়গা নেই ; কেউ ওর দিকে তাকিয়েও দেখে না। ফৌজি উর্দি পরেছে, বগলে সেঁটে ধরেছে নিজের সহায়-সম্পত্তি ; একটা চাদর। এটুকু সম্বল করে সে সোমার খোঁজে এসেছে ; বিরাট বিরাট বাড়ির নিচে সোমাকে সে খোঁজে ; প্রশস্ত রাস্তায়, মোটরের ক্রমাগত বিরামহীন প্রবাহে, ফুটপাথে ভিড়ের চিরন্তর ডামাডোলের মধ্যে সোমাকে সে খুঁজে বেড়ায়, পাহাড়নের সন্ধানে ফেরে।

পাহাড়নকে কোথায় খুঁজবে, কী করে তাকে পাবে ধনসিং জানে না। দেয়ালে দেয়ালে সোমা নেচে নেচে ফেরে, মুচকি হাসি ছড়িয়ে বিরাট বিরাট চিত্রিত সোমা ওকে পরিহাস করে বলে— দেখো, এই তো আমি এখানে, এই তো আমি। আমাকে ধরো! চায়ের দোকানে দোকানে সেই সোমার গান, গ্রামাফোনে রেকর্ডে বেজে যায়— 'কস গলে ডালো বহিয়াঁ, মোরে সইয়াঁ, ইস বিধ করিয়ে প্রীত'। চারদিক থেকে যেন সোমা ওকে ডেকে ডেকে জানাতে চাইছে— এইখানে আমি, এই তো আমি ধরো, আমাকে ধরো তো!

ভালো মানুষ দেখতে এমন দশ-বারো জন লোককে ধনসিং থামিয়ে থামিয়ে একই প্রশ্ন করছে— আরে ভাই, পাহাড়ন কোথায় থাকে, জানেন?

ধনসিং-এর প্রশ্নের কেউ হয়তো কোনো জবাবই দেয় নি ; কেউ হয়তো হাত নেড়েছে। অধিকাংশের চোখেমুখে পরিহাসের একটা বাঁকা হাসি ফুটে উঠতে দেখেছে। খেতবাড়ীতে একটা সিনেমা হলের কাছে

গিয়ে হাজির। বিকেলবেলার শো আরম্ভ হবে। দেয়ালে এবং বড়ো বড়ো সাইন-বোর্ডে পাহাড়নের ছবি ; চোখের তির্যক দৃষ্টি মেলে আকর্ষণ করছে দর্শকদের। লাউডস্পীকারে পাহাড়নের গান। ধনসিং ভাবল, এরা যখন সোমার সিনেমা দেখে তখন নিশ্চয় জানে সে কোথায় থাকে। বেশ কয়েকজন লোককে জিজ্ঞেস করল ধনসিং। কিন্তু তারাও বিদ্রূপের হাসি ছড়িয়ে, কখনো বা একটু যেন রেগে উঠে মুখ ফিরিয়ে নিল।

একজন অবশ্য ধনসিংকে করুণা করে জবাব দিল— আ-বে, পাহাড়নের ঘর জেনে কী করবে শুনি ? এখানে পাঁচ আনার টিকিট কেটে ঢুকে পড়ো। দু'ঘণ্টা পাহাড়নের সঙ্গে স্ফূর্তি করো, মৌজ করো আর নিজের ঘরে ফিরে যাও। ধনসিং এ অপমান গ্রাহ্য করল না ; অপমান বিদ্যুৎ-তাড়িত জ্বালা ধরাল না, তবে সে কেমন যেন জড় পদার্থের মতো দাঁড়িয়ে রইল। ঠোঁট চেপে চুপ করে রইল, কারণ এ ছাড়া আর উপায় কী ? না, এবার ভালো চেহারার লোকদের জিজ্ঞেস করলে হয়তো কাজ হবে।

একজন ভদ্রলোককে দেখে ধনসিং এগিয়ে এল। তার প্রশ্ন শুনে সে বলল— পাহাড়ন অন্ধেরীতে থাকে। পথও তাকে বাৎলে দিল— চূর্ণীরোড স্টেশন থেকে গাড়ী ধর। চার পয়সায় অন্ধেরীতে পৌঁছে যাবে।

ধনসিং নিজের উদ্দেশ্য ছাড়বার পাত্র নয়। স্টেশনের রাস্তা জিজ্ঞেস করতে করতে সে এগিয়ে গেল। স্টেশনের ভিতরে সে বিজলীর গাড়িতে গিয়ে বসল ; ঐ যেসব গাড়ি সরসর শব্দ করে হঠাৎ চলতে শুরু করে আর ঠিকমতো ওঠার আগেই সাঁ করে বেরিয়ে যায়। ধনসিং প্রত্যেক স্টেশন খুব মন দিয়ে দেখতে লাগল, শেষকালে অন্ধেরী আবার বেরিয়ে না যায়। অন্য একটা স্টেশন থেকে পাঁচ-ছয়জন যুবতী আর তিন জন তরুণ গাড়িতে এসে উঠল। তরুণদের গায়ে সাদা কাপড়। নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে ওর কামরায় এসে বসল।

ধনসিং একজন মেয়েকে যেন চিনতে পারছে। ও আবার মন দিয়ে দেখল ; চেহারা একেবারে পালটে গেছে। কিন্তু এ নিশ্চয় মনোরমা বিবি, লালাজীর মেয়ে। খুব রোগা হয়ে গেছে ; মুখের মধ্যে একটা ক্লান্তির ছাপ, একটু যেন রুক্ষ মনে হচ্ছে দেখে। হয়ত অসুস্থ ছিল, কিন্তু এখনো বেশ হাসিখুশী। ধনসিং ধরমশালায় এদের বাড়িতেই সোমাকে ছেড়ে এসেছিল। ভাবল, এরা নিশ্চয় সবাই এখন বোম্বাইতে। সোমা এদের এখানে থেকেই হয়তো সিনেমার কাজ করে। ধনসিং-এর বুক ধুক ধুক করছিল— মনোরমা বিবির সঙ্গে ও সোমার কাছে চলে যাবে। মনোরমাকে ও এক মুহূর্তের জন্য দৃষ্টির আড়াল করল না : কেবলই ভয়, কোথা থেকে কোন্ ফাঁকে অন্য রাস্তায় মিলিয়ে যায় মনোরমা। অন্ধেরীতে মনোরমা অন্য সঙ্গীদের সঙ্গে গাড়ি থেকে নামল। ধনসিংও নেমে পড়ল। মনোরমাকে ডাকার সাহস হল না ওর। ও অন্য মেয়েদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে এগিয়ে চলেছে, ধনসিং পিছনে পিছনে চলতে থাকল। একটু দূরে থেকে ও ওদেরই পিছনে পিছনে যেতে লাগল। স্টেশনের কাছে ঘন লোকালয় ছাড়িয়ে ওরা গাছপালায় ঘেরা একটা বড়ো বাংলোয় গিয়ে ঢুকলো। মনোরমা ভেতরে চলে গেছে। ধনসিং বাংলোর বারান্দার নিচে দাঁড়িয়ে চারিদিকে সোমাকে খুঁজতে লাগল। কেউ ওকে কোনো জেরা করল না অথচ সোমাকে কোথাও দেখতে পেলো না।

বারান্দায় একজন লোক দেখে ধনসিং ডাকল— সোমাকে একটু ডেকে দেবেন ?

—সোমা আবার কে ? লোকটি বিস্মিত হয়ে বলল।

—আরে সোমা, ঐ যে পাহাড়ন।

—পাহাড়ন ? এখানে পাহাড়ন নেই, অন্য দিকে যাও। লোকটি ভেতরে পা বাড়াল।

ধনসিং আবার তাকে ডাকল— মনোরমা বিবিজীকে একটু ডেকে দাও না।

—মনোরমাকে কী নাম বলব ?

ধনসিং নিজের নাম বলে দিল।

মনোরমা এল ; বেশ ঘাবড়ে গিয়েছে, কী এক আশংকায় যেন শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে ধনসিং-এর দিকে তাকিয়ে রইল, চিনলও। কিন্তু কিছু বলতে চেয়েও বলতে পারছে না।

ধনসিং আতঙ্ক-ভরা মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করল— সোমা··· ?

হাতের সংকেতে মনোরমা ধনসিং-কে ভিতরে ডাকল। মেঝেতে বিছানো সতরঞ্চির উপর তাকে বসাল ও নিজে তার পাশে বসে বললো— তুমি কোথায় ছিলে ?

ধনসিং নিঃসংকোচে সব-কিছু বলে আবার জিজ্ঞেস করল— সোমা কোথায় ?

মনোরমা তার কোনো উত্তর না দিয়ে অন্য প্রশ্ন করল— পাহাড়ে গিয়েছিলে নাকি ?

মনোরমার প্রশ্ন যেন আর শেষ হয় না— লাহোরে কি গিয়েছিলে ? ধনসিং আবার মাথা নাড়ে।

মনোরমা একটু ভেবে নিয়ে বললো— সিনেমা দেখে বুঝি ওর খবর জেনেছ ?

হ্যাঁ, ওকে খবর দিন না। ধনসিং তখনও ভাবছে সোমা ভেতরে আছে, শুধু খবর দেবার অপেক্ষা। বুক-ভরা আশা নিয়ে গভীর শ্বাস নিল।

মনোরমা ওর প্রশ্নের উত্তরটা একটু ঘুরিয়ে বলতে চাইল— শোনো ধনসিং, তারপর থেকে ত কত কিছু ঘটে গেছে। আমি এখন এই কম্যুনিষ্ট পার্টিতে আছি, একটি পত্রিকায় কাজ করি। কত বছর হয়ে

গেল লাহোর যাই নি। ওখানকার কোনো খবরই জানিনা। মনোরমা জানতো, ধনসিং শুধু একটা কথাই শুনতে চায়; বাকি যা কিছু ও বলছে ওর কাছে তার কোনো মূল্য নেই।

একটু থেমে মনোরমা আবার বললো— সোমা লাহোরে আমাদের ওখানেই ছিল। এখন বোম্বাইতে আছে। কমরেড ভূষণকে জানো তো, যে তোমাকে ধরমশালায় নিয়ে এসেছিল। মনে আছে?

—হ্যাঁ জী।

— ভূষণও বোম্বাই-তে আছে। সোমার ঘর বোধ হয় ও জানতেও পারে। আজ এখানে থেকে যাও। কাল তোমাকে নিয়ে যাব। তুমি খেয়েছ তো?

ধনসিং মাথা নাড়ল।

—দাঁড়াও। মনোরমা ভিতরে চলে গেল। আবার ফিরে এসে ধনসিং-কে নিয়ে গেল। কয়েকজন পুরুষ ও মহিলা পাত পেড়ে খেতে বসেছে। ধনসিং-কেও তাদের সঙ্গে বসিয়ে দিল।

শোবার জন্য ধনসিং-কে একটি সতরঞ্চি ও একটি চাদর দিল। শরীরে সারাদিনের ক্লান্তি, তাই বারান্দায় শোবার সঙ্গে সঙ্গে ধনসিং ঘুমিয়ে পড়ল। মনোরমা ভিতরে অন্য মেয়েদের সঙ্গে শুয়েছে; বাতি নিভিয়ে নিজের মশারীতে শুয়ে আছে; ঘুম আসছে না; চোখ খোলা; নানা ভাবনা এসে চোখের ঘুম যেন কেড়ে নিয়েছে।

পরের দিন সকাল ন'টা নাগাদ ধনসিং-কে নিয়ে মনোরমা পার্টি দপ্তরে ভূষণের কাছে গিয়ে হাজির। সোমার জন্য ব্যাগ্রতা ধনসিং-এর মুখে সুস্পষ্ট ছায়া ফেলেছে। দু'জনেই ক্লান্ত, ব্যথিত কিন্তু করার তো কিছু নেই।

ভূষণ ও মনোরমা দু'জনে ইংরেজীতে কথা বলে যেতে লাগল। আশংকা-ভরা দৃষ্টি নিয়ে ধনসিং একবার ভূষণের মুখের দিকে তাকিয়ে

থাকে আবার কখনো মনোরমার মুখের দিকে। দু'জনেই একমত যে, সোমার কাছে ধনসিং-এর যাওয়া ঠিক হবে না। কিন্তু সেটা কি মুখ ফুটে বলা যায়? ধনসিং কী বলবে? মনোরমা সেটা ভেবেই ভূষণকে বলল— আমাকে দেখে সোমা বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিল আর একে দেখে ওর কী অবস্থা হবে ভাবো তো?

ভূষণ তাই ধনসিং-কে বোঝাতে লাগল— তুমি ওকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলে। তাই ওর পেছনে দাঁড়াবার কেউ ছিল না। ওরা সোমার বদনাম করে ওকে ঘর থেকে বার করে দিয়েছিল। তুমি নিশ্চয় জান, অল্প বয়সী বউদের যদি কেউ দেখবার না থাকে তবে দুনিয়াটা কী রকম পেছনে লেগে যায়। তুমি থাকতেই লোকেরা ওকে কীরকম হয়রানী করত। আর তুমি না থাকতে ওর কী অবস্থা হয়েছিল বুঝতেই পার। খাওয়া-পরার ঠিক নেই, কখনো জোটে কখনো জোটে না; থাকবার জায়গা নেই, দুয়ারে দুয়ারে ধাক্কা খেয়ে ফিরেছে, জনে জনে হাত বদলেছে। এখন ও এই কাজ করছে। এখন ওর অনেক নাম ডাক। শুনেছি এক লাখপতির সঙ্গে ওর বিয়ে হবে। তুমিই ভেবে দেখ, ওখানে যদি যাও তার কী অবস্থা হবে? ও বেচারী এখন করবেই-বা কী? ও কখনো তোমার কোনো খবর পায়নি। কখনো তুমি একটা চিঠিও লেখনি; চিঠি পেলেও ওর আশা বলে কিছু থাকতো। এ ছাড়া ওর আর কী করার ছিল? ওকে কী করে দোষ দিই?

ধনসিং-এর চোখ দুটো রক্তবর্ণ হয়ে উঠল— আপনি ওর ঠিকানাটা আমাকে দিন। আমি একবার ওর কাছে যেতে চাই। একবার অন্ততঃ আমি দেখা করবোই।

ভূষণ আবার বুঝিয়ে বললো— লাভ কী হবে বলো? শুনে তোমার খারাপ লাগবে, তোমাকে দেখে তারও মন খারাপ হবে। বড় জোর ও থাকতে না পেরে বিষ খেয়ে নেবে। তুমি কি এটাই চাও?

ধনসিং-এর মুখে গভীর উদ্বেগের রেখা ফুটে উঠল— আপনি তো জানেন, আমি ওর জন্যে কী না করেছি। চাকরী ছাড়তে হল, জেলে গেলাম, খুন করলাম, আবার জেল খাটলাম, আবার বনে বনে ঘুরে না খেয়ে না দেয়ে লড়াই করলাম, আবার জেলের জীবন। আমি একবার দেখতে চাই আমাকে ও কি জবাব দেয়।

মনোরমা ইংরেজীতে ভূষণকে অনুরোধ করল— লোকটা এখনো সোমাকে কী গভীরভাবে ভালোবাসে। একদিন সোমাও এর জন্যে প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিল। যা-কিছু ও করছে উপায় নেই বলে করছে, এও তো হতে পারে। এর জন্যে ভালবাসা এখনও যদি মরে গিয়ে না থাকে তবে হয়তো এর জন্যে সব-কিছু ছাড়তেও পারে। তখন হয়তো ভাববে এর সঙ্গে মিলনই সোমার জীবনের পরম ভাগ্য। তুমি এদের দুজনের মিলনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছ কেন? এক নিশ্বাসে যেন মনোরমা বলে গেল।

ভূষণ দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা চেপে অসম্মতি জানাল।

রুদ্ধ স্বরে মনোরমা বলে উঠল— শত হলেও এই মানুষটার প্রতি তুমি এত বড়ো অন্যায় করছ কেন? একে একবার তো সুযোগ দেবে?

বেদনাহত চোখে তাকাল ভূষণ, মনোরমার চোখে চোখ রেখে বলল— এর পরিণামের জন্য তুমি কিন্তু দায়ী হবে।

—হ্যাঁ, মনোরমা সে দায়িত্ব মাথা পেতে নিয়ে বলল— আমার কথা শোনো, তুমি একে সঙ্গে নিয়ে যাও। খারাপ একটা কিছু হলে তুমি অবস্থাটা সামলে নিতে পারবে। তুমিই একে 47 সালে আমাদের কাছে নিয়ে এসেছিলে।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভূষণ দুপুরের পরে ধনসিংকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল।

বরকতের মনের ভয়টা কাটে নি। ওর আশঙ্কা সুতলীওয়ালা

পাহাড়নকে ভাগিয়ে নিয়ে যাবার নানা রকম চক্রান্ত করছে ; এইজন্য আজাদ হিন্দ্ ফৌজের ঐ চৌকিদারটাকে দিয়ে ওকে পেটাবার মতলব আঁটছে। এই ভয়ে বরকত আমীনকে ডেকে অম্বেরীর বাংলোয় নিজের সঙ্গে রেখেছে। ওকে কেউ বিষ খাইয়ে না মারে সেটাও ওর ভয় ; তাই আজকাল ও পাহাড়নের ঘরের রান্না খাবারও খায় না। হয় বরকত না হয় আমীন— দুজনের মধ্যে একজন না একজন সব সময় পাহারা দেয়।

আমীন চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য বারান্দার কোণে একটা খাটের উপর বসে ছিল। ও দেখল একজন ফৌজি উর্দি পরা লোক এবং অন্য একজন সাধারণ কাপড় পরা ভদ্রলোক বাংলোর মধ্যে ঢুকছে। আমীন সতর্ক হল।

ভূষণ এগিয়ে এসে আমীনকে বলল– ভাইয়া আমরা পাহাড়নের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

—আরে আমার দেখা-করনেওয়ালা রে! রূঢ় ভাষায় সাবধান করল আমীন— খবরদার, সোজা উল্টো পথ দেখ।

ভূষণের প্রতি এই উদ্ধত আচরণ করতে দেখে ধনসিং আর থাকতে পারল না। একটু এগিয়ে এসে ধমকে দিল— মুখ সামলে কথা বল, বে। উত্তেজনায় ধনসিং বারান্দায় উঠে গেল।

ডাণ্ডাটা হাতে নিয়ে খাট থেকে উঠে দাঁড়াল আমীন। চিৎকার করে ডাকল— বরকত মিয়া, শীগ্‌গির এস। এগিয়ে ডাণ্ডাটা দিয়ে ধনসিং-এর মাথায় একটা খোঁচা দিয়ে বলল— পেছনে হটো।

ধনসিং এক হাতে ডাণ্ডাটা ছিনিয়ে নিয়ে অন্য হাতে আমীনের কানের পাশে কষে একটা চড় বসাল। আমীনের শরীর তো ওরকম মজবুত নয়, তা ছাড়া নেশার ঘোরে তার পা টলছিল। রাম চড় খেয়ে সে গড়িয়ে পড়ল। পাথরের মেঝেয় মাথাটা লেগে ঠকাস করে শব্দ

করে উঠল। ভয় পেয়ে আমীন চিৎকার করে উঠল -- মেরে ফেলল রে, আমাকে গুঁড়িয়ে ফেলল রে।

ভূষণ দু'পা পিছনে ছিল। ধনসিং ও আমীনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দু'জনকে বাঁচাতে এক লাফে এগিয়ে এল, আর ঠিক সেই মুহূর্তে বাঁ দিকের ঘর থেকে বরকত বেরিয়ে এল। ওর সঙ্গীকে মেরে মাটিতে ফেলে দিয়েছে দেখে বরকতের মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। ও তাড়াতাড়ি একটা ছোরা টেনে নিয়ে ধনসিং এর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ধনসিং ওর হাতটা চেপে ধরতে গিয়ে পিছনে মেঝেতে পড়ে গেল। ছোরাটা ধনসিং-এর দিকে তাক করে মেরেছিল বরকত। আর ঠিক সে সময় ভূষণ ওদের মাঝখানে এসে পড়ায় ছোরাটা গিয়ে বিঁধল ভূষণের ঘাড়ে।

ধনসিং সামনে উঠে ডাণ্ডাটা হাতে নিয়ে বরকতের ওপর লাফিয়ে পড়ল। কিন্তু ফিনকি দিয়ে রক্ত পড়তে দেখে ধরা পড়ার ভয়ে বরকত প্যালিয়ে গেল।

ধনসিং ভূষণের কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখল ছোরাটা কাঁধের কাছে চার আঙুল গভীরে ঢুকে গেছে! গল গল করে রক্ত পড়ছে। পাহাড়নের আয়া ঝগড়া শুনে বারান্দায় ছুটে এসেছিল। রক্ত দেখে সে চিৎকার করে উঠল। আয়ার চিৎকার শুনে পাহাড়ন বাইরে বেরিয়ে এল। সেপাইয়ের উর্দি পরা একজন লোক ও অন্য জনের রক্তাক্ত অবস্থা দেখে পাহাড়নের মুখটা একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

ধনসিং ভূষণের আঘাতের জায়গাটায় হাত দিয়ে চেপে ধরে রক্ত বন্ধ করার চেষ্টা করছিল। এত রক্তপাত হওয়ায় ভূষণের মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল। ও থামটা ধরে বসে পড়ল।

পাহাড়নকে ভয়ানক ঘাবড়িয়ে যেতে দেখে ভূষণ ওকে ডেকে বলল— সোমা ঘাবড়িও না, চিনতে পারছ না তুমি, আমি ভূষণ আর এ ধনসিং।

দু'হাতে দরজার কপাট ধরে কোনোমতে দাঁড়িয়ে রইল পাহাড়ন। গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ফ্যাল ফ্যাল চোখে তাকিয়ে রইল ; যেন মাথার মধ্যে জোয়ার-ভাঁটার ঢেউ আছড়ে পড়ছে।

ভিতরে টেলিফোন বেজে উঠল। টেলিফোন ধরে আয়া চিৎকার করে ডাকল — মেমসাহেব, সাহেব ফোনে ডাকছেন।

পাহাড়নকে নির্বাক নিশ্চল দেখে আয়া নিজেই জবাব দিয়ে দিল— হুজুর, বরকত বাংলোতে খুন করে পালিয়েছে। মেমসাহেব খুব ঘাবড়ে গেছে।

প্রচণ্ড যন্ত্রণায় অধীর হয়েও ভূষণ হাসবার চেষ্টা করল— এ ধনসিং, সোমা। ধনসিং।

ধনসিং চোখ ভরে সোমাকে দেখছিল।

সোমার নিস্পন্দ দৃষ্টি মেঝের ওপর ; ও ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছিল। দরজার কপাটটা ও আরো শক্ত করে ধরেছে।

ভূষণ আবার জিজ্ঞেস করল — কী, চিনতে পারলে না সোমা ?

পাথরের মতো নিথর চোখের দৃষ্টি তুলে ভূষণের দিকে তাকাল সোমা, বলল— আপনারা আমার পিছনে এত পড়েছেন কেন বলুন তো ? আমি সোমা নই। আমি কিছুতেই সোমা নই। চোখ দু'টো ওর রক্তবর্ণ হয়ে গেছে ; গালে দু'ফোঁটা অশ্রু থমকে আছে।

ভূষণ রূঢ় স্বরে বলল -- ঠিক বলছ তুমি সোমা নও ?

পাহাড়ন ভিতরে যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়াল।

মিস পাহাড়ন ! ভূষণ আবার ডাকল— এই দুর্ঘটনা তোমার এখানে হয়েছে। তুমি অযথা বিপদে জড়িয়ে পড়বে। যদি তোমার গাড়িটা দাও তবে এ আমাকে হাসপাতালে পৌঁছে দিতে পারে।

—গাড়ি নিয়ে যান। পাহাড়ন কথাটা বলেই দরজাটা কোনোমতে চেপে ধরে ভেতরে চলে গেল।

ধনসিং আয়াকে জিজ্ঞেস করল— গাড়ি কোথায় ?

আয়া ড্রাইভারকে গাড়ি নিয়ে আসতে বলল।

ধনসিং ভূষণকে সামলে গাড়ির জন্য দাঁড়িয়ে রইল। ঠিক সেই সময়ে একটা হালকা নীল গাড়ি বাংলোর ভেতরে ঢুকতে দেখা গেল।

সুতলীওয়ালা গাড়ি থেকে নেমে সমস্ত ঘটনার ওপর একটা তীক্ষ্ণ নজর যেন ভেতরে চলে গেল। সে আয়ার সঙ্গে কথা বলল। পাহাড়নের কাছ থেকে খুঁটিয়ে সব কথা জানল। প্যান্টে হাত ঢুকিয়ে পায়চারি করতে লাগল ; মুখে দুশ্চিন্তার কালো ছায়া পড়ল। আয়াকে ডেকে পাহাড়নের গাড়ি দিতে বারণ করল। পুলিশে ফোনে করে বলল - মিস পাহাড়নের বাড়িতে গুণ্ডারা মারপিট করেছে। ছোরা চলেছে। একজন জখম হয়ে পড়ে আছে। দয়া করে আপনারা এসে পরিস্থিতি সামলান।

কয়েক মিনিটের মধ্যে পুলিশের গাড়ি এসে পড়ল। ইনস্পেকটর আয়ার বয়ান নিলেন। পাহাড়নের বয়ানও লিখে নেওয়া হল। সুতলীওয়ালা সব ব্যাপারটা ইনস্পেকটরকে ইংরেজীতে বুঝিয়ে বলছিল।

ভূষণ প্রতিবাদ জানিয়ে বলল— এসব বাজে কথা বলা হচ্ছে, সব মিথ্যে কথা।

ইনস্পেক্টর ওকে ভরসা দিয়ে বলল— আমি আপনার বয়ানও নেব। একটু দাঁড়ান।

পুলিশ ভূষণকে গাড়িতে করে হাসপাতালে পৌঁছে দিল এবং ধনসিং-কে হাজতে বন্ধ করে রাখল।

মনোরমা ও অন্য লোকেরা ফোনে খবর পেয়ে ছুটে এল হাসপাতালে। ডাক্তার ভূষণকে পরীক্ষা করে বললেন, অনেকক্ষণ থেকে রক্তপাত হয়েছে, রুগীর অবস্থা সঙ্কটজনক। ক্ষতের জায়গা বেশীক্ষণ অনাবৃত থাকায় এক ধরণের বিষ ঢুকে পড়েছে। অর্দ্ধ-মূর্ছিত অবস্থায়

পড়ে আছে ভূষণ। ওকে ইনজেকশন লাগান হচ্ছে ; কিন্তু অবস্থার কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না।

প্রচণ্ড এক মানসিক আঘাতে নির্জীব বসে আছে মনোরমা ; কেমন যেন বিত্রস্ত, বিক্ষিপ্ত মুখের ভাব, চোখের দৃষ্টি। দু'জন বন্ধুর সঙ্গে মনোরমা ভূষণের বিছানার কাছে ঝুঁকে আছে। ভূষণ অর্দ্ধ-মূর্ছিত অবস্থায় বারবার একটা কথাই বলে যাচ্ছে — আমি তো আগেই বলেছিলাম। আরো কী যেন বিড়বিড় করে বলে যাচ্ছিল ভূষণ। কিন্তু অন্য কেউ তা বুঝতে পারছে না। শুধু মনোরমার মনে পড়ছে, ভূষণ নিশ্চয় বলছে — এর পরিণাম যা হয় তার জন্য পুরোপুরি তুমি দায়ী হবে কিন্তু।

ডাক্তার ভূষণের শরীরে রক্ত দিতে চাইলেন। কমরেড ও মনোরমা নিজের রক্ত দান করতে প্রস্তুত। ডাক্তার একজনের রক্ত নিয়ে নিল কিন্তু রক্ত দেবার আগেই ভূষণের অবস্থা হঠাৎ খুব সঙ্কটজনক হয়ে পড়ল। এই অবস্থায় রক্ত দেওয়ার কোনো অর্থ নেই। কিন্তু সঙ্গীদের অনুরোধে ডাক্তার রক্ত দিতে রাজী হলেন।

পার্টি-মন্ত্রী যোশী সাহেব ও বি. টি. খবর পেয়ে ভূষণকে হাসপাতালে দেখতে এলেন। এ ঘটনার সব কথা তাঁরা মনোরমার কাছে শুনতে চাইলেন। কিন্তু মনোরমার পক্ষে এখন কিছু বলা সম্ভব ছিল না।

ভূষণকে বাঁচাবার শেষ চেষ্টা হিসেবে অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছিল। কম্যুনিস্ট পার্টি সমর্থক একজন ডাক্তার ভূষণের নাড়ী টিপে বসে ছিলেন। তিনি ভূষণের হাত বিছানার ওপর রেখে দিয়ে মাথা নেড়ে আস্তে আস্তে ঘোষণা করলেন — সব শেষ।

মনোরমা ভূষণের খাটের এক কিনারে বসে প্রতি মুহূর্তে যেন নিঃস্ব ও রিক্ত হয়ে উঠছে। ভূষণ শেষ হয়ে গেছে শুনে হঠাৎ ও ওয়ার্ডের বারান্দার দিকে ছুটে গেল। দোতলায় হাসপাতালের এই ওয়ার্ড।

কিছু একটা সন্দেহ করে যোশীজী দ্রুত ছুটে গেলেন এবং বারান্দার গাছাপালার আড়ালে ধাবমান মনোরমাকে ধরে ফেলে পিছনের দিকে টেনে নিলেন। ছোট ছোট চোখ মেলে ধরে যোশীজী বললেন— বন্ধু, এর চেয়ে বড়ো কাজের জন্য তোমাকে বেঁচে থাকতে হবে।

মনোরমা মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

জ্ঞান ফিরে এলে মনোরমার ধনসিং-এর কথা মনে পড়ল। পার্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উকিলদের দিয়ে মনোরমা ধনসিং-কে জামিনে খালাস করার চেষ্টা করল। উকিলরা পুলিশদের কাছ থেকে জানতে পারল ধনসিং চায় নি ভূষণের ওপর এই ঘটনার কোনোরকম আঁচ পড়ুক আর তাই যা-কিছু ঘটেছে অদ্যোপান্ত সে সব তার বয়ানে লিখিয়েছে। বোম্বাই-এর পুলিশ বরকতের তালাস করছে। পাঁচ বছর আগে ধনসিং পাঞ্জাব-ধরম-শালায় যে খুন করেছিল তাও সে পুলিশের কাছে নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছে আর সেজন্য তাকে হাজতে আটকে রাখা হয়েছে। ওকে জামিনে খালাস করার অধিকার শুধু পাঞ্জাব-ধরমশালার আদালতেরই আছে, আর কারুর নয়।

মনোরমার মানসিক ও শারীরিক অবস্থা বিচার করে পার্টি কোয়ার্টারের একটা ঘরে চারপাইয়ে শুইয়ে রাখা হয়েছে। সুমতী ওর শুশ্রূষার ভার নিয়েছে। পার্টির ডাক্তার ওকে অনবরত ওষুধপত্র দিয়ে যাচ্ছেন। ওকে মন্ত্রীমহোদয়ের ইচ্ছা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে মনোরমা একটু সুস্থ হলে ওর কাছ থেকে তিনি সমস্ত ঘটনা অদ্যোপান্ত শুনতে চান।

মনোরমার পক্ষে যতটা সম্ভব হল, সে সব কথা পার্টির মন্ত্রীর কাছে খুলে বলল ; ও কেন পাহাড়নের কাছে ভূষণকে পাঠিয়েছিল, আর পাহাড়ন ও ধনসিং-এর মধ্যে কত গভীর ভালবাসা ছিল— সেই সব পুরনো কথা। মনোরমার সামনে এর কোনো বন্ধু ওকে কিছু বলতো না।

কিন্তু বারান্দায় ওকে নিয়ে যে সব আলোচনা হত তার কিছু কিছু ওর কানে এল। পার্টির নেতারা এ-ব্যাপারটায় খুবই বিরক্ত এবং অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তাঁদের এই অভিমত যে, ভূষণের মত এমন একজন সুদক্ষ ও কর্তব্যপরায়ন পার্টির কর্মীকে পার্টির হুকুম ছাড়া এ-ব্যাপারে ফাঁসানো একেবারে উচিত হয়নি। এরকম ক্ষেত্রে বিরোধী কোনো পার্টি কোনো সদস্যের জীবনের কোনো ঘটনাকে কাজে লাগিয়ে কম্যুনিষ্ট পার্টির নামে কলঙ্কের বোঝা আনতে পারে। নভেম্বর মাসে যখন পার্টির দপ্তরের উপর হামলা হয়েছিল তখন কম্যুনিষ্ট বিরোধী পত্রিকাগুলি কী না লিখেছিল। সদস্যদের ব্যক্তিগত ব্যবহারের ওপর গোটা পার্টির স্থিতি ও সুনাম নির্ভরশীল। মনোরমা এসব শুনে নিশ্চুপ হয়ে রইল।

সকালবেলা দৈনিক পত্রিকাগুলির সরবরাহের ভার ভোঁসলের ওপর। মনোরমা অসুস্থ বলে ভোঁসলের সহানুভূতির অন্ত নেই; তাই একটা পত্রিকা প্রথমেই সে মনোরমাকে পাঠিয়ে দিয়েছিল। ঘোর কম্যুনিষ্ট বিরোধী এই পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় খবরটা এরকমভাবে ছাপা হয়েছিল :

"প্রসিদ্ধ কম্যুনিষ্ট নেতা কমরেড ভূষণ এক গুণ্ডার সঙ্গে হামলায় জড়িয়ে পড়ে জখম হয়েছেন এবং তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।" নীচে বিস্তৃত বিবরণ :

"বিশ্বস্তসূত্রে জানা যায় যে এ্যাক্‌ট্রেস মিস পাহাড়নের ব্যাপারে স্থানীয় গুণ্ডাদের সঙ্গে কমরেড ভূষণের বহুদিন ধরেই মনোমালিন্য ও ঝগড়া চলছিল। কমরেড ভূষণ তার নিজের এক পরিচিত গুণ্ডাকে পাঞ্জাব থেকে ডেকে আনেন এবং স্থানীয় গুণ্ডাদের ওপর হামলা করতে গিয়ে নিজে জখম হয়। প্রডিউসার শ্রীসুতলীওয়ালা এই ঘটনা সম্পর্কে জানতে পেরে পুলিশ ডাকেন এবং পরিস্থিতি আয়ত্বে নিয়ে আসার ব্যাপারে যথেষ্ট চাতুর্য্য ও সাহসের পরিচয় দেন। ভূষণ হাসপাতালে। স্থানীয় গুণ্ডা এখনও পলাতক। ভূষণের পরিচিত গুণ্ডাকে হাজতে

আটকে রাখা হয়েছে। কমুনিষ্টরা ভূষণের বন্ধু গুণ্ডাকে জামিনে খালাস করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু জামিনের আবেদন না-মঞ্জুর হয়েছে।" খবরটা পড়ে মানারমা স্তব্ধ হয়ে বসে রইল; তার হাত থেকে পত্রিকাটা মাটিতে খসে পড়ল।

সুমতী এসে দেখল মনোরমা প্রায় অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে। তাড়াতাড়ি ডাক্তারকে খবর দিল। পত্রিকাটা হাতে তুলে সুমতী একটু চোখ বুলিয়েই বুঝল মনোরমা হঠাৎ কেন বেহুঁশ হয়ে পড়েছে। দেড় ঘণ্টা পরে মনোরমা চোখ মেলে তাকালো। প্রথমেই তার কানে এল, বাইরের বারান্দায় কে-যেন ভোঁসলেকে খুব ডাঁটছে:

— তুমি ওকে এই খবরের কাগজটা দিয়েছ?

কাতরস্বরে ভোঁসলে মাথা মেড়ে বলল— সহকর্মী অসুস্থ, তাই ভাবলাম, পত্রিকা পড়লে মনটা ভালো লাগবে।

মনোরমা আবার বেহুঁশ হয়ে পড়ল। ডাক্তারও বুঝে উঠতে পারছেন না আবার মনোরমার কখন জ্ঞান ফিরবে। জ্ঞান ফিরবে তো? শরীরের এই অবস্থায় প্রচণ্ড একটা মানসিক আঘাত নিশ্চয় মারাত্মক হতে পারে